বৃহৎ-ভারত সংস্কৃতি

সমুদ্র-মেখলা, নারিকেল-পত্র-মর্মরিত যবদ্বীপের এক নির্জন বনস্থলীতে স্থাপত্যশিল্পের যে অনুপম ঐশ্বর্য্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে বিমুগ্ধ করেছিল তা বর-বুদুর—হিন্দু-বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের এক অপূর্ব নিদর্শন ! প্রায় বারশো বছর আগে এর সৃষ্টি।......

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে জাপানের এক মন্দির গাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা তন্ত্রের মন্ত্র। লেখাগুলি ছিল অবশ্য সুপ্রাচীন গুপ্তযুগের ব্রাহ্মিলিপিতে। এই গুপ্ত ব্রাহ্মিলিপি থেকেই বাংলা অক্ষরের সৃষ্টি। স্বামীজীর চোখে বিশেষ ভাবে পড়লো 'ওঁ হ্রীং ক্রীং' কথা কটি। নেপাল, সিকিম, ভুটান, লাদক, চীন ও জাপানের মঠে-মন্দিরে আজও এই লেখাগুলি দেখা যায়। এই সব অঞ্চলে যে একদিন বুদ্ধের অহিংসার বাণীর পাশাপাশি ভারতবর্ষের শৈবধর্ম ও তন্ত্রমন্ত্র প্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই সুদূর অতীতে বাঙালী ধর্ম-প্রচারকগণই প্রাচীন বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত মন্ত্রগুলি এশিয়ার দেশে দেশে মন্দির-প্রাচীরে উৎকীর্ণ করে এসেছিলেন।···

দুরন্ত মরু-অভিযাত্রী স্যার অরেলষ্টিন (Sir Aurel Stein) মধ্য-এশিয়ার তাক্‌লামাকান মরুর নীচে ঘুমিয়ে-পড়া এক প্রাচীন নগর আবিষ্কার করেন। সেখানে পাওয়া যায় বৌদ্ধস্তূপ, বিহার, বুদ্ধমূর্তি আর ভারতীয় ভাষায় লেখা প্রাচীন পুঁথি। স্যার অরেলষ্টিন অবাক হয়ে দেখলেন পাঞ্জাবের কোন প্রাচীন শহরকে যেন তুলে এনে বসানো হয়েছে।......

সপ্তম শতকে প্রখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন-সাঙ্‌ দেখেছেন মধ্য এশিয়ার গ্রামে, নগরে, হিন্দু-বৌদ্ধ, সংস্কৃতি-সভ্যতার চিহ্ন। জনশ্রুতি আছে যে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খাঁ বৌদ্ধ শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করেন।......

ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতি যে একদিন কাস্পিয়ান হ্রদের তীরভূমি থেকে এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে চৈনিক প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

আরব সাগরের সকোত্রা ও ভারত · হাসাগরের মাদাগাস্কার থেকে প্রশান্ত

সূচীপত্র

(প্রথম ভাগ)

[ভারত-সংস্কৃতির ধারা]

(দ্বিতীয় ভাগ)

[ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা]

(তৃতীয় ভাগ)

[প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি]

(চতুর্থ ভাগ)

[কয়েকজন আধুনিক চিন্তাবিদের
দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতি]

উপক্রমণিকা

ধর্মের সঙ্গে কৃষ্টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। শুধু যে ভারতে ধর্ম, কৃষ্টিকে প্রেরণা যুগিয়েছে তা নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। তবে ভারতে এই বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে লক্ষণীয়।

ভারতে ধর্ম মানে শুধু প্রার্থনা, উপবাস, তীর্থ-যাত্রা নয়, সব কাজই ধর্ম। অন্নপ্রাশন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যা কিছু আমরা করি তাই ধর্মের অঙ্গ। এই অর্থে ধর্মের অঙ্গ যা তা দিয়ে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগুচ্ছি, অথবা তা থেকে পেছিয়ে যাচ্ছি। কি আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য? আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ, মুক্তি। আমরা এখন সসীম, অসীম হতে চাই। নদী যেমন সমুদ্রের সঙ্গে মিলতে চায়, মিললে অসীম হয়, মুক্তি লাভ করে, আমরাও তাই ঈশ্বরের সঙ্গে মিলতে চাই, কারণ একমাত্র তিনিই অসীম এবং তাঁকে লাভ করতে পারলেই আমরা সমস্ত গণ্ডী অতিক্রম করে মুক্ত হতে পারি, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সবাই এই মুক্তির সন্ধানে চলেছি। মুক্তিতেই আনন্দ, বদ্ধ অবস্থায় আমরা কখনও সুখী হতে পারি না। আমাদের জীবনের সমস্ত প্রয়াস এই মুক্তির উদ্দেশ্য। যখন ভুল করি, অন্যায় করি, তখন হয়ত সাময়িকভাবে এই প্রয়াস ব্যাহত হয়, তবে আমরা আমাদের ভুল শুধরে নিতে পারি এবং আমরা নূতন উদ্যমে মুক্তির সন্ধানে অগ্রসর হতে পারি।

আমরা চাই সকল বন্ধনের অবসান, আত্যন্তিক মুক্তি। আপেক্ষিক মুক্তি আমাদের সাময়িক আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু যে আনন্দের কোন ক্ষয় নেই, যা চিরস্থায়ী, তা পেতে গেলে আত্যন্তিক মুক্তিলাভ করতে হবে। তাই মুক্তি লাভ হয় ঈশ্বর লাভ করলে। যিনি অসীম, যিনি সমস্ত বন্ধনের ঊর্ধ্বে, যিনি মুক্তি স্বরূপ। ঈশ্বরকে পেলে আর কিছুই পাওয়ার থাকে না। ঈশ্বর-প্রাপ্তিই পরম প্রাপ্তি। তাঁকে পেলেই মানুষ পূর্ণ হয়, তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত সে অপূর্ণ, সে সসীম, বদ্ধ। তাঁকে পেলেই আনন্দ, কারণ তিনি আনন্দ-স্বরূপ। তাঁকে পাওয়া মানে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, যখন বিন্দু সিন্ধুতে মিলে যায়, সেও সিন্ধু হয়; সে তখন আর ক্ষুদ্র থাকে না, সে ভূমা হয়।

প্রথমে আমরা মনে করি ঈশ্বরকে বুঝি শুধু বাইরে পাওয়া যায়। তাঁকে তাই আকাশে খুঁজি, পাহাড়, পর্বতে খুঁজি, বন, জঙ্গলে খুঁজি, গ্রহ, নক্ষত্রে খুঁজি, প্রকৃতির বিচিত্র লীলার মধ্যে খুঁজি। ক্রমে বুঝতে পারি তিনি শুধু বাইরে নন, আমার মধ্যে, আপনার মধ্যে, আমাদের সকলেরই মধ্যেই বিরাজ করছেন। তিনি আমাদের অন্তরাত্মা। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনিই আমাদের সব কিছুর উৎস। যা কিছু বলি বা করি, তার ভিতর দিয়ে তাঁকেই প্রকাশ করার চেষ্টা করি।

তাঁকে প্রকাশ করার চেষ্টার অন্যতম নাম সংস্কৃতি। যে জাতি যত সুন্দরভাবে তাঁকে প্রকাশ করতে পারে, তাঁর সংস্কৃতি তত সুন্দর। গানে, সাহিত্যে, শিল্পে যেভাবে বা যে ভঙ্গীতেই হোক না কেন, তাঁকেই আমরা প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। যে শিল্পী গভীরভাবে তাঁকে অনুভব করে, তার শিল্প সৃষ্টি তত সুন্দর। শিল্পী তার অনুভূতিকেই রূপ দিতে চেষ্টা করে, তাই তার সৃষ্টি নিজস্ব, অপরের সঙ্গে তার মিল হয় না, এমন কি বাস্তবের সঙ্গেও হয় না। চিত্রশিল্পী গাছের ছবি আঁকে, হয়ত সেই গাছ বাস্তবে যে গাছ দেখি, তার মত নয়, আলাদা। আলাদা এই কারণে যে চিত্রশিল্পী তার মনের মুকুরে যে গাছ দেখে তারই ছবি সে আঁকে এবং তা স্বভাবতঃই বাস্তবের গাছ থেকে আলাদা।

ধর্মের সঙ্গে কৃষ্টির সম্পর্ক যে কত নিবিড় তা বুঝা যায় কয়েকটা দৃষ্টান্ত থেকে। সামবেদই বোধহয় আদি সংগীত গ্রন্থ, কিন্তু সেই সামবেদ দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত। বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে কত না সাহিত্য ও শিল্প গড়ে উঠেছে। তেমনি গড়ে উঠেছে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েও। অন্যান্য অবতার বা ধর্মগুরুও প্রেরণা জুগিয়েছেন বিভিন্নযুগের সাহিত্য ও শিল্প প্রচেষ্টাকে। ভরতের সমগ্র কৃষ্টি এইভাবে ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন গ্রীসেও দেবদেবীকে নিয়ে কাব্য, নাটক ও স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল। পরে ভগবান যীশুকে কেন্দ্র করেও কত না শিল্পসম্ভার সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্য জগতে।

পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার, ঈশ্বরের সাথে মানুষের মিলনের যে আকুতি, তাই নিয়েই জীবন। সেই জীবনের প্রতিফলন নানা ভঙ্গীতে, নানা রূপে সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে। কৃষ্টি এই সব প্রয়াসের সমষ্টি। ভারতের কৃষ্টি অতি প্রাচীন এবং বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু এই কৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভারতের মানস জগতের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভারতের

সেই মানস জগতকে জানতে সহায়তা করবে, এই আমাদের আশা। বহু গুণী ব্যক্তি তাঁদের লেখা দিয়ে এই গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাঠকরা বইখানি পড়ে ভারতাত্মাকে জানতে আগ্রহী হয়েছেন দেখলে আমাদের চেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করব।

আমাদের কথা

ভারতবর্ষের সভ্যতা তপোবনাশ্রিত সভ্যতা। তার সংস্কৃতির মূলে রয়েছে তপোবন। এই ভারতবর্ষের তপোবন থেকেই একদিন উচ্চারিত হয়েছিল,, "মা হিংসীঃ,"—হিংসা করো না—ভালবাসায় জয় কর মানুষের হৃদয়-"মা-গৃধঃ,"—লোভ কোর না। 'দম, দত্ত, দয়ধ্বম্'—রিপুকে দমন কর, দীন দুঃখীকে দান কর, আর্তপীড়িতকে দয়া কর। এ সকল কথাই সত্যদ্রষ্টা আর্য ঋষিদের জীবনে, পরীক্ষিত সত্যের সারাৎসার।

অতীত ভারতবর্ষের প্রায় সমকালের সুসভ্য-দেশ—গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন, আজ ইতিহাসের স্মৃতি মাত্র। বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ ভোগ্যবস্তুলোভী তারা জড়, প্রাণী, বৃক্ষলতাদির অন্তর্লীন চৈতন্য শক্তির সন্ধান পায়নি। তাই তাদের হীরা-মাণিক্যের ঘটা, অস্ত্রের ঝনৎকার, ভোগ-লালসা, শক্তির দম্ভ কবে ইতিহাসের আবর্জনাকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিদুষী মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে বলেছে—অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা নিয়ে কি করবো কারণ—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্"—যাতে আমি অমৃত হয়ে উঠবো না, তা নিয়ে আমার কি প্রয়োজন? ভারতবর্ষের সাধনা এই অমৃতলাভের সাধনা। অমৃতত্ব তাই যা ক্ষুদ্রত্বের খাঁচা ভেঙ্গে—অসীমের, অনন্তের, আস্বাদ দেয়। তাই ইতিহাসের চক্রে যখন দম্ভী হিংস্র শাসককুলের রাজছত্র বিচূর্ণ হয়েছে, তখনও ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী ধ্বনিত হয়েছে—কখনও সংসারত্যাগী শ্রমণ, অর্হৎএর কণ্ঠে, কখনও বা রাজৈশ্বর্যত্যাগী ভোগলিপ্সাহীন সন্ন্যাসী রাজপুত্রের আত্মত্যাগের জীবনবাণীতে। ভারতবর্ষের আদর্শ চিরামর, কারণ তা ভোগকে নয়, ত্যাগকে, হিংসাকে নয়, অহিংসাকে আশ্রয় করে আছে। তা প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে মূল্য দিয়েছে বেশী। জীবনে অভিজ্ঞতার নিকষে পরীক্ষিত সত্যজ্ঞানকে ভারত গ্রহণ করেছে বলেই অশ্রদ্ধাকে কখনো সে প্রশ্রয় দেয়নি। সে জানে "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"—যে শ্রদ্ধাশীল সে জ্ঞান লাভ করে। ভারত-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাণীবহ গীতার কথা হল—অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। অজ্ঞতা, অশ্রদ্ধা এবং সংশয়ই বিনাশের হেতু। খাদ্য, পানীয়, প্রভৃতির প্রয়োজন জীবনে অবশ্যই আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রথমে অন্নকেই "ব্রহ্ম" বলা হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন আমাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা—ব্রহ্ম, আনন্দ-স্বরূপ। মর্তের ধূলিকণা থেকে মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও সংযোগ উপলব্ধি

করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা। প্রতিটি জীব, জড়, বৃক্ষলতার মধ্যে ব্রহ্মের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই তাঁরা বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বসুধৈব কুটুম্বকম্—সারা বিশ্বই আত্মীয়—এই সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলেন। বিশ্বের একত্ব ও অখণ্ডত্ববোধ তাঁদের মধ্যে জেগেছিল। তাঁরা জেনেছিলেন এক ব্রহ্মই বহুরূপে প্রতিভাত, —"একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।"

ত্যাগ, প্রেম, বিশ্ববোধ ও সর্বভূতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরবোধকে আশ্রয় করেই ভারতবর্ষের মহাদুর্দিনে আচার্য শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, দেশ ও জাতিকে রক্ষা করেছিলেন। আধুনিক কালেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ— সহস্র-সমস্যা-জর্জরিত ভারতবর্ষকে যে সুধা সঞ্জীবনীর সন্ধান দিয়েছিলেন, তা অদ্বৈত-বেদান্ত। যা তাঁকে এই সত্য উপলব্ধিতে পৌঁছে দিয়েছিল,—

"জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

জীবকে সেবা করার ভিতর দিয়ে, সেবক ও সেব্যের মধ্যে একত্ব অনুভূত হবে। জীবনে অদ্বৈততত্ত্বকে এমনি করেই গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন স্বামীজী।

মনন-সর্বস্ব অদ্বৈত-বেদান্তকে প্রীতি ও ভালবাসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে বেদান্তকে এক নবমূর্তি দান করে গেছেন তিনি। আবার বেদান্তের মূল দুটি শিক্ষা—প্রসারণশীলতা ও নির্ভীকতার দিব্য প্রেরণা দেশকে দিয়ে গেছেন তিনিই। তাই দেশের শৃঙ্খল-মোচনের জন্য স্বামীজীর "অভীঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত তরুণেরা অক্লেশে হাসিমুখে ফাঁসী বরণ করেছেন। সর্বজীবে ব্রহ্ম বিদ্যমান— গীতার এই অবিনাশী শাশ্বত বার্তা স্বদেশী যুগের তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। স্বামীজী তাঁর জীবনবাণীর মধ্য দিয়ে একথাই আগামী ভারতবর্ষকে শুনিয়ে গেছেন। পরমগুরু যম—জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থী নচিকেতাকে যে দিব্যবাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন—সেই "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত"—বীজমন্ত্রেই স্বামীজী আধুনিক ভারতবর্ষের তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

প্রজ্বলন্ত ত্যাগের প্রতিমূর্তি, অগ্নির ন্যায় পরিশুদ্ধ চরিত্র তরুণ বিবেকানন্দকে তাঁর গুরু, আত্মমোক্ষলাভের,—স্বার্থপর পথের পথিক হতে দিলেন না— "বহুজন-সুখায়, বহুজন-হিতায়,"—দেশ ও দশের সেবায় উৎসর্গ করলেন তাঁকে। বিবেকানন্দের জীবন শুধু ভারতবাসীর কাছে নয়, বিশ্ববাসীর নিকটও পরম শিক্ষণীয়। ভারত-সংস্কৃতির মহাবাণীর প্রোজ্জ্বল বিগ্রহ তিনি। কে কি বলছে

সেটা বড় কথা নয়, কে কি করছে সেটাও এমন কিছুই নয়—কে কি হয়ে উঠেছে (Becoming) সেটাই জীবনসাধনার সার কথা। বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় ত্যাগের পরাকাষ্ঠা ; সামান্যতম স্থূলভোগের মালিন্যও সে জীবনে স্পর্শ করেনি। সন্ন্যাসী হয়েও আপন দেশ, সমাজ ও দুঃখী মানুষকে তিনি ভোলেননি। সকল যুগের সব সাধনার শ্রেষ্ঠ সমন্বয়-সাধক—শ্রীশ্রীঠাকুর দেশের এক বিপর্যয়ের লগ্নে এসেছিলেন—দেশকে, জাতিকে, সমাজকে পরানুকরণ থেকে ফিরিয়ে,—জড় ভোগ্যবস্তুর মোহমুক্ত করে—চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর-অভিমুখী করতে। তাঁরই হাতের অনুপম যন্ত্র বিবেকানন্দ দেশকে ভালবাসতে শিখিয়ে গেছেন,—দেশের তারুণ্যশক্তিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। দেশে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেশের ছেলেদের অর্থকরী বিদ্যাদানের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছেন। কিন্তু দেশের শাশ্বত আত্মীক ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ করে তাদের যথার্থ ত্যাগব্রতী মানুষ হবার প্রেরণা দিয়েছেন সবার আগে। ইউরোপ, আমেরিকার মতো শিল্পসমৃদ্ধ দেশরূপে গড়ে ওঠাই তো শুধু ভারতের লক্ষ্য নয়—কারণ অনেক ঐশ্বর্য, অনেক ভোগে আত্মার তৃপ্তি নেই। পাশ্চাত্যের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে স্বামীজী তাদের ক্লান্তি, অতৃপ্তি, তৃষ্ণাকে সঠিক ভাবেই বুঝেছিলেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যাকে গ্রহণের পক্ষপাতী হলেও—পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করুক ভারত—এ তিনি চাননি।

তিনি চেয়েছেন প্রত্যেকটি মানুষ, প্রত্যেক জাতি, আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকশিত হবে—সে বিকাশ হবে ধর্ম ও ঈশ্বর আশ্রয়ী।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'ধর্ম' অর্থে বুঝায়, 'যা ধারণ করে থাকে'—অহিংস সত্য, ব্রহ্মচর্য, অপ্রতিগ্রহ, অচৌর্য, সন্তোষ, ঈশ্বর-প্রণিধান, স্বাধ্যায় ইত্যাদি আশ্রয় করে চরিত্র গঠিত হলে তাকেই ভারত বলে 'ধার্মিক'। যিনি ধার্মিক তিনি আত্মস্থ,—সচ্চিদানন্দে ভরপুর।

তাই ধার্মিক মানুষ যে দেশেই থাকুন তাঁদের মধ্যে বিরোধ অসম্ভব। কাজেই মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে বিরোধের অবসান ঘটবে মানুষ ঈশ্বর-পরায়ণ ধার্মিক হলে। এই ধর্মবোধের অভাবেই বিজ্ঞানশক্তিতে বলীয়ান ইউরোপ-আমেরিকা ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্যের মধ্যেও ক্লান্ত এবং নিঃসঙ্গ। যুদ্ধের হিংস্র উত্তেজনার মধ্যে তার যন্ত্রণার সাময়িক উপশম।

মানুষের মধ্যে নিত্য চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বর্তমান, এই বোধ জাগ্রত হলে —মানুষে মানুষে হিংসার কারণ ঘটবে না।

মানুষ যেদিন উপনিষদের মহাবানী "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"—বিশ্বের সকলকিছুকে ঈশ্বর আবৃত করে আছেন—ভারতীয় সংস্কৃতির এই মূল কথাটি উপলব্ধি করবে এবং বুঝবে,—

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
নহিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥"

["—সকল স্থলে, সকলের মধ্যে—ঈশ্বর আছেন। এরূপ দর্শনকারীর জীবনে হিংসার অবকাশ নেই, পরমাগতি তিনিই প্রাপ্ত হন।"] এই উপলব্ধিই জগৎ-সংসারের সকল বিরোধের অবসান ঘটাবে।

মানুষ জগতে তার আসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জানেনা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।" এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের এষনায়ই ভারতীয় দর্শন-সংস্কৃতির উদ্ভব। তার শিল্পে, সাহিত্যে, বেদমন্ত্রে সেই পরম রহস্য-ভেদের অভীপ্সা। চিরকালীন জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীর প্রতিভূ নচিকেতার মুখ দিয়ে ভারতবর্ষের মর্মবানীই ধ্বনিত :—

শ্বোভাবা মর্ত্তস্য যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়ানাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বজীবিত মল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥—

["ভোগের বস্তু আগামীকালও থাকবে কিনা সন্দেহ। ভোগে ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় হয়। মানব-জীবন পদ্মপত্রের জলের মত যে কোন মুহূর্তে নষ্ট হতে পারে। অতএব অশ্ব এবং নৃত্যগীত প্রভৃতি তোমারই থাকুক। এসবে আমার কাজ নেই।"]

ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যো লপ্সা মহে বিত্তমদ্রাক্ষ্মচেত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যামি ত্বং পরস্তমে বরণীয়ঃ স এব।

["—মানব মন কেবল ঐশ্বর্য্য ও ভোগে তৃপ্ত হয় না। তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন বিত্ত অবশ্যই পাব। তুমি প্রভু যতদিন আছ, ততদিন জীবিত থাকব। কিন্তু আমার পুর্বোক্ত বর—আত্মতত্ত্বই প্রার্থনীয়।"]

ভারতবর্ষ চিরদিন জানে—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।"
"যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ নাল্পে সুখমস্তি।"

["যা অসীম ও অনন্ত তাতেই শাশ্বত আনন্দ তাই অমৃত,—জগতের সবকিছুই স্বল্পস্থায়ী এবং দুঃখদায়ক।"]

পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞান-দর্শন বলে অহরহ দ্বন্দ্ব ও হিংস্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে

মানব সভ্যতার অগ্রগতি ঘটছে—সনাতন ভারত সংস্কৃতির নবব্যাখ্যাতা স্বামীজী বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেছেন জীবনসংগ্রাম (Struggle for existence) ও প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) জীবজগতের নিম্ন-স্তরে সত্য হলেও মানুষের স্তরে এটি মোটেই খাটে না। 'রাজযোগ' গ্রন্থে স্বামীজী দেখিয়েছেন পাশ্চাত্যের জীবনসংগ্রামের তত্ত্ব যদি সত্য হত, তবে মানব ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের নাম বিলুপ্ত হত। ভারত সংস্কৃতির এই তত্ত্ব ও তথ্য আজকের তরুণদের কাছে অবশ্য শিক্ষনীয়।

তাই শিক্ষার্থীদের "আত্ম-বিদ্ধির" (Know thyself) মধ্যে দিয়ে আত্মস্থ করতে হবে। তাদের বুঝতে দিতে হবে, তারা কারা। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই গল্পে আছে—"এক গর্ভিনী বাঘিনী ছাগল পালে পড়ে,—তখন তার প্রসব হয়ে যায়। ছানা পড়ে থাকে, বাঘিনী যায় মরে। বাঘের ছানা বড়ো হয়, ছাগলের পালে। ঘাস খায়, ডাকেও ভ্যা, ভ্যা করে। একদিন এক বাঘ তাকে ধরে জলের কাছে নিয়ে গিয়ে জলে তার মুখ দেখিয়ে বললে—"দেখ, তুই বাঘ—ছাগল নয়।" এই নিজেকে চেনার জন্য দরকার এমন শিক্ষাপ্রকল্প—যেখানে—ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটবে ছাত্রদের, তারা নিজেদের জানবে তবেই তারা দেশকে ভালোবাসতে শিখবে এবং শ্রদ্ধাপরায়ণ বিনীত জিজ্ঞাসু ছাত্রও অনলস, ত্যাগব্রতী, দেশকর্মী হয়ে উঠবে।

তারা সবিস্ময়ে দেখবে বহু সহস্র বৎসরের ভারত-সংস্কৃতির ধারায় বিরোধের অবকাশ নেই। শক, হুণদল, মোগল, পাঠান যেমন এক দেহে লীন হয়েছে—এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে—তেমনি তাদের রক্ত মিলেছে ভারতবাসীর দেহে—তাদের আচার আচরণ, ভাষা, শিল্পবোধ ভারত-সংস্কৃতির ধারাকে করেছে পরিপুষ্ট। সুপ্রাচীন নেগ্রিটো, অষ্ট্রিক, মঙ্গোলিয় ও আর্যজাতির মিলনে এক মহাজাতির সৃষ্টি হয়েছে। আর্যপ্রজ্ঞার সহিত মিশেছে দ্রাবিড় ভক্তিবাদ।

পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শে বিশ্বাসী ভারত কাউকে উৎখাত করেনি—কর্মভেদ অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে—তার বিশাল সমাজ-দেহে স্থান দিয়েছে সকলকে। ভারতবর্ষ মানবসভ্যতার এক পরমাশ্চর্য্য যাদুঘর। বিভিন্ন আচার, আচরণ, ধর্ম, ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমন্বয়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে সে। পরমত সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাই তার সাধনার মূলমন্ত্র। একথা যেদিন আমাদের ছাত্রেরা জানবে সেদিন তারা হবে শ্রদ্ধাশীল, সহিষ্ণু, দেশপ্রেমিক, বিশ্বমানবের দুঃখবেদনায় শরীক, যথার্থ অনাসক্ত কর্মযোগী। শান্তম্, শিবম্ অদ্বৈতমের পুজারী।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের শিক্ষা পাঠক্রমের মধ্যে ধর্ম-সংস্কৃতি শিক্ষার স্থান সীমিত। এসব পড়াবার মত উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব। তা সত্ত্বেও আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘকাল ধরে ভারত-সংস্কৃতির পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু উপযুক্ত পুস্তকের অভাব বোধ করেছি বহুদিন, কারণ একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত-পরিসর গ্রন্থের মধ্যে ভারত-সংস্কৃতির সামগ্রিক আলোচনা আজও কেউ করেছেন বলে জানা নেই। তাই সেই অভাব পূরণের জন্য এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা। এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে ছাত্র ও পাঠক দেখবেন বহিরঙ্গে আপাতঃ বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই সাংস্কৃতিক পাদপীঠে বিশাল ভারতের অখণ্ড সত্তা বিধৃত, মহাভারতের জাতীয় সংহতির স্বর্ণ-সূত্র, তার সংস্কৃতি ও সাধনা।

কোন দেশের সংস্কৃতি বলতে তার শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, খাদ্য, পোষাক, ভাষা, সংস্কার এমনকি ধর্ম চেতনাকেও বোঝায়। বস্তুতঃ সেই দেশ ও জাতির সমগ্র-জীবনচর্যারই প্রকাশ ঘটে তার সংস্কৃতির মাধ্যমে। তাই ভারত-ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মূল কথাটি বলতে গিয়ে বিগত কয়েক সহস্র ব্যাপী তার শিল্প সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস বিজ্ঞান, দর্শনের বিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ করতে হবে।—ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক চিন্তার কেন্দ্রে (Nucleus) রয়েছে ধর্ম। এ ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক আচার অনুষ্ঠানের নয়—এ ধর্ম তার আত্ম-সংযমের ফসল—চিত্তভূমি কর্ষণের (Cultivation) ফলে এর সৃষ্টি। Culture (কৃষ্টি বা সংস্কৃতি) শব্দটির সঙ্গে Cultivate (কর্ষণ) কথাটির বেশ মিল আছে। ধাতুমূল দুয়েরই এক, একটি ভূমি কর্ষণের ফলে ফসল ফলায়, তাতে উদর পূর্তি হয়। আর মনোভূমি কর্ষণের ফল, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কি ধর্মচিন্তা। তা' মনের ক্ষুধা মেটায়। এই Culture বা সংস্কৃতির মধ্যেই একটা দেশের সত্য পরিচয় নিহিত। এই গ্রন্থের বিভিন্ন নিবন্ধের মধ্যে এই সত্যটিই প্রোজ্জল হয়ে আছে।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। ঈশ্বর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উর্ধ্বে সে স্থাপন করেছে—সত্য, ও ন্যায়কে, মানব-প্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতাকে। এখানে যেমন অদ্বৈত দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, ঈশ্বর বিশ্বাসী আছেন, তেমনি সাংখ্যকার কপিল, নাস্তিক চার্বাকও আছেন। ঈশ্বর সম্পর্কে নীরব, অহিংসার মন্ত্রগুরু বুদ্ধ ও মহাবীরের জন্মও এই দেশে। শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্প আজও বিশ্বের বিস্ময়। সেই শিল্প, ধর্ম সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুদূর অতীতে সাগর পারের দেশে দেশে উপস্থিত হয়েছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য যে ধারায় সূচনা করেন মধ্যযুগে তা ব্যাহত হ'লেও বর্তমান কালে আচার্য জগদীশ বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, সি, ভি, রমণ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে আজও তা প্রবহমান। যখনি দেশ ও জাতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তখনি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের মত পরম পুরুষেরা আবির্ভূত হয়ে অধর্ম থেকে, উপপ্লব থেকে সাধু ও সৎদের পরিত্রাণ করে গেছেন।

বহু বিপরীতধর্মী বস্তুকেও আপন জারক রসে জারিত করে ভারতবর্ষ আত্মস্থ করেছে যুগে যুগে। এই গ্রহণশীলতাই (Adaptibility) ভারত সংস্কৃতির মৌল লক্ষণ—তার প্রাণের লক্ষণও বটে। শিল্পে গ্রীক প্রভাবকে আত্মস্থ করে প্রসিদ্ধ "গান্ধার শিল্পের" সৃষ্টি করেছে। অগ্নিহোত্রী পারসীকরা পারস্য থেকে পালিয়ে এসে ভারতবর্ষের সমাজদেহে আজও বিদ্যমান। ইসলামীয় সুফী মতবাদের অহিংসা, বিশ্বপ্রেম এবং পরমতসহিষ্ণুতার মধ্যেও ভারত-সংস্কৃতির সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। নানা বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভারত-সংস্কৃতির ধারা বয়ে চলেছে। ভারতবাসীর খাদ্যে, পোষাকে, ভাষায়, দেহগঠনে তাঁর নির্ভুল স্বাক্ষর রয়েছে। আজও এই গতি অব্যাহত। শাস্ত্র বলে—গতিই জীবন। ভারত-সংস্কৃতি গতিশীল, তাই আজও প্রাণবন্ত। এই গতিধারাকে অনুসরণ করতে হলে—অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই "ভারত-সংস্কৃতির রূপরেখার পরিকল্পনা।

ভারত-সংস্কৃতির মর্মকথা

ভারত-সংস্কৃতির লক্ষ্য—মুক্তি, স্বাধীনতা, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, ঐক্য। এ মুক্তি সার্বিক মুক্তি। এর মধ্যে খণ্ড নেই। অন্যান্য জাতি যেমন কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতাতে তুষ্ট থাকে, ভারত কিন্তু তাতে তৃপ্ত নয়। কারণ একমাত্র ভারতই জেনেছে যে ঐরূপ খণ্ডিত স্বাধীনতা মানুষের বন্ধন বা দুর্বলতাকে ধ্বংস করতে পারে না। দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতাই ভারত-সংস্কৃতির মূল মন্ত্র। আর এই অখণ্ড পূর্ণ স্বাধীনতার জয়গান বিভিন্ন সুরে-ছন্দে গীত হয়েছে উপনিষদে। উপনিষদে ভয়ের ধর্ম নেই; উপনিষদের ধর্ম প্রেমের, জ্ঞানের। মানবমহিমার এত উচ্চাসন—পৃথিবীর আর কোন সংস্কৃতি দেখাতে পারেনি।

ভারত-সংস্কৃতি দেখিয়েছে প্রকৃত শাশ্বত, শান্তির পথ। সামরিক শান্তি বা চুক্তির দ্বারা শান্তিতে ভারত কোনদিন বিশ্বাসী নয়। উপনিষদের ঋষিরা প্রকৃত শান্তিলাভ করে বলেছেন, 'সর্বভূতের অন্তরাত্মা সকলের নিয়ন্তা হয়ে যে অদ্বিতীয় আত্মা এক রূপকে বহুধা বিভক্ত করেন; এবং সকল অনিত্য বস্তুর যিনি শাশ্বত কারণশক্তি, সচেতনদেরও যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি অদ্বিতীয় হয়ে মানুষের কর্মফল বিধান করেন—সেই সত্তাকে যে ধীমান্ উপলব্ধি করে তারই শাশ্বত শান্তি হয় অপর কারও নহে। 'তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী ন ইতরেষাম্' (কঠ ২।২।১২-১৩)—এ যেন বৈদিক ঋষিরা মাথায় দিব্য দিয়ে বলছেন।

ভারত-সংস্কৃতি কোনদিন pleasure কে (ইন্দ্রিয়সুখকে) গুরুত্ব দেয় নি; সে বরণ করেছে blissকে (স্বর্গীয় আনন্দকে)। ভারত অল্প সুখের কাঙাল নয়; সে চেয়েছে ভূমা-সুখকে। জাগতিক আনন্দকে অস্বীকার করে ভারত সবাইকে গিরিগুহাবাসী হতে বলেনি। গীতামুখে ভারতের ভগবান বলেছেন—'ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্' (গীতা, ১১।৩৩) অর্থাৎ তুমি উঠ। যুদ্ধ কর। শত্রু জয় করে যশ লাভ কর। নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। ভারত এই ভোগকে পরম পুরুষার্থ বলে গ্রহণ করেনি। সে তপস্যার বলে জেনেছে এ জগতের সুখভোগ সীমিত। এ সুখ অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ছিটেফোঁটা মাত্র।

ভারতের সংস্কৃতিতে শতধারে বয়ে গেছে প্রেমের মন্দাকিনী। উপনিষদের ঋষিরা ঘোষণা করেছেন, 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি'

অর্থাৎ যিনি স্বয়ং-কর্তা তিনি রসস্বরূপ। এই জীব সেই রসকে লাভ করে আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। যুগে যুগে ভারতের পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হয়েছেন রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শংকর, রামানুজ, মধ্ব, চৈতন্য, নানক, দাদু, কবীর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। এঁদের প্রেমের বন্যায় ভেসে গেছে সমগ্র মানবজাতি। ঐ প্রেমের হিন্দোলে এখনও আন্দোলিত হচ্ছে মানব মন। এসব মরণজয়ী জীবনের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানমদে মত্ত মানুষ খুঁজছে আপন জীবনজিজ্ঞাসা।

মহামিলনের জয়গান শত-কণ্ঠে শত-রাগে রূপ পেয়েছে ভারত-সংস্কৃতিতে। ঐক্য কোথায়?—ভারতের ঋষিরা তা খুঁজে বের করেছেন অতন্দ্র সাধনার বলে। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এ এক মহামিলন মন্ত্র। আর এ মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে ভারতের বুকে চার-পাঁচ হাজার বছর পূর্বে; যখন অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি ছিল বিস্মৃতির অন্ধকারে। 'বহুর মধ্যে এক এবং 'একের মধ্যে বহু'—এ দিব্য-দর্শনের অধিকারী হয়ে ভারত-ঋষিরা বিভেদের জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন। ভারত-বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণার পর ঘোষণা করেছেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই; আবার 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেকে জান। মানুষ যেদিন তার যথার্থ স্বরূপ জানতে পারবে, সেদিনই সব জানা হয়ে যাবে। এই পূর্ণতার সাধনায়, ভূমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে মানুষ সব সংকীর্ণতার, অল্পতার পারে যেয়ে অমর হয়ে যাবে। প্রকৃত দ্বন্দ্বাতীত ঐক্য সে উপলব্ধি করবে।

ভারত-সংস্কৃতিতে দেবতা শুনিয়েছেন মানুষকে গতির মন্ত্র। গতিহীনতাই মৃত্যু আর গতিশীলতাই জীবন। জীবনে চলার পথে মানুষ যখন গতিহীন হয়ে পড়ে, দিশেহারা হয়ে পড়ে, লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে তখন ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই পাঁচটি মন্ত্র তার জীবনকে উজ্জীবিত করে তুলবে, অসাড় প্রাণে সাড়া আনবে।

● চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার শ্রীর অন্ত নেই। হে রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠ জন হলেও ক্রমে নীচ হতে থাকে, পাপে লিপ্ত হতে থাকে। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

● যে চলে দেহের দিক থেকেও তার অপূর্ব শোভা ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তার আত্মা দিনে দিনে বিকশিত হতে থাকে। এই তো মস্ত ফল। তারপর তার চলার শ্রমে চলবার মুক্ত পথে তার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হয়ে

ঝরে পড়ে। পাপের সমস্যার জন্য আর তার মাথা-ঘামাতে হয় না। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

● যে বসে থাকে, তার ভাগ্যও থাকে বসে। যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়। যে শুয়ে পড়ে, তার ভাগ্যও পড়ে শুয়ে। যে এগিয়ে চলে, তার ভাগ্যও চলে এগিয়ে। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

● ঘুমিয়ে থাকাটাই হল কলিকাল। জাগলেই হল দ্বাপর। উঠে দাঁড়ালেই ত্রেতা। এগিয়ে চলাই হল সত্যযুগ। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

● চলাটাই হল অমৃতলাভ। চলাটাই হল স্বাদু ফল। চেয়ে দেখ ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ ; সে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে এক দিনের জন্যও একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

'চরৈবেতি চরৈবেতি'—এগিয়ে চলার এই দীপ্তবানী ভারতের বুকে উচ্চারিত হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে। ভারত অন্যান্য জাতির মত অর্থ ও কামকে জীবনের লক্ষ্য করেনি। তাই বলে অর্থ-কামকে অস্বীকারও করেনি। একটা উপমা ধরা যাক। একটি নদী। নদীর এপার ধর্ম, ওপার মোক্ষ। মাঝখানে যে প্রবাহ—তা হচ্ছে অর্থ ও কাম। ভারতীয় জীবন শুরু হয় ধর্ম থেকে এবং শেষ হয় মোক্ষে। সে ইচ্ছা করলে অর্থ-কামরূপ প্রবৃত্তিমার্গের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে লক্ষ্যে যেতে পারে বা নিবৃত্তিমার্গের ভিতর দিয়ে অর্থ-কামকে অস্বীকার করে দ্রুত মোক্ষে পৌছুতে পারে। সকলেরই এক রাস্তা—এ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে না। এ প্রসঙ্গের সুষ্ঠু সমাধান ভারত-সংস্কৃতি করেছে কর্মবাদও জন্মান্তরবাদ দিয়ে।

'ধম্মপদ' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ভারতের এই কর্মবাদ প্রসঙ্গে একটা সুন্দর তুলনা তুলে ধরেছেন :

'ইউরোপ কর্মকে কর্ম হইতে মুক্তির সোপান করে নাই, কর্মকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এইজন্য ইউরোপে কর্মসংগ্রামের অন্ত নাই ; সেখানে, কর্ম ক্রমশই বিচিত্র ও বিপুল হইয়া উঠিতেছে। কৃতকার্য হওয়া সেখানে সকলেরই উদ্দেশ্য ইউরোপের ইতিহাস কর্মেরই ইতিহাস। ইউরোপ কর্মকে বড়ো করিয়া দেখিয়াছে বলিয়া কর্ম করা সম্বন্ধে স্বাধীনতা চাহিয়াছে।

ভারতবর্ষও স্বাধীনতা চাহিয়াছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা একেবারে কর্ম হইতে স্বাধীনতা। আমরা জানি. আমরা যাহাকে সংসার বলি সেখানে কর্মই বন্ধন

কর্তা, মানুষ তাহার বাহনমাত্র। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এক বাসনার পরে আর এক বাসনাকে, এক কর্ম হইতে আর এক কর্মকে বহন করিয়া চলি। হাঁফ ছাড়িবার সময় পাইনা। তাহার পর সেই কর্মের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যে সরিয়া পড়ি। এই-যে বাসনার তাড়নায় চিরজীবন অন্তবিহীন কর্ম করিয়া যাওয়া ইহারই দাসত্ব ভারতবর্ষ উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে।'

ভারত পুরুষেরা যদি ভারতের সংস্কৃতির জয়গান করেন—আমরা তা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখি। কিন্তু কোন বিদেশী মনীষী যদি ভারতের মহিমা জ্ঞাপন করেন তবে তা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করি। শত শত বছরের দাসত্বের এই শোচনীয় পরিণাম!

যাহোক পৃথিবীর বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্সমূলার ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেন: 'যদি সারা পৃথিবী খুঁজে দেখা হয় কোন দেশকে প্রকৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য, শক্তি ও সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়েছে, কোথায় স্থানে-স্থানে ভূপৃষ্ঠে স্বর্গের শোভা ফুটে উঠেছে—আমি ভারতবর্ষকে দেখিয়ে দেব। যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে কোন দেশের আকাশের তলে মানুষের মন সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব সকল সঞ্চয় করেছে, জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি গভীর চিন্তার বিষয় হয়েছে, এবং তাদের কোন-কোনটির এরূপ মীমাংসাও নির্ণীত হয়েছে, যে যাঁরা প্লেটো এবং কান্টের দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত তাঁদের পক্ষেও সেগুলিকে বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি ভারতবর্ষকেই নির্দেশ করব। ইউরোপ এতকাল ধরে গ্রীক, রোমান ও সেমেটিক সভ্যতার আওতায় প্রতিপালিত হয়েছে। ইউরোপের মানসরাজ্যে ইহুদীসুলভ সংকীর্ণ ভাবধারার স্বাক্ষর অতি প্রত্যক্ষ। যদি আমি নিজেকে প্রশ্ন করি কোন দেশের সাহিত্য হতে সেই পরিশোধন আমরা পেতে পারি যা নিতান্তই আবশ্যক, যদি আমাদের অন্তরকে আরও পূর্ণ, আরও সর্বাঙ্গীন, আরও সার্বজনীন করতে চাই; বস্তুতঃ যদি পূর্ণতর মানবজীবন পেতে চাই—কেবল ইহকালের জন্য নয়, আমাদের দেহান্তের এবং অনন্ত জীবনের জন্যে তাহলে আমি পুনরায় ঐ ভারতবর্ষের দিকেই দৃষ্টি ফেরাব।'

প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে রোমা রোঁলা ঐ একই সুরে বলেছেন: 'যদি পৃথ্বী-পৃষ্ঠে এমন কোন স্থান থাকে যেখানে আদিকালে মানুষ যখন অস্তিত্বের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল তখন থেকে তার সমস্ত স্বপ্ন আশ্রয় পেয়েছে—সে ভারতবর্ষ।'

ভারতের সাংস্কৃতিক পটভূমিটি প্রাচীন দর্শন, প্রাচীন আচার, ব্যবহার,

ইতিবৃত্ত, পৌরাণিক ও অন্যান্য নানা কাহিনীর সংমিশ্রণে তৈরী। এর কোন উপাদানটাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। নিতান্ত অশিক্ষিত ও নিরক্ষর যে-লোক, তার উপরেও এর প্রভাব অসামান্য। ভারতের গণজীবনে রামায়ণ-মহাভারতের কথাকাহিনী, নীতিউপদেশ কী সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

সংস্কৃতি হয় মানুষের। অন্য প্রাণীর সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। মানুষ হিসাবে মানুষের প্রকৃত পরিচয়ই তার সংস্কৃতি। ভারতের জনগণের সংস্কৃতির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে সম্যকরূপে কৃতির বা কাজের ভিতর দিয়ে তারা মনুষ্যত্বের সাধনায় রত।

প্রত্যেক জাতি মনে করে তার সংস্কৃতিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় কতকগুলি বিষয়ের উপর। এই বিষয়গুলির উপর আমরা পূর্বেই কিছু আলোকপাত করেছি। শ্রেষ্ঠত্বের আরও দুটি বিশেষ কারণ তার প্রাচীনত্ব এবং অমরত্ব। বৈদিক ঋষিরা এবং ব্যাস-বাল্মীকি, মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি পৌরাণিক ঋষিরা যদি এই বর্তমান ভারতে আজও আসেন তবে তাঁরা বিশেষ নূতন কিছুই দেখবেন না। তাঁদের প্রবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থা এখনও রয়েছে; কেবল দেশ-কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্য বাইরের খোলসটার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। এ সংস্কৃতির কবে জন্ম কেউ জানে না। ইতিহাস এমন কি কিংবদন্তী পর্যন্ত ভারত-সংস্কৃতির জন্মক্ষণ বলতে সাহস করে না।

এতো গেল প্রাচীনত্বের কথা। এ সংস্কৃতির উপর যত অত্যাচার হয়েছে, এত আর কোন সংস্কৃতির উপর হয়েছে কিনা সন্দেহ। ভারত-সংস্কৃতি যে মৃত্যুকে পদদলিত করে এখনও বেঁচে আছে তার কারণ তার অপূর্ব সম্মোহন বিদ্যা। আর এ বিদ্যা সে লাভ করেছে পবিত্রতা, ঔদায, পরমতসহিষ্ণুতা, বিশ্বজনীনতা প্রভৃতি গুণরাশির দ্বারা। যার ফলে অমরত্ব পাওয়া যায় না—ভারত তার সাধনায় কোনদিন ব্রতী হয়নি। 'ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' অর্থাৎ কর্ম, সন্তান বা ধনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের বিনিময়ে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। এই চৈতন্যাভিমুখী দৃষ্টি ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যদি সে জড়ের, জাগতিক ঐশ্বর্যের জন্য চেষ্টা করত তবে তার সংস্কৃতি পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতির মত বিলীন হত অথবা ইতিহাসের পাতায় অতীতের সাক্ষী হয়ে থাকত।

পৃথিবীর কোন্ জাতির কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি—শিল্পক্ষেত্রে তার একটু নমুনা তুলে

ধরছি : প্রাচীন মিশরীয় শিল্প ঝোঁক দিয়েছে স্থায়িত্বের দিকে, যেমন পিরামিড‌্; রোমক শিল্পে শরীর বিজ্ঞান ও বাহ্য সৌন্দর্যের জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে; আসিরীয় শিল্প রূপায়িত করেছে দৈহিক শক্তিকে; জাপান ও চৈনিক শিল্পী প্রাকৃতিক দৃশ্যকে প্রাণবন্ত করেছেন। আর ভারতীয় শিল্প অরূপকে অপরূপ রূপ দিয়েছে। দৃশ্য-নিচয় অলক্ষিত ছন্দের উপর দিয়ে ভেসে ওঠে আবার চলে যায়; আর ঐ ক্ষণিক স্থিতির মধ্যে রূপ দিয়ে যায় সেই অদ্বিতীয় সত্তাকে। উপনিষদ বলছেন : 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।' (কঠ ২।৩।২) অর্থাৎ এই চরাচর সমস্ত বস্তু সেই পরমব্রহ্মের সত্তা থেকে বেরিয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। আর ঐ সত্তাই জীবনের গতি ও ছন্দ।

ভারত-সংস্কৃতির ইতিকথার শেষ নাই। মোটামুটি সংস্কৃতি বলতে কি বুঝায়, প্রত্যেক পাঠকের মনে এ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। মানুষের একটা সংস্কৃত জীবন তৈরী করতে যে সব সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তা মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—

১। ভাষা : (ক) সাহিত্য (খ) দর্শন (গ) বিজ্ঞান
২। কলা : (ক) শিল্প (খ) নৃত্য (গ) গীত
৩। সমাজসেবা : (ক) সমাজকল্যাণ ও বহুবিধ প্রকরণ

সামান্য দু'চার কথায় এতগুলি বিষয়ের উপর আলোচনা সম্ভব না হলেও কৈশোরে পড়া 'হিতোপদেশের' সেই কথাটা 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ' অর্থাৎ চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি সিদ্ধিলাভ না হয় তাতে দোষ কি?—স্মরণ করে, ভারত-সংস্কৃতির উদ্গাতাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে—প্রার্থনা জানাই।—

অপধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষু-র্মুমুগ্ধ্যাস্মান্ নিধায়ব বদ্ধান্।

[হে দেবতা, ধ্বান্ত (অন্ধকার) দূর কর। চক্ষু পূর্ণ করে দাও। পাশবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আমরা আছি—মুক্ত কর।]

সনাতন ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি

ধর্মের সহিত সংস্কৃতির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। ভারতীয় সংস্কৃতিরও বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছে ধর্মকে ভিত্তিকরে। ধর্মচিন্তার অফুরন্ত সঞ্জীবনী সুধা থেকে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করে যুগে যুগে নানা বিচিত্র রূপে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রোজ্জল আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি একদিন সুদূর সাগর পারের দেশেও দিগ্বিজয় করেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি সেদিন পরিচিত ছিল আর্য-সংস্কৃতি রূপে।

পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই আর্য-সংস্কৃতির কাছে ঋণী, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, কোচিন, মালয়, যবদ্বীপ, বালী, সুমাত্রা, চীন, জাপান, কোরিয়া—যেকোন জাতিরই ইতিহাস খুলে দেখি না কেন, সর্বত্রই এক কথা। তাঁদের ধর্ম, তাঁদের সংস্কৃতি এই আর্য-সভ্যতার দ্বারাই অনেকাংশে পুষ্ট, সুদূর মেক্সিকো, গ্রীস এবং রোমেও যে এই ধারা পৌঁছেছিল, তার নিদর্শনেরও অভাব নেই।

এই আর্যধর্মের শাশ্বত অনুশাসনের মধ্যেই প্রথম মানব-সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কৃতির সনাতন রূপটি সার্থকরূপে ধরা পড়েছিল। সত্যদ্রষ্টা আর্যঋষির তপঃস্নিগ্ধ অনুশাসন মানুষের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী উভয়বিধ উন্নতি বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার কার্য রূপায়নের জন্য কার্যকরী হয়েছিল। আবার তা অন্য ধর্ম বিদ্বেষী নয়, বরং সমন্বয় ধর্মী, এই জন্যেই ভারতীয় সংস্কৃতি সর্বত্র সমাদর পেয়েছে।

বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের বাণী প্রচারই আর্য সভ্যতার মূল সুর। যখন মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশ পরস্পরের মধ্যে ধর্মের যথার্থ রূপ এবং দেব দেবীর যথার্থ প্রকৃতি নিয়ে বিবাদে মত্ত, তখনই ভারতের তপোবন থেকে উচ্চারিত হয়েছিল সেই সনাতন মহাবাণী 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' অর্থাৎ ব্রহ্ম এক। ঋষিগণ নানাভাবে বলে থাকেন।

মানব সভ্যতার উষাকালে হয়তো পৃথিবীর অনেকদেশেই সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্মের বিকাশ হয়েছিল, কিন্তু তা আজ ইতিহাসের উপকরণ মাত্র. এক মাত্র ভারতবর্ষই তার 'সনাতন সত্য'কে চিরকাল বহন করে চলেছে। কারণ তা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহা চিরন্তন।

বহিরাক্রমণ, রাজনীতিক সংঘাত, আর্থনীতিক বিপর্যয় কোন কিছুই ভারতের এই প্রাণমন্দাকিনীর গতিরোধ করতে পারে নি। আপাত দৃষ্টিতে জাতির অবিরাম চলার ছন্দ হয়তো কখনও ব্যাহত হয়েছে, হয়তো বা আর্যসমাজ বন্ধন কখনও হয়ে পড়েছে শিথিল কিন্তু তাতে কি আসে যায়। সংগে সংগে আবির্ভূত হয়েছেন কোন মহামানব। দূর করে দিয়েছেন বহির্জীবনের সমস্ত ক্লেদ-গ্লানি। সব কিছুরই হয়ে গিয়েছে সুষ্ঠু সমাধান।

ধর্মবিষয়ে ভারতের স্থান সুউচ্চে; কিন্তু এর জন্য তার কোন বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় নি। সনাতন ধর্মের অবিসংবাদিত উৎকর্ষ তাকে দিয়েছে নব নব সম্ভাবনাময় সৃষ্টির প্রেরণা। আপাতঃ দৃষ্টিতে বহিরাক্রমণ ভারত সংস্কৃতির পরিপন্থী মনে হলেও, তা মূলতঃ ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারে নি।

ভারতীয় সংস্কৃতি খুব ব্যাপক। কি সাহিত্য, কি শিল্প, কি ভাস্কর্য, কি দর্শন কি ইতিহাস, কি বিজ্ঞান, কি ভেষজশাস্ত্র সর্বক্ষেত্রেই বহু প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয়গণ অত্যশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। গৌতম, কনাদ, পতঞ্জলি. শংকরাচার্য, কপিল, রামানুজের মতো দার্শনিক; ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি; কালিদাসের মত অমর কবি; জীবক, চরকাদি চিকিৎসক; আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্তের মতো বৈজ্ঞানিক, মানব সভ্যতার ইতিহাসে চির ভাস্বর।

সনাতন ধর্মের বিপর্যয়ের লগ্নে আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রমুখ মহাপুরুষেরা। নূতন করে জানিয়ে দিয়েছেন যুগবাণী। দেখিয়ে দিয়েছেন পথ! গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

অনুবাদ— হে ভারত, যখন প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের কারণ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়। তখন আমি স্বীয় মায়াবলে যেন দেহবান হই, যেন জাত হই।]

সব দিক থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি—চিরকাল সনাতন ধর্মের দ্যোতক।

মনুষ্য জীবনে অন্তর্নিহিত দেবত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুশাসনের। আমাদের ভারতীয়গণের সৌভাগ্য এই যে আমরা এই রূপ অনুশাসন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। এই সনাতন নিয়ম একদিন আবিষ্কার করেছিলেন আমাদের ঋষিরা। হ্যাঁ, আবিষ্কারই করেছিলেন, যেমন

শ্রীরামচন্দ্র

শ্রীকৃষ্ণ : (কাংড়া শিল্প)

মহাবীর

বুদ্ধ ঃ সারনাথ

শঙ্করাচার্য্য

'গাছ থেকে আপেল পড়া'র সাধারণ ঘটনা থেকে শাশ্বত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী নিউটন। ত্যাগপ্রোজ্জল মহাপ্রতিভায় তেমনি একদা অনাবৃত হল এক মহাসত্য—যা আদি ও অপৌরুষেয় বেদবানীতে নিহিত। এই বেদবাণীই আমাদের সমাজ ও জীবনকে সুন্দর ভাবে ধরে রাখতে সমর্থ। এক কথায় তাই এই বেদই আমাদের ধর্ম। ধৃ—'ধারণ করা' থেকেই ত, ধর্মের উৎপত্তি। ভারতীয় সংস্কৃতির 'কেন্দ্রবিন্দু' হিন্দুধর্ম তথা সনাতনধর্মকে এই বেদই ধারণ করে আছে।

হিন্দুধর্ম বৈদিকধর্মেরই নামান্তর। বেদ চার প্রকার: ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। আবার প্রত্যেক বেদেই আছে দুইটি বিভাগ: কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। কর্মকাণ্ডের দুটি উপবিভাগ: সংহিতা ও ব্রাহ্মণ, আর এতেই রয়েছে সুষ্ঠ সমাজ জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুরই সুন্দর দিঙ্‌নির্ণয় ও তত্ত্ব বিন্যাস। দেবদেবীর স্তোত্র এবং মন্ত্র সংহিতাভাগে সংগৃহীত। যাগ যজ্ঞের নিয়ম ও মন্ত্রের প্রয়োগ ব্রাহ্মণভাগে বর্ণিত। লক্ষণীয়, বেদে জাতিগত গোঁড়ামির কোন স্থান নেই। অনেকে অবশ্য সেরকম প্রশ্ন তুলে থাকেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ নিরর্থক। আমাদের মনে রাখতে হবে বেদে যে ব্রাহ্মণদের সম্মান দেওয়া হয়েছে, তাঁরা কর্মে ব্রাহ্মণ, জাতিগত দিক এখানে তুচ্ছ। ধীবর পুত্র ব্যাস, দাসী পুত্র নারদ, সকলেই 'ঋষি' বলে সম্মানিত।

বেদের শেষ ভাগের নাম 'বেদান্ত বা উপনিষদ. সংক্ষেপে ইহাই, বেদের সার। আবার সমগ্র জ্ঞানের আধার বলে এর আর এক নাম 'জ্ঞানকাণ্ড'। ঈশ্বরের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বর লাভের উপায়, জীবন যাপনের সঠিক পথ, এক কথায় হিন্দুধর্মীয় সমস্ত কিছুরই আলোচনা রয়েছে এখানে। হিন্দু ধর্মকে তাই সংক্ষেপে বলা হয় বৈদান্তিক ধর্ম।

আমাদের দার্শনিক চিন্তায় কতকগুলি ধারা আছে। তাহার মধ্যে, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রধান। এই গুলির বিচিত্র সমন্বয়ে পরবর্ত্তীকালে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ইত্যাদির উদ্ভব। বহিরঙ্গে এগুলির মধ্যে বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হলেও এগুলি বেদান্ত নির্ভর। এখানে স্মরণীয় যে, এগুলির প্রবক্তাগণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিভিন্ন ধরনের মানুষের জন্য। এক প্রকার ব্যাখ্যা অপর ব্যাখ্যার পরিপূরক মাত্র।

উচ্চ অধিকারীর জন্য উচ্চস্তরের সাধনা ; নিম্ন অধিকারীর জন্য নিম্নস্তরের

সাধনা। উপনিষদের অদ্বৈততত্ত্ব শেষে, 'তত্ত্ব মসি' ; 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' বা 'সোহ' 'হং' এর মধ্য দিয়ে চরম পরিনতি লাভ করেছে।

জ্ঞান, মুক্তি, ভক্তি, ত্যাগ সব কিছুরই আলোচনা রয়েছে এই বেদান্তে। জ্ঞান প্রধান ও ভক্তি রস বিবর্জিত বলে একে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

'বেদান্ত' শিক্ষা দেয় 'ব্রহ্মের'। জানায় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। অর্থাৎ সব কিছুই ব্রহ্মময়।

আত্মার স্বরূপ উদঘাটন বেদান্তের আর এক অবদান। আত্মা সর্বশক্তির আকর। আত্মা আবার অবিনশ্বর, গীতা বলেন—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাহভাবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতো হয়ং পুরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

অনুবাদ—[এই আত্মা কখনও জাত বা মৃত হন না। কারণ, পূর্বে না থেকে পরে বিদ্যমান হওয়ার নাম জন্ম এবং পূর্বে থেকে পরে না থাকার নাম মৃত্যু ; আত্মাতে এই দুই অবস্থার কোনটিই নাই। অর্থাৎ আত্মা জন্ম ও মৃত্যু রহিত, অপক্ষয়হীন এবং বৃদ্ধিশূন্য ; শরীর নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।]

দর্শনের কথা হয়ত একটু কঠিন। সবাইয়ের পক্ষে রসাস্বাদন করা তা থেকে সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজনের অনুরোধে জন্ম নিল—গল্প, কাহিনী, ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব, নাম পেল পুরাণ। পুরাণের সংখ্যা আঠারো। তিন প্রধান হিন্দু দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রত্যেকের সম্পর্কে ছটি করে পুরাণ আছে। এদিকে আবার পেলাম শাশ্বত মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। নতুন ভাবে হিন্দুধর্মকে জনমানসে বাঁচিয়ে রাখার এ আর এক উপায়। মহাভারতের মধ্যে আমরা পেলাম আর এক অতুলনীয় গ্রন্থ 'গীতা'। বেদের সার বেদান্ত। আবার বেদান্তের সার 'গীতা'। স্বামীজীর ভাষায়, "The Bhagbat Gita is the best commentory we have on the vendanta philosophy."

নিষ্কাম কর্মের' মধ্যেই নিবিড় প্রশান্তি। স্বামীজীর মতে—এই হোল গীতার মূলোপদেশ।

ভারতবর্ষের মত আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-বিশ্বাস, ধারণা সব কিছুতেই সেই একই সনাতনধর্মের প্রতিফলন। সর্বত্রই সেই একই শিক্ষা চাই আত্ম

বিশ্বাস, স্বাবলম্বন, দেবভক্তি আর নিষ্কাম কর্ম করার সৎপ্রেরণা, জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে ধারণা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধে বিশ্বাস, মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা প্রাচীন ঋষিগণ আলোচনা করেছেন বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে।

'জন্মান্তরবাদ' ও 'কর্মবাদ' হিন্দু ধর্মের এক বিশেষ অংশ। জীব পূর্ব জন্মের সংস্কার নিয়েই আবার করে জন্মগ্রহণ।

হিন্দু ধর্মের মতে, জীবের শরীর দুটি—'সূক্ষ্ম শরীর ও স্থুল শরীর।' জড় এই স্থুল শরীর, তাই এতে আসে প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবর্তন। কালক্রমে শরীর হয় জীর্ণ। তখন এই 'স্থুল শরীর ছেড়ে সূক্ষ্ম শরীর' চলে যায় অন্যত্র। এক্ষেত্রে সনাতন ধর্ম আমাদের আত্মার স্বাধীনতার কথাই ঘোষণা করেন।

পূর্বজন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুযায়ী মানুষ এ জন্মের সুখ ও দুঃখ ভোগের অধিকারী হয়। এজন্মে কর্মদ্বারা বাসনা ক্ষয় হলে মুক্তি ঘটে অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু মুক্তি অর্থাৎ জীবাত্মার সংগে পরমাত্মার যোগ খুব সহজে হয় না। তার জন্য প্রয়োজন জীবের চিত্ত শুদ্ধি।

সকল জীব একই রকম নয় তাই সকলের চিত্ত শুদ্ধিও একই রকমে হয় না। সকলের জন্য তাই 'একই মার্গ' নির্দিষ্ট হয় নি। হিন্দুশাস্ত্রে চিত্তশুদ্ধির জন্য দুপ্রকার পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—'প্রবৃত্তি মার্গ' ও 'নিবৃত্তি মার্গ'।

প্রবৃত্তি মার্গে মানুষকে সৎকর্ম অনুশীলনের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করতে বলা হয়েছে। সংগে সংগে অসৎ কর্ম ত্যাগেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সৎকর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হলেই পরমাত্মার সংগে জীবাত্মার যোগ সম্ভব। চিত্তশুদ্ধি মুক্তির প্রথম ধাপ।

প্রবৃত্তি মার্গে যা কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা যেন মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দেওয়ার উপায়। তাই ওগুলিকে সাধারণ ভাবে বলা যায় 'যজ্ঞ'। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ প্রভৃতি পাচ প্রকার যজ্ঞ আছে। দেবযজ্ঞ, দেবদেবীর পূজা ও পার্বন। পিতৃযজ্ঞে, পিতৃ পুরুষগণের তুষ্টিমূলক শ্রাদ্ধাদি, ঋষিযজ্ঞে, বেদাদি শাস্ত্রপাঠ, নৃযজ্ঞে, মানবসেবা এবং মানব কল্যানকর কর্ম, আর ভূত যজ্ঞে, অবশিষ্ট জীবগণের কল্যাণ বিষয়ক কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুষ্ঠু সমাজ জীবন যাপনের জন্য একদা ঋষিগণ সৃষ্টি করলেন সমাজ জীবনে 'কর্মবিভাগ'। সৃষ্টি হয়েছিল চারিবর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। নির্দিষ্ট হয়েছিল প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্তব্য।

আর্যহিন্দুর জীবন চারটি স্তরে বিভক্ত ছিল।

সে চারটি স্তর হল—

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য পালনে গড়ে উঠে জীবনের ভিত্তি। তার উপরেই ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠে আর তিনটি স্তর গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। বৈদিক সমাজে এগুলিকে বলা হয়েছে চতুরাশ্রম।

তারপর আছে নিবৃত্তি মার্গের কথা, যাঁরা বৈরাগ্যবান তাঁরা এই পথে মুক্তিলাভ করতে পারেন। আবার প্রত্যেকের মধ্যে চিন্তাপ্রবণতা, ভাবপ্রবণতা এবং ইচ্ছাপ্রবণতা থাকলেও কেউ বা বেশী ইচ্ছাপ্রবণ কেউ বা বেশী চিন্তা প্রবণ আবার কেউ বা বেশী ভাবপ্রবণ। নিবৃত্তিমার্গ সাধন করতে গিয়ে জীব তাই যে কোন একটি বা ততোধিক পথে অগ্রসর হতে পারেন।

সাধারণ ভাবে প্রবৃত্তিমার্গ প্রেয়ের পথ আর নিবৃত্তিমার্গ শ্রেয়ের পথ। হিন্দুধর্মে মুক্তিই সবার লক্ষ্য।

ভক্তির দ্বারাও মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। ভগবানকে ভালবাসার দ্বারা পাওয়া যায়। ভগবানের প্রতি অহেতুক প্রীতিই ভক্তি। ভগবানের প্রতি ভক্তের এই অনুরাগ ভক্ত মনের স্বাভাবিক গতি। ভক্তের নিকট ভগবানই জগতে একমাত্র সত্যবস্তু আর সব মিথ্যা। বিষয় প্রেম দুঃখের ছায়ামাত্র।

ভক্তি দুই প্রকার—পরাভক্তি ও গৌণীভক্তি। ভগবানের প্রতি সহজ স্বাভাবিক আন্তরিক অহেতুকী প্রগাঢ় প্রেম পরাভক্তি। ইহাই ভক্তের লক্ষ্য। এই পরাভক্তি লাভ সহজে হয় না। ইহা সাধনা সাপেক্ষ। এই সাধনা গৌণীভক্তি। গৌণীভক্তি কালে পরাভক্তিতে পরিণত হয়। প্রত্যেক সাধককে ত্যাগ, সংযম, অহিংসা, শুচিতা প্রভৃতি নৈতিক গুণের অনুশীলন করিতে হয়। ঈশ্বরের নামজপ, পূজা, ধ্যান, স্তবস্তুতি, ঈশ্বর কথাশ্রবণ ও পাঠ, তীর্থবাস ও সাধুসংগ এইগুলি গৌণীভক্তির সাধন।

যিনি যে ভাবে ও যে রূপে ভগবানের পূজা করেন ভগবান সেই ভাবে পূজা গ্রহণ করেন, ও সেই রূপে ভক্তকে দর্শন দেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী সত্য হলেও একটি দেবতার পূজা নিষ্ঠাপূর্বক করতে হয়। ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা। কিন্তু নিজের ইষ্ট ছাড়া অন্য দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা ও ধর্মবিরোধী। সত্যকার ভক্ত ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে বিবাদ করেন না। ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার দুইই, আবার তিনি সাকার এবং নিরাকারেরও পার।

ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান। চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, তারা, নদী, পর্বত, বৃক্ষে ভগবানের অধিষ্ঠান জেনে হিন্দুগণ পূজা করেন। শালগ্রামশিলা, শিবলিঙ্গ ও ঘটে পটে ভগবানকে পূজা করা যায়। ইহাই প্রতীক উপাসনা। আবার কাঠ, মাটি বা পাথরের নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি বা প্রতিমাতে শ্রীভগবানের পূজা করা হয়। ইহাই শ্রীভগবানের প্রতিমা উপাসনা। ভক্তগণ, মাতা, পিতা, সখা, সন্তান প্রভৃতি ভাবে শ্রীভগবানের পূজা করে থাকেন।

বাহ্যজগতে মানুষের যা কিছু কাজ সবই তার অন্তর্জগতের প্রতিফলন। মানুষ যা ভাবে, কর্মে তাই রূপ দেয়। কাজেই মানুষের কর্মনিয়ন্ত্রণের সহজ নিয়ম হল মনকে সংযত করা। এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে আর্যঋষির অনুধ্যানে জন্ম নিল মুক্তি প্রচেষ্টার আর এক উপায়—রাজযোগ।

মহামুনি পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' রাজযোগের প্রামাণিক গ্রন্থ। মহামুনি কপিলের 'সাংখ্য-দর্শন' রাজযোগের যুক্তি বা দার্শনিক ভিত্তি।

মনকে সংযত করতে গেলে চাই মনের শাসন। কিন্তু তাতেই সব নয়। সংগে সংগে শরীরের দিকেও তাকাতে হবে কেননা "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্।" অর্থাৎ সমস্ত ধর্মাচরণে প্রথমেই প্রয়োজন স্বাস্থ্য। রাজ যোগের আটটি অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি যম। শৌচ, সন্তোষ তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি নিয়ম।

মনের প্রভু হওয়া সহজ নয়। তাই ধাপে ধাপে এগোতে হয়। ক্রমে ক্রমে আসে ধারণা ধ্যান ও সমাধির অবস্থা।

অন্তর্মুখীন একাগ্র মনকে কোন একটি বস্তুর উপর স্থির করার নাম 'ধারণা', পরে তীব্রতর একাগ্র শক্তির বলে বৈরী হৃদয় বৃত্তি গুলিকে দমন করে কোন কিছুর অনুচিন্তনই 'ধ্যান'। আর যখন মন লীন হয় সেই পরম পুরুষে, তখনই আসে সমাধি।

আত্মতত্ত্বের শ্রবন, মনন ও নিধিধ্যাসন এই তিনটি জ্ঞান যোগীর সাধন। প্রথমে, ব্রহ্মজ্ঞ সিদ্ধগুরুর কাছ থেকে আত্মতত্ত্ব শুনতে হয়। গুরু ও শাস্ত্র বাক্য দ্বারা সংশয়হীন হওয়ার নাম মনন। মননের দ্বারা সাধক বুঝতে পারেন আত্মা; দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় হতে পৃথক। আত্মাই, একমাত্র চেতন আর সব জড়। এই আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হওয়াই নিধিধ্যাসন। নিধিধ্যাসন গভীর হলে

সমাধিলাভ হয়। জগৎ তখন লীন হয়ে যায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য উপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধিতে সাধক মুক্তি লাভ করে।

সনাতন হিন্দুধর্ম আর ভারতীয় সংস্কৃতি প্রায় সমার্থক। হিন্দুধর্মের আধারেই একদিন ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বমৈত্রীর বাণী বহণ করে নিয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরে। ধর্মজগতের ইতিহাসে একমাত্র হিন্দুধর্মই চিন্তার স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। জিজ্ঞাসা ও মননের মাধ্যমে সত্যোপলব্ধিকেই সারাৎসার বলে গ্রহণ করেছে। যথার্থ হিন্দুধর্মে অন্ধ বিশ্বাসের কোন স্থান নেই, স্থান নেই পরমত অসহিষ্ণুতার। তাই মহাভারতের সাগর তীরে শক, হুণ দল, পাঠান, মোঘল এক দেহে লীন হয়েছে। তাই উপনিষদের নিরাকার-বাদী প্রতিমাপূজক সাকারবাদী, তান্ত্রিক, শৈব, শক্তি, বৈষ্ণব, গানপত্য, দ্বৈত-, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত,—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, নাথযোগী প্রভৃতি নানা মত ও পথের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও সনাতন হিন্দু ধর্মের বিশাল দেহের অঙ্গীভূত। জড় জগতের সাফল্য নয়—মুক্তিই এদের সকলের লক্ষ্য। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সনাতন হিন্দু ধর্ম বহু সহস্র বৎসর ধরে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। আগামী বহু সহস্র বৎসর হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির বিজয় নিশাণ উড়বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশে দেশে।

—: * :—

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৌদ্ধচিন্তার স্থান ও দান

বুদ্ধ ভারতীয় জীবনাদর্শের মূর্ত বিগ্রহ

গৌতম বুদ্ধ ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা ও সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ। প্রত্যেক জাতির কর্ম ও চিন্তা এক একটা আদর্শকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়। ভারতের জাতীয় জীবনের আদর্শ হল ভোগবাসনার নিবৃত্তিদ্বারা মোক্ষ বা পরম শান্তিলাভ। গৌতম বুদ্ধ অনুপম রূপ, অতুল ঐশ্বর্য, অটুট স্বাস্থ্য, ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কোমল ও সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। একজন মানুষ সুখী জীবন যাপন করতে যে সকল বস্তুর কামনা করতে পারে তার সব কিছুই বুদ্ধের জীবনে ছিল। কিন্তু বুদ্ধ, চিন্তা ও বিচার করে দেখলেন যে ধন-জন-যৌবন সব কিছুই নশ্বর। আজ আছে তো কাল নেই। তার উপর আছে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু। তাই বুদ্ধ সংসারের তথাকথিত সুখ পরিত্যাগ করে বাহির হলেন চিরন্তন সুখ ও শান্তির সন্ধানে। নিজের চেষ্টায় কঠোর সাধনা করে বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করলেন। এই নির্বাণই হল জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ও পুনর্জন্মের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায়। নির্বাণ লাভেই মানুষের চরম ও পরম শান্তি। এই নির্বাণ বা মোক্ষই সকল মানুষের কাম্য। গৌতম বুদ্ধ প্রদর্শিত মত ও পথকে অবলম্বন করে কোটি কোটি মানুষ জীবনে পরম শান্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। বুদ্ধ ভারতীয় জীবনাদর্শের মূর্ত বিগ্রহ।

বুদ্ধপূর্ব যুগের ধর্মানুষ্ঠান—যাগযজ্ঞ, বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ও সমসাময়িক কালে ভারতে বেদবিহিত যাগযজ্ঞের দ্বারাই ধর্মানুষ্ঠান করা হত। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুন, সূর্য, সোম প্রভৃতি দেবদেবীর উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করা হত। এই সকল যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া হত। যুদ্ধজয়, পুত্রলাভ, রোগশান্তি, আয়ু ও স্বাস্থ্যলাভ স্বর্গ-প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে দেবদেবীর নিকট প্রার্থনা করা হত। বৈদিক উপাসকেরা এই সকল যজ্ঞে সামগান করে দেবদেবীর স্তুতিবন্দনা করতেন। কালে কালে এই যজ্ঞানুষ্ঠান একটা গতানুগতিক ব্যাপার হয়ে উঠল। কোন চিন্তা বা বিচার না করে শুধুমাত্র পুরোহিত বা যাজ্ঞিকের উপর নির্ভর করেই ধর্মানুষ্ঠান চলতে থাকল। বিচার ও ধ্যান-ধারণাহীন কর্মানুষ্ঠানে মনের শান্তি বা তৃপ্তি পাওয়া যায় না—

এই যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ড মানুষের মনকে তৃপ্তি দিতে পারল না। তাই একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি বেদের এই ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি সংশয় প্রকাশ করতে লাগলেন। কারও কারও নিকট পশুহনন ক্রিয়া কাণ্ডের জটিলতা ও সোমরস পানাদি—রুচিকর বলে মনে হল না।

বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সংশয়—জ্ঞান কাণ্ডের উৎপত্তি

তাই বৈদিক উপাসকদের মধ্যে একশ্রেণীর দার্শনিক ও মননশীল ঋষির উদ্ভব হল। তাঁরা জীবন মৃত্যুর রহস্য, বিশ্বের উৎপত্তি বিলয়, বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক—এই জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে খুব ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা করতে লাগলেন। ধ্যান-ধারণার ফলে এই সব ঋষিরা বুঝতে পারলেন যে বিশ্বের সর্বত্র একই শক্তি বা ব্রহ্ম বিরাজমান। এই ব্রহ্মই জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত। মানুষের মধ্যেও এই ব্রহ্মই আছেন। এই ব্রহ্মের চিন্তা ও ধ্যানের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে মানুষ জন্মমৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে এই ব্রহ্মকে জানাই মানুষের পরম পুরুষার্থ, জীবনের চরম সার্থকতা। এই শ্রেণীর ব্রহ্মোপাসকদের কাহিনী বেদের উপনিষদ অংশে নিহিত। উপনিষদেই বেদের ও ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার সারকথা আছে। উপনিষদের ঋষিগণ আর একটি সত্যের আবিষ্কার করলেন—তা হল কর্মবাদ। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কর্মানুসারেই ভালমন্দের, জন্মমৃত্যুর বশীভূত হয়। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও কর্মফলবাদ ভারতীয় দর্শনের এক বিশেষ আবিষ্কার। উপনিষদের ঋষিরা অনুভব করলেন যে বিশ্বের সর্বত্র একই 'ব্রহ্ম' বিরাজমান। মানুষও এই ব্রহ্মেরই অংশ। উপনিষদের ঋষিদের মধ্যে ক্ষত্রিয়ও ছিলেন।

বেদের বিকৃত কর্মকাণ্ডের ও জৈনদের কৃচ্ছ্র সাধনার প্রতিক্রিয়া—বৌদ্ধধর্মের উত্থান

বুদ্ধের জন্মের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বিকৃত ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকাণ্ড এবং যাগযজ্ঞের বিরোধী কয়েকটি ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। এদের মধ্যে জৈনধর্মেরই প্রাধান্য ছিল বেশী। উপনিষদের কর্মফলবাদকে জৈনরাও স্বীকার করতেন। কিন্তু যাগযজ্ঞ, পশুবলি ও জীবহত্যাকে তাঁরা মোটেই পছন্দ করতেন না। জৈনরা উপবাস ও দৈহিক কঠোরতাকে ধর্মসাধনের বিশেষ সহায়ক বলে মনে করতেন। কিন্তু জৈনদের কঠোরতা ও নগ্নতাকে (দিগম্বর জৈন-সম্প্রদায়) সকলে পছন্দ করতেন না। বুদ্ধ বেদবিহিত, অনুষ্ঠান-সর্বস্ব

ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে অথবা জৈনদের মাত্রাতিরিক্ত দেহকৃচ্ছ্রতার মধ্যে ধর্ম সাধনার সারবস্তু আছে বলে মনে করলেন না। তিনি উপনিষদের কর্মফলবাদকে এবং জৈনদের নিরীশ্বরবাদকে নিয়ে 'মধ্যপন্থা'র মাধ্যমে ধর্মের সারবস্তু 'নির্বাণ'কে লাভ করলেন। বুদ্ধের এই সহজ, সুখকর, বিচারশীল ও যুক্তিবাদী ধর্মমতকে তখনকার লোকেরা সানন্দে বরণ করে নিল। বেদের বিকৃত অনুষ্ঠান-সর্বস্ব যাগযজ্ঞে ও পুরোহিত প্রধান ধর্মাচারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। বুদ্ধের ধর্মমত ছিল জীবনাশ্রয়ী ও প্রত্যক্ষ নির্ভর। তাই যাগযজ্ঞ, পশুবলি ত্যাগ করে মানুষ বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মকে অভিনন্দন জানাল।

হিন্দু চিন্তা ও বৌদ্ধ চিন্তা পরস্পর বিরোধী নয়—পরিপূরক

গৌতমবুদ্ধ নিজ সাধনা ও বিচারের দ্বারা সত্যলাভের এক নূতন পথের সন্ধান পেলেন। তিনি বেদের যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডকে অস্বীকার করলেন। ঈশ্বর বা দেবদেবীর অস্তিত্ব এবং অনুগ্রহলাভের কথাও স্বীকার করলেন না। বুদ্ধ বললেন "সুখ দুঃখের, ভাল মন্দের মানুষই মানুষের স্রষ্টা। মানুষের কর্মই মানুষের ভাল মন্দের জন্য দায়ী। মানুষ নিজের চেষ্টায়ই নিজের মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করতে পারে। এর জন্য দেবদেবীর অনুগ্রহের প্রয়োজন হয় না।" বেদের অন্তর্গত উপনিষদও মানুষের কর্মফলকে ব্যক্তির ভাগ্য-স্রষ্টা বলে মনে করে। বাসনা বা কর্মফলই জীবকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে নিয়ে যায়—এবং সুখদুঃখের ভাগী করে। কর্মফলের হাত থেকে অব্যাহতিলাভ করতে পারলেই মুক্তি বা নির্বাণ। উপনিষদের মোক্ষ বা মুক্তি এবং বুদ্ধের নির্বাণ স্বরূপতঃ একই অবস্থা। উপনিষদের সাধনার ও বৌদ্ধ মতে সাধনার একই ফলশ্রুতি। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় বুদ্ধ বৈদিক চিন্তার বিরোধী ছিলেন না। বরং বুদ্ধের মধ্যে উপনিষদের ও বেদের, সারবস্তুই মূর্ত হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব উপনিষদের সাধনাকেই বিশেষ করে নৈতিক দিকটা সময়োপযোগী করে নিজ জীবনে অনুভব করেছেন; এবং উপনিষদের চিন্তা বা ভাবনাকেই প্রকারান্তরে প্রচার করেছেন। বুদ্ধদেব হিন্দু ভাবধারারই বাহক ও পোষক। বৌদ্ধধর্মও দর্শন হিন্দু চিন্তার বিরোধী নয়। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুচিন্তারই পরিপূরক। হিন্দুগণ বুদ্ধকে দশ অবতারের এক অবতার রূপে পূজা করেন। বস্তুতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই বিদ্রোহী সন্তান।

বুদ্ধদেবের ধর্ম মত প্রত্যক্ষ জীবনাশ্রয়ী—বুদ্ধের মধ্যপন্থা

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বৌদ্ধ দর্শনের উৎপত্তি। বৌদ্ধ ধর্ম "এহি পশ্যিক ধর্ম'। এর অর্থ হল "এস, নিজে এসে পরীক্ষা করে এই ধর্মের ফলাফল লাভ কর।" বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরানুগ্রহের বা দেবদেবীর কৃপালাভের কোন স্থান নেই। মানুষ নিজেই নিজের সুখদুঃখের জন্য দায়ী—এর জন্য বাইরের কারও উপর নির্ভর করা চলে না। বুদ্ধ সাধকজীবনে অনেক ধর্মবক্তা আচার্যের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁদের মত ও পথকে যাচাই করে দেখেছিলেন। অনেক ধর্মগুরুই গৌতমের মত বুদ্ধিমান ও তত্ত্বান্বেষী প্রিয়দর্শন যুবককে শিষ্য করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তদানীন্তন কোন ধর্মগুরুর মত বুদ্ধের পছন্দ হল না। তিনি নিজের পথ নিজেই বেছে নিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের চেষ্টায় নির্বাণ লাভ করলেন। বুদ্ধ প্রথম জীবনের সাধনায় জৈন ও তীর্থিকদের মত কঠোর দৈহিক ক্লেশের পন্থা অবলম্বন. করেন। কিন্তু কঠোর ক্লেশে অথবা অপরিমিত ভোগে ধর্ম লাভ সম্ভব নয় বলে তিনি অনুভব করেন। তিনি তাই মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন এবং তাতেই নির্বাণের আনন্দ লাভ করেন। বুদ্ধ বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনে অপরিমিত ভোগের মধ্যে লালিত-পালিত হন। ভোগ তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। সাধকাবস্থায় বুদ্ধ প্রথমে অল্পাহারে-অনাহারেএবং শীতাতপ অগ্রাহ্য করে শরীরকে খুবই কষ্ট দেন। কিন্তু কঠোরতার পথেও বুদ্ধ সত্য লাভ করতে পারেন নি। পরে তিনি অতিভোগ ও অতি কঠোরতার পথ পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। মধ্যপন্থাই তাঁকে সুখকর নির্বাণের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। পরবর্তী জীবনে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের 'অতিভোগ' ও 'অতিকঠোরতা' ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে উপদেশ দিতেন।

বুদ্ধের আবিষ্কৃত চারটি আর্য সত্য

বুদ্ধ দীর্ঘকাল তপস্যাদ্বারা নিজের চেষ্টায় নির্বাণের যে আনন্দ লাভ করলেন সেই আনন্দের পন্থাকে তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে উৎসাহী হলেন। উপনিষদের ঋষিগণও ঠিক এমনি ব্রহ্মোপলব্ধি করে সমগ্র জগৎবাসীকে ডেকে মুক্তির পন্থা বলে দিতেন। বুদ্ধদেব সাধনার দ্বারা চারটি 'আর্য সত্য' আবিষ্কার করলেন। এই আর্য-সত্যের প্রথমটি হল দুঃখ। দুঃখ আমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বাঞ্ছিত

বস্তু না পেলেই দুঃখ—আবার অবাঞ্ছিত বস্তু এসে উপস্থিত হলেও দুঃখ। জন্মে দুঃখ, জরায় দুঃখ, ব্যাধিতে দুঃখ। যে পর্যন্ত না আমাদের নির্বাণ লাভ হয় সমগ্র বাসনার কামনার ক্ষয় হয়, সে পর্যন্ত আমাদের দুঃখ থাকবেই। দ্বিতীয় আর্য-সত্য হল দুঃখের উৎপত্তি। দুঃখ অহেতুক নয়। তৃষ্ণা বা কামনা বাসনা থেকেই দুঃখ উৎপন্ন হয়। তৃতীয় আর্য-সত্য হল দুঃখের অবরোধ। চতুর্থ আর্য-সত্য হল দুঃখ অবরোধের পন্থা। অর্থাৎ বুদ্ধদেব বুঝালেন—আমাদের জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের হেতু বা উৎপত্তি আছে, দুঃখের অবরোধ আছে এবং দুঃখ রোধের পথও আছে। যেমন আমাদের যদি কোন অসুখ হয় তাহলে আমরা জানি, কোন না কোন কারণে আমাদের অসুখ হয়েছে। তখন অসুখের কারণ নির্ণয় করি, অসুখ সারাবার জন্য ডাক্তার ডাকি, ঔষধ পথ্য ব্যবহার করি—শেষে অসুখ নিরাময় করি। ঠিক তেমনি 'ভব'-রোগেরও (ভব=জন্মগ্রহণ। জন্মগ্রহণও একটা রোগ বিশেষ) হেতু আছে। এবং এই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের পন্থাও আছে। সকল ধর্মের ও সাধনার সার কথা হল, এই 'ভব' বা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। বুদ্ধ অতি সরল লৌকিক ভাষায় নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সকল মানুষকে এই চারটি আর্য সত্যের ভাবনা করতে উপদেশ দিয়েছেন। আমরা প্রত্যেকেই আর্য-সত্য চারটি সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। বুদ্ধ মানুষ জীবনের সব সমস্যাকেই এই চারটি আর্য-সত্যের ভিতর দিয়েই সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

নির্বাণ-লাভেরপন্থা—অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

এই দুঃখের উপশমের পন্থা হল আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আমাদের চালচলনে, কথাবার্তায়, আচার আচরণে এই আটটি বিষয় 'সম্যক' (যথাযথ) হওয়া উচিত। ১. সম্যক দৃষ্টি (বিশ্বাস, মত), ২. সম্যক সংকল্প ৩. সম্যক বাক্য ৪. সম্যক কর্ম ৫. সম্যক আজীব (জীবিকা) ৬. সম্যক ব্যায়াম (প্রচেষ্টা, প্রয়াস) ৭. সম্যক স্মৃতি ও ৮. সম্যক সমাধি (ধ্যান, চিন্তা)। বুদ্ধ-কথিত ধর্ম ও দর্শনের সার কথাই হল এই চারিটি আর্যসত্য ও আটটি আর্যপথ বা শুদ্ধক্রিয়া। আমাদের প্রথম বুঝতে ও জানতে হবে 'জীবনে দুঃখ আছে।' দুঃখের কারণটা বুঝে নিতে হবে। শেষে আমাদের কর্ম, বাক্য, চিন্তা, ধ্যান, স্মৃতি ও প্রচেষ্টা প্রভৃতিকে শুদ্ধপথে পরিচালিত করে, নির্বাণ লাভ করতে হবে। ভারতীয় সকল

ধর্মমতই শুদ্ধ কর্ম ও চিন্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বুদ্ধ অন্য সব পুজা অর্চনা ও যাগযজ্ঞের উপর নির্ভর না করে নিজের কর্ম ও চিন্তার উপর লক্ষ্য রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। কারণ আমাদের কর্ম এবং চিন্তাই আমাদের জীবনের শুভাশুভের জন্য দায়ী। যদি আমরা জীবনে সকল দুঃখ থেকে অব্যাহতি লাভ করতে চাই তা হলে আমাদের কর্ম ও চিন্তাকে শুদ্ধপথে চালিত করতে হবে। পূর্বসংস্কারকে নাশ করতে হবে। যাতে নূতন কোন কামনা বাসনা আমাদের চিত্তকে মলিন না করতে পারে, সেই চেষ্টা করতে হবে। বুদ্ধ-প্রদর্শিত আটটি মার্গের যথাযথ অনুশীলন করলে আমাদের নির্বাণ লাভ হবে। আর পুনর্জন্ম হবে না—কোন দুঃখ থাকবে না। বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম অতি 'ঋজু' (সরল)। সকলেই বুঝতে পারে, এবং একটু চেষ্টা করলেই আচরণও করতে পারে।

ধর্ম শুধু তর্ক বিচার নয়—ধর্ম আচরণ বা চর্যা

ধর্ম-বিষয়ে বুদ্ধ খুব তর্ক বা দার্শনিক বাদানুবাদ পছন্দ করতেন না। তিনি বেশী জোর দিতেন জীবনের অভিজ্ঞতার উপর। প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। ধর্ম শুধু তর্ক বা বিচারের বস্তু নয়—ইহা জীবনে আচরণের বস্তু। চারটি আর্যসত্য জেনে নিয়ে অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনা করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি অগ্নিপরিবৃত গৃহের মধ্যে থাকে তা হলে সে সর্বাগ্রে সর্বপ্রকারে গৃহের বাইরে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চায়। অগ্নিপরিবৃত গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে যদি কেউ জানতে চায় কে গৃহে অগ্নিসংযোগ করল, 'তার নাম গোত্র কি' 'তার বর্ণ কি রকম' ইত্যাদি—তাহলে সে ব্যক্তি অযথা বিলম্বের জন্য অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাবে। ঠিক তেমনি আমরা সংসাররূপ গৃহে বাসনা কামনা এবং ভবতৃষা রূপ অগ্নিদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছি। আমাদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত যাতে আমরা এই সংসাররূপ অগ্নিগৃহ হতে শীঘ্র বেরিয়ে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারি।

গৃহস্থের পঞ্চশীল অনুষ্ঠান ও ত্রিরত্ন শরণ

বুদ্ধ-উপাসকদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—গৃহস্থ ও ভিক্ষু (সন্ন্যাসী)। গৃহস্থদের জন্য বুদ্ধ পঞ্চ 'শীল' বা পাঁচটি অবশ্য পালনীয় আচরণ বিধির ব্যবস্থা দিয়েছেন। গৃহস্থের এই পঞ্চশীল হল: ১. জীবহিংসা বা প্রাণীহত্যা না করা, ২. অদত্ত গ্রহণ (চুরি) না করা, ৩. অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবা না করা,

৪. মিথ্যাকথা না বলা ও ৫. মাদকদ্রব্য (মদ, গাঁজা ইত্যাদি) ব্যবহার না করা। গৃহস্থরা এই কয়টি নিয়ম পালন করবেন এবং চারটি আর্য-সত্যের কথা সর্বদা মনে রাখবেন। বুদ্ধ উপাসকদের 'ত্রিরত্ন' অর্থাৎ ; —

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

এই তিন মহাবাণীর শরণ নিতে হয়। এইরূপ শীলানুষ্ঠানের ও ত্রিরত্ন শরণের দ্বারা তাঁদের দেহমন ক্রমশঃ শুদ্ধ হয়। দেহমন শুদ্ধ হলেই উচ্চ ধ্যানধারণা সম্ভব এবং এই ধ্যানধারণার সাহায্যেই নির্বাণ বা চরম শান্তি লাভ হয়।

ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণী সংঘ

ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীদের জন্য বুদ্ধদেব গৃহস্থের পঞ্চশীল ব্যতিরিক্ত আরও কয়েকটি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ভিক্ষুরা সাধারণতঃ গার্হস্থ্য পরিবেশের বাইরে সংঘ বা মঠে বাস করতেন। ভিক্ষুণীদের জন্যও পৃথক সংঘ ছিল। ভিক্ষুণী সংঘেরও অনেক কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল। প্রাতিমোক্ষ নামক গ্রন্থে বৌদ্ধসংঘের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে। এই নিয়মভঙ্গকারীকে সংঘের অপরাপর ভিক্ষুর নিকট অপরাধ স্বীকার এবং শাস্তি গ্রহণ করতে হত। সাধারণ অপরাধের জন্য অনুশোচনা এবং সংঘের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু গুরুতর অপরাধ অথবা সংঘভেদের অপরাধের জন্য অপরাধীকে সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হত। বৌদ্ধসংঘ পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হত। অধিকাংশ ভিক্ষুর ভোটে সংঘের নির্বাচন এবং শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হত।

বৌদ্ধমতে সাধকের স্তর ভেদ।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধন এবং শীলব্রতের অনুষ্ঠান করলে ক্রমশঃ সাধকের চিত্ত থেকে মালিন্য দূর হয়। শুদ্ধচিত্ত সাধক নির্বাণলাভের অধিকারী হন। বৌদ্ধ সাধনার ক্রম অগ্রগতির চারটি স্তর আছে:—১. স্রোতাপন্ন, ২. সকৃদাগামি, ৩. অনাগামি ও ৪. অর্হৎ। যখন সংসারের অনিত্যতা ও দুঃখ অনুভব করে সাধক ধর্মপথে নির্বাণলাভের জন্য উদ্‌যোগী হন, তখনই তিনি ধর্মের স্রোতে 'আপন্ন' বা পতিত হন। এখান থেকে সাধকের ঊর্ধ্বপথে নির্বাণলাভের পথে যাত্রা সুরু। স্রোতাপন্ন হয়ে সাধক যদি নির্বাণলাভের পূর্বেই দেহত্যাগ করেন তাহলে তাঁকে দুঃখ নিরোধের জন্য 'সকৃৎ' (আর একবার)

জন্ম গ্রহণ করতে হয়। অনাগামি স্তরে সাধকের সব বাসনা কামনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। অনাগামি নির্বান লাভ করেন এবং তাঁকে আর সংসারে আগমন (জন্মগ্রহণ) করতে হয় না। অর্হৎ অবস্থায় সাধকের চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞার আনন্দ লাভ হয়। তাঁর কোন তৃষ্ণা থাকে না। তিনি সংসারে বাস করলেও সংসারের কোন বন্ধনে লিপ্ত হন না। অর্হত্ব অবস্থাই নির্বাণের ফলশ্রুতি। বৌদ্ধ সাধকের সাধনার চরম অবস্থা হল অর্হত্ব লাভ। এই অর্হৎগণই হলেন 'তথাগত'। 'তথা'=নির্বাণ বা মুক্তির অবস্থা সেখানে 'গত'=উপনীত। গৌতম বুদ্ধও ছিলেন 'তথাগত'।

বৌদ্ধধর্মে নানা শাখার উৎপত্তি—হীনযান ও মহাযান

বুদ্ধের দেহত্যাগের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বুদ্ধের মূল বাণী ও উপদেশকে ভিত্তিকরে নানা দার্শনিক মতবাদ ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে। বুদ্ধের দেহত্যাগের কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম ভারতের সর্বত্র এবং পৃথিবীর নানা দেশে—বিশেষতঃ বর্তমান এশিয়ার সর্বত্র বিস্তারলাভ করে। ভারতের বাইরে যে সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করেছে সেই সকল দেশের সমসাময়িক দার্শনিক চিন্তা ও ধর্মীয় সাধন পদ্ধতির সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম এক অভিনব রূপে মিশে গিয়ে নূতন আকার ধারণ করেছে। আবার ভারতেই বৌদ্ধসংঘের মধ্য থেকে নানা মতের সৃষ্টি হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম নানা শাখা উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে। চীন, তিব্বত, জাপান, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্মের শতাধিক শাখা উপশাখা দৃষ্ট হয়। ভারতেই এক কালে বৌদ্ধধর্মের আঠারটি শাখা উপশাখা দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্মের সকল শাখার উপাসকগণই বুদ্ধকে তাঁদের জীবনাদর্শরূপে এবং তাঁদের নিজ নিজ শাখার মত ও পথের প্রবক্তা রূপে দাবী করেন।

বৌদ্ধধর্মের বহুশাখার অস্তিত্ব স্বীকার করেও ইহাকে প্রধানতঃ দুই শাখায় ভাগ করা হয়—হীনযান ও মহাযান। বুদ্ধের বাণী ও মূল উপদেশ পালিভাষায় তিনটি 'পিটকে' (গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ আছে। সূত্রপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক। যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় পালিভাষা-গ্রথিত এই তিন পিটকে উল্লিখিত উপদেশ, মত ও পথকে অবলম্বন করে 'ধর্মসাধনা করেন তাঁদের বলা হয় হীনযান। বর্তমান সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যাণ্ডে এই সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ বেশী। ভারতে ও কিছুসংখ্যক হীনযানী বৌদ্ধ আছেন। 'যান' শব্দের অর্থ হল 'পথ' বা সাধন-পন্থা। যে সকল বৌদ্ধ উপাসক শুধু মাত্র নিজের নির্বাণ-

লাভের সাধনা করেন তাঁরাই 'হীন' যানী। 'হীন' বা সংকীর্ণ এই অর্থে যে তাঁরা অপরের কথা না ভেবে শুধুমাত্র নিজের নির্বাণ নিয়েই মত্ত থাকেন। অপর পক্ষে 'মহাযানীরা' শুধু নিজের মুক্তির কথাই চিন্তা করেন না। তাঁরা নিজের নির্বাণ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সকলের নির্বাণ বা মুক্তির কথাও চিন্তা করেন। যেহেতু মহাযানীদের ভাবনা সকলের মুক্তির জন্য সেইজন্য তাঁরা 'মহৎ' বা 'মহান'। এবং তাঁদের যান বা সাধনমার্গ মহাযান। এই হল হীনযানে ও মহাযানে মোটামুটি পার্থক্য। অবশ্য অনেক বৌদ্ধই এই জাতীয় 'হীন' ও 'মহা' শ্রেণী বিভাগ পছন্দ করেন না। তাঁদের মতে সবই বুদ্ধপথ। এতে আবার 'হীন' 'মহান' কি? সিংহল ও ব্রহ্ম ব্যতীত প্রায় সকল দেশের বৌদ্ধকেই এই অর্থে 'মহাযানী' বলা যায়।

মহাযান ও বোধিসত্ত্ববাদ

মহাযান বৌদ্ধদের মধ্যে আবার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। এদের মধ্যে বোধিসত্ত্ববাদিগণ পরের মুক্তির জন্য নিজের মুক্তিকেও উপেক্ষা করতে প্রস্তুত। তাঁরা মনে করেন প্রত্যেক ব্যক্তিই বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ লাভ করতে পারেন—এবং সামগ্রিক নির্বাণই যথার্থ নির্বাণ। যে পর্য্যন্ত না সকলের নির্বাণ লাভ হয় সে পর্যন্ত বোধিসত্ত্বগণ নিজের নির্বাণ চান না। মহাযানীদের বিশ্বাস এই যে, পূর্ব পূর্ব বোধিসত্ত্বের সাধনলব্ধ ফলের দ্বারা পরবর্ত্তীগণ নির্বাণপথে সহজে অগ্রসর হতে পারেন। বোধিসত্ত্ববাদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটি সুপ্ত-বুদ্ধ। মহাযানী বৌদ্ধদের মধ্যে পূর্ব বোধিসত্ত্বগণের এবং নানা দেব-দেবীর পূজার অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়।

কালক্রমে মহাযানীদের মধ্যেও নানা দার্শনিক চিন্তা ও অসংখ্য মতবাদের উৎপত্তি হল। হিন্দুতন্ত্রের সাধন পদ্ধতিও মহাযানে স্থান পেয়েছে। তিব্বত ও জাপানের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মন্ত্রযান ও তন্ত্রযান এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে। সাধন পথের নানা বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও এই সকল বৌদ্ধগণ—"আমরা বুদ্ধ উপাসক বৌদ্ধ"—এই সাধারণ ভাবটি পোষণ করেন। সব চেয়ে মজার কথা, যে সকল ভারতীয় নিজেদের 'বৌদ্ধ' বলে পরিচয় দেন না তারাও বুদ্ধকে অবতার বা ভগবানরূপে পূজা করেন। বুদ্ধদেব নিজে পূজাপদ্ধতি এবং নানা দেবদেবী না মানলেও ভারতীয়গণ তাঁকেই দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা করে তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করছে।

বুদ্ধ কি যথার্থই বেদবিরোধী ?

অনেকেই বুদ্ধকে বেদবিরোধী ও নাস্তিক আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখলে সনাতন হিন্দু চিন্তাধারার সঙ্গে বুদ্ধচিন্তার বিরোধভাব কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। বেদের সেরা অংশ বেদান্ত—উপনিষদ। উপনিষদ বিশ্বাস করে মানুষের অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তিতে। উপনিষদের মতে মানুষের ভিতরের শক্তি ও সর্বব্যাপী বহ্মের শক্তি এক ও অভিন্ন। মানুষই নিজ চেষ্টাদ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারে ; এবং ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হয়ে যান। আর ব্রহ্ম হয়ে গেলে জীব জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুকে জয় করতে পারে। বুদ্ধ উপনিষদের ন্যায় মানুষের নিজের কর্মফলের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ঈশ্বরকে মানেন নি। মানুষকেই মানুষের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা বলে মনে করেন। মানুষই নিজের চেষ্টায় ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণের আনন্দ লাভ করতে পারে। উপনিষদের মোক্ষ আর বুদ্ধের নির্বাণ স্বরূপতঃ এক। সুতরাং বুদ্ধ কর্মবাদী হওয়ায় বেদ বিরোধী নন। বুদ্ধ বেদের সাধনার পরিপূরক—বেদান্ত মূর্তি।

জৈন ও বৌদ্ধ মতের সাদৃশ্য

আমাদের দেশের জৈনধর্মমতের সঙ্গেও বৌদ্ধমতের অনেক সাদৃশ্য আছে। জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মাপেক্ষা বহু প্রাচীন। জৈনেরাও বৌদ্ধদের মত বেদ-বিহিত পশুবলি যাগযজ্ঞ ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। জৈনেরাও কর্মবাদী। অহিংসা বা প্রাণিহত্যা ব্যাপারে জৈনেরা আরও নৈষ্ঠিক। জৈনেরাও বৌদ্ধদের মত বিশ্বাস করেন যে চিত্তের মালিন্য, কর্মবন্ধন এবং আসক্তি ক্ষয় করলেই 'জিন' বা অর্হৎ হওয়া যায়। পরমাত্মা, ভগবান বা দেবদেবীর উপর নির্ভর করার উপদেশ জৈনধর্মে নেই। জৈনধর্মমতে মানুষই তা'র শুভাশুভের বিধাতা। বুদ্ধের উপর উপনিষদের ও জৈনদর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। বুদ্ধ তার সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী ধর্মমতকে বিচার ও বিশ্লেষণ করে সার বস্তুটুকু গ্রহণ করেছেন এবং ইহাকে কালের উপযোগী করে ব্যক্ত ও প্রচার করেছেন। বৌদ্ধ চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় মৌলিক ধর্মচিন্তাধারার মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই। ঈশ্বর বা দেবদেবীকে না মেনে যাঁরা শুধুমাত্র কর্মফলবাদী তাঁদের সঙ্গেও মূল হিন্দু চিন্তাধারার কোন বিরোধ নেই। হিন্দুচিন্তায় 'সব মতই সত্যলাভের পথ'।

ভারতীয় সংস্কৃতির উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

ভারতীয় ধর্মচিন্তা ও সংস্কৃতির উপর বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বেদ-নিহিত ধর্মের গূঢ় রহস্যকে বুদ্ধদেব জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করে দিলেন। বেদে শূদ্র ও নারীর বিশেষ কোন অধিকার ছিল না। বুদ্ধ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই নির্বাণ লাভের অধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। বৌদ্ধভিক্ষুসংঘে কোন জাতি বিচার ছিল না। সকলকেই সন্ন্যাসের (প্রব্রজ্যার) অধিকার দেওয়া হত। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের দ্বারা পীড়িত ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষ বুদ্ধের দয়ায় একটা মানবিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হল। সাধারণ মানুষেরও এই আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হল যে তারাও মানুষ হিসাবে কারও চেয়ে হেয় নয়। বৌদ্ধসংঘে সকল জাতি ও বর্ণের ভিক্ষুই ছিলেন।

ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুনী সংঘেরও প্রতিষ্ঠা হল। ভিক্ষুনী সংঘ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়ে বুদ্ধ নারীর ধর্মসাধনার অধিকারকে প্রসারিত করে দিলেন। বৌদ্ধধর্ম যুক্তি, বিচার ও নীতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, বৌদ্ধধর্ম মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করল। শুধু অন্ধ বিশ্বাসের উপর মানুষ ধর্মসাধনার ফলাফল নির্ভর করে থাকতে পারল না। বৌদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় করে গণচিত্ত, বুদ্ধিবাদ ও বিচারশীলতার দিকে অগ্রসর হল। মানুষ চিন্তার স্বাধীনতা লাভ করল।

বুদ্ধের নিজের এবং আনন্দ, সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন, কাশ্যপ প্রমুখ পণ্ডিত ও শান্তদান্ত আদর্শচরিত্র ভিক্ষুদের জীবনচর্যা, সমাজের উপর এক অলৌকিক শুভ প্রভাব বিস্তার করল। গৃহস্থ উপাসকদের পঞ্চশীল সাধনের উপদেশ সমাজের নীতিবোধ ও নৈতিকচরিত্রকে উন্নীত করল। দান, পরোপকার ও জনসেবার আদর্শ প্রচারে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অপরিসীম।

বুদ্ধের সমসাময়িক এবং পরবর্তী বহু রাজা, শ্রেষ্ঠিগণ এবং অভিজাত বর্গ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ফলে দেশের রাজশক্তি, মেধাশক্তি ও অর্থশক্তি প্রজাসাধারণের মঙ্গল বিধানে নিযুক্ত হল। প্রসেনজিৎ, বিম্বিসার, সম্রাট অশোক প্রমুখ রাজা এবং অনাথপিণ্ডদের ন্যায় বহু বণিকের দ্বারা দেশের বহু কল্যাণ সাধিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত রাজা ও বণিকগণ ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে সহায়তা করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও ললিতকলা বিদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছে, ভারতকে গুরুর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভারতের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও ভাস্কর্যের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যথেষ্ট। বৌদ্ধমঠগুলি মুসলমান আগমণের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শিক্ষা ও দার্শনিক চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরীর বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি ছিল বৌদ্ধ পণ্ডিত ও আচার্যের দ্বারা পরিচালিত। পালিভাষায় বুদ্ধের উপদেশ লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হওয়ায় উহা সাধারণ লোকের বোধগম্য হওয়ার পক্ষে সুবিধা হল। সংস্কৃত ভাষার বন্ধন থেকে ধর্মশাস্ত্রকে মুক্তিদান করে সাধারণ লোকের বোধগম্য ও সহজলভ্য করার মধ্যেও বুদ্ধের কৃতিত্ব যথেষ্ট। জাতক, অবদান, গাথা ও বুদ্ধের জীবনকাহিনী নিয়ে দেশে নূতন সাহিত্যের একটি ধারা সৃষ্টি হল। বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের কাহিনী নিয়ে অতি-আধুনিক কালেও আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও নাটক রচনা করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ভারতের চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, গুহাচিত্র প্রভৃতির উপরও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যথেষ্ট। বুদ্ধের সাধনা ও জীবনের নানা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহে বহু স্তূপ, গুহা, মন্দির, মূর্তি, স্তম্ভ ও চিত্র নির্মিত হয়েছিল। এই সকল শিল্প-নিদর্শন এখনও বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যকে বহন করে আছে। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি ভারতীয় ভাস্কর্যকে এক অপরূপ কান্ত-কোমল-শান্ত-গম্ভীর সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। ইলোরা-অজন্তার গুহাচিত্র শত শত বৎসর যাবৎ শিল্পী ও ভাবুকের চিত্তকে নির্মল আনন্দে অভিভূত করছে। বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভলেখ যুগ যুগ ধরে মানুষের নৈতিকজীবনকে ও শিল্পী মনকে সত্য ও সুন্দরের পথে উদ্বুদ্ধ করছে। মহাযান মতবাদের উৎপত্তির পর ভারতীয় ধর্মসাধনায় এক বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে। হিন্দুর বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পুজার সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের দেবদেবী আশ্চর্যরূপে মিশে গিয়ে ভারতীয় সাধনাকে এক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বাংলাদেশের লৌকিক ধর্মসাধনায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অপরিসীম। বুদ্ধ ও বৌদ্ধভাব ভারত সংস্কৃতির শিরায়-শিরায়, মজ্জায়-মজ্জায় মিশে আছে। বর্তমান স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র প্রতীকও বৌদ্ধ ধর্মচক্র।

বহির্বিশ্বে বৌদ্ধ সংস্কৃতি

বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরে বহির্বিশ্বে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধ এশিয়ার আলো। তমসাচ্ছন্ন বহু দেশ বুদ্ধের জীবনালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধের জীবন ও বাণীর মৃতসঞ্জীবনী আহরণ করে বহু জাতি আজও সগৌরবে পৃথিবীর

বুকে দণ্ডায়মান। খৃষ্টধর্মের উপরও বুদ্ধের প্রভাব অল্প নয়। পূর্ব্ব ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলি বুদ্ধের ধর্মের আলোকেই উদ্ভাসিত। বৌদ্ধধর্ম চর্যাপ্রধান, জীবনভিত্তিক, নীতিবহ ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠ। বুদ্ধের উপদেশ ও ধর্মচর্যা সরল এবং সহজ। রাজানুকূল্যে ও প্রচারক ভিক্ষুদের চরিত্র-মাধুর্য্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সমগ্র এশিয়াকে আলোকিত করে আছে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে এশিয়ার বহু অসভ্য ও বর্বর জাতি সভ্য হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম কোন দেশের কোন ভাবের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নি—অতি স্বাভাবিকভাবে বিদেশের ভাবকে নিজের বিরাট দেহে মিশিয়ে নিয়ে বলিষ্ঠ হয়েছে। চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশ বৌদ্ধ ধর্মের বন্ধন সূত্রেই ভারতের সঙ্গে সংবদ্ধ। বুদ্ধকে দিয়ে ভারত দিগ্বিজয় করেছে। সেই অর্থে বুদ্ধ যথার্থই ধর্ম-সেনাপতি। ঐ সকল বৌদ্ধ দেশের সংস্কৃতির সোল আনাই বুদ্ধ ময়। পৃথিবীর বহু সংখ্যক লোকই বুদ্ধ উপাসক।

উপসংহার—বর্তমান ভারতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম

আশ্চর্যের বিষয় বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি যদ্যপি ভারতে তথাপি উহার বিস্তার ও স্থিতি বহির্দেশেই। বুদ্ধ ভারতের গৌরব—ভারতীয় সাধনার পরিপূর্ণ মূর্তি। বুদ্ধকে ভারতীয়েরা ভগবান বা অবতার বলে পূজা করেন—ইহাও সত্য। কিন্তু ভারত ভূমিতে মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত অপরে নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দেন না। এর কারণ কি? বুদ্ধ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং দেবদেবীর প্রতীককে মানেন নি। কিন্তু সাধারণ লোকের উপাসনার জন্য একটা মূর্ত্তি বা প্রতীক চাই। বুদ্ধ প্রবর্তিত প্রতীকহীন ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান বিচার সাধারণ লোকের সাধ্য নয়। সাধারণ লোক আচার অনুষ্ঠান পূজা অর্চনার ভিতর দিয়ে নিজেদের দেহমনকে সংযত ও শুদ্ধ করে ধর্মলাভের পথে অগ্রসর হতে চায়। তাই ভারতীয়েরা আবার মূর্তি পূজায়, দেবদেবীর বিশ্বাসে ফিরে এল। তবে বুদ্ধের ধর্ম ও নীতি উপদেশকে একেবারে উপেক্ষা করল না। বুদ্ধকে নিজেদের ভাবে মিশিয়ে হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে এক করে দিল। ভগবানকে যে বুদ্ধ স্বীকার করেন নি সেই বুদ্ধকেই কালক্রমে ভগবানের আসনে বসিয়ে পূজা করতে লাগল। বুদ্ধ যে কালে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে সময় ভারতীয় জীবনে আধ্যাত্মিকতার আদর্শরূপে তাঁর মত একজন বাস্তববাদী, ত্যাগশীল, বিবেক সম্পন্ন, হৃদয়বান মহামানবের প্রয়োজন ছিল। বুদ্ধ ভারতে তথা সমগ্র বিশ্বে ধর্মচক্র প্রবর্তন করে মানুষের মুক্তির

পথ প্রশস্ত করে দিয়ে গেছেন। বুদ্ধ এখন ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্মজীবনে প্রচ্ছন্ন ও অনুস্যূত হয়ে আছেন।

বুদ্ধের বাণী মানবতার বাণী। বুদ্ধ কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়, ওটা একটা উচ্চ অবস্থা। এই উচ্চ অবস্থা লাভ করেছিলেন কপিলাবস্তুর সর্বস্ব ত্যাগী রাজপুত্র গৌতম। রাজগৃহে একটা তুচ্ছ ছাগশিশুকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। একবার এক ব্যাঘ্রীর ক্ষুধাপরিতৃপ্তির জন্য নিজ শরীরই দান করেছিলেন। বারনারী, অন্ত্যজ কেউই তাঁর দয়া থেকে বঞ্চিত হয়নি। আজিকার হিংসা-স্বার্থপূর্ণ বিশ্বে শত শত বুদ্ধের প্রয়োজন।

—০—

ভারতীয় সংস্কৃতিতে খ্রীষ্ট সভ্যতার স্থান ও দান

বর্তমান ভারতে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ। ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলে এঁরা সমানভাবে ছড়ানো নন। কেরল রাজ্যেই খ্রীষ্টানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী—রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ। কেরলের পর গোয়াতে এই সংখ্যা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মাদ্রাজ, ম্যাঙ্গালোর, বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশের জায়গায় জায়গায় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের অবস্থান ও প্রভাব লক্ষ্য করবার বিষয়। বাংলাদেশে শুধু কলকাতা শহরেই এঁদের বসবাস। পল্লী বাংলায় খ্রীষ্টধর্মানুসারী নেই বললেই চলে। আসামের পার্বত্য অঞ্চলে খাসিয়া নাগা প্রভৃতি পাহাড়ী উপজাতিদের একটি বড় অংশ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

কোনও কোনও কিংবদন্তী অনুসারে খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই ভারতে আসে। খ্রীষ্টের বারোজন অন্তরঙ্গ শিষ্যের অন্যতম সেণ্ট টমাস নাকি ভারতে এসেছিলেন এবং যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও বাণী প্রচার করেছিলেন। অভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকদের মতে এই কিংবদন্তীর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কিন্তু যে করে হোক্ মাদ্রাজ এবং কেরলে খ্রীষ্টান সমাজ ও ঐতিহ্যে সেণ্ট টমাসের নাম বেশ দৃঢ়ভাবেই জড়িয়ে রয়েছে। মাদ্রাজ শহরে একটি ঢিবি আছে যার নাম সেণ্ট টমাস মাউণ্ড্। একটি প্রবাদ এখানেই সেণ্ট টমাসের সমাধি। ইংলণ্ডের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেট ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সমাধি দেখবার জন্য একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন, এও একটি প্রচলিত ধারণা।

খ্রীষ্টধর্ম প্রথম খ্রীষ্টাব্দে না হোক অন্ততঃ চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে যে ভারতের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে শিকড় গেড়ে বসেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ভারতের এই সময়কার গীর্জা-সংহতির রীতি-নীতি, উপাসনাপ্রণালী সিরিয়ান্ গির্জার পথানুলম্বী ছিল। প্রায় এক হাজার বৎসর ধরে এই ধারা একপ্রকার অব্যাহত থাকে। ইয়োরোপের নানা জাতি ভারতে আসবার পর থেকে এই ধারা পাশ্চাত্ত্য গীর্জার নিয়ম-কানুন দ্বারা প্রভাবিত হয়। সিরিয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশ। চিন্তা ও জীবন ধারায় ভারতের সঙ্গে ইয়োরোপের চেয়ে সিরিয়ার যে বেশী মিল থাকবে তা বলা বাহুল্য। সেই জন্য, ইয়োরোপীয়েরা ভারতে আসার আগে দক্ষিণ ভারতের বিশেষতঃ কেরলের সিরিয়ান্

গীর্জা প্রভাবিত খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তাঁদের অভারতীয় ধর্ম সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজের সঙ্গেই একতানতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের আবির্ভাবের পর এই একতানতা ব্যাহত হয়। পর্তুগীজ মিশনারীরা ইয়োরোপীয় রোমান গির্জার দৃষ্টিভঙ্গী ও রীতিনীতি চালু করতে থাকেন। ফলে ভারতীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ক্রমশঃই ভারতীয় ঐতিহ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পর্তুগীজ মিশনারীদের পিছনে ছিল পর্তুগীজ রাজশক্তি। গোয়ার খ্রীষ্টধর্মান্তরিত জনগণকে বাইবেলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আহারে, পরিচ্ছদে এবং জীবনধারায় ইয়োরোপীয় রীতি অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়। এমন কি তাঁদের ভারতীয় নাম বদলে ইয়োরোপীয় নাম দিতেও অত্যুৎসাহী ধর্মান্ধ এবং নিষ্ঠুর পর্তুগীজ প্রচারক ও শাসক সম্প্রদায়ের বিবেকে আদৌ বাধে নি। মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দুর্দমনীয় গোঁড়ামি এবং প্রমত্ত আত্মম্ভরিতা। শান্তি ও সহিষ্ণুতার প্রতীক যীশুখ্রীষ্টের নামে ইয়োরোপীয় মিশনারীরা রাজশক্তির সাহায্যে দেশে দেশে যে অমানুষিক বর্বরতা ও অত্যাচার বিস্তার করেছিলেন তা খ্রীষ্ট ধর্মের এক কলঙ্কময় ইতিহাস। পর্তুগীজ সন্ন্যাসী সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলে উপনীত হন এবং অদম্য উৎসাহে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন চরিত্রবান ভগবৎ প্রেমিক এবং সদাশয় ব্যক্তি হলেও অখ্রীষ্টানদের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল অসহিষ্ণু। সকল হিন্দুই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণরা তাঁর সংজ্ঞায় ছিলেন "দুষমণ পূজক" বৌদ্ধরা "নাস্তিক" এবং মুসলমানগণ ছিলেন "অবিশ্বাসী"। পরবর্তীকালে ইয়োরোপে এবং আমেরিকা থেকে যে সব মিশনারী আমাদের দেশে এসেছেন তাঁদের অধিকাংশেরই দৃষ্টিভঙ্গী ছিলেন ফ্রান্সিস্ জেভিয়ারের অনুরূপ অর্থাৎ ভারতের প্রচলিত ধর্মের প্রতি একটা তাচ্ছিল্য এবং নিন্দার ভাব। খ্রীষ্টান মিশনারীরা ভারতের নানা অঞ্চলে প্রচুর লোকহিতকর কাজ করেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু ভারতের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের প্রচণ্ড ভ্রান্তি ও উদাসীনতা এবং সক্রিয় অবজ্ঞা ও বিরোধিতার জন্য তাঁরা ভারতবাসীর হৃদয় স্পর্শ করতে পারেন নি। রাজশক্তি তাঁদের পিছনে থাকায় ভারতবাসীকে তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে বটে কিন্তু প্রাণে প্রাণে ভারতবাসী বুঝেছে যে খ্রীষ্টান মিশনারীরা যথার্থ ভারতের বন্ধু নন। ছলে বলে কৌশলে যে কোনও প্রকারে অশিক্ষিত জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করে তাদের খ্রীষ্টানগোষ্ঠীতে টেনে

আনাই যেন এই মিশনারীদের ছিল জীবনব্রত। যারা একবার খ্রীষ্টান হত মিশনরীদের শিক্ষা-দীক্ষায়, অতি শীঘ্র তারা ভারতের যুগ যুগ সম্মানিত ধর্ম-সমাজ ও জীবনাদর্শের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করতে সুরু করত। তারা প্রাণে প্রাণে যেন আত্মীয়তা অনুভব করত বিদেশী শাসকমণ্ডলীর সঙ্গে।

যীশুখ্রীষ্ট এবং তাঁর ধর্মোপদেশের প্রতি ধর্মানুরাগী হিন্দুর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। আশ্চর্য পবিত্রতা, ত্যাগ, সুগভীর ঈশ্বরপ্রেম ও আত্মজ্ঞান এবং মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা খ্রীষ্টের চরিত্রের মহৎ বৈশিষ্ট্য। ধর্মপ্রাণ ভারতের যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় মহাপুরুষকে পূজার আসনে স্থাপিত করায় কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত হিন্দু স্বতঃই তাঁকে দেবতার মান দিতে প্রস্তুত, যেমন রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি ভারতীয় অবতার ও মহাপুরুষদের তাঁরা সম্মান করেন। কিন্তু খ্রীষ্টের পতাকা নিয়ে ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে যাঁরা তাকে প্রচার করতে ভারতে এসেছেন সেই বিদেশী মিশনারীদের উপস্থাপিত খ্রীষ্টধর্ম হিন্দু ভারতের কাছে বড়ই বিসদৃশ ঠেকেছে। মিশনারীদের কীর্তিকলাপ দেখে বিভিন্ন সময়ে ভারতের বহু মনীষী অত্যন্ত অস্বস্তি ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মহাত্মা গান্ধী ১৯৩১ সালে তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি জনহিতকর কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করার পরিবর্তে মিশনারীরা যদি তাঁদের লোকসেবাকে জনগণকে ধর্মান্তরিত করার উপাস্তরূপে ব্যবহার করেন তাহলে আমি অবশ্যই তাঁদের বিদায় দেবার পক্ষপাতী। ভারতবর্ষের স্বকীয় যে সব ধর্মমত রয়েছে তা ভারতীয়দের পক্ষে পর্যাপ্ত। নিজের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবার কোনই প্রয়োজন নেই ভারতে।" স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় বহু স্থলে, খ্রীষ্টান মিশনারীদের, খ্রীষ্টের নামে ভারতীয় সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর কার্যকলাপের তীব্র, সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ—এঁরাও মিশনারীদের ধর্মধ্বজিতার সমর্থন করেন নি। পাদরীদের প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মের নামে দেশের সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি যে অশ্রদ্ধা এবং ভারতীয় সামাজিক জীবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করছিল তারই প্রতিকার বিধান ছিল ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম উদ্দেশ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বিজ্ঞান, শিল্পোন্নতি এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে খ্রীষ্ট

সভ্যতার কোনও সম্পর্ক নেই। ইয়োরোপে গীর্জাকেন্দ্রিক গোঁড়া ধর্মসংস্থা বরাবরই বৈজ্ঞানিক প্রগতির বিরোধিতা করে এসেছে। গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে কখনো সমর্থন করে নি। অথচ ভারতে খ্রীষ্টান মিশনারীরা বরাবর জোরগলায় এই ধুয়া গেয়ে এসেছেন যে খ্রীষ্টধর্ম ব্যতীত জাগতিক উন্নতির অন্য কোনও পন্থা নেই। ভারতের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য এবং আরও যাবতীয় দুর্দশার জন্য দায়ী তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্ম। খ্রীষ্টধর্মের আলোক ব্যতীত ভারতের দুঃখের অমানিশা কখনো কাটবে না। বৈদেশিক শাসন কায়েম করবার জন্য ঐ ধরণের অপপ্রচারের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও বর্তমান ভারতের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অনেক নেতারা মনে এখনও পর্যন্ত এই ধারণা বেশ দৃঢমূল হয়ে রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একটী পত্রে লিখেছিলেন—"খ্রীষ্টান দেশ সমূহ হতে যে সব প্রচারক এদেশে আসেন তাঁদের সবারই মামুলি নির্বোধ যুক্তি হল এই যে, যেহেতু খ্রীষ্টান জাতিরা শক্তিশালী ও ধনী এবং হিন্দুরা তেমন নয়, সেই হেতু খ্রীষ্ট ধর্ম নিশ্চিতই হিন্দু ধর্মের চেয়ে ভাল। তার উত্তরে হিন্দুরা ন্যায্যতই বলতে পারে যে, তোমাদের যুক্তিতেই প্রমাণিত হয় যে হিন্দুধর্মই যথার্থ ধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম ধর্মই নয় কেননা এই পশুভাবাপন্ন পৃথিবীতে ছল চাতুরীই-সমৃদ্ধি লাভ করে এবং সাধুতাকেই কষ্ট ভোগ করতে হয়।"

খ্রীষ্টান মিশনারীদের মধ্যে মাঝে মাঝে কোনও কোনও উদার হৃদয় চিন্তাশীল নেতা দেখা গেছে যাঁরা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মহত্তম অভিব্যক্তিগুলির প্রভূত সমাদর দেখিয়েছেন এবং খ্রীষ্টধর্মের গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতাকে নরম করে ঐ ধর্মকে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত করবার প্রয়াস করেছেন। বিদেশী ধর্মাজকদের কেউ কেউ ছিলেন যথার্থ ভারত-বন্ধু। ভারতবর্ষ তাঁদের এদেশে শিক্ষা ও সমাজোন্নয়নের ক্ষেত্রে অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা কখনো ভুলতে পারবে না।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে খ্রীষ্ট-সভ্যতার স্থান ও দান এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থান ও দান—এই দুটি একার্থক নয়। খ্রীষ্ট-সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। পাশ্চাত্য জাতিদের স্বাধীন চিন্তা, শিল্প, বিজ্ঞানের উন্নতি, কর্মকৌশল, সংগঠনী শক্তি, সাহস, উন্নতিস্পৃহা, এই বিষয়গুলি পাশ্চাত্য সভ্যতার বনিয়াদ। খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুব কম। ইংরেজ জাতি যদি খ্রীষ্টান না হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বী হত তাহলেও তাদের ভিতর আমরা

এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পেতাম। প্রায় আড়াই শ' বৎসর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় চরিত্র এইসব কল্যাণকর গুণগুলি অনুসরণ করবার সুযোগ পেয়েছে এবং প্রভূতভাবে লাভবান হয়েছে সন্দেহ নেই। রামমোহন রায় হতে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ জহরলাল নেহেরু পর্যন্ত ভারতবর্ষের মনীষীরা কেউই পাশ্চাত্য সভ্যতার এই উজ্জ্বল দিকগুলি সম্বন্ধে অন্ধ থাকেন নি। খ্রীষ্টান মিশনারীরা ভারতবর্ষে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করে জনগণের যে প্রভূত উপকার সাধন করেছেন তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁদের এই কর্মোদ্যমের প্রেরণা কি শুধু খ্রীষ্টধর্ম? বোধ করি, না। অনেকাংশে তাঁদের পাশ্চাত্ত্য চরিত্র তাঁদের কাজে প্ররোচিত করেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে খ্রীষ্টধর্মের প্রধান অবদান স্বয়ং খ্রীষ্ট। ভারত চিরদিন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পূজারী। যদি কোনও ব্যক্তিত্বে ভগবৎপ্রেম, নিঃস্বার্থ-সেবা, চরিত্রের নির্মলতা, বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান, আত্মত্যাগ মূর্ত হয়ে ওঠে ভারত অবনত মস্তকে তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করবে। অগণ্য তত্ত্বদ্রষ্টা সাধুসন্ত মহাপুরুষদের এই দেশে যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় ত্যাগ ও প্রেমের অবতার, কখনো অবহেলিত হতে পারেন না। কিন্তু এজন্য হিন্দুর, মুসলমানের বা বৌদ্ধের খ্রীষ্টান হবার প্রয়োজন নেই। হিন্দু, হিন্দু থেকেই যীশুখ্রীষ্টের মহৎ জীবনের অপার্থিব প্রেরণা লাভ করতে পারেন।

খ্রীষ্টের ৩২ বৎসরের স্বল্পপরিমিত জীবনে একান্ত ভগবদনুরাগের সঙ্গে অতন্দ্রিত মানব সেবা বিকশিত হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মে মানুষের সেবাকে একটি বড় স্থান দেওয়া হয়। খ্রীষ্টধর্মের এই মহৎ লক্ষ্য ও আচরণটি ভারতের জাতীয় জীবনে বিশেষভাবে গ্রহণীয়।

খ্রীষ্টধর্মে জাতি বিভাগ নেই, অস্পৃশ্যতা নেই। ভারতবর্ষে জাতি বিভাগের এককালে অনেক ভাল দিক ছিল, কিন্তু বর্তমান ভারতে জাতি বিভাগের নানা অপপ্রয়োগ একেবারেই অর্থহীন। খ্রীষ্টান সমাজের একবর্ণতা হিন্দু সমাজ ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে পারলে হিন্দুর সনাতন ঐতিহ্যের কিছু ব্যাহতি ঘটলেও মোটের উপর দেশের পক্ষে তা কল্যাণকরই হবে।

• খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্টের অবতারত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবতারবাদ খ্রীষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী আগে রামায়ণে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাধ্যমে ভারতে সুবিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মে অবতারবাদ প্রধানতম তত্ত্ব বলে পরিগণিত নয়।

লক্ষ লক্ষ হিন্দু হয়েছেন এবং হবেন যাঁরা অবতারবাদে বিশ্বাসী নন। তাছাড়া ভারতীয় অবতারবাদে একাধিক অবতার স্বীকৃত। যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রসার হয় তখনই ভগবানের দৈবীশক্তি পৃথিবীতে মানবদেহ ধারণ করে মানুষের মঙ্গল সাধন করেন, এই হল ভারতীয় অবতারবাদের মূল কথা। এ পর্যন্ত অনেক অবতার হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের মতে অবতার একমাত্র যীশুখ্রীষ্ট। তিনি ঈশ্বরের একমাত্র তনয়—সর্বকালের মানুষের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং ক্রুশে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তাঁকে যদি কেউ বিশ্বাস করে তা হলেই তার স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত। যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে গেঁথে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তিনদিন পরে কবর থেকে উঠে শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন এবং দিব্য দেহে চল্লিশ দিন তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের মতে যীশুখ্রীষ্টের এই কবর থেকে পুনরুত্থান (Resurrection) মানবাত্মার অমরত্বের প্রমাণ। যারা যীশুখ্রীষ্টকে বিশ্বাস করবে তারাও মৃত্যুর পর একদিন কবর থেকে উঠে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করবে। হিন্দুরা যীশুখ্রীষ্টের এবং তাঁর শিক্ষার উপর গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করলেও, খ্রীষ্টই একমাত্র পরিত্রাতা এবং তিনি মৃত্যুর পরও স্থুল দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন ;—খ্রীষ্টধর্মের এই দুটি গোঁড়া মতকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তাঁদের দৃষ্টিতে এই দুটি গোঁড়া মতকে বাদ দিয়েও যীশুখ্রীষ্টকে পূজা করা এবং তাঁর শিক্ষানুযায়ী ধর্মজীবন যাপন করা চলে।

বর্তমান কালে ভারতের খ্রীষ্টান গীর্জাসংস্থা ক্রমশঃ পাশ্চাত্য গীর্জার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিচ্ছে। ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ভারতের বৃহৎ জনসঙ্ঘের আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা, হৃদয়াবেগ এবং জীবনচর্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজশক্তির আওতায় একটা অন্ধ আত্মম্ভরিতা নিয়ে নিজেদের চালিত করছিল। তাদের অনেকে নিজেদের ভারতীয় বলে ভাবতেও কুণ্ঠিত হত, অনেকে নিজেদের ভারতীয় নাম,—জন, জোসেফ, মাইকেল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য নামে পরিবর্তিত করে উল্লসিত হত, রাজার জাতি ইংরেজের ধর্ম তারা গ্রহণ করেছে বলে প্রাণে প্রাণে তারা নিজেদেরকে ইংরেজের কুটুম্ব বলে ভেবে গৌরব বোধ করত। ইংরেজ শাসকরা অবশ্য মনে মনে হাসত এবং ভারতীয় খ্রীষ্টানদের এই সোনার স্বপ্নকে পুরোপুরি নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাত। ভারতীয় জনতার মধ্যে যত বিভাগ ও বিভেদ সৃষ্টি করা যায় ততই

ইংরেজ-শাসন দেশে কায়েম রাখার অনুকূল হবে একথা ইংরেজ বেশ বুঝে নিয়েছিল।

যাহোক স্বাধীনতার পর ভারতে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আত্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়েছে। ভারতই যে তাঁদের মাতৃভূমি, ভারতীয় জনতাই যে তাঁদের আত্মীয় ও বন্ধু, ভারতীয় জাতীয়তাই যে তাঁদের জাতীয়তা, এই সত্য সম্বন্ধে তাদের অনেকে উত্তরোত্তর সচেতন হচ্ছেন। পাশ্চাত্য মিশনারী গুরুদের অপশিক্ষা মুছে ফেলবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। ভারতের বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ যে কুসংস্কার নয়, ভারতের ধর্ম, সমাজ, নীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা যে পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়, এ কথা অনেক খ্রীষ্টান নেতা ক্রমশঃ বুঝতে আরম্ভ করেছেন।

খ্রীষ্টধর্ম অন্ততঃ সতেরশ বৎসর ভারতে এসেছে এবং সক্রিয় রয়েছে। ভবিষ্যতে, বহু ধর্মের আবাসভূমি ভারতবর্ষে, এই বৈদেশিক ধর্মের সসম্মানে অবস্থান করবার কোনও বাধা থাকতে পারে না। খ্রীষ্ট ও তাঁর শিক্ষাকে প্রাণে প্রাণে শ্রদ্ধা করবার উৎসাহ হিন্দুদের পক্ষ থেকে কখনো স্তিমিত হবে না। খ্রীষ্টসভ্যতার ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সুসমঞ্জস ভাবে সম্মিলিত হওয়া অবশ্যই সম্ভবপর। ভারতবর্ষের অখ্রীষ্টান এবং খ্রীষ্টান জনগণ যত পরস্পরকে বুঝতে ও সমাদর করতে শিখবেন ভারতীয় জাতির সংহতি ও শক্তি ততই বৃদ্ধি পাবে।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় জোর গলায় ঘোষণা করেছিলেন, যীশুখ্রীষ্টকে ভারত চায়, আন্তরিক ভাবেই চায়, কিন্তু তাঁর গোঁড়া প্রচারকদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের কটাক্ষ অবশ্যই চায় না। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় পারসীক, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলকেই সাদর আহ্বান জানিয়ে "মহামানবের সাগরতীরে" সম্মিলিত হতে বলেছেন।

বর্তমান ভারতের তরুণ গণ সকল ধর্মের, সকল বর্ণের ভারতীয়দের মধ্যে একটা নিবিড় প্রীতি, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও একতা অনুভব করে এবং আচরণে প্রদর্শন করে ভবিষ্যতের এক গৌরবময় ভারত সৃষ্টি করে তুলবেন—এই আশা পোষণ করি।

—০—

ভারতে ঐশ্লামিক সভ্যতার স্থান ও দান

সূচনা

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস নানান বৈচিত্র্যে ভরা। উহা কোন জাতের একক সভ্যতা নয়। নানা জাতির সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়া ভারতীয় সভ্যতার বনিয়াদ। বিদেশীরা যুগ যুগ ধরে একের পর এক এদেশে এসেছে কেউ বা রাজ্য জয়ের লিপ্সা নিয়ে কেউ বা ধর্ম প্রচারের জন্য, কেউ বা বাণিজ্যের লোভে আবার কেউ বা নিছক আধ্যাত্মিক আকর্ষণে। সবাইকে ভারত নিজের বুকে ঠাঁই দিয়ে নিজের কোরে নিয়েছে। ভারতবর্ষে ঐশ্লামিক সভ্যতা এমনি এক বহিরাগত সভ্যতা।

ভারতের ইসলাম ও ঐশ্লামিক সভ্যতার আসার কারণ

কাল অষ্টম শতাব্দী। ভারতের অপরিমিত ধন সম্পদ, অনেকদিন থেকেই বিদেশীদের এদেশে টেনে এনেছে। ফলে তুর্কী, পাঠান, মোগল ইত্যাদি মুসলমান শক্তি একের পর এক এসেছে এদেশে।

উত্তর ভারতে এ সময় ছিন্নভিন্ন অবস্থা। ছোট ছোট হিন্দুরাজ্যগুলির পক্ষে আক্রমণকারীকে পরাজিত করা বা একজোট হয়ে তাদের বাধা দেওয়া, কোনটিরই সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের প্রায় সুরু থেকেই কোন হিন্দু রাজা মুসলমান শক্তির অগ্রগতিকে ঠেকাতে পারেন নি, বা পারলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কোন কোন দেশীয় রাজা নিজেদের অস্তিত্ব কোন রকমে টিকিয়ে রাখলেও একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঐশ্লামিক শক্তিগুলি প্রায় বিনাবাধায় ভারতবর্ষে প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। আর মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এদেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।

আরবের মুসলমানরা যখন সিন্ধুদেশ জয় করে তখন উত্তর ভারতে ছিল রাজপুত জাতির আধিপত্য। তাঁদের পরাক্রমে প্রায় তিনশ বছর ধরে মুসলমান রাজত্ব সিন্ধুদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুর ধর্মে ও সংস্কৃতিতে মুসলমান শাসকগণ তখনও হাত দেয় নি।

শেরশাহ, বাবর, আকবর, প্রভৃতি রাজাদের উদার নীতি মুসলমান ও হিন্দু উভয়কেই সন্তুষ্ট করেছিল। এদের আমলেই প্রকৃত পক্ষে মুসলিম সংস্কৃতির

সমন্বয় সুরু হয়। এই সমন্বয়ের আর একটা কারণ ছিল। ভারতে মুসলমান রাজত্বের স্থায়িত্ব। দীর্ঘদিন বাস করায় ফলে মুসলমানরা এদেশকে স্থায়ী বাসভূমি বলে মেনে নেন। ফলে যে কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধ করতে হিন্দু মুসলমান সমান ভাবেই এগিয়ে যেতেন। তা ছাড়া যে সব হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতেন তাঁদের পক্ষেও হিন্দু রীতিনীতি একেবারে বর্জন করা সম্ভব হত না। অনেক মুসলমান সম্রাট ও রাজকর্মচারীরা হিন্দুর মেয়েদের বিয়ে করতেন। ফলে হিন্দুর ভাবধারা আচার ব্যবহার ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজকে প্রভাবিত করে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এভাবে পারস্পরিক আদান প্রদানের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আস্তে আস্তে ব্যবধান ঘুচে গিয়ে সমন্বয়ের সেতু গড়ে ওঠে। এই সমন্বয়ের ধারাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান কয়েকজন রাজা ও ধর্মগুরু। বাংলাদেশের হুসেন শাহ্ বিজাপুরের আদিল শাহ ও কাশ্মীরের জয়নুল আবেদীন তাঁদের অন্যতম। হুসেন শাহের রাজত্ব কালেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মধ্যে দিয়ে সকল সম্প্রদায়কে তিনি একই জায়গায় মিলিত করার প্রয়াস পান। বিজয়পুরের আদিল শাহ জনৈকা হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করে ও হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করে হিন্দু প্রীতির নিদর্শন দেখান। জয়নুল আবেদীনের উদার ধর্মনীতি হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির যোগ সূত্র রচনা করে।

এ সম্বন্ধে আরো কয়জন মহান সমন্বয়বাদী ভারতীয় মুসলমানের পরিচয় জানা দরকার। তাঁরা হলেন আলবেরুণী, আকবর, দারা শিকোহ্। ধর্ম সম্বন্ধে আকবরের নীতি ছিল খুবই উদার। সাম্প্রদায়িক ঝগড়া বিবাদের বাইরে হিন্দু মুসলমান যাতে স্থায়ীভাবে এক জায়গায় এসে মিলতে পারে তার জন্য তিনি "দীন ইলাহী" নামে এক নূতন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। সকল ধর্মের সারমর্ম নিয়ে গড়া এই ধর্মের মূলকথা ছিল এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সর্বধর্ম সহিষ্ণুতা। নিজের ইচ্ছা ছাড়া জোর করে কাউকে এই ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত আকবরের এই স্বপ্ন সফল হয় নি। তবুও সকল সকীর্ণতার ওপরে সকল ধর্ম সমন্বয়ের দ্বারা তিনি যেভাবে ভারতে হিন্দু মুসলমানের স্থায়ী মিলন ও সেই সংগে জাতীয় ঐক্য স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন তা বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। আকবরের রাজসভা ছিল জ্ঞানী ও গুনীর মিলন কেন্দ্র। মুসলমানের সংগে বহু হিন্দু পণ্ডিত, কবি,

কয়েকজন যথার্থ সমন্বয়বাদী ভারতীয় মুসলমানের পরিচয়
(১) আকবর

সাহিত্যিক ও শিল্পী তাঁর সমাদর লাভ করেছিলেন। রাজপদ লাভের বেলাও ছিল হিন্দু ও মুসলমানের সমান অধিকার। আকবরের আমলেই প্রথম হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সম্মেলন হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ এই ধর্ম সভায় যোগ দিয়ে সম্রাটের সংগে অবাধে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আকবরের এই বহুমুখী প্রয়াস সমসাময়িক কালে তাঁকে "দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা" আখ্যায় ভূষিত করেছিল। মুসলমান রাজত্বের প্রথমদিকে আলবেরুণী ও শেষের দিকে সাজাহান পুত্র দারা শিকোহ্‌র প্রচেষ্টা ও এই প্রসংগে স্মরণীয়। দুজনেই অজস্র লেখা ও চিন্তার মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের চেষ্টা করেন।

হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আরো দুটি ভাবধারার নাম করা যায়। একটি ভক্তিবাদ (Bhakti-cult) আর একটি স্যুফীবাদ (Sufism)। ভক্তিবাদের মূলকথা হল ভগবান এক। মুসলমানের কাছে যিনি আল্লাহ, হিন্দুর কাছে তিনিই ভগবান। নামে ভেদ থাকলেও মূলে এক। যে কেউ অন্তর দিয়ে ভক্তিভরে তাঁর পূজা করেন সেই তাঁর কৃপা লাভ করে।

স্যুফী ধর্ম মত ইসলাম ধর্মের অনুগামী হলেও আরও উদার। হজরত মহম্মদ বলেন মানুষকে সরাসরি ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ করতে। স্যুফীরা বলেন ভগবানকে পেতে হলে একজন উপযুক্ত গুরুর দরকার, যিনি ভক্তকে ভগবান লাভের ঠিক ঠিক পথটি দেখিয়ে দেবেন।[১] এখানে স্যুফী ধর্মমতের সংগে হিন্দু ধর্মের বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। এ ধর্মেরও মূল কথা ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সকল জীবের প্রতি প্রেম।

এ দুই সম্প্রদায়ের উদার ধর্মমতের ফলে হিন্দু মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মিলনের পথ সহজ হয়েছিল। এই ধর্মপ্রচারকদের হিন্দু মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা করতেন। কবীরের নাম এ প্রসংগে স্মরণীয়।

ধর্ম সম্বন্ধে কবীরের উদারতা অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তিনি জাতে মুসলমান জোলা, কারুর কারুর মতে তিনি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে পরে মুসলমানের ঘরে মানুষ হয়েছিলেন। হিন্দু, মুসলমান তিনি যাই হোন না কেন তিনি ছিলেন দুই সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে। যে কোন ধর্মেরই বাইরের আচার অনুষ্ঠান তিনি অপছন্দ করতেন, তাঁর মতে হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক উভয়েই একই ভগবানের সন্তান। সে ক্ষেত্রে পবিত্র ও সততার সঙ্গে তাঁর আরাধনা

১. Indian Inheritance. P. 134 Vol. II

করাই সকল ধর্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কবীরের উদার ধর্মমত প্রথম প্রথম সকলকে সন্তুষ্ট করতে না পারলেও, পরে দলে দলে লোক কবীরের কুঁড়ে ঘরে আসতেন তাঁর মুখের বাণী শোনার জন্য। নিরক্ষর কবীর তাঁর ধর্মমত প্রচার করতেন অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায়। অথচ সেগুলি যেমন তত্ত্ববহুল তেমনি যুক্তিপূর্ণ। ধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে সরলভাষায় কঠোর সমালোচনা করতে কবীর দ্বিধা করেননি। ধর্ম সম্বন্ধে কবীরের মত ও উপদেশাবলী কবীরের দোঁহা নামে পরিচিত। হিন্দীতে রচিত এই দোঁহাগুলি হিন্দী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। আজও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কণ্ঠে কবীরের দোঁহা আবৃত্তি ও কবীরের ভজন শোনা যায়। শেষ বয়সে তাঁর ধর্মমত সকলকে এতদূর আকৃষ্ট করেছিল যে হিন্দু মুসলমান জাত বিচার না করে দলে দলে লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এমন কি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহ নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যের মধ্যে বিবাদ বাধে। একদল চায় দাহ করতে, অপর দল চায় কবর দিতে। বিবাদ যখন চরমে ওঠে তখন শিষ্যদের একজন মৃতের আচ্ছাদন সরিয়ে দেখে মৃতদেহ নেই। কাজেই শবাধারে যে ফুলগুলি ছিল দু-দলে ভাগ করে আপন আপন রুচি অনুযায়ী সংকার করে, এরূপ একটা কাহিনী শোনা যায়। হিন্দু-মুসলমান মিলনের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক প্রভৃতি অমুসলমান ধর্মগুরুর নাম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

(২) কবীর

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আউলিয়া ছিলেন হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের আর একজন অগ্রদূত। অন্যান্য উদার মতাবলম্বী মুসলমানদের মত নিজামুদ্দিন ছিলেন সুফী সম্প্রদায়ের লোক। তাঁর বাস ছিল দিল্লীতে। ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা, সরলতা ও উদার ধর্মমতের সাহায্যে তিনি হিন্দু মুসলমান সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন। ভগবতপ্রেম, তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও ভক্তি এবং জীবজগতের কল্যাণ সাধনই ছিল নিজামুদ্দিনের ধর্মবিশ্বাসের মূলকথা। মহম্মদ তোগলক, আলাউদ্দিন খিলজী প্রমুখ সমসাময়িক সুলতানগণ নিজামুদ্দিনকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে আলাউদ্দিন তাঁর দরগায় এক মসজিদ ও তৈরী করে দিয়েছিলেন। এ প্রসংগে আর একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকিরের নাম করা যায়। তিনি হলেন আজমীরের খাজা

(৩) নিজামুদ্দিন আউলিয়া

মৈহুদ্দিন চিশতি। নিজামুদ্দিনের মত তিনিও সমানভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

এই সকল সমন্বয়বাদী ধর্মপ্রচারকের উদারতা ও প্রচারের ফলে হিন্দু মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যায়। হিন্দু ও মুসলমান একে অপরের কাছে এসে পরস্পরের সমাজ ও সংস্কৃতিকে বোঝার চেষ্টা করতে থাকে। এই মেলামেশার ফলে হিন্দুর প্রভাব পড়ে মুসলমানদের ওপর, আবার হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতিতে মুসলমানী প্রভাব আস্তে আস্তে দেখা দিতে থাকে। বিশেষ করে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা, পোষাক-পরিচ্ছদ ভাষা, ধর্ম, খাদ্য ও বিভিন্ন শিল্পকলার মধ্যে এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে ভারতীয় সংস্কৃতি নিজ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরি ইসলামী ছাঁচে গঠিত হয়েছিল। বাইরে নানাদিকে ঐশ্লামিক প্রভাব পড়লেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল রূপটি আগে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। মুসলমান সংস্কৃতিরও কোন কোন দিক আছে হাজার বছর পরেও যার কোন ওলট-পালট হয় নি। মোট কথা ওপরে ওপরে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের চেষ্টা অনেক দিক থেকে সফল হলেও উভয় সংস্কৃতির মধ্যে মূল পার্থক্য যা ছিল তা আজও আছে। তবে যতক্ষণ না দুটির কোনটির ভিতরে ঢোকা যাচ্ছে ততক্ষণ বোঝা যায় না, কে হিন্দু, কে মুসলমান। ভারতে কোন একটা প্রদেশে হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য বড একটা দেখা যায় না উভয়ের অন্তরঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত। বরং আঞ্চলিক পার্থক্য বড় বেশী করে চোখে পড়ে। তাও আবার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে নয়, প্রদেশে প্রদেশে এই পার্থক্য।

একই প্রদেশে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর সময় উভয় সম্প্রদায়ই উৎসব, আড়ম্বর ও কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান পালন করে; এমন কি জন্মের সময় অশৌচ পালনের রীতিও কোথাও কোথাও মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে। বিয়ের আচার অনুষ্ঠান হিন্দু ও মুসলমানদের ভিন্ন হলেও জাঁকজমক, অতিথি-আপ্যায়ন, উপহার বিনিময় ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক প্রথা উভয় সম্প্রদায়েই আছে, জাতিভেদের বেলায় হিন্দুরা কঠোর হলেও মুসলমান সমাজ এর প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত নন। সেখানেও সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, অথবা শিয়, সুন্নী, ইত্যাদি জাতিগত বা

ভাবতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিম সমন্বয়— সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

সম্প্রদায়গত ভেদ আছে। এ ছাড়া অনেক হিন্দু, মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে বহু হিন্দু রীতি-নীতি মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছে এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে।

সমাজ ব্যবস্থা

দিল্লীর সুলতানরা ছিলেন ফারসী সাহিত্যের ভক্ত। অনেক হিন্দুও এ সময় পারসিক সাহিত্যের উন্নতি করেন। সুলতানী যুগের সাহিত্যকদের মধ্যে আমীর খসরু ও আলবেরুণীর নাম করা যায়। এঁদের সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের অপূর্ব চেষ্টা দেখা যায়। এঁদের সময় থেকেই প্রথম ফারসী ও হিন্দীর সংমিশ্রণ দেখা যায়। এজন্য আমীর খসরুকে ফারসী ও হিন্দীর মিশ্রণে সৃষ্টি উর্দু সাহিত্যের প্রথম যুগের লেখক বলা হয়।

মোগল আমলেও সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারা বজায় থাকে। বাবর, আকবর ইত্যাদি শাসকদের আমলে এই ধারা জোরদার হয়। আকবর নি নিরক্ষর। কিন্তু তিনি বিদ্যার কদর করতেন, বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল ও কবি ফৈজী তাঁর দরবারে ছিলেন। তাঁর সময়ে রামায়ণ, মহাভারত, অথর্ববেদ ইত্যাদি কয়েকটি সংস্কৃত বইএর বাংলা অনুবাদ হয়। এমন কি তাঁর উৎসাহে লীলাবতীর বিখ্যাত অংকশাস্ত্রও পারসিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পরে সাহাজান পুত্র দারা শিকোহ হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃত ও ধর্ম সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বহু উপনিষদের পারসিক অনুবাদ করেন। এছাড়া ধর্ম প্রচারক, আউল, বাউল, দরবেশ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের চেষ্টায় লৌকিক ভাষা ও পল্লীসাহিত্যের ক্রম বিকাশ হয়। গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন দেবদেবীর কীর্তিকথা নিয়ে এক ধরণের সাহিত্য রচিত হয়। এর নাম মঙ্গলকাব্য। পদাবলী ও অন্যান্য অনুবাদ সাহিত্যে হিন্দুর সংঙ্গে অনেক মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়। আরাকান রাজের সভাকবি আলাওল এদের অন্যতম। হিন্দু মুসলমান একসংগে মিলে রচনা করেছেন পীরের গান। এইভাবে একই সংগে দরবারী সাহিত্য ও লোক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বাংলা, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি দেশীয় ভাষা যে এত উর্বর এর মূলে আছে হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকদের মিলিত সাধনা। মোগলযুগেই তুলসীদাস সুরদাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, আলাওল প্রভৃতি বহু হিন্দুও মুসলমান কবির হয়। ভাষার পার্থক্য আজ আর সম্প্রদায়গত নয়, প্রাদেশিক। তাই বাংলাদেশে বাংলা, পাঞ্জাবে পাঞ্জাবী, গুজরাটে গুজরাটী

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ভাষা, বলাই বাহুল্য ভাষাগত এই ঐক্য হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃত সমন্বয়ের কাজে অনেক সাহায্য করেছিল।

পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রভেদ থাকলেও সম্প্রদায়গত প্রভেদ বড় একটা নেই। মুসলমানের শেরোয়ানী, পায়জামা, আলখাল্লা একসময় হিন্দু সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। আজও যে নেই এমন কথা বলা যায় না। লুঙ্গী যদিও মুসলমানের নিজস্ব পোষাক নয় তবুও হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই আজকাল অবাধে লুঙ্গী ব্যবহার করতে দেখা যায়। মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দুর ধুতি, শাড়ি ও জামার কদর যথেষ্ট। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে যেমন বোরখার প্রচলন, হিন্দু মেয়েদের তেমনই কোনো কোনো ক্ষেত্রে পর্দানসীন দেখা যায়। গহনাগাঁটির বৈচিত্র্য ও হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে প্রায় সমান। বর্তমানে পাশ্চাত্য প্রভাব বাদ দিলে হিন্দু ও মুসলমানের পোষাকের স্বাতন্ত্র্য নেই বললেই চলে।

পোষাক পরিচ্ছদ

ভাষার দিক থেকেও অঞ্চল বিশেষে হিন্দু মুসলমানের একই ভাষা। কোথাও বাংলা, কোথাও হিন্দী আবার কোথাও উর্দু। অন্যান্য দেশীয় ভাষার মত উর্দুও একটি মিশ্র দেশীয় ভাষা। একদিকে দেশীয় হিন্দী, অন্যদিকে বহিরাগত আরবী, ফারসী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার সৃষ্টি। হাটে, মাঠে, উৎসব-অনুষ্ঠানে, রাজসভায়, সৈন্য শিবিরে পারস্পরিক কথা বার্তার মধ্য দিয়ে একই ভাষা হিন্দু মুসলমানের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া ধর্ম প্রচারকগণ জনসাধারণের মধ্যে নিজের নিজের ধর্ম প্রচারের জন্যে লৌকিক ভাষার সাহায্য গ্রহণ করলেন, যার ফলে স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য দেখা যায়। যতই দিন যাচ্ছে ভাষার বাঁধন ততই দৃঢ় হচ্ছে। বাংলা বিভাগের ফলে পশ্চিমবাংলা ও পূর্বপাকিস্তান দুটি রাজ্যের জন্ম হলেও উভয় রাজ্যেরই মাতৃভাষা এক— বাংলা। সাম্প্রদায়িক বিভেদ আর যাই করুক, ভাষার ক্ষেত্রে ফাটল ধরাতে পারে নি।

ভাষা

ধর্ম বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, কিন্তু কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উভয় সম্প্রদায়ই সমান অংশ গ্রহণ করেন। মহরমের অনুষ্ঠানে হিন্দুরাও আনন্দ উপভোগ করেন। মুসলমানের কাওয়ালী, মিলাদ শরিফ ও স্থানীয় পূজা পার্বণে মুসলমানের সংগে হিন্দুরাও যোগদান করেন। এখনও

সত্যপীর, ওলাবিবি প্রভৃতি দেবদেবীদের হিন্দু মুসলমান উভয়েই পূজা করেন।

ধর্ম

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে নাবিকরা সমুদ্র যাত্রায় এখনও দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম স্মরণ করে। অপর পক্ষে মুসলমানগণও শীতলা, মনসা ও অন্যান্য আঞ্চলিক দেবদেবীর পূজায় যোগ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। এই সব উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানের একত্র সমাবেশ যে মিলনের সেতু রচনা করেছিল তার মূল্য বড় কম নয়।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও এই সমন্বয়ের প্রভাব কম পড়ে নি। মোগলাই খাবার কোর্মা, কোপ্তা, পোলাও কালিয়া, কাবাব প্রভৃতি আজও হিন্দুদের প্রিয় খাদ্য। বড় বড় খাবারের কথা বাদ দিলেও মুসলমানের সাধারণ খাদ্যও হিন্দুর খাদ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে। মুসলমানের বেলায় ঐ একই কথা।

খাদ্য ব্যবস্থা

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক প্রভাবের দান কম নয়। এ বিষয়ে কয়েকটি খাদ্য ছাড়া হিন্দু মুসলমানের খাদ্য ব্যবস্থা পার্থক্য নেই বললেও চলে।

হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির যোগসূত্র রচনার আর একটা মাধ্যম ছিল সাহিত্য। ভারতের দুখানা মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত সকলের আগে

সাহিত্য

মুসলমান শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[২] এ বিষয়ে বাংলার সুলতান হুশেন শাহ ছিলেন প্রধান অনুরাগী। তাঁর আমলে বাংলা সাহিত্যের চর্চা বাড়ে। সে সময়ে ভাগবত পুরাণের বাংলা অনুবাদ হয়। হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ পিতার মতই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ মহাভারতের বাংলা অনুবাদে উৎসাহ দেন। এই মহাভারতকে কেউ কেউ পরাগলী মহাভারত বলে থাকেন।

সুলতানী আমলে শাসকগণের স্থাপত্যশিল্পের প্রতি অনুরাগ ছিল গভীর। তাঁদের উৎসাহে ভারতে এক নতুন স্থাপত্যশিল্প গড়ে ওঠে। ভারতের নানা জায়গায় নির্মিত মসজিদ, সমাধিভবন, মনোরম প্রাসাদগুলি এই স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। এই সব মসজিদ, প্রাসাদাদি নির্মাণের কাজে মুসলমান শাসকবৃন্দের ডাকে বহু হিন্দু শিল্পীও যোগ দিয়েছিলেন। এ সময়ে হিন্দুরও একটি নিজস্ব শিল্পরীতি ছিল।[৩] অজন্তা, কোণারক, ভুবনেশ্বর ও দক্ষিণ-

২. Indian Inheritance, Hindu Muslim Adjustments. P. 140 Vol. II

৩. ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্তি সাধনা। পৃঃ ৪৭

পশ্চিম ভারতের মন্দিরগুলিতে এর অনেক নজীর আছে। ফলে সেই শিল্পরীতির সংগে বাহিরাগত মুসলিম শিল্পকলার সমন্বয় ঘটে। এই সময় থেকেই মুসলমান ও হিন্দু শিল্পীর মিলিত সাধনার ফল ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পে দেখা যায়। সে শিল্প হিন্দুরই হোক বা মুসলমানের হোক। এই নতুন শিল্পরীতি "ইন্দো-মুসলিম" রীতি নামে পরিচিত। এ যুগের হিন্দু মন্দির, প্রাসাদগুলিতে যেমন মুসলিম প্রভাব দেখা যায়, মুসলমানের মসজিদ ও সমাধি সৌধগুলিতেও তেমনি হিন্দু স্থাপত্যরীতির নিদর্শন দেখা যায়।

প্রদেশে প্রদেশে পার্থক্য এ কালের স্থাপত্যশিল্পের একটা দিক ছিল। দিল্লীর কুতুবমিনার, মসজিদ ও সৌধাবলী, গুজরাটের আমেদাবাদে জাম-ই-মসজিদ ও মন্দিরগুলি, বাংলাদেশে সোনা মসজিদ, আদিনা মসজিদ ইত্যাদি স্থাপত্যকীর্তি নিজের নিজের প্রাদেশিক স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। কোন জায়গায় মুসলিম রীতির ছাপ স্পষ্ট, আবার কোথাও বা হিন্দু শিল্পরীতির বেশী প্রভাব। কিন্তু এ যুগের প্রত্যেক স্থাপত্য শিল্পই হিন্দু ও মুসলমান স্থপতির মিলিত সাধনার দান।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন শিল্পরীতি চরম উৎকর্ষ লাভ করে মোগল আমলে। মোগল বাদশাহগণ ছিলেন শিল্পরসিক। তাঁদের বিশেষ আগ্রহে ভারতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চারুকলা ও সংগীত শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হয়। বাবরের কাল থেকে সুরু করে সাজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত এদেশে যে সব মসজিদ, সমাধিভবন, দুর্গ ও প্রসাদ নির্মিত হয় তা এদেশের ও বিদেশী কলারসিকদের বিস্ময় ও ঈর্ষার কারণ। এ যুগের শিল্পরীতির নাম, "ইন্দো-পারসিক" শিল্প।[৪] নামকরণ থেকেই বোঝা যায় হিন্দু ও মুসলিম শিল্পরীতির সমন্বয়ে গড়া মোগল আমলের শিল্পকলা। সুলতানী আমলের মত মোগল বাদশাহগণ এই সব কাজে বহু হিন্দু শিল্পী নিয়োগ করতেন। তৈমুরের সময় থেকে মোগল শিল্প সাধনার সূত্রপাত হয়। সাজাহানের সময়ে তা চরমে ওঠে। এই পরিণতির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন একে একে বাবর, হুমায়ুন, শেরশাহ, আকবর, শাহজাহান প্রভৃতি শিল্পরসিক মোগল বাদশাহগণ। দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধিভবন, ফতেপুর সিক্রির সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, আগ্রার দুর্গ, সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি, তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-

বিভিন্ন শিল্পকলার রীতিতে ঐস্লামিক প্রভাব: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

৪. স্বদেশ ও সভ্যতা। পৃঃ ২৬৪

খাস ইত্যাদি মোগল আমলে হিন্দু পারসিক স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে মোগল চিত্রকলা এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। শেরশাহের কাছে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন পারস্যে পালিয়ে যান। সেখানে পারসিক কলাকুশলীর সংগে তাঁর পরিচয় হয়। ফলে হুমায়ুনের সংগে কয়েকজন পারসিক শিল্পী ভারতে এসে হুমায়ুন ও আকবরের দরবারে রাজশিল্পীর মর্যাদা পান। এভাবে ভারতে হিন্দু পারসিক চিত্রকলার সূত্রপাত হয়। এর নামই মোগল চিত্রকলা।[৫]

চিত্রশিল্প

আকবরের সময় থেকে সুরু করে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এই চিত্রকলার সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয়। পরে ঔরঙ্গজেবের ধর্মের গোঁড়ামি ও উৎসাহের অভাবে এই চিত্রশিল্পের পতন সুরু হয়। এই সময় রাজপুতানায় আর এক বিশেষ ধরণের শিল্প গড়ে ওঠে। এর নাম রাজপুত চিত্রকলা। পাশাপাশি দুটি পৃথক ধরণের শিল্প গড়ে উঠেছিল সত্যি, কিন্তু একে অপরের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। আঙ্গিকের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় মোগল চিত্রশিল্পে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বর্ণসুষমার সমারোহ, রাজপুত চিত্রকলায় সমাজ জীবন ও ধর্মীয় প্রভাব প্রধান। কিন্তু একে অপরের পদ্ধতি অনুকরণের ফলে ধীরে ধীরে উভয় চিত্ররীতিই পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মোগল যুগের শেষের দিকে পাহাড় অঞ্চলে নতুন এক ধরণের শিল্প গড়ে ওঠে। এটি কাংড়া চিত্রকলা নামে পরিচিত।

সংগীতের ক্ষেত্রেও হিন্দু মুসলমানের মিলিত সাধনার দান কম নয়। স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতে সংগীতের সাধনা চলে আসছে। সাধনার সেই মৌলিক ধারায় যুগে যুগে স্বতন্ত্র ধারা এসে যোগ দিয়েছে। ফলে দেখা যায় ভারতীয় সংগীতের নূতন নূতন রূপ। ভারতীয় সংগীতে মুসলমান প্রভাবের প্রথম খবর পাই সংগীত শাস্ত্র রচয়িতা শার্ঙ্গদেবের গ্রন্থ "সংগীত রত্নাকরে"।[৬] মুসলমান আমলে ভারতীয় সংগীত সাধনার সংগে মুসলিম সাধনা যুক্ত হবার ফলে ভারতীয় সংগীত আরো বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে।

সংগীতকলা

বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা যেমন মুসলমান শাসকদের চেষ্টায় পরিপুষ্ট হয়, দেশীয় সংগীতের অবস্থাও কতকটা ঠিক সেই রকম।

৫. স্বদেশ ও সভ্যতা। পৃঃ ২৬৭

৬. ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা। পৃঃ ৭৮

চর্চা ও উৎসাহের অভাবে দেশীয় স্বরগ্রাম ও রাগ রাগিণীগুলি প্রায় নষ্ট হতে বসেছিল। বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান ওস্তাদগণ সেগুলিকে যোগাড করে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি প্রভৃতি নতুন নতুন সংগীতকলার সৃষ্টি করলেন। মুসলমান শাস্ত্রে সংগীতকলা নিষিদ্ধ, অথচ দেখা যায় সংগীতের বড বড ওস্তাদরা প্রায় সকলেই মুসলমান। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শিল্পীরা বাদশাহের দরবারে স্থান পেতেন তেমনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মুসলমান ওস্তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন বিনা দ্বিধায়। বিখ্যাত গায়ক আমীর খসরু ও তানসেনের নাম এ প্রসংগে স্মরণীয়। বর্তমানে আমরা যাকে বিভিন্ন রাগ রাগিণীতে ভরা উচ্চাঙ্গ সংগীত বলে জানি তা প্রধানত মুসলমান ওস্তাদেরই সৃষ্টি। সানাই, সেতার, এসরাজ, তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র মুসলমান ওস্তাদেরই অবদান। আজও মুসলমান ও হিন্দুর সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সানাই এর মূর্চ্ছনা ও নহবতের বাজনা সমানভাবে সকলকে মুগ্ধ করে হিন্দু ও মুসলমান কবির রচিত ভজন ও ভক্তিমূলক গান উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পীদেরই গাইতে শোনা যায়। ভারতীয় সংগীত এখন যে পর্যায়ে পৌছেছে তাতে মুসলমান যুগের আগের শুদ্ধরূপ খুঁজে বার করাই দুষ্কর।[৭] একমাত্র কর্ণাটক সংগীতে ভারতীয় সংগীতের আদিরূপের কিছুটা পরিচয় মেলে। মোটকথা বলা যায় ভারতীয় সংগীত যেন সাগরগামী নদী, চলার পথে নতুন নতুন স্রোতধারা এর সংগে যুক্ত হয়ে এর কলেবরকে ক্রমশঃই ফাঁপিয়ে তুলেছে।

এখন বিভিন্ন শিল্পরীতির আলোচনা শেষে কেবল এটুকুই বলা যায় যে সৃষ্টির মূলে আছে প্রীতির সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা, বিরোধ ও বিদ্বেষ শুধু ধ্বংস করে, সৃষ্টি করে না। যে সব মুসলমান শাসক উদার, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যাঁরা সমানভাবে সকলকে ভালবেসেছেন তাঁদের আমলে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির দুটি শাখা পাশাপাশি বড হয়ে একে অপরের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু যে সব বাদশাহের রাজত্বকালের বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু বিদ্বেষ ও একচোখা নীতি তাদের রাজত্বেই দেখা দিয়েছে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা, ফলে হিন্দু সংস্কৃতি ত নয়ই মুসলমান সংস্কৃতির প্রসারও বড একটা হয় নি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল এর

মুসলিম অধিকারের প্রথম দিকে এর কোন কোন সময় হিন্দু সংস্কৃতির বিকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার কারণ:

৭ ভারতে হিন্দু মুসলমানদের মুক্তি সাধনা। পৃঃ ৮০

প্রমাণ। ধর্মপ্রাণ হিন্দু জাতি সব রকমের অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করেছে মুখ বুজে। বাইরের যে কেউ আসুক না কেন ভারত তাকে নিজের করে নিতে পারে।[৮] কিন্তু যত গোল বাধল তুর্কীদের আমল থেকে যখন সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করে ভারতের মূল ভিত্তিধর্মে আঘাত করল। এখান থেকে একটা না একটা হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের কাহিনী। মুসলমানদের চোখে রাজ্যজয়ের নেশা, হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ইসলাম ধর্ম ও ঐশ্লামিক সংস্কৃতি বিস্তারের বাসনা। অপরদিকে হিন্দুদের স্বদেশের স্বাধীনতা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে প্রাণপণে রক্ষা করার চেষ্টা। ফল সংঘর্ষ। সুলতানী আমলের বেশীর ভাগ সময় হিন্দুদের এই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হয়। ফলে এ যুগে হিন্দু সংস্কৃতির বিকাশ সাময়িক ভাবে সংকুচিত হয়ে আসে।

মুসলমান শাসকবৃন্দের কেউ কেউ ছিলেন তীব্র হিন্দু বিদ্বেষী। তাঁদের আমলে ভারতের অজস্র মন্দির প্রাসাদ ও নগরাদি ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়। তার জায়গায় নির্মিত হয় মসজিদ ও মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের বিরাট বিরাট নিদর্শন। এতে ও তাঁদের তৃপ্তি হয় নি। নানা অত্যাচার ও উৎপীড়নে স্বস্তি ছিল না কারুর। এসবের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বহু হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল। এই সংকট অবস্থায় ইসলাম প্রভাব যাতে হিন্দু সমাজকে কলুষিত করতে না পারে সেজন্যে হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ হিন্দু সমাজকে কঠোর বাধা নিষেধ ও অনুশাসনের গণ্ডীতে বেঁধে দিলেন। ফলে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হল বটে কিন্তু সংকীর্ণ হয়ে পড়ল।

এর আরও কারণ ছিল। সময় সময় ছুটকো আক্রমণে কোন কোন অঞ্চল একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল। সুলতান মামুদের সময় থেকে সুরু করে নাদির শাহের কাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে কত যে মুসলমান আক্রমণকারী এদেশে এসেছে তার শেষ নেই। এরা হিন্দুর মঠ, দেবায়তন, নগর, প্রাসাদ লুঠতরাজ ও ধ্বংস করে অপর্যাপ্ত ধনরত্ন নিয়ে পালিয়ে গেছে। তাদের ঠেকাতে গিয়ে হিন্দুরা ধনপ্রাণ সবই বিসর্জন দিয়েছে। বার বার এই বাইরের আক্রমণ ভেঙ্গে দিয়েছিল হিন্দু সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। এর ওপর গোঁড়া মুসলমান শাসকদের অসহযোগিতার ত কথাই নেই। সে সব সামলে উঠতে সময় লেগেছিল। এসব কারণে মুসলমান যুগে কোন কোন সময় হিন্দু সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ বন্ধ হয়েছিল।

---

৮. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। পৃঃ ২১১

তবে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা নানা কারণে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলেও কখনও তার স্রোতের পথ একেবারে রুদ্ধ হয় নি। যখনই এতটুকু সুযোগ পেয়েছে তখনই সে তার স্বাভাবিক ছন্দে এগিয়ে গেছে। শুধু কত ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে, তবু—কিছুতেই তার মৌলিকত্বকে কেউ খর্ব করতে পারে নি। অন্যান্য দেশে যেমন ঘটেছে, বাইরের প্রভাব এসে ঘাড়ে এমনভাবে চেপে বসেছে যে দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির কোন চিহ্ন নেই। বাইরের প্রভাবে তার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। ভারতে তা আমল পায় নি। ভারতের ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতন ধারাটি এত দৃঢ় যে অন্য কোন সংস্কৃতির কথা দূরে থাক এমন কি মুসলমান সংস্কৃতিও অন্য দেশে যেমন সাফল্যলাভ করেছে ভারতে তা করতে সক্ষম হয় নি।

নানা জাতের নানা সম্প্রদায়ের লোক এখানে বাস করেছে শান্তিতে, সমান অধিকারের সুযোগ নিয়ে, ধর্মের ভেদ, জাতের ভেদ, ভাষার ভেদ তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে ফাটল ধরাতে পারে নি। ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য তাই—"বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা"। ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান," তথাপি নানা ভাষাভাষী, নানা বেশধারী, নানা জাতের লোকের একমাত্র পরিচয়, তারা ভারতীয়, তাদের একটিমাত্র সংস্কৃতি, যার নাম ভারতীয় সংস্কৃতি, এখানেই ভারতের গৌরব।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থতালিকা :

১) The history culture of the Indian People the classical Age.

২) Indian Inheritance Vol I Ch X VIII

ভারত-সংস্কৃতির বিচিত্র ধারা

ভারত নামটির অর্থ কতই না তাৎপর্যপূর্ণ। ভা= জ্যোতিঃ, রত=মগ্ন। জ্যোতির ধ্যানে, অমরত্বের সাধনায় মগ্ন এই ভারতবর্ষ। সংস্কৃত ভাষায় 'কৃষ্টি' বা 'সংস্কৃতির' অর্থ উৎকর্ষ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্য সচেতন প্রাকৃতিক বুদ্ধিকে শুদ্ধ করে উৎকৃষ্ট করবে যে প্রক্রিয়া—তাই সংস্কৃতি বা কৃষ্টি। ভারতীয় সংস্কৃতি অতি প্রাচীন, দূরাবগাহী, ব্যাপক ও 'সম্মোহক'। এর বেদী হল বেদ অর্থাৎ জ্ঞানরাশি। এই বেদীর উপর উদ্ভব হয়েছে কত মত কত পথ। কিন্তু ঐ অসংখ্য মত ও পথের লক্ষ্য এক—সত্যদর্শন বা স্বরূপোপলব্ধি। নদী যেমন পর্বত শিখরে উৎপন্ন হয়ে নানা শাখায়, উপশাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দেশ ও জনপদকে প্লাবিত করে এক সমুদ্রে মিলিত হয়, তেমনি এই ভারতীয় সংস্কৃতিব উৎপত্তি স্থান এক, কিন্তু বিভিন্ন মানুষের সংস্কার অনুযায়ী তা বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়েছে এবং পৌছেছে একই লক্ষ্যে—অমৃতের আস্বাদনে।

এই ভারতের বুকে জন্মগ্রহণ করেছে দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি কত মতবাদ আবার জনসাধারণের মধ্যেও ছোট বড় বহু সম্প্রদায় গঠিত হয়েছে। তাদের ভাবগুলি শরতের শিশিরকণার মত লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রকাশ পেয়েছে আবার বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, কিন্তু রেখে গেছে একটা ধারা বা সম্প্রদায়। এভাবে যুগে যুগে কত ধারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধারণ ও বহন করে অগ্রগতির পথে নিয়ে গেছে। বাইরে বৈচিত্র্যে পূর্ণ কিন্তু ভেতরে সেই একত্বের সাধনা। মানুষের সাদা কাল ভেদ বাইরে কিন্তু ভেতরে সেই একই রক্তের রক্তিমা। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সাধনপথগুলির—উপনিষদের সাধনা, গীতার সমন্বয়ের সাধনা, বৈষ্ণবেব সাধনা, তন্ত্রের সাধনা, সহজিয়াদের সাধনা, নাথযোগী বাউলদের সাধনা, আলোয়ারদের সাধনা, রামানন্দ-কবীর-দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগের বিভিন্ন সন্তদের সাধনা—ভেতর রয়েছে এক গভীর ঐক্য।

এক নজরে ভারতীয় সংস্কৃতি ঃ

"ভারত কেবল এশিয়ার ইটালী নয়; এ শুধু রমন্যাস এবং শিল্পসৌন্দর্যে ভরা দেশ নয়। ভারত ধর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত, বিশ্বের প্রধান মন্দির।

ভারতবর্ষ ধর্মের মূর্তপ্রতীক।"—বলেছেন. পাশ্চাত্ত্য মনীষী ক্রাম্ব। কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারিকা এবং মণিপুর থেকে দ্বারকা এই বিরাট উপমহাদেশের বুকে উদ্ভব হয়েছে কত বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারা। কাশ্মীরে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে তুক্‌ দর্শনের সঙ্গে শৈববাদ, পাঞ্জাবের কাছ থেকে এসেছে বৈদিক স্তোত্রাদি এবং গান্ধার স্থাপত্য-ভাস্কর্য, আর্যাবর্তের বক্ষ থেকে বেরিয়েছে অনুষ্ঠানের বিধি ও নিয়মকানুন, উপনিষদ, মহাকাব্য-পুরাণাদি। জ্ঞান বিচারে মিথিলা ছিল প্রসিদ্ধ এর নিদর্শন আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে পাই। মগধের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি মহাবীর ও বুদ্ধের অমৃতনিস্যন্দী বাণী। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বন্যায় বাংলা ও উড়িষ্যা উতলা হয়েছিল। আসামে দেখা দিয়েছিল তন্ত্রের প্রভাব এবং শংকরদেবের বৈষ্ণববাদ। মধ্যযুগের সিদ্ধাচার্যেরা এবং মীননাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধনাথযোগীরা সম্ভবতঃ ভারতের পূর্ব প্রান্তেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। নেপালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সুন্দর সংমিশ্রণ হয়েছে এবং শিল্পীদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব ও সৌরধর্মের এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে উড়িষ্যাতে।

যখন আমরা দাক্ষিণাত্যের দিকে তাকাই তখন আমরা দেখি যে এখানেই সৃষ্ট হয়েছে সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রের বেদান্তদর্শনের অপূর্ব ভাষ্যগুলি। আর এই ব্রহ্মসূত্রই ভারতীয় দর্শনের বনিয়াদ। কেবল তাই নয়, বাংলাদেশ যেমন বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধক কবিদের ভাব বন্যায় প্লাবিত তেমনি দাক্ষিণাত্যে ঝঙ্কৃত হয়েছে বৈষ্ণব ও শৈব সাধক কবিদের সুন্দর সুন্দর স্তবস্তুতির সুর লহরী। বৈষ্ণব আলোয়ার ও শৈব নায়নারেরা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে ধর্মের মন্দাকিনী ধারা বইয়ে দিয়েছেন। মূর্তিবিদ্বেষী বৈদেশিকগণের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ায় দক্ষিণ ভারত হয়ে উঠেছে মন্দিরময়। বিরাট জমকাল সব মন্দির। স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। অসংখ্য তীর্থ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবের ছড়াছড়ি এই দক্ষিণ ভারতে। কর্ণাটের মার্গসঙ্গীত এবং অন্ধ্রের ত্যাগরাজের ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের ধারা এখনও অসংখ্য ভক্তকণ্ঠে কল্লোলিত হয়ে স্বমহিমায় মহীয়ান। ব্রাহ্মণেরা নিষ্ঠার সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও বেদপাঠের ধারাকে এখনও অব্যাহত রেখেছেন। মহারাষ্ট্রে জ্ঞানদেব, নামদেব ও তুকারাম প্রভৃতি ঈশ্বরপ্রেমিক সাধকদের প্রভাবে ভগবদবিশ্বাস ও প্রেম জীবন্তভাবে সমস্ত মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। মধ্যযুগে উত্তর ভারতে ধর্মকে

সংস্কৃত ভাষার কঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত করে লৌকিক ভাষায় দুয়ারে দুয়ারে বিলিয়ে দিলেন কবীর, দাদূ, রবিদাস, নানক, মীরাবাঈ, তুলসীদাস প্রভৃতি সাধক-সাধিকারা। গুজরাট এবং কাথিয়াওয়াড়ে ভাগবত ধর্ম এবং পরবর্তীকালে আর্যসমাজের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি রাজস্থান, বিন্ধ্যপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ এবং আসামের আদিবাসীদের সংস্কৃতির উপর গবেষণা হওয়ার ফলে ঐসব জায়গায় প্রাচীন ধর্ম এবং অজ্ঞাত বহু সম্প্রদায়ের ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়েছে এবং দেখা গেছে ঐগুলি প্রাচীন আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতারই অপরিস্ফুট শাখা-প্রশাখা মাত্র। সুতরাং India is Religion (ভারতবর্ষ ধর্মের মূর্ত প্রতীক) ক্রাম্বের এ উক্তি অভ্রান্ত সত্য। স্বামী বিবেকানন্দও বার বার বলে গেছেন—রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষসীর প্রাণপাখীর ন্যায় ভারতের প্রাণপাখী ধর্মের মধ্যে লুক্কায়িত।

পূর্ব ভারত ঃ

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সম্প্রদায় ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলাদেশে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের গান ও ব্রতাদিকেই সাধারণ মানুষ ধর্ম বলে মনে করত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রাদির তর্কবিচার করতেন। শংকরাচার্যের প্রচারিত জ্ঞানমার্গের প্রভাবে এবং নৈয়ায়িকদের শুষ্ক যুক্তিতর্কের প্রভাবে একটা নীরস আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ধর্ম তদানীন্তন ভারতের ঐ পরিস্থিতিকে সরস করে দিল। তিনি বাংলাদেশের নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকেই তিনি ধর্মভাবাপন্ন ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নেন এবং পায়ে হেঁটে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি পুরীধামে জীবনের শেষ কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। ভক্তিবাদের প্রচারকদের মধ্যে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের দ্বারাই মানুষ জাগতিক দুঃখ থেকে মুক্তি পায় এবং সংসার মায়া কাটাতে পারে—এই হচ্ছে তাঁর ধর্মের মূলকথা। নাম ও নামী অভেদ। ভগবানের নাম মাহাত্ম্য কীর্তনই ছিল তাঁর বাণী। আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণের মধ্যে নাম বিলিয়েছেন শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সম্প্রদায়। "তাঁর ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাহিত হল, সকলের প্রাণে শান্তি এল। তাঁর প্রেমের সীমা ছিল না। সাধু, পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র, অপবিত্র সকলেই তাঁর প্রেমের ভাগী ছিল, সকলেই তিনি দয়া করতেন এবং আজ পর্যন্ত

তা দরিদ্র, দুর্বল, জাতিচ্যুত, পতিত, কোন সমাজে যার স্থান নেই, এরূপ সব ব্যক্তির আশ্রয়স্থল।" (ভারতে বিবেকানন্দ পৃঃ ২৭৯) ভারতীয় সাহিত্যে বৈষ্ণব কাব্যের দান কম নহে। কীর্তন বাংলার নিজস্ব সম্পদ। খোল মৃৎশিল্পের সুন্দর নিদর্শন এবং তার বাদ্য শ্রুতিমধুর এবং ঈশ্বরভাবোদ্দীপক।

বাংলাদেশের শৈব ও শাক্তধর্ম ঃ ভারতের অন্যান্য স্থানের শৈবমতের সঙ্গে বাংলার শৈবমতের বেশ একটু পার্থক্য আছে। উইনটারনিজের মতে তন্ত্রশাস্ত্র ও শাক্তদর্শনের উৎপত্তি খুব সম্ভব এই বাংলাদেশেই। উত্তর ভারতের ভেতর বাংলা, আসাম, নেপাল কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানেই তন্ত্রের প্রভাব বেশী। বেদের সত্যকে তন্ত্র রূপকভাবে প্রকাশ করেছে। শিবই ব্রহ্ম এবং কালীই শক্তি। বৈষ্ণবদের যেমন পদাবলী কীর্তন ও নানাবিধ গান আছে তেমনি শাক্তদেরও আগমনী ও বিজয়ার বহু গান আছে। এই আগমনী গান বাংলার নিজস্ব। আর এই সব গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে বাঙালী মনের সুন্দর সুন্দর প্রতিচ্ছবি এবং উপাস্য দেবীর সঙ্গে মানবীয় সম্পর্কের যোগসূত্র। আগমনী ও বিজয়া গানে ঘরে ঘরে নিজ নিজ উমারূপী কন্যার জন্য কন্যাবিরহাতুর পিতা-মাতার দল কেঁদে আকুল। দেবীকে 'মা' বলে আরাধনা করেছেন রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকের দল। দক্ষিণ ভারতে শক্তি সাধনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু বাংলার মতো এরূপ স্নেহে ভরা সাধনা কোথাও নেই।

বাংলার বাউল ঃ "বাংলার মাটির সঙ্গে তাদের যোগ রয়েছে বলেই, অন্তরে অন্তরে পরিপূর্ণ সহজ মানুষ অর্থাৎ প্রকৃত বলেই বাউলেরা এমন প্রাণবন্ত। তাই তাঁরা বাইরের সব সাধনাকেও আত্মসাৎ করতে পেরেছেন। প্রাণের লক্ষণই এই আত্মসাৎ করবার শক্তি। বাউলদের মধ্যে কোন জাতিভেদ নেই, সম্প্রদায় ভেদ নেই। তাঁরা তীর্থ, প্রতিমা, শাস্ত্র বিধির ধার ধারেন না। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এই মানবতত্ত্বই তাঁরা বোঝেন। 'জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিখারী'—এই প্রেমের সাধনায় প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন বাউল, দরবেশ, সাঁই, কর্তাভজা, আউল সম্প্রদায়। বর্তমান বিশ্বে মানবিকতাবাদের উপর সব চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। রাজনীতিক, সামাজিক, ধর্মনীতিক, আর্থনীতিক চাপে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লেও এবং শত শত বিভেদ বৈষম্য সৃষ্টি হলেও 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, শুধু সে জাতির নাম মানুষ জাতি' এ কথা বোধসম্পন্ন মানুষ এক বাক্যে স্বীকার করবে।

আউল-বাউল প্রভৃতি এসব অখ্যাত অজ্ঞাত সম্প্রদায়ের মানবিকতাবাদ বিশ্বের সমস্ত সভ্য সম্প্রদায়ের ও জাতির অনুকরণের বিষয়। এই তুলনাহীন মানবসাধনার ধারা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত থাকবে। বাউলেরা তাঁদের উদার সারগর্ভ সঙ্গীতের দ্বারা প্রচার করবেন বিধাতার সর্বোত্তম লীলা—এই নর লীলাকে। এ জগতের সবাই যে সেই বিষ্ণুর অর্থাৎ ব্যাপনশীল দেবতার প্রত্যক্ষ বিগ্রহ। স্বার্থপর, জড়বাদী, যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে এই মানব ধর্মের বাণী সত্যই সুন্দর ও কল্যাণকর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের দেশের ইতিহাস প্রয়োজনের মধ্যে নয়, মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেচে। বাউল সাহিত্যে, বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি—এ জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা সমিতির প্রতিজ্ঞা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানে কণ্ঠ মিলেচে, কোরাণ পুরাণে ঝগড়া বাধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা।"

আদিবাসীদের সংস্কৃতির ধারা ঃ

বেদনাকাতর কবি গেয়েছেন :

"হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।"

মানবের জয়যাত্রা ত সব মানুষকে নিয়েই। একটু সহানুভূতি, একটু দরদ, একটু সাহস ও সাহায্য পেলে এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো যে মানব সংস্কৃতিকে দ্রুত অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। ভারতে এই আদিবাসীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। প্রকৃতিক বিপর্যয়পূর্ণ আবহাওয়ায় তারা মানুষ; দুঃখ-কষ্টে তাদের জীবন গড়া। উৎপীড়িত, বঞ্চিত এই বিরাট মানব গোষ্ঠী এখনও সভ্যতার আলোক পায় নি। কিন্তু এই দুরন্ত জীবন সংগ্রামের মধ্যেও তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে রয়েছে এবং তুকতাক্ প্রভৃতি যাদু বিদ্যার সাহায্যে নিজেদের দুঃখ কষ্টের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। নাগা কুকী, প্রভৃতি আসামের পার্বত্য উপজাতি, ছোট নাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, হায়দাবাদ ও নীলগিরি প্রভৃতি অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যেও ঈশ্বর ও আত্মার

ধারণা বিদ্যমান। কারো মতে আত্মা শরীর পরিমাণ, কারো মতে তা ছায়া পরিমাণ ইত্যাদি বহু মত আছে। বৃক্ষ পূজা, পাথর পূজা, উর্বরতা পূজা, মৃত পূর্বপুরুষদের পূজা, টোটেম পূজা, দেব তুষ্টি বা দেবতার কোপ শান্তি প্রথা, গ্রাম্য দেবতার পূজা প্রভৃতি এখনও তাদের ভিতর বর্তমান।

এইসব আদিবাসীদের বিশ্বাস যে মানুষের এবং পশুর স্বাস্থ্য, সুন্দর ফসল এবং বনজ দ্রব্যের উৎপাদন—সব কিছু নির্ভর করে এক অদৃশ্য শক্তির ওপর। এই অদৃশ্য শক্তিকে তারা খুব ভয় করে কারণ এদের বিশ্বাস এই শক্তিটা অমঙ্গলকর। তাই এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারা যাদুবিদ্যার আশ্রয় নেয়, ডাইনী-মন্ত্র উচ্চারণ করে শিশুদের অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। যথা সময়ে পূজা দেয়, ভোগ নিবেদন করে, প্রার্থনা করে। এক কথায়, আদিবাসীদের সমাজে বিজ্ঞানের স্থান দখল করেছে যাদুবিদ্যা। দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য এই সব আদিবাসীরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তুকতাক্ ও মন্ত্র প্রভৃতি আশ্রয় নিয়েছে আর সভ্য মানুষ গ্রহণ করেছে বিজ্ঞানকে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে আদিবাসীদের নৃত্যানুষ্ঠান, শিকারোৎসব প্রভৃতির মধ্যে একটা গূঢ় অর্থ আছে। নৃত্য সম্বন্ধে নাগাদের একটা সংস্কার উল্লেখযোগ্য। নাচের সঙ্গে উঁচু লাফ দেওয়ার উদ্দেশ্য হল শস্যের শীষকে বাড়িয়ে তোলা। নাচ যত ভাল হবে ধান তত ভাল হবে। সুতরাং শস্য বৃদ্ধির যাদু হিসাবে নৃত্য সামাজিক আচরণে পরিণত হয়েছে। গন্দ উপজাতিদের হরিণ, নীলগাই, খরগোস ইত্যাদির গতিভঙ্গী এবং মুখোসাদি ধারণ করে যে জন্তু নৃত্য, তার ভেতরেও রয়েছে বন্য জন্তুর বৃদ্ধি এবং ওদের মাংসে নিজেদের জীবন ধারণের কথা। আদিবাসীদের শিকারোৎসব ঋতু উৎসবের নামান্তর মাত্র। এই ঋতু শিকারোৎসবের উদ্দেশ্য হল—আগামী বছরের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা। আদিবাসীদের সমাজ সংহতি প্রত্যেক সভ্যসমাজের অনুকরণের বস্তু।

নাথ-যোগী সম্প্রদায়ঃ মধ্যযুগে ভারতে নাথ সম্প্রদায় একটা প্রধান সম্প্রদায় রূপে গণ্য হত। এই নাথযোগীদের ভারতের সর্বত্র গতিবিধি ছিল এবং তাদের অলৌকিক কীর্তিকাহিনী আসমুদ্র হিমাচল লোককে স্তম্ভিত করত। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল 'কায়াসাধনের' দ্বারা 'জীবন্মুক্তিলাভ'। এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে রেখে যে বিদেহমুক্তি, নাথসিদ্ধাচার্যগণ সে মুক্তির সাধক ছিলেন না। এই দেহকেই অমর করে 'সিদ্ধদেহে' বা 'দিব্যদেহে' অবস্থানই তাঁদের কাম্য ছিল। এই হল মৃত্যুঞ্জয় অবস্থা, এই মৃত্যুঞ্জয়রূপই শিবের

রূপ। এই শিবের পূজারী ছিলেন নাথ সম্প্রদায়। যে দেশে মৃত্যু নেই তা শিবের দেশ, আর যেখানে জরা-মৃত্যু বিকারের আবর্তন রয়েছে তা প্রকৃতির বা শক্তির দেশ। নাথযোগীদের আদিগুরু মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ এ বিদ্যা সুকৌশলে লাভ করেন। এ বিষয়ে একটা সুন্দর উপাখ্যান আছে। পার্বতীর অনুরোধে শিব তাঁকে এই 'মৃত্যুঞ্জয়ী বিদ্যা' বলবার জন্ত গোপনে নির্জন সমুদ্রে আশ্রয় নেন। যোগীরাজ মীননাথ তা জানতে পেয়ে যোগবিদ্যার দ্বারা পার্বতীকে অভিভূত করে মৎস্য হয়ে শিবের মুখ থেকে ঐ বিদ্যা জেনে নেন এবং ঐ বিদ্যা গুরু পরম্পরা রূপে চলে আসছে। প্রসিদ্ধ যোগী গোরক্ষনাথ ছিলেন মীননাথের শিষ্য। প্রাচীন সাহিত্যে নাথ সাহিত্যের অবদান কম নহে।

উত্তর ভারত :

মধ্যযুগে উত্তর ভারতে সংস্কৃতির ধারা এক নবীনভাবে প্রকাশ পেল। সুপ্রাচীন আর্য সংস্কৃতির পাশে এল নবাগত মুসলমান সংস্কৃতির ধারা। কিন্তু এই দু-ধারার মিলন সেতু কোথায়? গোঁড়াদের দ্বারা এর সংযোগ রাখা সম্ভব ছিল না, তাই উদার হিন্দু প্রেমিক সম্প্রদায় আর উদার মুসলমান সুফী সম্প্রদায় একযোগে এই সংস্কৃতির সেতু নির্মাণ করলেন। গড়ে উঠল এক মহান ঐতিহ্য।

রামানন্দ-কবীর ও তাঁদের সম্প্রদায় : উত্তর ভারতে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন রামানন্দ। নিজে ব্রাহ্মণ ও রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রামানন্দ রাম-সীতার উপাসক ছিলেন, কিন্তু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই তাঁর শিষ্যত্বে গ্রহণ করতেন। তাঁর প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে কবীর ছিলেন জোলা, রবিদাস ছিলেন মুচি, সেনা ছিলেন নাপিত, ধন্না ছিলেন জাঠ, পীপা ছিলেন রাজপুত। তিনি হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না, ভগবৎ প্রেমে ছোটবড় বা হিন্দু মুসলমানের ভেদ মানতেন না। আচারের ধর্ম ছেড়ে ভক্তির ধর্ম প্রচার করলেন রামানন্দ ও তাঁর সম্প্রদায়। সংস্কৃত ছেড়ে লৌকিক হিন্দী ভাষায় আশ্রয় নিলেন যাতে আপামর সবাই তা গ্রহণ করতে পারে।

রামানন্দের প্রধান শিষ্য কবীর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা ধর্মের মাধ্যমে করেছেন। তিনি বলতেন : রাম ও আল্লা এক এবং অদ্বিতীয়। হিন্দু ও মুসলমান একই মাটির তৈরী দুটি পাত্র বিশেষ। তাঁর দোহাগুলি দার্শনিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ। ধর্মকে অনুষ্ঠানের মধ্যে না [illegible]

অকপট ভালবাসার দ্বারা গ্রহণ করতে বলতেন। বহু হিন্দু মুসলমান কবীরের শিষ্য ছিলেন। মধ্যযুগে ভারতীয় সংস্কৃতিতে কবীর মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান। তথাকথিত নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে কবীর এত মহান সত্যের বাণী কি করে পেলেন? উত্তরে কবীর বললেন: "বৃষ্টি হলে সে জল উঁচু জায়গায় ত দাঁড়ায় না, সব জল গিয়ে জমে নীচে, সবার পায়ের তলায়।" প্রেমিক কবীর বলে চলেছেন: "পণ্ডিতেরা পড়ে পড়ে সব হলেন পাথর, লিখে লিখে সব হলেন ইট, প্রেমের একটা ছিটাও পারে না তাঁদের মনে প্রবেশ করতে।" সংস্কৃত জ্ঞানহীন কবীর লৌকিক ভাষায় ধর্ম প্রচার করলেন এবং যুক্তির দ্বারা কাশীর পণ্ডিত সমাজের মুখোমুখি হয়ে বললেন: "সংস্কৃত হল কূপজল, ভাষা হল বহতা জলধারা।" কবীরের প্রেমের ধর্মে ভীরুতার স্থান নেই, কেবল বীরত্বের সাধনা। মৃত্যুপণ করে এগিয়ে যেতে হবে জীবনের উদ্দেশ্যের দিকে "গগন দমামা বাজিয়া পড্য। নিসানৈ যাব।"

দাদূ, রজ্জব, সুন্দরদাস প্রভৃতি মধ্যযুগের মরমীয়া সাধকেরা কবীরের ধারাকেই পুষ্ট করেছেন। সুন্দরদাস ছিলেন বৈশ্য এবং দাদূ ও রজ্জব ছিলেন জাতিতে মুসলমান। কিন্তু ভক্তের কোন জাত নেই, ভক্তিতেই তাঁদের আসল পরিচয়। রাজপুতনাতে ১৫৭৪ খৃঃ দাদূ জন্মগ্রহন করেন। এখনও তাঁর বহু ভক্ত ভারতে নানাস্থানে আছেন। তিনি বলেন, "সব ঘট একৈ আত্মা ক্যা হিন্দু ক্যা মুসলমান।" মধ্যযুগের সাধকেরা বার বার বলেছেন সকল মত ও পথ একই ভগবানে গিয়ে মিশেছে। এদিকে সবাই ঝগড়া করে মরছে আর মতুয়ার বুদ্ধি নিয়ে বলছে, "আমার পথই একমাত্র সাচ্চা পথ।" অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত এই ভারতবর্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতি মানুষের মধ্যে এই যে ঐক্যবোধ তা মধ্যযুগের একটা মস্ত অবদান। বর্তমান আইনের দ্বারা জাতিভেদ বন্ধ করেছে কিন্তু সে যুগে প্রেমের দ্বারা এ ভেদ বহু পরিমাণে লাঘব হয়েছিল। বাধা-বিপত্তি এই সাধকদের মৈত্রী ও সমন্বয়ের বিরাট সাধনাকে খর্ব করতে পারেনি।

নানক ও তাঁর সম্প্রদায়ঃ নানক লাহোরের নিকট তালবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিখধর্মের প্রবর্তক। সর্বধর্ম সহিষ্ণুতার নীতি প্রচার করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক মিলনের চেষ্টাতেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। হিন্দু ও মুসলমানের অর্থহীন কুসংস্কার ও অনুষ্ঠান তিনি পছন্দ করতেন না। শুদ্ধচিত্তে আন্তরিকভাবে ভগবানের উপাসনা ও গুরুবাক্যে

বিশ্বাস রেখে চলা—এই ছিল তাঁর প্রচারের পন্থা। কবীরের স্থায় নানকের বহু হিন্দু মুসলমান শিষ্য ছিল। শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেবে বিভিন্ন মতবাদের সারমর্ম রয়েছে। পরবর্তীকালে মোগল, পাঠানদের হাত থেকে ধর্মকে বাঁচাবার জন্য খালসা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তাঁরা ক্ষাত্রশক্তির দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন।

পশ্চিম ভারত ঃ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন "ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা, ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না।" ভগবান বিঠ্ঠলের ভক্তদের নিয়ে অপূর্বলীলা কথা এখনও পশ্চিমভারতের জনমনে অহরহ অনুপ্রেরণা আনে। মধ্যযুগে মহারাষ্ট্রের ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহকরূপে ভক্তবীর জ্ঞানদেব বা জ্ঞানেশ্বর আবির্ভূত হন। এইকালে মারাঠায় নাথপন্থী এক সম্প্রদায়, যোগী গহিনি নাথের প্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে, আবার পংধরপুরের ভক্তিবাদী সম্প্রদায় বিঠ্ঠলদেবের পূজার্চনা ও নামকীর্তনের মধ্য দিয়ে ভগবৎ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের সমন্বয় ঘটল জ্ঞানদেবের জীবনে। তাঁর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনা এক অপূর্ব অবদান। ধর্মসাহিত্যে তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি—গীতা জ্ঞানেশ্বরী (গীতার এক মৌলিক ভাষ্য), অনুভবামৃত, অভঙরাজী (ভজনরাশি)। জ্ঞানদেবের ভক্তিসাধনাকে অবলম্বন করে মহারাষ্ট্রে নামদেব, একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি এক মরমী সাধককুলের আবির্ভাব হয়। 'মিষ্টিসিজম্ ইন্ মহারাষ্ট্র' গ্রন্থে বেলওয়ারকর ও রাণাডে লিখেছেন: "জ্ঞানদেব প্রেমধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন, নামদেব ঐ ভিত্তির উপর মন্দির নির্মাণ করেন এবং পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাধক তুকারাম ঐ মন্দিরের চূড়ায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন।"

নামদেব দর্জির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্রমে দস্যু সর্দার হয়ে ওঠেন এবং তাঁর দল একবার চুরাশী জন অশ্বারোহীকে বধ করে। একজন নিহত ব্যক্তির স্ত্রীর মর্মভেদী কান্না ও অভিশাপ নামদেবের জীবন পাল্টে দিয়েছিল। তিনি এক মন্দিরে ঢুকে দেবীর খড়্গ নিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলেন, কিন্তু দেবীর কৃপায় তা ব্যর্থ হয়। 'পুণ্যাত্মার যেমন অতীত আছে, পাপীরও তেমন ভবিষ্যৎ আছে।' নামদেব ভগবানের নাম জপ করে সিদ্ধ হলেন। নামদেবের রচিত বহু অভঙ (ভজন) আছে এবং তার কিছু কিছু উল্লেখ গ্রন্থসাহেবে

দেখা যায়। একনাথ ও তুকারামের জীবন গাথা এখনও মহারাষ্ট্রের জনমনে উজ্জ্বল রয়েছে।

'মিষ্টিসিজম্ ইন মহারাষ্ট্র' গ্রন্থে আছে: "পংধরপুরের বিঠ্ঠল সম্প্রদায় জ্ঞানদেব ও নামদেবের পূর্বেও ছিল। এই সম্প্রদায়ের নেতা ও শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন আচার্য পুংদলিক, তাঁর পরবর্তীকালে নেতৃত্ব করেন জ্ঞানদেব ও নামদেব। গুজরাট, কর্ণাট, তেলেগু ও তামিলভাষী অঞ্চল ও মারাঠার নানা স্থান থেকে এ সময়ে দলে দলে তীর্থ যাত্রীরা সমবেত হত পংধরপুরে। এই ভক্ত যাত্রীদের কাছে এখানকার ভক্তসাধকদের বাণী তুলে ধরা প্রয়োজন, সর্বজন বোধ্যভাবে ইহার পরিবেশন প্রয়োজন, তাই একাজে সাহায্য নেওয়া হতে থাকে কীর্তন গানের। অনুমিত হয় যে কীর্তন রচনা ও কীর্তন গানের প্রাথমিক গৌরব অনেকাংশে জ্ঞানদেব ও নামদেবেরই প্রাপ্য।"

দক্ষিণ ভারত:

সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কৃতির বন্যা এনেছেন পূর্বভারত, উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়। ঠিক তেমনি দক্ষিণ ভারতে আলোয়ার প্রভৃতি বৈষ্ণব সাধকেরা এবং নায়নার প্রভৃতি শৈব সাধকেরা অপূর্ব ভাব বন্যার সৃষ্টি করেছেন। শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত ও গাণপত্য এই চারি সম্প্রদায়ের প্রভাব দক্ষিণ ভারতে বেশী। ভারতের ধর্মীয় চিন্তাধারা কেবল ভাবোচ্ছ্বাস নয়, কেবল [illegible]স্তুতি, গান-কীর্তন নয়, শুধু দার্শনিক শুষ্ক কূটবিচার নয়, এর মধ্যে [illegible] পেয়েছে অপূর্ব মানবিকতা, ঐক্য, প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, প্রকৃত কল্যাণ লাভের চেষ্টা। শুধু কি তাই, ঐ চিন্তাগুলি থেকে উদ্ভব হয়েছে [illegible]পত্য ভাস্কর্য, নৃত্য-গীত, মনোবিজ্ঞান, কলা, শিব জ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ। [illegible]ণ ভারতের গগনচুম্বী মন্দিরগুলি ভারতের সংস্কৃতিকে অপূর্ব [illegible] [illegible]ভিত করেছে। ভারতের শিল্পীরা অমর হয়ে রয়েছেন।

আলোয়ার সম্প্রদায়: আলোয়ার সম্প্রদায়ের ইতিকথা মাধুর্যে ভরা। প্রেমের মন্দাকিনী ধারা আলোয়ার আচার্যেরা বইয়ে দিয়েছেন গোটা [illegible] দেশে। 'আলোয়ার শব্দের অর্থ শাসন কর্তা।' 'অল' শব্দের অর্থ 'ওয়ার' শব্দের অর্থ কর্তা। ভক্তি বলে যিনি সমস্ত জগৎ শাসন করেন তিনিই আলোয়ার। এইসব আলোয়ারদের শ্রদ্ধাভক্তি প্রবাহকে পরবর্তীকালে রামানুজাচার্য দার্শনিক রূপ দেন। এই আলোয়ারদের বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা

উত্তর ভারতের সাধকদের স্থায় সংস্কৃত ছেড়ে লৌকিক ভাষায় (তামিলে) ভগবানের নাম মাহাত্ম্য প্রচার করেন এবং এই ভক্তিবাদকে কেবল ভাবপ্রবণ না করে তার নৈতিকমান অব্যাহত রাখেন। আলোয়ার আচার্যদের জীবন কাহিনী অপূর্ব। আলোয়ারদের আদি আচার্যেরা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান বিষ্ণুর নানাবিধ অবতার বলে লোকে খ্যাত। ভগবান বিষ্ণু পঞ্চজন্য নামক কোন দৈত্যকে বধ করে তার অস্থি দিয়ে তাঁর প্রিয় পাঞ্চজন্য শঙ্খ তৈরী করেন। কাঞ্চীপুরস্থ পোইহে আলোয়ার, নাস্তিক, দুরাত্মা ও পাষণ্ডগণের হৃদয়মাল্যস্বরূপ ছিলেন। তাঁর সদ্‌যুক্তিপূর্ণ, তমোনাশকারী, শ্রুতিমনোহর বাগ্মিতায় দুষ্কৃতকারিগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত বলে তিনি বিষ্ণুর পাঞ্চজন্যের আবির্ভাব বলে খ্যাত! মহাত্মাপূদত্ত আলোয়ার মাদ্রাজ হতে বাইশ মাইল দূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নাস্তিকদের গর্ব খর্ব করে দিতেন বলে লোকে তাঁকে বিষ্ণুর কৌমোদকী গদাংশ-সম্ভূত বলে পূজা করে। পে আলোয়ার ময়লাপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মোহান্ধগণের মোহপাশ ছেদন করে দিতেন বলে লোকে তাঁকে বিষ্ণুর নন্দক নামক খড়্গাবতার বলে পূজা করেন। 'পে' শব্দের অর্থ উন্মাদ। তিনি শ্রীহরির প্রেমে উন্মাদ ছিলেন বলে তাঁর ঐরূপ নাম। মহীসারপুরে তিরুমড়িশি আলোয়ার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর তীক্ষ্ণধার জ্ঞানবিচার মানুষের মোহের মূলোচ্ছেদ করে দিত, সেহেতু তিনি বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রাংশ বলে খ্যাত। এই আলোয়ারদের মধ্যে একজন নারীও ছিলেন। তাঁর নাম অণ্ডাল। এই অণ্ডালের কাহিনী অপূর্ব। তিনি নারায়ণকে স্বামীরূপে পান এবং তাঁর বিগ্রহে একীভূত হয়ে যান। রাজপুতনার রাজমহিষী মীরাবাঈও ভগবানকে স্বামীরূপে সাধনা করেছিলেন। তাঁর বিরচিত বহু ভজন এখনও ভারতের প্রায় সর্বত্র গাওয়া হয়। মোটকথা আলোয়ারদের জীবন কাহিনী অলৌকিক। তাঁদের জীবনের সাধনা ভক্তিরসে পুষ্ট এবং তা প্রকাশ পেয়েছে অসংখ্য গান, পদাবলী ও দোঁহার মাধ্যমে।

নায়নার নামক শৈব-সম্প্রদায়ঃ দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায় সমকালে শৈব সম্প্রদায়ও আত্মপ্রকাশ করে। যদিও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ বর্তমান তবুও উভয়েরই লক্ষ্য ভক্তির দ্বারা ভগবৎসাধন। তেষট্টি জন শৈবাচার্যের মধ্যে চারজন প্রধান এবং প্রত্যেকেই ঐ একই সম্প্রদায়ের চারটি মার্গের প্রবর্তক। তিরুনাবুক্করসু (আপ্পর) চর্যামার্গ বা দাসমার্গ,

জ্ঞানসম্বন্ধর ক্রিয়ামার্গ বা সৎপুত্রমার্গ, সুন্দর মূর্তি যোগমার্গ বা সহমার্গ এবং মাণিক্যবাচাকর (চিন্তায় ও বাক্যে রত্নের ন্যায় স্বচ্ছ যিনি) জ্ঞানমার্গ বা সৎমার্গ প্রচার করেন। এইসব শৈবাচার্যদের জীবন কাহিনী খুবই উদ্দীপনা-পূর্ণ। স্বর্গের ভগবানের সঙ্গে মর্তের মানুষের এরূপ আপনভাবে লীলাখেলা সত্যই বিস্ময়ের বস্তু অথচ তাহা সত্য। জ্ঞান সম্বন্ধরের জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা হল। তখন সে মাত্র তিন-চার বছরের বালক। বাবার কাঁধে উঠে মন্দিরে শিব দর্শন করতে গেছে। ছেলেকে মন্দির সংলগ্ন পুকুর পাড়ে রেখে বাপ গেলেন স্নানে। কিন্তু মন্দিরের শিবপার্বতীর মূর্তি দেখে শিশুর ভাবান্তর হল। সে 'আপ্পা' 'আম্মা' বলে ডাকতে লাগল। বালকের পবিত্রতা ও সরলতা দেখে হরপার্বতী দর্শন দিলেন। তাকে ক্ষুধার্ত দেখে পার্বতী শিশুকে নিজের দুধ পান করালেন এবং ভগবৎ বিষয়ের জ্ঞানও দিলেন। বাপ স্নান শেরে এসে দেখেন শিশুর মুখে দুধের ফেনা। বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আধ আধ ভাষায় শিশু শিবের মহিমা গাইল: "মন্দিরের শিব চুপি চুপি এসে আমার হৃদয় চুরি করে নিয়েছেন। যিনি বৃষবাহন, যিনি বিষধর সর্পের হার গলায় পরেন, যাঁর শির পূর্ণ চন্দ্রের মত উজ্জ্বল এবং যিনি শ্মশানের চিতাভস্ম গায়ে মাখেন সেই শিবের আদেশে বিশ্বজননী ভগবতী নিজের স্তন মুখে দিয়ে দুধ পান করিয়েছেন, সেজন্য এখন মুখে দুধের ফেনা লেগে আছে।" ভগবদ্‌ ভক্তদের জীবন কপটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়, কিন্তু যারা সরল, পবিত্র ও বিশ্বাসী তাদের সঙ্গে ভগবান চিবকাল ঐরূপ লীলাখেলা করে থাকেন।

শংকর, রামানুজ ও মধ্ব—ভারত গগনে তিন জ্যোতিষ্ক। তিন আচার্য যথাক্রমে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত এই তিন বিখ্যাত মতবাদ প্রচার করেন। একথা অভ্রান্ত সত্য যে শংকরই ভারতীয় দার্শনিক ভিত্তির একখানি সুদৃঢ় বিরাট শক্ত-প্রস্তর, এবং একথা সর্ববাদিসম্মত যে রামানুজের দ্বারাই প্রথম ধর্মের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালের শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম মধ্বাচার্যেরই একটা শাখা বলে অনেকে মনে করেন।

বিভিন্ন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়: ভারতের ইতিহাসে বড় বড় রাজার উত্থান হয়েছে পতন হয়েছে। বৈদেশিক আক্রমণে ভারত কখনও কখনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু তার সংস্কৃতির ধারা কখনও ব্যাহত হয় নি। তার প্রধান কারণ ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি।

এরাই সংস্কৃতির ধারাকে সংগোপনে বুকে আঁকড়ে নানাবিধ বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে পরবর্তী বংশধরদের দিয়ে গেছেন আর ঐ পরম্পরা এখনও সমানেই চলছে। এখনও আমরা যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদ, সত্যকাম-জাবালের উপাখ্যান, রামায়ণ মহাভারতের ভাবধারা বহন করে নিয়ে চলেছি। ভারতবর্ষে যখন রাজনৈতিক বিপর্যয় নেমেছে—পরাধীনতা, অরাজকতা, বিধর্মীদের ধর্মের প্রতি অত্যাচার শুরু হয়েছে তখন এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই অনেকক্ষেত্রে এগিয়ে এসে তা রক্ষা করেছেন। রামদাস স্বামীর ধর্ম বিষয়ে পথ নির্দেশ, সংঘশক্তি সংগঠনে সক্রিয় সাহায্য এবং বীর শিবাজীর গুরুভক্তি, দেশপ্রেম, অদম্য কর্মশক্তি সব মিলিত হয়ে মারাঠা শক্তিকে ভারতের ইতিহাসে প্রাধান্য দিয়েছে। বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যের ভ্রাতা বিদ্যারণ্য মুনির জীবনও অদ্ভুত। তিনি সাধক ও পণ্ডিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের উপর তখন মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচার চলেছে। হিন্দু সংস্কৃতি যায় যায় অবস্থা। তখন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এই বিদ্যারণ্য মুনির পরামর্শে রাজা হরিহর দুর্গাদি নির্মাণ করালেন এবং বুক্বারায়ের সেনাপতিত্বে নূতন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করিয়ে বিধর্মীদের দমন করেন। বিজয়নগরের সাহিত্য, স্থাপত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির পশ্চাতে রয়েছেন এই স্বাধীনচেতা, স্বধর্মোনিষ্ঠাবান, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন স্বামী বিদ্যারণ্য। রাজ্যে শৃঙ্খলা এনে দিয়ে সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য আবার শৃঙ্গেরী মঠে চলে গেলেন। নাগা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল সম্রাট আকবরের সময় মধুসূদন সরস্বতীর ব্যবস্থাপনায়। অপূর্ব কৌশলে, মুসলমান মোল্লাদের হাত থেকে হিন্দু সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্য এই নাগাসন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

উপসংহার :

'সুরুচিসঞ্জাত উৎকর্ষই সংস্কৃতি। জনগণের শোভনতাই সংস্কৃতি, যা অশোভন ও অসুন্দর সেইটাই সংস্কৃতির পরিপন্থী। একটা সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতির প্রত্যেকেই যে সংস্কৃতির বাহক হবে তা বলা যায়না, তবে একটা মান বজায় রাখা দরকার। দেশ কাল ভেদে সংস্কৃতি পাল্টে যায় সত্য কিন্তু জাতির ঐতিহ্যে সংস্কৃতির একটা ধারা বর্তমান থাকবে, আর সে ধারা পুষ্ট হবে সকল মানুষের হৃদয় রসে এবং গতিশীল হবে তাদের সাধনায়। 'ত্যাগ ও সেবা ভারতের জাতীয় আদর্শ', বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। যুগে যুগে ভারতের জীবননীতিতে কত পরিবর্তন এসেছে, বৈদেশিকদের আক্রমণে ভারতীয় ভাব-

ধারা ম্লান হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি এই ত্যাগের ব্রত থেকে কখনও বিচ্যুত হয় নি। এই ত্যাগের মহিমাই কীর্তন করে গেছেন পূর্বোল্লিখিত ভারতের ছোট ছোট সম্প্রদায়গুলি। এই সম্প্রদায়গুলি যদি না থাকত নানা রঙের ফুলে গাঁথা নয়নাভিরাম মালার ন্যায় এই বৈচিত্র্যে ভরা ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠত না। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন: "সাম্প্রদায়িকতা দূর হোক। সাম্প্রদায়িকতায় জগতের কিছু উন্নতি হবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকলে জগৎ চলতে পারে না।"

পুণ্যচরিত, দেবচরিত, পুরাণ, উপপুরাণ, প্রাচীন সম্প্রদায়গুলির সাধনা, সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সঙ্গীত, দোঁহা-গাথা, নাটক, শিল্পকলা প্রভৃতি যদি রচিত না হত তবে কে জানতে পারত কোন যুগে কি ভাবে পরিচালিত হত জাতির সমাজ জীবন, রাষ্ট্রজীবন, ধর্মজীবন, কর্মজীবন। কে ভাবতে শিখত জাতীয় ঐতিহ্য কি, তার সংস্কৃতির ধারা কোন পথে প্রবহমান। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই সব সম্প্রদায়ের অবদান বিরাট। এরা মানুষকে দিয়েছে মানবিকতাবোধ, মানুষের জন্য বহন করে এনেছে চিরন্তন উন্নতির চেতনা ও অন্তরের শাশ্বত বাণী, জাগিয়ে দিয়েছে মানবজীবনের উদ্দেশ্য, রেখেছে ঐক্য ও বর্ণসংযোগ, সমৃদ্ধ করেছে কাব্য ও সাহিত্য, শিল্প ও স্বদেশ চেতনা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, নৃত্য ও গীত, মিটিয়েছে মানুষের মনের ক্ষুধা ও অশান্তি আর সবশেষে তুলে ধরেছে ত্যাগের গৈরিক পতাকা।

—০—

নটরাজ

শ্রীরঙ্গম্‌ মন্দিরস্তম্ভের অলঙ্করণ

অশোকস্তম্ভ : সারনাথ

মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত সীলমোহর
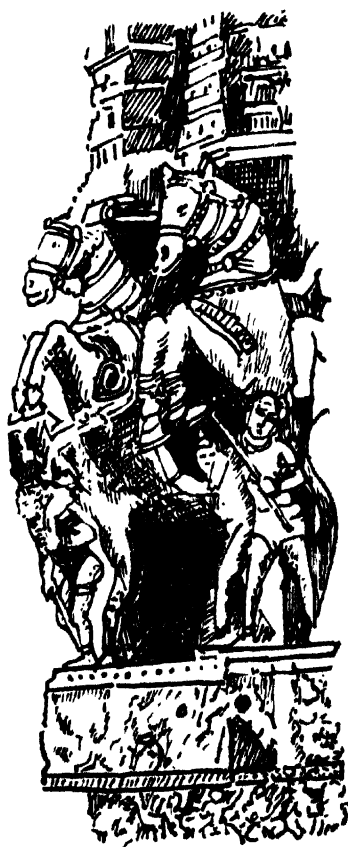
মহাসাগরের সেলিবিশ ও ফিলিপাইন পর্য্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশিয় (Polynesian) ও মেলিনেশিয় (Melanesian) দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন আজও আবিষ্কার করা যায়।

বৌদ্ধ শ্রমণরা নাকি উত্তর আমেরিকার গুয়াটেমালা প্রদেশেও গিয়েছিলেন। তারা ওটির নাম করণ করেন 'গৌতমালয়'। কালক্রমে নামটি বিকৃত হয়ে পড়ে।

মূল ভারতবর্ষ ছাড়াও ব্রহ্মদেশ, সিংহল, আফগানিস্থান, তিব্বত, শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, প্রভৃতি দেশ বৃহত্তর ভারতের অঙ্গীভূত ছিল। এই সকল দেশে ভারতীয় সভ্যতার যে প্রচার হয়েছিল তার প্রমাণ আজও বর্তমান।

সিন্ধুনদ তীরে হাজার পাঁচেক বৎসর পূর্বে যে বিস্ময়কর সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল তার স্রষ্টা হিন্দু জাতি। এখন হিন্দু কথাটা এল কোথা থেকে দেখা যাক। আর্যদের সুপ্রাচীন গ্রন্থ বেদে – সিন্ধুনদের দুটি নাম পাওয়া যায়। একটি "সিন্ধু' অপরটি 'ইন্দু'। বৃহৎ ভারতের প্রতিবেশী ও প্রাচীন সভ্যদেশ ইরাণ বা পারস্যবাসীদের লিপিমালায় 'স' বর্ণ না থাকায় তারা সিন্ধুনদকে উচ্চারণ করতো হিন্দুনদ বলে। এই হিন্দুনদ তীরবর্তী— বাসিন্দাদের তারা হিন্দু জাতি বলে মনে করতো। প্রাচীন সভ্যজাতি গ্রীকরা সিন্ধুনদের নাম দেয় ইণ্ডুস — এটা ইন্দু থেকে এসেছে। এখন কালক্রমে ইণ্ডুস থেকে ইণ্ডিয়া শব্দের সৃষ্টি হয়। গ্রীকদের কাছ থেকে ইণ্ডিয়া নামটি পাশ্চাত্য দেশগুলি গ্রহণ করেছে। বহির্বিশ্বে ইণ্ডিয়া অর্থে ভারতবর্ষ আর ইণ্ডিয়ান বলতে এখন ভারতবাসীকে বুঝায়। অবশ্য রাজা ভরতের নাম থেকেই ভারতবর্ষ কথাটির উৎপত্তি।

সিন্ধু অববাহিকায় মহেন জো-দারো ও হরপ্পার বিস্ময়কর কীর্তির রূপকার দ্রাবিড় ভাষাভাষী হিন্দু জাতি। হিন্দু আর্য জাতি. এই দ্রাবিড়, তামিল ও বৈদিক কথ্য সংস্কৃত ভাষাভাষী গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গঠিত। সুপ্রাচীন তামিল জাতির "সুমের" বলে একটি শাখা পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে 'সুমেরীয়' সভ্যতার স্রষ্টা। এই সুমেরীয়দের কাছ থেকে জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, আচারবিদ্যা শিক্ষা করে অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এই সুমেরীয়দেরই প্রাচীন পুরাণ কথাগুলি নতুন ভাবে রূপায়িত হয়ে খ্রীস্টানদের বাইবেল গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

এই তামিল বা দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতির একটি শাখা, ভারতবর্ষের মালাবার উপকূল থেকে সমুদ্রপার হয়ে মিশরে গিয়ে, নীলনদ তীরবর্তী মিশরীয় সভ্যতা গড়ে তোলে। প্রাচীন মিশরীয় ধর্মের সঙ্গে ভারতের পুরাণ কথার বেশ মিল আছে। মিশরে টলেমীর (Ptolemy) শাসনকালে, অশোক ধর্ম প্রচারক পাঠিয়ে পুরাতন যোগ সূত্রটিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মিশরে প্রখ্যাত "রোজেট্টা স্টোনের" জীবজন্তুর লাঙ্গুলাকৃতি চিত্রলিপির সঙ্গে অশোকের আমলের লিপির আশ্চর্য সাদৃশ্য চোখে পড়ে। পরবর্তীকালের আর্য ও সেমেটিক সভ্যতায়, আদি সভ্যতার লালাভূমি ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন তামিল জাতির দান অপরিসীম।

বড় বিচিত্র ও বিস্ময়কর এই আর্য-সভ্যতা। বর্ণাশ্রমাচারের মধ্যে দিয়ে, নানা জাতি ও গোষ্ঠীকে আয়ত্ত করে বহু শতাব্দীর সাধনায় ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। সেই সংস্কৃতি ছিল সজীব ও গতিশীল। দেখতে দেখতে তা প্রাচীন ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে সাগর পারের দেশ সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, ব্রহ্ম, মালয়, শ্যাম, কাম্বোজ, বলি, বোর্ণিও ও চম্পায় পৌছে যায়। ভারত-সংস্কৃতির পূতাগ্নিকে কোথাও বহন করে নিয়ে যান ব্রাহ্মণ গুরু-পুরোহিত, কোথাও বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ, অর্হৎ এর দল, কোথাও বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মী বণিককুল অথবা রাজ্যলিপ্সু রাজপুত্র।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি ঘটে বিচিত্র ভাবে। এই অঞ্চলের অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে ভারতের নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক আগেই ছিল। এবারে তাদের জ্ঞাতি ভাইদের আনা হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার স্পর্শে তারা নূতন ভাবে জেগে উঠে। খ্রীষ্ট জন্মের বেশ কিছুকাল আগে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষার আধারে তাদের কাছে পৌছে যায়। এতো গেল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কথা।

ওদিকে পশ্চিম এশিয়ার দিকে তাকালেও দেখা যায় ব্যাবিলন, সিরিয়া, মিশর, গ্রীস, পারস্য, এইসব দেশে মাটি খুঁড়ে যেসব ভারতীয় তৈজসপত্র পাওয়া গিয়েছে তাদের ভারতীয় নাম আছে। মনে হয় এইসব দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল। মৌর্য যুগের প্রথম দিকে মিশরবাসী জনৈক গ্রীক নাবিক ভারতে এসেছিলেন লোহিত সাগরতীরের পথ ধরে। তিনি একখানি বই লিখেছিলেন 'The Periplus of the Erythraean sea'। এতে দেখি ভারতের সঙ্গে পশ্চিম দেশের বাণিজ্যের সম্পর্ক রয়েছে ভালই।

এই পুস্তকে কয়েকটি বন্দরের নাম পাই, যেখানে ভারতীয়রা জাহাজ নির্মাণ করত আর সেখান থেকেই যাত্রা করত বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে। সে বাণিজ্য দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল হীরা, মুক্তা, মসলা, লাক্ষা, মস্‌লিন্‌ ও তুলাজাত দ্রব্য। পশ্চিমে এগুলির বড় আদর ছিল।

ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny) বলেন, এইসব দামী বস্তু, মূল্যবান পণ্য, রোমের অভিজাতবর্গ অনেক স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে কিনতেন। ভারতে আজও অনেক প্রাচীন স্তূপ ও প্রাসাদ খুঁড়তে গিয়ে রোমক স্বর্ণমুদ্রা বেরিয়ে পড়ে। ভারতের রাজা পাণ্ড্য খ্রীষ্টপূর্ব ২৬ অব্দে রোমের রাজা অগষ্টাস সিজারের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন।

পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য চলত মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর মারফৎ। ভারতবর্ষ থেকে ভূমধ্যসাগরের কূলে কূলে, পারস্যের মধ্য দিয়ে, কাস্পিয়ান হ্রদের তীর দিয়ে, এশিয়া-মাইনরের মধ্যে অনেকগুলি বাণিজ্য পথ ছিল। অশোক পশ্চিম-এশিয়া, উত্তর-আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বৌদ্ধ মিশন পাঠিয়েছিলেন, এবং সেখানে তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম, ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে, পূর্ব ইউরোপে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আর্য ভারতের জ্ঞান সাধনায় ও প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার পরোক্ষ প্রভাবে ইউরোপের একটি জাতি সুসভ্য হয়ে উঠে ছিল। সে জাতিকে ভারতীয়রা বলতো যবন, ইউরোপীয়রা বলে গ্রীক। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো ও পিথাগোরাসের চিন্তাধারায় ভারতীয় দর্শনের প্রভাব আছে। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক দুঃখবাদী দার্শনিক হেরাক্লিটাসের দার্শনিক চিন্তার সহিত বুদ্ধ দর্শনের সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

ইসলামের আবির্ভাবে আরব জাতির মধ্যে মহাবলের সঞ্চার হয়। তারা বারবার ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে। আরবিয়গণ অনুবাদের মাধ্যমে হিন্দু ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আয়ত্ত করে। পরে তারা যখন ইউরোপ প্রবেশ করে, তখন তাদের সঙ্গে ভারত ও গ্রীসের সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপে প্রবেশ করে নব-জাগরণ (Renaissance) ঘটায়। ইটালির ভেনিসে ভারতীয় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। কাজেই ইটালিই প্রথম ভারতীয় সভ্যতার আলোকে জাগ্রত হয়। কিন্তু বৃদ্ধ জাতির এই নব-ভাব গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না। তাই তরুণ ফরাসী জাতি নব-জাগরণের বাণীকে আত্মস্থ করে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে

দেয়। অর্ধ-বর্বর ইউরোপ সভ্যতার আলোক স্পর্শে, খ্রীষ্টানী রক্ষণশীলতার অন্ধকার থেকে জেগে উঠতে থাকে।

ভারতবর্ষের জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন ও ভেষজবিদ্যা আরবি অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপ লাভ করে। হিন্দুদের পাটিগণিতের জ্ঞান, গ্রীকদের চেয়েও বেশী ছিল। বীজগণিতের আবিষ্কারকও হিন্দু জাতি। পাটিগণিত ও বীজ গণিতের চর্চা আরবিয়দের মারফৎ ইউরোপে সুরু হয়।

পৃথিবীর গোলাকৃতির প্রমাণ, দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধির কারণ, ভারতীয় বিজ্ঞানী আর্যভট্টের আবিষ্কার। হাজার বছর পরে কোপার্নিকাস এ সকল নতুন করে আবিষ্কার করে ইউরোপকে চমৎকৃত করেন। নিউটনের পাঁচশো বছর আগে ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্করাচার্য, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Law of gravitation) ও ব্যাসকলন (Differential calculas) আবিষ্কার করেন।

বর্তমানকালেও প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তা, সারা জগতের বিস্ময়ের বস্তু। জার্মান দার্শনিক শোপেন হাওয়ার, উপনিষদের ল্যাটিন অনুবাদ পড়ে প্রভাবিত হন। সুবিখ্যাত কান্টের দর্শনে উপনিষদের প্রভাব স্পষ্ট।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-শতকের পর ভারতবর্ষে নেমে এল এক অন্ধকার যুগ। ইসলামী আক্রমণে জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্রগুলি হ'ল ধ্বংস। বৈজ্ঞানিক মননশীলতার স্থলে এল কুসংস্কার ও আচার-সর্বস্বতা। সমাজ ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে ভারতবর্ষে এক নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে যায় অথচ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিশের লেখা ইণ্ডিকা (Indica) গ্রন্থে ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনীতির যে রূপ পাওয়া যায় তাতে চমৎকৃত হতে হয়। গ্রীক ভাষায় লেখা বইটি অনুবাদের মাধ্যমে সারা ইউরোপে পঠিত হ'ত, তাই তার কিছু কিছু উদ্ধৃতি মাত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী কালে ইউরোপীয় দেশগুলির শাসন ব্যবস্থা কার্যে পুস্তকটির প্রভাব পড়েছে।

ভারতের আরণ্যক তপোবনে যখন হোমাগ্নি জ্বলছে—উচ্চারিত হচ্ছে সাম-স্তোত্র, ইউরোপ সেদিন অন্ধকারে ঢাকা। বর্বর, আম-মাংসভোজী নর-বানরদের লীলাভূমি। নীল, ইউফ্রেটিস আর ইয়াংসিকিয়াং তীরের সভ্যতার দীপ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে এল। তখনও নির্ধূম শিখায় জ্বলছে সিন্ধু ও গাঙ্গেয় সভ্যতার মশাল। সেই আগুনে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিলে গ্রীস, তারও পরে রোম। তাদের আলোয় আজ ইউরোপ আলোকিত। ইউরোপের মত এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত কিন্তু আঁধারে ঢাকা ছিল না। জ্ঞান, ধর্ম

কম্বোজ, চম্পা ছিল ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোয় উদ্ভাসিত। ভারত মহাসাগরের সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্ণিওতে এক দ্বীপময় বৃহত্তর ভারত গড়ে উঠেছিল। মধ্য এশিয়ায় তুর্কিস্থানে সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় উপনিবেশ। সুদূর কোরিয়া, জাপানেও পৌঁছে ছিল 'শান্তম, শিবম অদ্বৈতমের' মহাবাণী, ভগবান তথাগতের অহিংসা ও মৈত্রীর বীজমন্ত্র। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের মধ্যে দিয়ে ভারতের উপনিষদের বাণীই সারা এশিয়ায় প্রসারিত হয়েছিল। কারণ এই দুই ধর্মের ভিত্তি উপনিষদ। প্রায় অর্ধ-এশিয়া জুড়ে আয় ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তরবারির জোরে নয়, প্রেম, প্রীতি ও অহিংসার বন্ধনহীন গ্রন্থিতে। বৃহত্তর ভারতের সে কাহিনী যেমন বিস্ময়কর, তেমনি জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষাপ্রদও বটে।

বৃহত্তর ভারতের অন্তর্ভুক্ত সাংস্কৃতিক ভূমিগুলিকে নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। --

(১) **ইন্দোনেশিয়া**ঃ এর মধ্যে পড়ে সুমাত্রা, যবদ্বীপ বা জাভা, বলি-দ্বীপ, বোর্ণিও, লম্বক প্রভৃতি। এগুলিকে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ব'ল।

(২) **ইন্দোচীন**ঃ এর মধ্যে রয়েছে কাম্বোডিয়া (কম্বোজ) কোচিন চীন (চম্পা), টং কিং, আনাম ও লাওস।

(৩) **সেরিন্দিয়া**ঃ এটি রুশ তুর্কিস্থান ও চীনা তুর্কিস্থান (মধ্য এশিয়ার মানচিত্রে এর নামোল্লেখ নেই)

(৪) **অন্যান্য দেশ**ঃ ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, মালয়, তিব্বত চীন, জাপান ও কোরিয়া।

নেপাল ও আফগানিস্থানতো ভারতেরই অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু এখন অঞ্চল দুটি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আফগানিস্থানের প্রাচীন নাম গান্ধার। মহাভারতের গান্ধারী ছিলেন এই অঞ্চলের রাজকন্যা। তাই তার নাম গান্ধারী। ইউরোপীয়রা আফগানিস্থানকে বলতো 'ইণ্ডিয়া মাইনর' (India minor) বা ক্ষুদ্র ভারত। কাবুল শহরের কাছেই আজও ব্রহ্মযান বা বামিয়ান নামক স্থানে কয়েকটি বিরাট বৌদ্ধমূর্তি মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে। আফগানিস্থানে বহু মন্দির ও মূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলি বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের নিদর্শন।

পৃথিবীতে নেপালই একমাত্র দেশ যেখানে হিন্দু ধর্ম সরকারী ভাবে স্বীকৃত।

মুসলমান আক্রমণের ফলে ভারতে যখন বহু মূল্যবান পুঁথি বিনষ্ট হয় তখন হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মগুরু ও ভিক্ষুশ্রমণগণের অনেকে নেপালে পালিয়ে যান। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অমূল্য নিদর্শন 'চর্যাপদের' পুঁথি আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালেই আবিষ্কার করেন। নেপালের ভাষা, লিপি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ভারতের প্রভাব অপরিসীম।

ইন্দোনেশিয়া ঃ প্রথমেই ইন্দোনেশিয়ার কথা ধরা যাক্। ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জের নাম একশো বছর আগেও ছিল 'ডাচ-ইণ্ডিয়া'। ১৮৬০ নাগাদ ডাচ পণ্ডিত ডেক্কর এর নাম দেন 'Insul India'। অর্থাৎ দ্বীপময় ভারত। ল্যাটিন Insula কথার অর্থ দ্বীপ। কিন্তু জার্মাণ পণ্ডিত A. Bastian, Insula শব্দের পরিবর্তে গ্রীক Nesos কথাটি ব্যবহার করেন। India ও nesos এই শব্দ দুটি মিলে Indonesia কথাটির সৃষ্টি হয়। এই দ্বীপের জাতীয়তাবাদী অধিবাসীরা নামটিকে পছন্দ করেন।

সুপ্রাচীন কাল থেকে মসলা ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই দ্বীপগুলি ভারতীয়দের আকর্ষণ করেছে। সেকালে গঙ্গার মোহনা থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে অনেকগুলি বন্দর ছিল। এই বন্দরগুলি থেকে সুবর্ণদ্বীপের (মালয়) উদ্দেশ্যে বণিকেরা বাণিজ্যে যেত। টলেমি তার গ্রন্থে মালয়, যবদ্বীপ সুমাত্রার অনেকগুলি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম করেছেন। সমসাময়িক কালের লেখা বৌদ্ধগ্রন্থে অনেকগুলি নাম পাই। নামগুলি সবই সংস্কৃত। টলেমি বলেছেন ভারতের চিরাকোল ও গঙ্গাম থেকে যবদ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্র পথ ছিল। বৌদ্ধ-জাতক, কথা-সরিৎ-সাগর প্রভৃতি গ্রন্থে, এই দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশ্যে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র যাত্রার বর্ণনা আছে। অনেক ভারতীয় ক্ষত্রিয় যুবরাজ সমুদ্র পারে গিয়ে দ্বিতীয় শতক থেকেই রাজ্যস্থাপন করেছেন। তাঁদের ধর্ম— সামাজিক আচার-আচরণ, ভাষা-লিপি ইত্যাদি নূতন দেশে গৃহীত হয়েছে সাদরে। এমনি করেই একদিন সুমাত্রা, মালয়, বলি, বোর্ণিও, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে ভারতের সাংস্কৃতিক উপনিবেশ গড়ে উঠে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম এসব অঞ্চলে শৈবধর্মরূপে প্রচলিত ছিল। পরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বেড়ে ওঠে।

স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল জাতে মালাই। তাদের ভাষাও ছিল মালাই ভাষা। মালাই ভাষার লিপির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার লিপির বেশ মিল আছে। সমাজের মধ্যে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এমনভাবে প্রবেশ করেছিল

যে পরবর্তী কালে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটলেও আধুনিক ইন্দোনেশিয়া সাংস্কৃতিক জীবনে আজও ভারতীয় রয়ে গেছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সুবর্ণভূমির নাম পাই। রামায়নে যবদ্বীপের কথা আছে। সুমাত্রার শ্রীবিজয় বা শ্রীবিষয় সংস্কৃত চর্চার একটা বড় কেন্দ্র ছিল। চীন দেশীয় পর্যটক ই-চিং ভারতে আসার পথে শ্রীবিজয় কেন্দ্রে বেশ কিছুদিন সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। বাঙালী পণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকর একাদশ শতকে শ্রীবিজয়ে কিছুদিন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। বিখ্যাত শৈলেন্দ্র রাজবংশের রাজধানী এই শ্রীবিজয়ের অবস্থান যে কোথায় ছিল আজও তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে সুমাত্রা ভারতীয় উপনিবেশ ছিল।

বৌদ্ধ ও হিন্দু দুই ধর্মেরই যথেষ্ট প্রভাব ছিল সুমাত্রায়। আজও এখানে অনেক অপূর্ব সুন্দর শিব-বিষ্ণু-বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। এগুলি সবই পাথরে অথবা ব্রোঞ্জে তৈরী। এগুলিব ভাস্কর্যে গুপ্ত ও পালরীতির ছাপ আছে। সুমাত্রার অধিবাসীদের, ভারতীয়রা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করার ও চরকায় সুতো কাটার শিক্ষা দেন। প্রথম দিকে সুবর্ণভূমিতে হিন্দু ক্ষাত্রশক্তির একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। পরে মালয়-যবদ্বীপ-সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ নিয়ে শক্তিশালী শৈলেন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এঁরা ছিলেন মহাযানী বৌদ্ধ। চীন ও ভারতের সঙ্গে এঁদের সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। এই বংশের রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বিহারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করতে, গৌড়ের রাজা দেবপালের কাছে দূত পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন। দেবপাল সানন্দে সে অনুরোধ রেখেছিলেন। ৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত একখানি তাম্র-শাসন থেকে একথা জানা যায়। শৈলেন্দ্র বংশীয়েরা প্রেরণা পেতেন বাংলাদেশের বৌদ্ধ-মঠ গুলি থেকে। কুমার ঘোষ বলে এক বৌদ্ধ শ্রমণ শৈলেন্দ্রদের গুরু ছিলেন। তাঁর অনুরোধে রাজারা তারাদেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। এই শৈলেন্দ্ররাজারাই বরবুদুরের বিখ্যাত স্তূপ নির্মাতা। বরবুদুর বিশ্বের বিস্ময়। ১৯২৬ সালে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বরবুদুর পরিদর্শন করেন। ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে সমুদ্র পারের দেশে, ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির এই অনুপম নিদর্শন দেখে তিনি বিমোহিত হন। একটি কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন বরবুদুরের উদ্দেশ্যে।

কত যাত্রী কতকাল ধরে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কতদিন
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।
ইঙ্গিতপুঞ্জিত তুঙ্গ পাষাণের সংগীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি, 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

বরবুদুর কথাটির অর্থ বুদুর নামক গ্রামের বিহার। এটি একটি স্তূপ বা চৈত্য। যবদ্বীপের এই প্রখ্যাত চৈত্যের গায়ে বুদ্ধের জীবনকথা ও নানা বৌদ্ধ উপাখ্যান বাটালি ও ছেনির সাহায্যে খোদাই করা আছে। এটি একটি টিলার মত উঁচু জায়গায় অবস্থিত। তারপরে একটা চৌকো চাতাল। থাকে থাকে আটটি ভূমি বা তলা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রথম পাঁচটি ভূমি চৌকো আকারের। উপরের তিনটি ভূমি গোলাকার। প্রত্যেক তলার বারান্দায় পাথরের দেওয়ালে চিত্রগুলি খোদাই করা। চিত্রগুলি সংখ্যায় তের শত। পাশাপাশি রাখলে এরা তিন মাইলের বেশী লম্বা হয়। এটি বিশ্বশিল্পের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে স্বীকৃত। উপরের তিনটি আর নিচের পাঁচটি তলার মধ্যে কুলুঙ্গিতে উপবিষ্ট-বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্বের মূর্তি আছে। সেগুলির সংখ্যা প্রায় পাঁচ'শ।

অষ্টম শতকের পর যবদ্বীপ, বৌদ্ধ শৈলেন্দ্র বংশের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসে। আবার হিন্দু রাজারা যবদ্বীপে হিন্দু সংস্কৃতি বিস্তারের আয়োজন করেন। আর তখনই নবম শতকে প্রাম্বানান নামক স্থানে গড়ে ওঠে হিন্দু দেবতাদের মন্দিরগুলি। সবচেয়ে বড় মন্দিরটি শিবের। তাঁর সামনেই তাঁর বাহন বৃষের মন্দিরটিও রয়েছে। শিবের মন্দিরের পাশেই রয়েছে বিষ্ণুর মন্দির। তাঁর বাহন গরুড়ের মন্দিরটিও দর্শনীয়। আর একপাশে রয়েছে ব্রহ্মা ও তাঁর বাহন হংসের মন্দির। এই আসল মন্দিরগুলি ছাড়া আরও প্রায় দেড়শত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। ভারতীয় হিন্দুধর্মের অনুপম শিল্প-সম্ভারের পীঠস্থান প্রাম্বানান্ যেন বৌদ্ধ শিল্পকীর্তি বরবুদুরকে হারিয়ে দেবার জন্যই তৈরী। যবদ্বীপের রাজারা ছিলেন হিন্দু-শৈব। এঁদের রাজা দক্ষই নাকি এই মন্দিরগুলি তৈরী করেছিলেন। শিবমন্দিরের আর ব্রহ্মার মন্দিরের চিত্রাবলী রামায়ণের। আর বিষ্ণু মন্দিরের চিত্রগুলি

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। প্রাম্বানান্‌এর চিত্রগুলিও বিশ্ব ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে গণনীয়।

ক্রমে যবদ্বীপের হিন্দু রাজারা পূর্বদিকে সরে যান। পর পর তিনটি রাজবংশ সেখানে রাজত্ব করেন। হয়তো এই সময়েই যজ্ঞক্ষেত্র নগরটি গড়ে ওঠে। সেটিই আজ ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী যোগজকর্তা (জাকর্তা)। শেষ রাজধানী মজপহিত (Majapahit) বা বিল্বতিক্ত থেকে ষোড়শ শতকে শেষ হিন্দুরাজবংশ বলিদ্বীপে চলে যান। এই বলিদ্বীপের শতকরা পচানব্বই জন আজও হিন্দু। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে ইস্‌লামের আক্রমণে মালাইজাতি ক্রমশঃ ধর্মান্তরিত হন। কিন্তু আচারে আচরণ ও সামাজিক রীতিনীতিতে আজও তাঁরা হিন্দু রয়ে গেছেন। রামায়ণ মহাভারত আজও তাদের প্রিয় গ্রন্থ। ছায়া নাটকে রামায়ণের কাহিনীর অভিনয় দেখিয়ে এঁরা রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিলেন। আধুনিক ইন্দোনেশীয় সরকার দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত. তাঁদের বিমান সংস্থার (Airlines) নামকরণ করেছেন, বিষ্ণুবাহন গরুড়ের নামে।

বলিদ্বীপে এখনও প্রাচীন ভারতবর্ষের মত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্বর্ণ আছে। তবে জাতিভেদের কড়াকড়ি নেই। ছুৎমার্গের ভেদাচার এখানে অজানা। প্রাচীন ভারতে ছুৎমার্গ ছিল না তাই শক হুণ-প্রভৃতি নানা জাতি সহজেই হিন্দু সমাজে স্থান পেয়েছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে বৌদ্ধ ও হিন্দুরা একটা রফা করে নিয়েছেন। পুরোহিতদের 'পদণ্ড' বলা হয়। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় সংস্কৃত মন্ত্র মালাই ভাষায় ও মালাই উচ্চারণে তাঁরা পাঠ করে থাকেন। আধুনিক ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক দূত মহাকবি রবীন্দ্রনাথ দ্বীপময় ভারত পরিক্রমার পথে উপস্থিত হয়ে ছিলেন দুহাজার বছরের স্মৃতি সুরভিত হিন্দু সংস্কৃতির লীলাভূমি বলি দ্বীপে। সঙ্গে ছিলেন ভাষাচার্য সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত মন্ত্রাদি পাঠ করে তিনি পদণ্ডদের অভিভূত করেন। সেই হিন্দুবৌদ্ধপদণ্ডরা প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে চাননি তাঁদের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন দেবভূমি ভারতবর্ষ থেকে। রবীন্দ্রনাথ 'বালী' (সাগরিকা) নামক একটি অপূর্ব সুন্দর কবিতায় তাঁর 'বলি' পরিভ্রমণের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও ভাব ব্যাকুলতা অক্ষয় করে রেখে গেছেন—

> সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে
> বসিয়াছিলে উপল উপকূলে।

শিথিল পীত বাস
মাটির পরে কুটিল রেখা লুটিল চারি পাশ।

* * *

মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট পরে
ধনুক বাণ ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজবেশী—
কহিনু, 'আমি এসেছি পরদেশী'।

* * *

কহিনু আমি, রেখো না ভয় মনে
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।

* * *

দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।

তারপর অনেক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ শতাব্দীর অবসানে ভারত-সংস্কৃতির দিব্যদূত রবীন্দ্রনাথ দ্বীপময় ভারতের পুণ্য পাদপীঠে উপস্থিত হয়ে দেখলেন প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক চিহ্ন সেখানে অম্লান—

দেখিনু আমি নটরাজের দেউল-দ্বার খুলি—
তেমনি করে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগুলি।

ইন্দোচীন: ইন্দোচীন কথাটির মধ্যে ইণ্ডিয়া ও চায়না দুটি কথা আছে। ইন্দোচীনের অন্তর্ভুক্ত টংকিং, আনাম, কোচিন চীন, কাম্বোডিয়া ও লাওস পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে টংকিং-এর উপর প্রাচীন চৈনিক সভ্যতার কিছু প্রভাব আছে।

আনামদেশের প্রাচীন নাম অন্নম। কেউ কেউ বলেন ভারতের অতীত যুগের অঙ্গ রাজ্যের অনুকরণে অন্নম দেশের নাম করণ হয়েছিল। আজও সেখানে অঙ্গ-চমনিক নামে একটি জনপদ আছে।

কাম্বোডিয়া ও কোচিন-চীনের প্রাচীন নাম ছিল যথাক্রমে কম্বোজ ও চম্পা। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে এই দুটি নাম পাওয়া যায়। চম্পার আধুনিক নাম দক্ষিণ-ভিয়েতনাম। এই সব অঞ্চলে একদিন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এখানে এমন বিকাশ লাভ করেছিল যে এই অঞ্চলটিকে ভারতের অংশ বলেই মনে করা হত। প্রাচীন আরবির

বণিকদের বিবরণীতে একথার সমর্থন মেলে। শুধু কম্বোজ ও চম্পার অধিবাসীরা নয় আজও পাশ্ববর্তী শ্যাম-ব্রহ্মের লোকেরা ধর্মে বৌদ্ধ। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ শ্রমণ ও হিন্দু পুরোহিতদের আনীত পালি ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা এখনও এই সব অঞ্চলে বেশ প্রচলিত।

কম্বোজের প্রাচীন ইতিহাস রহস্যাচ্ছন্ন। জনশ্রুতি কৌণ্ডিন্য নামে ভারতাগত এক ব্রাহ্মণ স্থানীয় এক রাজকন্যা সোমাকে বিবাহ করে কম্বোজ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি নাকি মহাভারতের দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার কাছে পাওয়া বর্শা মাটিতে পুঁতে রেখে ছিলেন। আরেকটি কিংবদন্তী— ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা আদিত্য-বংশের বীর এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আবার কেহ কেহ বলেন ভারতীয় কাব্যপুরাণে উল্লিখিত কাশ্মীর-সংলগ্ন কম্বোজ রাজ্যের এক নির্বাসিত রাজপুত্র এই কম্বোজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই দেশে এসে স্বদেশের অনুকরণে নূতন কম্বোজ নির্মান করেন। কম্বোজের প্রাচীন শিল্পকলায় কাশ্মীরী শিল্পের প্রভাব লক্ষণীয়। বোধহয় প্রথম বা দ্বিতীয় খ্রীষ্টীয়শতকে রাজ্যটি গড়ে ওঠে। প্রায় নয়শত বছর ধরে এই হিন্দু রাজ্যটি গৌরবের সহিত টিকে ছিল। এই বংশের বিখ্যাত রাজাদের নাম জয়বর্মণ, যশোবর্মণ, রুদ্রবর্মণ ইত্যাদি। এঁদের কেউ বৌদ্ধ কেউ বা বৈষ্ণব মতের পৃষ্ঠপোষক হলেও অধিকাংশ রাজাই ছিলেন হিন্দু-শৈব মতাবলম্বী। কম্বোজে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যের চর্চা ভালই হ'ত। কম্বোজের বর্ণমালা, ভারতীয় লিপি থেকে গৃহীত। রামায়ণ কম্বোজী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

এখানকার মন্দিরে উৎকীর্ণ চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত। কম্বোজের অঙ্কোরভাটের (AngkorVat) প্রস্তর নির্মিত সুবিশাল বিষ্ণু মন্দির, আয়তনে, ভাস্কর্যের উৎকর্ষে সাংস্কৃতিক জগতের এক অবিস্মরণীয় শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এটি মহারাজা সূর্যবর্মনের (১১১৫ খ্রীঃ- ১১৫২০খ্রীঃ) পরিকল্পনায় তৈরী। মন্দিরটি সমচতুষ্কোণ। দেওয়ালের লাগোয়া ছাদযুক্ত টানা বারান্দার গাত্রে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের ঘটনাবলী সুন্দরভাবে খোদাই করা আছে।

পাথরের দেওয়াল ঘেরা রাজধানীর নাম অঙ্কোরথম (Angkor Thom) বা "ওঙ্কারধাম"। রাজধানীর কেন্দ্রে পিরামিডের আকারে তৈরী বেয়নের (Bayon) মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে ধ্যানমগ্ন শিবের মূর্তি। কম্বোজ-শিল্প

ভারতীয় শিল্পেরই এক পরিবর্তিত রূপ। তাইতো আমাদের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সগৌরবে গেয়েছেন

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি
শ্যাম-কম্বোজে 'ওঙ্কারধাম' মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।

কম্বোজ, শ্যাম প্রভৃতি দেশের মানুষ ধর্মে বৌদ্ধ হলেও সামাজিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনুসংহিতার বিধান আজও মেনে চলে। কম্বোজের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন মনুস্মৃতিকে ভিত্তি করে লিখিত। কালক্রমে আনামী ও থাই জাতির আক্রমণে কম্বোজ দুর্বল হয়ে পড়ে।

আধুনিক চম্পায় (দক্ষিণভিয়েতনাম) হাজার বছরের বেশী হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজ্যটি খৃষ্টের জন্মের দু'শ বছরের মধ্যে গড়ে ওঠে। চম্পার মাটির তলা থেকে শিব, বিষ্ণু, গণেশ, উমা, লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আজও পাওয়া যাচ্ছে তবে শিবের প্রভাব বেশী ছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ভারতবর্ষের নটরাজ শিবকে যে বেশী পছন্দ করেছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই, রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতায় সে কথার সমর্থন মেলে। চম্পায় পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করেছিল। ভারত থেকে মারজীবক, কল্যাণরুচি প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু তৃতীয় শতাব্দীতে চম্পায় যান তার প্রমাণ আছে। সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন চর্চা চম্পায় বেশ ভালভাবেই হত। হিন্দু রাজত্বের কালে চম্পাপুর, ইন্দ্রপুর নামে বিখ্যাত শহরগুলি গড়ে ওঠে। চম্পাপুরের মন্দিরে, হরিবংশ ও পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণ ও বলরামের আখ্যান অবলম্বনে অনেক চিত্র খোদাই করা আছে।

অমরাবতী ও পাণ্ডুরঙ্গ বলে দুটি প্রদেশ ছিল চম্পায়। অমরাবতী ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে অবস্থিত। আর পাণ্ডুরঙ্গ, মহারাষ্ট্র দেশে বিষ্ণুর নাম। প্রাচীনকালে চম্পায় মাস গণনা হত শুক্ল প্রতিপদ থেকে আর শেষ হত অমাবস্যায়। আর নববর্ষ শুরু হত চৈত্রমাসের প্রথম দিন থেকে। আজও এ প্রথা অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত। পরে আনামী আক্রমণে কম্বোজের মত চম্পায়ও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব কমে যায়।

সেরিন্দিয়া : Seres ও India এই দুটি শব্দের মিশ্রণে সেরিন্দিয়া শব্দটি গঠিত। Seres শব্দটি গ্রীক, অর্থ চীন। আধুনিক মানচিত্রে সেরিন্দিয়ার নাম নেই। এটি চীনা তুর্কিস্থান ও রুশ তুর্কিস্থান এই দুটি খণ্ডে বিভক্ত। ভারতীয় সভ্যতা ও চৈনিক সভ্যতার মিলনস্থল ছিল সেরিন্দিয়া। হিমালয়

পর্বতমালার মধ্য দিয়ে ভারতের সঙ্গে তিব্বতের ও চীনের অনেকগুলি বানিজ্য পথ ছিল। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়। মধ্য এশিয়া আজকের মত ভারতের কাছে বিস্মৃত ও অবহেলিত অঞ্চল ছিল না। বাণিজ্যিক কারণেই এই অঞ্চলে বহু মানুষের বসবাস গড়ে ওঠে। অশোকের রাজত্বকালে একদল ভারতবাসী কাশ্মীর থেকে গিয়ে খোটান শহরের পত্তন করেন। ভারতে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা কয়েক শতাব্দী ধরে খোটানের কথ্য ভাষা ছিল। ফরাসী পণ্ডিত গ্রুসের মতে সংস্কৃত ছিল খোটানের ধর্ম ও সাহিত্যের ভাষা। কুবেরের ও গণেশের প্রাপ্ত মূর্তি ও চিত্র থেকে অনুমান করা যায় এ অঞ্চলে হিন্দু ধর্মের প্রভাব ছিল, পরে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধ শ্রমণ বৈরোচন, হিন্দু রাজা বিজয়সম্ভবকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। ক্রমশঃ অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার এ অঞ্চলে গড়ে ওঠে।

প্রসিদ্ধ পর্যটক হিউয়েন সাঙ্‌ মধ্য এশিয়া পথে ভারত থেকে চীনে ফেরার সময় খোটানে একশত বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। তাতে প্রায় পাঁচ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। একাদশ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ইস্‌লামী আক্রমণের ফলে খোটানের ভারতীয় সভ্যতা ম্লান হয়ে পড়ে ও অধিবাসীরা ক্রমশঃ ধর্মান্তরিত হন। কুচানগরও বৌদ্ধ ধর্মচর্চা ও সংস্কৃত অধ্যয়নের বড় কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কুমারজীব (৩৪ খ্রী, ৪১৩ খ্রীঃ) ছিলেন কুচার অধিবাসী। সিলভাঁ লেভীর মতে চীনদেশে ভারতীয় ভাবধারা যাঁরা অনুবাদের সাহায্যে প্রচার করেন কুমারজীব তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মধ্য এশিয়ায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনূদিত পুঁথি পাওয়া যায়। সেগুলি কুচা থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল। মঙ্গোলিয়ার গোবী মরু অঞ্চলের টোখারি রাজা স্বর্ণদেব ছিলেন বৌদ্ধ। হিউয়েন-সাঙ্‌ যখন কুচা আসেন তখন বৌদ্ধস্থবির মোক্ষগুপ্ত ছিলেন স্বর্ণদেবের গুরু। তুরফান, মধ্য-এশিয়ার আর একটি বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র। অশ্বঘোষের একখানি নাটক এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব অঞ্চলে দুহাজার বছর আগে যে সব রাজা রাজত্ব করতেন তাঁদের নাম ছিল ইন্দ্রার্জুন, চন্দ্রার্জুন প্রভৃতি। নামগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয়।

এইসব অঞ্চলের লোকেরা ভারত থেকে যেমন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তেমনি ভারতীয় বর্ণমালাসহ ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি-সাহিত্য গ্রহণ করে মধ্য এশিয়ায় একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের ভারতবর্ষ গড়ে তোলেন। চীনী-তুর্কিস্থানের টুন

তুয়াং-এর সুপ্রাচীন 'হাজার বুদ্ধের গুহা' থেকে আবিষ্কৃত চিত্রশিল্পের প্রেরণা যে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বৈদেশিক আক্রমণে সেদিনের সেই প্রাণোচ্ছল সভ্যতা মরুবালুর নীচে ঢাকা পড়ে যায়। তারপর একদিন তাকলামাকান মরুর বালুর তলা থেকে মঠ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে এসে বিদেশী মরু-অভিযাত্রীকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে দেয়। সেদিনটা আজ ইতিহাসের স্মৃতি মাত্র।

চীন ঃ চীন ও ভারতের মধ্যে একদিন গভীর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। ভারতের বৌদ্ধধর্ম একদিন চীনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। চীন দেশ থেকে কোরিয়া ও সেখান থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। এদিকে তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যাম ও সিংহলও বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে এ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। তবে চীন, জাপান, কোরিয়া ও তিব্বত মহাযানী মতবাদ গ্রহণ করে আর হীনযান মত প্রচলিত হয় ব্রহ্ম, শ্যাম ও সিংহলে। ধর্মাশোক প্রথমে চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই বৌদ্ধধর্ম চীন দেশে রাজমান্যতা লাভ করে। মধ্য এশিয়ার বাণিজ্য পথ ধরে ও সমুদ্র পথে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীন দেশে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন। এদের মধ্যে কুমারজীব, ধর্মগুপ্ত, গুণবর্মা, বোধিধর্ম ও পরমার্থের নাম প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য অনেক চীনা বৌদ্ধ পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ এবং ই-চিঙয়ের নাম প্রখ্যাত।

যীশুর জন্মের তিনশ' বছরের মধ্যে চীনদেশে একশত আশীটি বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হয়। তিন হাজার ভারতবাসীর একটি উপনিবেশও চীনদেশে গড়ে ওঠে। ভিক্ষু গুণবর্মার চেষ্টায় চীনদেশের শিল্পে এক নতুন রীতি প্রবর্তিত হয়। ভারতীয় জ্যোতিষ ও অংক শাস্ত্রের প্রভাবও ঐ দেশের শাস্ত্রে দেখা যায়। চীন থেকে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সভ্যতা সংস্কৃতিও একদিন এশিয়ার দূরতম প্রান্ত কোরিয়ায় পৌঁছে যায়। তবে বর্তমানে চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব নেই বললেই হয়।

জাপান ঃ কোরিয়ার জনৈক রাজা জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন। জাপানী শিল্পের পিছনে রয়েছে খোটান, কুচা ও "হাজার বুদ্ধের গুহায়" প্রাপ্ত শিল্পের প্রেরণা। আর "হাজার বুদ্ধের গুহা" শিল্পের রীতি তো অজন্তা

গুহার শিল্পের প্রেরণাতেই সৃষ্টি। অবশ্য জাপান আপন প্রতিভা বলে নিজস্ব শিল্পশৈলী গঠন করে নিয়েছে।

সপ্তম শতাব্দীতে জাপানের রাজধানী ছিল "নারানগরী"। নারায় বিভিন্ন মন্দির দেখলে মৃগদাবের (সারনাথ) কথা মনে পড়ে যায়। নারায় জাপানী মন্দিরের বুদ্ধমূর্তি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়মূর্তি। নারায় একদিন সংস্কৃত চর্চার বড় কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধধর্ম আজও জাপানে জীবন্ত।

তিব্বত ঃ চীন ও ভারতের মধ্যে তিব্বতের অবস্থান। সপ্তম শতাব্দী থেকে ভারতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠে। তিব্বতের রাজা গাম্পো নেপালের এক রাজকুমারী এবং চীনের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। দুই রাজকুমারীই ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁদেরই প্রভাবে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। বিখ্যাত ভারতীয় সন্ন্যাসী পদ্মসম্ভব তিব্বতে এসে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। পদ্মসম্ভবই তিব্বতে লামা প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। তিব্বত, খোটান মারফৎ ভারতীয় লিপি গ্রহণ করেছে। প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে তিব্বতে এসেছিলেন ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে। তের বৎসর ধরে পরিশ্রম করে তিব্বতের বৌদ্ধধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ভারতে মুসলমান আক্রমণে বহু মূল সংস্কৃত গ্রন্থের বিলোপ ঘটলেও তিব্বতে ঐসব গ্রন্থের অনুবাদ ও কোন কোন ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থটিও পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোষ' দিঙ্‌নাগের 'ন্যায়মুখ' ও শংকর স্বামীর 'ন্যায়প্রবেশ' উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধধর্মের যে দুটি তিব্বতী অনুদিত সংকলন গ্রন্থ আজও বিখ্যাত সে দুটির নাম তঞ্জুর ও কঞ্জুর।

ব্রহ্ম ঃ ভারতের পূর্বে ব্রহ্মদেশ। জনশ্রুতি এক ভারতীয় ক্ষত্রিয় বীর আসামের মধ্যদিয়ে ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হয়ে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। অশোক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য শোন ও উত্তর নামক দুই বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ব্রহ্মে প্রেরণ করেছিলেন। পঞ্চম শতকে বুদ্ধঘোষ নামে জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণ নিম্ন ব্রহ্মে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ব্রহ্মদেশে বর্ম্মন ও বিক্রম উপাধিধারী রাজারা রাজত্ব করতেন। বৌদ্ধ ধর্ম জনসাধারণের ধর্ম হলেও ব্রহ্মে হিন্দুধর্ম যে প্রচার লাভ করেছিল, তার প্রমাণ, তার মাটির তলা থেকে পাওয়া বহু হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহ। ব্রহ্মে পালি সাহিত্যের চর্চা হত। ব্রহ্মের লিপিও ভারতবর্ষ হতে গৃহীত। ব্রহ্মের শিল্প-ভাস্কর্যে বাংলার পাল শিল্পের ছাপ আছে। ব্রহ্মদেশের

বিভিন্ন অংশের প্রাচান কয়েকটি নাম বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়। কখনো বলা হয়েছে হংসাবতী কখনও বলা হয়েছে সুবর্ণভূমি কখনও বা শ্রীক্ষেত্র।

মহাভারতের দিগ্বিজয় পর্বে বম্মক ও শম্মক নামে দুটি জনপদের উল্লেখ আছে। অনেকে বলেন সেই বম্মকই বর্তমান বহ্ম আর শম্মক, শ্যাম।

শ্যাম ঃ শ্যাম দেশের আধুনিক নাম থাইল্যাণ্ড। থাই মানে স্বাধীন। ত্রয়োদশ শতকে থাই জাতি কর্তৃক শ্যামদেশ অধিকৃত হয়। কিন্তু তারও প্রায় হাজার বছর আগে শ্যামদেশের নাম ছিল দ্বারাবতী—রাজধানীর নাম অযোধ্যা। নাম দুটি মহাভারত ও রামায়ণ থেকে গৃহীত। দ্বারাবতী ছিল শ্রীকৃষ্ণের আর অযোধ্যা শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী। সেই সুপ্রাচীন কালে ভারতের সহিত শ্যামদেশের সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। শ্যামে একদিন সংস্কৃত চর্চা হ'ত। আধুনিক কালেও শিল্প সাহিত্যচর্চার জন্য একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেটির নাম 'রাজ পাণ্ডিত্য সভা'। শ্যামের অধিবাসীরা নিষ্ঠাবান হীনযানী বৌদ্ধ। তার শিল্পে ও ভাস্কর্যে, গুপ্ত ও পাল যুগের শিল্পের প্রভাব পড়েছে। এখানে প্রাপ্ত অনেক বৌদ্ধ মূর্তির সঙ্গে সারনাথ ও অজন্তা-গুহা মূর্তির বেশ মিল আছে। শ্যামের বর্ণমালা দক্ষিণ ভারতীয় কোন বর্ণমালা থেকেই উদ্ভূত। অধিবাসীদের নামও সংস্কৃত থেকে গৃহীত। সরকারী পদ বা পদবীর অনুবাদে শ্যামী ভাষাতে সংস্কৃতেরই ব্যবহার হয়। Railway এর district superintendent কে বলা হয় 'বর. রথচারণ প্রত্যক্ষ'। Irrigation officer কে 'বারিসীমাধ্যক্ষ' নামে অভিহিত করা হয়।

শ্যাম ধর্মে বৌদ্ধ হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে ভারতীয় মনুসংহিতার বিধান মেনে চলে। মস্তক মুণ্ডন করে, শিখা রাখে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের পূজা করে। বিগ্রহ পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকে। রাজার অভিষেক হয় হিন্দুরীতিতে। রাজা স্নান করেন পঞ্চ নদীর পবিত্র বারিতে। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করেন। শাঁখ বাজানো, ধূপধুনা পোড়ানো ও চামর ব্যজন করা হয়, এ ছাড়া আছে স্ত্রী আচার।

হিন্দু আমলের পূজা-পার্বনের মধ্যে শিবরাত্রির উৎসব এখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত। শ্যাম রাজ্যের রামযাত্রা প্রতি উৎসবের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এটি রামায়ণের কাহিনী নিয়ে রচিত। এটি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রামায়ণের অনুরূপ। তবে অভিনেতারা মুখোশ পরে অভিনয় করে। এদের কাছে রাম

দাস হনুমান ছিল একটি সাদা রঙের বানর আর জটায়ু একটা সাদা কাক। এরা রামায়ণকে বলে রামাকিয়েন (Ramakien)। শ্যামের জাতীয় সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব বর্তমান।

ভারত-সংস্কৃতি যে আজও শ্যাম রাজ্যে সজীব তা মহাকবি রবীন্দ্রনাথ নিজে দেখে উপলব্ধি করে কবিতায় বাণীবদ্ধ করেছেন—

সে ঘটনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব—
আজি আমি তারে দেখি লব
ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গন সীমা,
অর্ঘ দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি তব প্রাণ
তীর্থ জলে করি যাব স্নান
তোমার জীবন ধারা স্রোতে,
যে নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্য যুগ হতে
যে যুগের গিরি শৃঙ্গ পর
একদা উদিয়া ছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।

সিংহল : রামায়ণের রাবণরাজার দেশ লঙ্কার প্রাচীন নাম তাম্রপর্ণী। পরবর্তীকালে হয়েছে সিংহল। বাংলাদেশের এক রাজপুত্র বিজয়সিংহ, সুপটু বাঙালী কারিগরের তৈরী পাল তোলা জাহাজে করে লঙ্কায় গিয়ে সে দেশের রাজা হয়ে বসেন। তাঁর নামের উপাধি থেকেই লঙ্কার নাম হয় সিংহল। অনুরাধা পুরে ছিল বিজয়সিংহের রাজধানী। সম্রাট অশোক, তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যান বুদ্ধ গয়া থেকে বিখ্যাত বোধিবৃক্ষের একটি শাখা। এই বৃক্ষের তলায় বসে সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ পরম জ্ঞান বা বোধি লাভ করে হ'ন বুদ্ধ। সেই থেকে বৃক্ষটিও বোধিবৃক্ষ নামে সারা ভারতে হয় স্বীকৃত ও পূজিত। সংঘমিত্রা ও মহেন্দ্র এই বোধিবৃক্ষের শাখাটি রোপণ করেন অনুরাধাপুরে। কালক্রমে অনুরাধাপুর হয়ে ওঠে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার শ্রেষ্ঠকেন্দ্র এবং বোধিবৃক্ষ মাহাত্ম্যে পরম তীর্থও।

বহু শত বছর পরে বুদ্ধগয়ার মূল বোধিবৃক্ষটি বিশুষ্ক হয়ে বিলুপ্ত হলে—অনুরাধাপুর থেকে সংঘমিত্রা ও মহেন্দ্র রোপিত বোধিবৃক্ষের শাখা এনে বুদ্ধগয়ায় রোপণ করা হয়েছে।

সিংহলীরা ব্রহ্ম ও শ্যামবাসীদের মত হীনযানী বৌদ্ধ। এঁরা বৌদ্ধ মন্ত্র তন্ত্রের দিকে না ঝুঁকে—স্বয়ং বুদ্ধকেই আরাধ্য বলে গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধদেবের একটি দাঁত এঁরা অনেক আয়াস স্বীকার করে পুরীর জগন্নাথ মন্দির থেকে এনে কান্দিতে প্রতিষ্ঠা করে তার উপর মন্দির নির্মাণ করেছেন। সিংহলের প্রধান তীর্থ আজ কান্দির দন্ত মন্দির।

সিংহলের বর্তমান রাজধানী কলম্বোতে বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ পরিনির্বাণ মূর্ত্তি শায়িত অবস্থায় আছে। কুশী নগরীতে ভগবান বুদ্ধদেব যে অবস্থায় যে ভঙ্গিতে মাথার নিচে হাত রেখে শিষ্য আনন্দ প্রভৃতিকে উপদেশ দিতে দিতে মহানির্বাণ লাভ করেন সেই ভঙ্গিটিকে সম্রাট অশোক ভাস্কর্য শিল্পে রূপায়িত করে কুশী নগরীতে স্থাপন করেন। একথা ভারতবাসীরা ভুলেই গিয়েছিলেন। গত শতকে এক ইউরোপীয় পণ্ডিতের প্রচেষ্টায় নেপালের তরাই সংলগ্ন ঘন অরণ্যের মধ্যে কুশী নগরীর সন্ধান মিলেছে আর পাওয়া গেছে বুদ্ধের শায়িত সুবিশাল পরিনির্বাণ মূর্ত্তি টিকে। এরই অনুকরণে বোধকরি কলম্বোর পরিনির্বাণ মূর্ত্তিটির পরিকল্পনা। এমন বিরাট শায়িত মূর্ত্তি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

অনুরাধাপুরের পর কলিঙ্গপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে কলিঙ্গপুর বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 'লঙ্কাতিলক' বলে সিংহলের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মন্দিরটি কলিঙ্গপুরে অবস্থিত। কলিঙ্গপুরের শিব মন্দিরটিও বিখ্যাত। শৈবধর্ম ভারতবর্ষ থেকে সিংহলে প্রবেশ করেছিল। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবীভাব সিংহলে এনেছিলেন তামিলরা। আজও সিংহলে শিবের স্তবগান, মৃদঙ্গ কর্তালের আওয়াজ আর বৈষ্ণবী নৃত্য-কীর্তন স্মরণ করিয়ে দেয় সিংহলে হিন্দু ধর্ম প্রবল ভাবে বিদ্যমান। বর্তমান রাজধানী কলম্বো যেমন বৌদ্ধদের প্রধান কেন্দ্র তেমনি হিন্দুদের প্রধান স্থান জাফনা।

সিংহলের ভাস্কর্য্য শিল্পে অমরাবতী, পাল ও সেন শিল্পের প্রভাব বর্তমান। ভারতীয় ভাষার লিপি গৃহীত হয়েছে সিংহলী ভাষার লিপিরূপে। পালি-ভাষার প্রভাব পড়েছে সিংহলী ভাষার উপর। সিংহলে প্রচুর তামিল ভাষাভাষী ভারতীয় হিন্দুর বাস। রাজনৈতিক ভাবে ভারত থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও সিংহল ভারত বর্ষেরই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে।

মালয়ঃ মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণাংশের প্রাচীন নাম কটাহ দেশ। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে পেগু থেকে মালয় উপদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ এককালে সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে এখানে। দুর্গা, গণেশের মূর্তিরও দেখা মিলেছে। দুহাজার বছর আগেই এখানে হিন্দুরাজ্য গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে বৌদ্ধ ধর্মের লোক মালয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে শৈবগণও প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'কেডা' ও 'পেরাক' নামে দুটি শৈব ও বৌদ্ধ রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। মালয়ের পথেই চম্পা ও কম্বোজ রাজ্যের হিন্দু উপনিবেশকারীরা ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

দ্বাদশ শতকের শেষে ইসলামী আক্রমণে মূল ভারতবর্ষে হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতির বেগবান ধারাটি ক্ষীয়মাণ হলেও সাগর পারের বৃহত্তর দ্বীপময় ভারতে পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাণবন্ত ছিল তার প্রমাণ আছে। মূল উৎস বিশুষ্ক হওয়ায় বৃহত্তর ভারতে সজীব ভারতীয় চিন্তার স্রোত ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে শেষে একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়। ইসলাম ধর্ম দ্বীপময় ভারতকে প্লাবিত করলেও ইন্দোনেশিয়ার শান্তিপ্রিয় অধিবাসীরা আজও ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ।

তবে মধ্য-এশিয়ার তুর্কিস্থানের রুক্ষ প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষরা তাদের পূর্বকথা নিঃশব্দে ভুলেছে। মরু বালুর নিচে তাদের পূর্ব পুরুষদের ঐশ্বর্য্যময় অতীত ঢাকা পড়ে আছে।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে এ কথা আজ স্পষ্ট যে সভ্যতার সেই ঊষা লগ্নে যখন আজকের দর্পী ইউরোপ, আমেরিকার মানুষেরা বর্বর আরণ্যক জীবন যাপন করছে তখন পূর্ব ইউরোপের গ্রাস থেকে এশিয়া মাইনর হয়ে জাপান, চীন ও দক্ষিণ পূর্বএশিয়া পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশিয়, মেলিনেশিয় দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির বাণী বহন করে হিন্দু আচার্য্য, বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ, অর্হৎএর দল পরিভ্রমণ করেছেন।

তারপর কত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ শতাব্দীতে ভারত-সংস্কৃতির দীপ অনুজ্জ্বল ম্রিয়মান হয়েছে কিন্তু একেবারে নেভেনি। এসেছে তুর্কি, পাঠান, মোঘল। নিষ্ঠুর হাতে ভেঙেছে হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ মঠ। নালন্দা, বিক্রমশীলার জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলি অগ্নিসাৎ হয়েছে। হিন্দু ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি নিপীড়িত হয়েছে কিন্তু নিঃশেষ হয়নি। পশ্চিম ভারতে নানক, পূর্ব ভারতে চৈতন্য আর মধ্য-দক্ষিণ ভারতে কবীর, দাদু প্রভৃতি সাধক অতন্দ্র ত্যাগ তপস্যায় সেই প্রাণশক্তিকে রক্ষা করেছেন। তারপর পলাশী প্রান্তরে হল ইতিহাসের পালাবদল। এল দূর সাগর পারের দেশের বণিক ইংরেজ। তাদের ভাষার আধারে এল পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-সাধনা। সেই সাধনার আলোয় ঝকমক্ করে উঠলো প্রাচীন ভারতের লুকায়িত গুপ্তধন।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় নূতন ভারতবর্ষের প্রভাত হল। বেদান্তের দিব্যবাণী নিয়ে নবীন ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক দূত বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যেদিন দূর আমেরিকার বিশ্ব-ধর্মসভায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন সেদিন থেকে আবার স্বরু হয়েছে চিরপ্রাচীন চিরনবীন ভারতবর্ষের নতুন সাংস্কৃতিক অভিযান।

অতীত ভারতের সুমহান বাণীবহদের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেন আমরা বিস্মৃত না হই। এঁরা বহির্ভারতে বহন করে নিয়ে গেছেন উপনিষদের সঞ্জীবনী বাণী, বিগ্রহ উপাসনার কল্যাণাদর্শ, ভগবান তথাগতের সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার শাশ্বত মন্ত্র। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারত তার বীর্যদীপ্ত প্রেমের আদর্শের বলে বলীয়ান। এই মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শের দ্বারাই ভারত সারা বিশ্বে আধ্যাত্মিক দিগ্বিজয় করেছে, করছে ও করবে।

ভারতের প্রেম, প্রীতি কল্যাণ ও মৈত্রীর বাণীতে একদিন সারা পৃথিবীর চিত্তের ঘুম ভেঙে ছিল। তারা সাদর আমন্ত্রণে বরণ করেছিল সনাতন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক কল্যাণাদর্শের মহাবাণীকে। কাস্পিয়ান তীরভূমি হতে সুদূর আমেরিকার গুয়াতেমালা পর্যন্ত, ভারত-চিন্তার মেল-বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল। অর্ধ-এশিয়া আনত হয়ে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়েছিল সুমহান ভারত-সংস্কৃতির উদ্দেশ্যে। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক মিথ্যা সীমা বন্ধন অস্বীকার করে বৃহৎ ভারতের মুক্ত বাতায়ন হতে উচ্চারিত হয়েছিল 'মা হিংসী'। হিংসা করো না, ভালবাস। বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে

পৃথিবীর দেশে দেশে কত মহাপ্রাণই না এই মহাদর্শ রক্ষায় আত্মনিবেদন করে সারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের প্রাণের যোগকে দৃঢ় করেছেন। সনাতন ভারতবর্ষের আদর্শ অনুসরণের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর ভারতের আত্মিক রাখিবন্ধন দূর অতীত কাল হতে সংশয় বিক্ষুব্ধ বর্তমান পার হয়ে আগামী বহু শতাব্দীর ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত।

———— ॰ ————

ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম

ভারত সংস্কৃতিতে ধর্ম ও দর্শনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক :

ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সম্পদ তার আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ধর্ম ও দর্শন দুইই অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করে আলোচনা করা দুরূহ কেননা এদেশে এই দুটি পরস্পরের পরিপূরকরূপে গড়ে উঠেছে।

শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ধ্যান-ভক্তি-পূজা-অনুষ্ঠান এসবের দ্বারা ঈশ্বর বা আত্মাকে অনুভব করাকে আমরা সাধারণভাবে বলি ধর্ম আর যুক্তি বিচার দ্বারা চরম সত্যকে বুঝবার কাজকে বলি 'দর্শন'। ঈশ্বর আছেন কিনা? মানুষের আসল স্বরূপ কি? সে কি শুধু এই শরীর মনের সমষ্টি অথবা আরও কিছু? মৃত্যুর পর তার কি হয়? জগত কোথা থেকে হল? এসব প্রশ্ন দর্শনের প্রশ্ন। সাধারণ মানুষ কঠিন যুক্তিবিচারের ধার বড় একটা ধারে না। তাই সব দেশে সহজসাধ্য আচার-অনুষ্ঠানমূলক ধর্মই আগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দর্শনশাস্ত্র পরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ভারতীয় সভ্যতার আদিকালে হয়ত সে ভাবেই ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল। তবে ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে ধর্মের প্রায় সমকালে অথবা অতি অল্পকাল পরেই দর্শনের অপূর্ব বিকাশ ভারতের মাটিতে সম্ভব হয়েছিল। একদিকে আচার অনুষ্ঠান-পূজা উপাসনা অন্যদিকে দার্শনিক যুক্তি বিচার—দুই-ই প্রাচীন ভারতে গড়ে উঠেছে। ভারতের পক্ষে এটি কম গৌরবের বিষয় নয়।

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের যুগ যুগব্যাপী সজীবতা : তার কারণ :
(ক) ভারতে ধর্মীয় নেতা ও দার্শনিকগণের যুগে যুগে আবির্ভাব।

বার বার বৈদেশিক আক্রমণ, পরাধীনতার নিপীড়ন, জড়বাদ-ভোগবাদের সম্মোহনী প্রলোভন সত্বেও ভারতের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির ধারাটি সুপ্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি প্রবহমান রয়েছে। এর একটা বিশেষ কারণ ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের প্রবর্তক ও বাহক যাঁরা তাঁরা কেবলমাত্র এসব বিষয়ে অধ্যয়ন-আলোচনা করেই ক্ষান্ত হন নি; নিজ নিজ জীবনে ঐ বিষয়ের তত্ত্বগুলি অনুভব করে এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে এগুলি তাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন। 'দর্শন' কথার মানে 'দেখা'। ভারতীয় 'দর্শন' চরম সত্যকে, বড় বড়

তত্ত্বকে 'দর্শন' করিয়ে দেয়, দেখিয়ে দেয়; চোখে দেখার মত প্রত্যক্ষ অনুভূতি করিয়ে দেয়, শুধু বুদ্ধিগম্য করিয়ে ক্ষান্ত হয় না। ধর্ম কথার মানে যা মানুষের মনকে, তার সমাজকে, সংস্কৃতিকে একটা বিশেষ স্তরে, মনুষ্যত্বের স্তরে ধারণ করে রাখে তার নীচে অর্থাৎ পশুত্বের স্তরে নামতে দেয় না বরং পরবর্তী ঊর্ধ্বস্তরে, দেবত্বের স্তরে উন্নীত করে। পরম সত্যের উপর বিশ্বাস ও তাঁর অনুভূতিই মানব-সমাজকে ঐভাবে ধরে রাখতে সক্ষম। তাই এই পরম সত্যানুভূতিই ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন উভয়ের প্রাণ। ভারতীয় ধার্মিকের মত ভারতীয় দার্শনিকও মনে করেন শুধু পঠনপাঠন, যুক্তিবিচার যথেষ্ট নয়। সত্য-সংযম, ত্যাগ-পবিত্রতার ভিত্তিতে জীবন-যাপন, সেবা-পরোপকার, ধ্যান উপাসনার নিত্য অভ্যাস ভারতবর্ষে দর্শন চর্চ্চার, তথা ধর্ম চর্চ্চার অপরিহার্য অঙ্গ।

ভারতে আধ্যাত্মিকতার স্রোত কখনও যে মলিন, সংকীর্ণ, জড়তাযুক্ত হয়নি একথা অবশ্য বলা যায় না। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে ভারতে প্রায় প্রতি যুগে, প্রতি শতাব্দীতে এমন উচ্চ আধ্যাত্মিক-প্রতিভা-সম্পন্ন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা নিজ নিজ সাধনা ও শিক্ষার দ্বারা সে রুদ্ধপ্রায় স্রোত-প্রবাহকে নির্মল ও বেগবান করে দিয়েছেন। সুদূর অতীতে মহাজ্ঞানী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, মহীয়সী মৈত্রেয়ী, রাজর্ষি জনক, নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র, গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ, ত্যাগবীর বুদ্ধ, মহাতাপস মহাবীর প্রভৃতি অসাধারণ আধ্যাত্মিক মনীষা-সম্পন্ন ধর্মবীরদের সন্ধান যেমন পাই তেমন ভাবেই পাই পরবর্তী যুগে অসংখ্য সাধু-সন্ত ফকির-দরবেশের সান্নিধ্য। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আচার্য শংকর, আচার্য রামানুজ, শ্রীচৈতন্যদেব, মীরাবাই, রামদাস, তুকারাম, নামদেব, নানক, কবীর, দাদু, রামপ্রসাদ, আরও কত প্রাতঃস্মরণীয় পূতচরিত্র মহাত্মা। আধুনিককালে ত্রৈলঙ্গস্বামী, পওহারী বাবা, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমা সারদাদেবী, ঋষি অরবিন্দ, রমন মহর্ষি প্রমুখদের মধ্যে ভারতীয় সাধকদের ধারা যে অক্ষুন্নভাবে প্রবাহিত তা কে অস্বীকার করবে? অতীতকালে যেমন মহামুনি কপিল, ঈশ্বরকৃষ্ণ, কণাদ, গৌতম, পতঞ্জলি, ব্যাসদেব, জৈমিনি এইসব বিস্ময়কর দার্শনিক প্রতিভায় ভারতের সারস্বত-আকাশ ভাস্বর হয়েছিল পরবর্তীকালে তেমনি কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, বল্লভাচার্য, মধুসূদন সরস্বতী, বিদ্যারণ্যমুনি প্রভৃতি প্রতিভাধর সাধক-দার্শনিকদের আবির্ভাবে সে দ্যুতি অম্লান থেকে গেছে। আধুনিককালে

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, ঋষি অরবিন্দ প্রভৃতি মনীষীদের মধ্যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার অস্তিত্ব ও যুগোপযোগী পরিপুষ্টি সমগ্র বিশ্বের বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

(খ) অন্য কারণ--ধর্ম ও দর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বস্তরে ব্যাপ্ত, ভারতীয় জনজীবনের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা (সাধারণ ভাবে যার শুধু ধর্ম নামেই পরিচয় দেওয়া হয়) সম্বন্ধে আমাদের ভালভাবে এটা জানা দরকার যে এদেশের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সব কিছুর সঙ্গে ধর্ম ওত-প্রোতভাবে মিশে আছে। ধর্মীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্রই সুপরিস্ফুট। অন্যদেশে, অন্য সমাজে ধনকুবের যাঁরা অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতাবান যাঁরা তাঁরাই সমাজে সব চেয়ে বেশী সম্মান পান। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা ও সম্মান পান যাঁরা তাঁরা হলেন বড় বড় ধর্মবীর।* এদেশের লোক আপনাকে বড় বলে জাহির করতে চাইলে কোনও সর্বত্যাগী, ঈশ্বরপরায়ণ মুনিঋষির বংশধর বলে নিজের পরিচয় দেয়। অন্যদেশের মানুষ নিজেকে কোনও "নাইট্" বা "ব্যারণ" বা "লর্ড" বা "রাজামহারাজের" বংশধর বলে পরিচয় দিতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। এ থেকেই বোঝা যায় কোন্ আদর্শ ভারতীয় সাধারণের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট। আবার এটাও লক্ষ্যণীয় যে ভৌগোলিক-ভাবে ভারতের কোনও বিশেষ অংশ, বিশেষ প্রদেশ যে শুধু ভারতীয় ধর্মবীরদের জন্ম দিয়েছে তা নয়। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর, আসাম থেকে গুজরাট, আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে রয়েছে এসব ধর্মনেতার আবির্ভাবস্থল। ভারতের অধ্যাত্মসংস্কৃতির গঠনে ভারতের প্রত্যেকটা অংশের যথেষ্ট দান রয়েছে। ভারতের প্রত্যেকটা প্রদেশই এজন্য গর্ব অনুভব করতে পারে।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে পৃথিবীর সব সভ্য সমাজেই ধর্ম ও দর্শনের একটা ভূমিকা আছে। ভারতবর্ষে যে সব ধর্মীয় বা দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হয়েছে তার সব না হলেও অনেক কিছু অন্য দেশের মানুষ, স্বাধীনভাবে অথবা

* এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: স্বামী বিবেকানন্দের: "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", রবীন্দ্রনাথের "শান্তিনিকেতন", "বিশ্ববোধ" প্রবন্ধ এবং ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের History of Indian Philosophy.

ভারতসংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, চিন্তা করেছে। ভারতের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ঐসব মহান্, গম্ভীর চিন্তার সে উদ্ভাবক বলে শুধু নয়—এ বিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে, যে ঐসব চিন্তাভাবনাকে ভারতীয় সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনার সঙ্গে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার মধ্যে, মিশিয়ে এক করে দিতে পেরেছে। এ কথা মনে করলে মারাত্মক ভুল করা হবে যে মুষ্টিমেয় মুনি-ঋষি দার্শনিক মানুষের অন্তর্জীবন সম্বন্ধে সাধনা গবেষণার দ্বারা যা কিছু আবিষ্কার করেছিলেন তা তাঁদেরই মানস-লোকে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। বস্তুতঃ পক্ষে ভারতবর্ষ তার ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা-সম্পদকে এমন সহজ-সরল-অনাড়ম্বর ভাবে সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে গ্রথিত করেছে যার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের ইতিহাসে নাই।* ভারতবর্ষের লোকের মত অন্য কোনও দেশের সাধারণ মানুষ এত অন্তরঙ্গভাবে ধর্মকে প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ করে না। কেবলমাত্র তাই নয়, ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাদের ধারণা প্রায়ই অস্পষ্ট ও ভাসা ভাসা রকমের। অপরপক্ষে ভারতের চাষী, মজুর, মুচি, মেথর প্রভৃতি সাধারণ মানুষ অধিকাংশ স্থলে নিরক্ষর হতে পারে, জাগতিক নানা বিষয়ে তার অজ্ঞতার বহর দেখে আমরা হতাশ বোধ করতে পারি কিন্তু যদি তাকে ঈশ্বর, আত্মা, পুনর্জন্ম ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তবে অনেক সময় তার থেকে এমন সব চমকপ্রদ উত্তর পাওয়া যাবে যার দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষও যথেষ্ট উপকৃত হতে পারবেন।* কিন্তু শুধু উত্তর দেওয়াটা বড় কথা নয়—বড় কথা এই যে, সে উত্তর দেয় অকপট বিশ্বাস থেকে এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে সে তার দৈনন্দিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে।

ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, শিখ-জৈন,বৌদ্ধ-খৃষ্টান, পার্শী-আদিবাসী নানা ধর্মমতের লোক আছে। আচার-অনুষ্ঠানে তাদের প্রভেদও প্রচুর। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও তারা সকলে এ বিষয়ে এক যে তাদের সকলের মতে ভোগসুখটাই জীবনের চরম কাম্য নয়, চরম কাম্য নিজের ধর্মজীবনকে বা আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিপূর্ণ বিকশিত করা। ভারতবাসীর ধর্ম ও দর্শন শুধু বিশেষ বিশেষ পূজাপার্বন, বা উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে অথবা মন্দিরে যাবার

* এই প্রসঙ্গে বোম্বের ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত Indian Inheritance Vol. II পুস্তকে ঋষি অরবিন্দ লিখিত 'The Unity of Indian Religion' শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

* স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত—ভারতে বিবেকানন্দ (উদ্বোধন প্রকাশিত) পৃষ্ঠা ১২ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম ও দর্শনকে প্রতিপদক্ষেপে অনুসরণ করা তার সর্বক্ষণের চেষ্টা। সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক যতক্ষণ সে না হয়, অশেষ বিত্তশালী হয়েও ততক্ষণ সে মনে করে—জীবন তার অপূর্ণ। "যা দিয়ে অমৃতত্ব লাভ হবে না—তা দিয়ে আমার কি হবে ?" "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ ?"—উপনিষদের মহীয়সী মহিলা মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে এই যে কথা একদা ধ্বনিত হয়েছিল—তা ভারতবাসীরই অন্তরের কথা।

ভারতের সামগ্রিক জাগরণ—আধ্যাত্মিক জাগরণের উপর কতখানি নির্ভরশীল এবিষয়ে ইতিহাসের প্রমাণ।

আধ্যাত্মিক জাগরণের উপর ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নতি কতখানি নির্ভরশীল ভারতের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে তা বোঝা যায়। দেখা যায় যখনই ভারতে বা ভারতের কোনও অংশবিশেষে ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলন (যার মধ্যে দার্শনিক-মতবাদের সংস্কার অবিচ্ছিন্ন ভাবেই যুক্ত) প্রবল হয়েছে, বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার স্রোত যখনই সমাজে প্রবাহিত হয়েছে, তখনই ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য অঙ্গগুলি—ভাষা-সাহিত্য, শিল্প-ভাস্কর্য,. রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা, শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন—পরিপুষ্টি লাভ করেছে। বুদ্ধদেব ও মহাবীরের ধর্ম-প্রচারের ফলে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার এবং পৌরোহিত্যের পীড়নমুক্ত সামাজিক সুবিচার ও সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটেছিল। আবার সেই বৌদ্ধধর্ম যখন বীভৎস আচারঅনুষ্ঠানে লিপ্ত হল তখন দার্শনিক-শিরোমণি শংকরাচার্য হিন্দুধর্মের পুনঃসংস্কার করলেন। এর পরই দক্ষিণ-ভারতে সুঙ্গ, কণ্ব, প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী হিন্দুরাষ্ট্রের উত্থান হয়েছিল। তুকারাম, রামদাস স্বামী প্রভৃতি মারাঠাদেশীয় সাধুসন্তদের দ্বারা জনগণের ধর্মীয় চেতনা যখন বিকশিত হল তখন তাদের মনুষ্যত্ব চেতনাও স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হল। সেইজন্যই শিবাজী অমন শক্তিশালী মারাঠা-সাম্রাজ্যের পত্তন করতে পেরেছিলেন। গুরুনানক ও অন্যান্য শিখগুরুদের প্রচারের ফলে নবীন-ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত বীরহৃদয় শিখদের দ্বারা একটা রাজ্য গঠন সম্ভব হয়েছিল। দক্ষিণভারতে পল্লব, পাণ্ড্য, চোল, চালুক্য প্রভৃতি স্বাধীন হিন্দু-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ছিল—আপ্পায়ার স্বামী, সুন্দরমূর্তি, সম্বন্ধর, মানিক্যবাসকর প্রভৃতি শৈবাচার্য এবং রামানুজাচার্য, তিরুমঙ্গল, তিরুপ্পন-আলোয়ার প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যদের প্রবর্তিত ধর্ম আন্দোলন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের ভোগবাদ-জড়বাদ-সর্বস্ব শিক্ষাসভ্যতায় মোহগ্রস্ত

ভারতবাসী আমরা আমাদের ধর্ম-দর্শনকে জলাঞ্জলি দিতে বসেছিলাম, এমন সময় রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁদের সহকর্মীদের ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন, পশ্চিম ভারতে দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ আন্দোলন, মহারাষ্ট্র অঞ্চলে প্রার্থনা সমাজ-আন্দোলন, সর্বশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীবিবেকানন্দের সামগ্রিকভাবে হিন্দুধর্মজাগরণ দ্বারা যখন আমাদের ধর্ম ও মনুষ্যত্ব-চেতনা মালিন্যমুক্ত হয়ে বলিষ্ঠ আকারে প্রকাশ পেল অমনি সুরু হল ভারতের সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, সমাজসংস্কারে এবং রাজনীতিতে নবজাগবণের প্রথম অধ্যায়।

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের একটী অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা

উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা ভাবতীয় ধর্ম তথা দর্শনের একটা নিজস্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষে নানা ধর্মাবলম্বীদের বাস। "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন। শক, হুন, দল, পাঠান, মোগল, একদেহে হল লীন।" হিন্দুদের মধ্যে আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য নানা শাখা-প্রশাখা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আচার-অনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতিতে পার্থক্যও প্রচুর। তা সত্ত্বেও স্মরণাতীত কাল থেকে এইসব সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করে আসছেন ভারতের মাটিতে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে। যুগে যুগে যাঁরা বাইরের থেকে এসেছেন, দিগ্বিজয়ী হয়ে এসেছেন, তাঁরাও ভারতে এসে আগেব ধর্মমত ও ধর্মাবলম্বীদের নস্যাৎ করেন নাই বা করতে পারেন নাই। এর কারণ, ভারতের ধর্মের মধ্যেই এই পরমত সহিষ্ণুতার বীজ নিহিত। অবশ্য এই বীজের উৎসস্থল হল হিন্দুধর্ম বা সনাতন বৈদিক ধর্ম। সেই উৎসস্থল থেকে পরমত ও সহিষ্ণুতা ভাবতে নবাগত ধর্মেও সঞ্চারিত হয়েছে। মানব সভ্যতার শৈশবকালে যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ধর্মে ধর্মে হানাহানি চলেছে; তোমার দেবতা বড় না আমার দেবতা বড় এই নিয়ে বাদবিসম্বাদ, যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত হচ্ছে সেই কালে আমরা দেখতে পাই ভারতের ঋষিকণ্ঠ সিন্ধুনদীতটে বিশ্ববাসীকে উদাত্তস্বরে ঘোষণা করছেন—একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি (ঋগ্বেদ)। সত্য এক, বিপ্রগণ তাকে বহুভাবে বর্ননা করেন। তারা বল্লেন—ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি নামে নানাভাবে আমরা এক সত্যেরই উপাসনা করি। পরবর্তীকালে বৈদিক দেবতা

ছাড়া আরো কত দেবতা, ঈশ্বরের আরো কত রূপের উপাসনা পদ্ধতি ভারতে প্রবেশলাভ করেছে। ভারত তাদেরও ঈশ্বরের নিকট যাবার বিভিন্ন পথ বলে গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষ জানে—ঈশ্বর এক, তাঁর অসংখ্য নাম, অসংখ্য প্রকাশ, অসংখ্য রূপ। তাই সে বলে না—একটা ধর্মই ঠিক, অন্য ধর্ম ভুল। আল্লা, গড্, কালী, কৃষ্ণ শিব, দুর্গা, ব্রহ্ম যে নামে, যেভাবে আমরা উপাসনা করি না কেন, আন্তরিক হলে সব পথ দিয়ে সেই এক ভগবানের কাছে পৌছব। রামকৃষ্ণদেব যেমন বলেছেন—পুকুরের একঘাটে হিন্দুরা কলস করে জল নিচ্ছে বলছে 'জল' বা বারি। একই পুকুরের অন্যঘাটে মুসলমানরা বদনা করে জল নিচ্ছে বলেছে—'পানি'। তৃতীয়ঘাটে খৃষ্টানরা অন্যরূপ পাত্রে জল নিচ্ছে বলছে 'ওয়াটার'। একই জল কিন্তু তার বহুনাম এবং যে পাত্রে জল নেওয়া হচ্ছে সে পাত্রের আকার অনুযায়ী ভিন্ন আকার ও বটে। রামকৃষ্ণদেব তাই যে বলেছেন 'যত মত তত পথ' এটা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের একটা প্রধান কথা কিন্তু নূতন কথা নয়। ঋগ্বেদে যে উদার মতবাদ আমরা লক্ষ্য করেছি রামকৃষ্ণদেবের বাণী সেই মতেরই পুনর্ঘোষণা তাঁর নিজস্ব অনুভবের ভিত্তিতে। এই মতবাদ বৈদিক সভ্যতার পরবর্তীকালে যুগে যুগে নানা ভাষায়, নানা ছন্দে ভারতবর্ষে গীত হয়েছে। অবশেষে ভারতবাসীর রক্তে মজ্জায় তা মিশে গেছে। সাধক কবি পুষ্পদন্ত বলছেন, 'বহু নদ নদী যেমন নানা স্থানে জন্ম নেয়, সরলবক্র নানা পথ ধরে চলে, কিন্তু পরিশেষে এক সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয় তেমনি, হে ঈশ্বর, মানুষ তার বিভিন্ন রুচি অনুসারে নানাধর্ম অনুসরণ করে কিন্তু পরিণামে তোমাতেই মিলিত হয়।' কবীর বলছেন—লোকে বলে' 'পূর্বদিকে হরির বাসা আর পশ্চিমদিকে আল্লার মোকাম।' কিন্তু অন্তরের খোঁজ কর সেখানে রাম রহিম উভয়েই বিরাজ করছেন। যে সব ধর্ম ভারতের বাইরে থাকবার সময় উগ্রপন্থী ছিল, পরধর্মে বিদ্বেষ যার মধ্যে উৎকট ছিল ভারতে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে, ভারতের ধর্মীয়ও সামাজিক আবহাওয়ার গুণে সে সব ধর্মও ক্রমে ক্রমে পরমত সহিষ্ণুতার পোষক হয়ে গেছে। যা ছিল আগে হিন্দু ধর্মের বিশেষত্ব তা ধীরে ধীরে ভারতীয় ধর্মসমূহের বিশেষত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য ভারতে ধর্মের নামে বাদবিসম্বাদ, ঈর্ষাদ্বেষ যে একেবারে হয়নি বা হচ্ছে না তা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু অন্যদেশের তুলনায় যা হয়েছে তা নগণ্য। আর তা ছাড়া পরমত শ্রদ্ধার আদর্শকে যুগে যুগে সাধক ও সমাজসেবকরা অনুশীলন এবং প্রচার করার ফলে

পরধর্ম বিদ্বেষের কৃষ্ণমেঘ কখনই সমাজে স্থায়ী বা প্রবলাকার হতে পারে নাই।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মও ধর্মসম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অন্য নিবন্ধে আলোচনা হয়েছে। কাজেই এদেশের ধর্ম ও দর্শনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি জানার পর এখন আমরা ভারতীয় দর্শন, তার বিশেষত্ব ও শাখা প্রশাখা সম্বন্ধে কিছু আলোচনার চেষ্টা করব।

ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ (direct) অনুভূতি। উপায় —ব্রহ্মচর্যপরায়ণ নৈতিক জীবন ও যুক্তিবিচার।

'প্রশ্ন' উপনিষদে এক 'পিপ্পলাদ' ঋষির আখ্যায়িকা. রয়েছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ছয় জন শ্রদ্ধাবান শিক্ষার্থী এই ঋষির কাছে উপনীত হয়েছিলেন। ঋষি তাঁদের সদ্বংশজাত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ জেনেও বল্লেন—তোমরা সংযত-পবিত্র হয়ে আরও একবছর ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন কর। তারপর ব্রহ্মের কথা যা জানি তোমাদের বলব। ভারতীয় দার্শনিকদের সর্বসম্মত সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে নৈতিক জীবনের বুনিয়াদ মজবুত না হলে দার্শনিক তত্ত্বের ধারণা ও উপলব্ধি অসম্ভব।

ধর্মচর্চার প্রায় সমকালে প্রাচীন ভারতে দার্শনিকচচার আরম্ভ হয় এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। কেবল পূজাপার্বন নয়, এখনকার দিনে যেমন নানাবিষয়ে বিতর্কসভা, সেমিনার প্রভৃতি বিদ্বৎ-সভা আয়োজিত হয় সুদূর প্রাচান ভারতে ও অন্ততঃ দার্শনিক তত্ত্বের সেরূপ আলোচনা-সভা বেশ জমকালোভাবেই অনুষ্ঠিত হত। বৃহদ্-আরণ্যক উপনিষদ বলছেন—রাজর্ষি জনক তার যজ্ঞের অঙ্গহিসাবে এরূপ একটি বিরাট সভা আহ্বান করেছেন। শত শত দার্শনিক ঋষিদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন ব্রহ্মবিচারের জন্য। ঘোষনা করেছেন যোগ্যতম ব্রহ্মিষ্ঠ ঋষিকে উপহার দেবেন এক হাজার গাভী যে গাভীর প্রত্যেকটীর শৃঙ্গে বাঁধা ছিল দশটি স্বর্ণ খণ্ড। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য শেষ পর্যন্ত এই উপহার লাভ করেছিলেন। অতীত কাল থেকে ভারতে দার্শনিক বিচার কত সমাদর পেয়ে আসছে এ ঘটনা তার একটি নিদর্শন।

জ্ঞানের প্রত্যক্ষ-অনুভূতি দ্বারা সকল দুঃখকে অতিক্রম করতে হবে—ভারতীয় দর্শন সমূহের সিদ্ধান্ত।

ভারতীয় দর্শন ভারতীয় জীবনের সাথে যে মিশতে পেরেছে তার একটা কারণ, এই দর্শন মানুষের জীবনের একটা সার্বজনীন প্রয়োজন মেটায়। এই

প্রয়োজনটী হলো—দুঃখনিবৃত্তি। মানুষ মাত্রেই আনন্দ চায়, সকল দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। ভারতীয় দর্শন বলেন আমাদের সকল দুঃখের কারণ হলো অজ্ঞান। অজ্ঞান দূর হলে, চরমসত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হলে শুধু যে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি হবে তা নয় আমরা এমন একটা নির্ভয় মানসিক অবস্থার সন্ধান অন্তরের মধ্যে প্রাপ্ত হবো যার ফলে জগতের তীব্রতম দুঃখ ও আমাদের ব্যথিত করতে পারবে না। দুঃখ-নিবৃত্তি বলতে এই বুঝায় না যে জরা, বার্ধক্য, রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এগুলিকে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান নির্মূল করে দেবে। ভারতীয় দর্শন মোটামুটী ভাবে এটাই বুঝাতে চেয়েছে যে দুঃখ আমাদের শরীর-মনে। তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হলে আমরা সুস্পষ্ট বুঝতে পারব আমরা শরীর মন থেকে আলাদা। তত্ত্বজ্ঞান-প্রাপ্তির এই অবস্থাকে ভারতীয় দর্শনের নানা শাখা নানা নাম দিয়েছেন—মুক্তি, কৈবল্য, ঈশ্বরলাভ, নির্বাণ ইত্যাদি। শরীর থেকে, মন থেকে নিজেদের পৃথক বলে ধারনা হলে আমরা আর দেহমনের ক্ষয়বৃদ্ধিতে দুঃখিত, বিচলিত হব না, ঠিক এখন যেমন ভাবে আমার গায়ের পোষাক জীর্ণ, ছিন্ন হলে আমি মুসড়ে পড়ি না। কেন না আমি নিশ্চিত জানি যে আমি আলাদা, আমার পোষাক আলাদা। দেহমন হলো আমার (আত্মার) পোষাক।

ভারতীয় দর্শন হতাশাবাদীর দর্শন নয়। দুঃখের সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা থাকায় কোনও কোনও মহলে একসময় ভারতীয় দর্শনকে দুঃখবাদী বা হতাশাবাদী দর্শন বলে মনে করা হত। এ ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। জীবন দুঃখময়, এ দুঃখের শেষ হবে না—এমন হতাশার কথা ভারতের কোনও দর্শন শাখা বলে না। জীবনে দুঃখ আছে একথা স্বীকার করেও ভারতীয় দর্শন বরং এই নিশ্চিত আশা, এই পরম আশ্বাস মানুষকে দিচ্ছে যে সকল দুঃখের কারণ অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর করে সমস্ত রকমের দুঃখকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করা যাবেই যাবে। প্রয়োজন শুধু সঠিকপথে চলার অবিরাম, আন্তরিক চেষ্টা।

ভারতীয় দর্শনে সূক্ষ্ম যুক্তিবিচারের স্থান ও তার বিশালতা।

অতীন্দ্রিয় সত্যকে দর্শন করা ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য। তাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি বা দার্শনিকের বাক্যকে ভারতীয় দর্শন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেন, এবং এগুলিকে বলেন 'শাব্দ' প্রমাণ। কেউ কেউ বৈদিক ঋষিদের চরম সত্য বিষয়ক বাক্যকে বলেন শাব্দ প্রমাণ, কেউ কেউ বুদ্ধদেব, মহাবীর প্রভৃতিদের বাক্যকেও শাব্দপ্রমাণ বলেন। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষদের বাক্যকে

প্রমাণ বলে গ্রহণ করলেও ভারতীয় দর্শনে যুক্তিবিচারের স্থান কিছু তুচ্ছ নয়। ভারতীয় দার্শনিক কখনও মনে করেন না যে তাঁদের স্বীকৃত বেদ, উপনিষদ্ বা বুদ্ধবাণী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি যুক্তিবিরোধী। বিনা যুক্তিবিচারে কোনও দর্শন-শাখাই নিজ নিজ আপ্তপুরুষের—(আপ্ ধাতু পাওয়া, আপ্ত অর্থাৎ যারা সত্যকে পেয়েছেন)—বাক্য গ্রহণ করেন না। তাই 'শাব্দ' প্রমাণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও চুল-চেরা বিচার সম্বলিত বিশাল দর্শন-সৌধ ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে। আর একটা কথা, ভারতীয় দর্শনে বহু শাখা আছে। যখন একটা শাখা নিজমত প্রতিষ্ঠা করতে চায় তখন অন্যশাখার মত তাকে খণ্ডন (refute) করতে হয়। খণ্ডিত মতাবলম্বীরা হয়ত বা কয়েক বছর পরে খণ্ডনকারীর মতকে কেটে দেন। এই ধরণের কাটাকাটি, বাদানুবাদ ও পারস্পরিক আলোচনার ফলে ভারতীয় দর্শনে সূক্ষ্মযুক্তিতর্কের যে বিশাল সমারোহ দেখা যায় তা যে কোনও দেশের বুদ্ধিজীবীদের শ্লাঘার বস্তু। এক সময় ছিল যখন ভারতীয় ধর্মদর্শন বলতে ইংরাজীশিক্ষিতদের বেদ উপনিষদ গীতার কিছু কিছু ইংরাজী অনুবাদ, তাও অনেকক্ষেত্রে ভুল অনুবাদ—ছাড়া অন্যকিছুর সন্ধান রাখতেন না। কেন না অন্যান্য ধর্ম দর্শন গ্রন্থ তখন ইংরাজীতে অনূদিত ছিল না। বেদ-উপনিষদ্-গীতা ভারতীয় দর্শনের উৎসভূমি হলেও এগুলি অনুপ্রেরণাময় কাব্যিক ভাষায় লেখা —ঠিক দার্শনিক পদ্ধতিতে রচিত নয়। এগুলিকে ভিত্তি করে উত্তরকালেই ভারতবর্ষে বহু-শাখান্বিত, বিচার-বহুল মনোমুগ্ধকর দর্শনবৃক্ষ গড়ে উঠেছে। কিন্তু সে বৃক্ষের পরিচয় লাভ না করে জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে নিরাশা বোধ করতেন। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, যতই শংকরভাষ্য, রামানুজভাষ্য এবং অন্যান্য রাশি রাশি ভাষ্য, 'টীকা', 'কারিকা', 'টিপ্পনী', 'বার্তিক', 'প্রকরণ' প্রভৃতি হরেক রকমের দার্শনিক সাহিত্যের ইংরাজী বা আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টির সামনে আসছে ততই যেন এক একটা দিগন্ত খুলে যাচ্ছে, ততই সমগ্র শিক্ষিত জগৎ বিস্মিত হচ্ছেন ভারতীয় দর্শন সাহিত্যের বিপুলতা দেখে, দার্শনিক বিশ্লেষণের সূক্ষ্মনৈপুণ্য দেখে। ভাবলে অবাক লাগে যে পাশ্চত্য দর্শনে বস্তুতন্ত্রবাদ (Realism), বিজ্ঞানবাদ (Idealism), বহুত্ববাদ (Pluralism) দ্বৈতবাদ (Dualism), একত্ববাদ (Monism) প্রভৃতি যে সমস্ত মতবাদের উদ্ভব-আধুনিককাল পর্যন্ত হয়েছে সেগুলির উদ্ভব—এবং ভাষা-ভাষা নয়—গভীর চর্চা ভারতীয় দর্শনে অন্ততঃ দুই আড়াই হাজার বছর ধরে চলে আসছে।

ভারতীয় দর্শনের আরম্ভ।

ভারতীয় দর্শন তথা ধর্মের আরম্ভ কবে নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রাক্-বৈদিক মোহনজোদারো ও হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শনগুলির মধ্যে বহু শীলমোহর পাওয়া গেছে এবং ধ্যানরত যোগীব মূর্তিও পাওয়া গেছে। শীলমোহব ও অন্যান্য লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ঐকালের দার্শনিক ভাবধারা ঠিক কী ছিল বলা সম্ভব নয়। জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে বহু দেবদেবী এক পরম সত্যের বিচিত্র প্রকাশ এই মহান দার্শনিক তত্ত্ব ঘোষিত হয়েছে। ঋগ্বেদের 'পুরুষসূক্ত' অথবা অথর্ববেদের 'বরুণসূক্ত' সর্বব্যাপী চৈতন্য সত্তার ভাবধারায় পূর্ণ। 'পুরুষসূক্ত' বলছেন—জগতে বা কিছু রয়েছে যা কিছু ছিল, যা কিছু হবে সবই সেই পুরুষময়।' বেদের এইসব অংশে দার্শনিক চিন্তা ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কিন্তু বেদের শেষভাগগুলি যেগুলিকে বলা হয় উপনিষদ্ বা বেদান্ত, (বেদের অন্ত)—মহত্তম দার্শনিক চিন্তায় পরিপূর্ণ। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ, এক শাশ্বত অনন্ত চৈতন্যময় সত্তা থেকে জগতের উৎপত্তি, বিবর্তন, কর্মফলবাদ, জন্মান্তর রহস্য, কার্যকারণ তত্ত্ব, প্রভৃতি বহুরকমের দার্শদিক চিন্তা উপনিষদে হৃদয়গ্রাহী কবিত্বময় ভাষায় বিবৃত হয়েছে। ফলে উপনিষদ্গুলি রূপ নিয়েছে একাধারে সাহিত্য ও দর্শনের। পৃথিবীর মহানভাবোদ্দীপক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে উপনিষৎগুলি—বিশেষতঃ প্রাচীন এগারখানি উপনিষদ্--একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই উপনিষদ্গুলির নাম—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ও শ্বেতাশ্বেতর। জর্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ার উপনিষদ্ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"উপনিষদ্ অধ্যয়নের মত এমন হিতকারক অধ্যয়ন জগতে অন্যকিছু নাই; উপনিষদ্-পাঠ আমার জীবনে মরণে সান্ত্বনার স্থল।" নানাভাষায়, ভঙ্গিমায়, ছন্দে উপনিষদ্ বলছেন—(ক) যে মূলকরণ থেকে এই বিশ্বের বিশাল জাব-জগৎ জাত হয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যার মধ্যে বেঁচে আছে, ধ্বংসের সময় যার মধ্যে লয় পাবে, তা হচ্ছে চৈতন্যময়, আনন্দময় ব্রহ্ম, তা হচ্ছে সৎ-চিৎ-আনন্দ। (খ) এবং শুধু মানুষ নয় প্রত্যেক প্রাণীই সেই ব্রহ্মের, সেই সৎ-চিদ্-আনন্দের একটী প্রকাশ। (গ) চিত্ত শুদ্ধ, পবিত্র হলে এ সত্য জানা যায়। (ঘ) জানা গেলে মানুষ জরাভয়, মৃত্যুভয় দুঃখভয়, সর্বভয় অতিক্রম করে, অভীঃ হয়।

"পুরুষ এবেদং সর্বং, যদ্ভূতং, যচ্চ ভব্যম্'

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা

এগারখানি প্রাচীনতম উপনিষদ্ ছাড়া আরও সাতানব্বইখানি উপনিষদ্ প্রচলিত আছে। বাহ্যতঃ এগুলিকে পরস্পর খাপছাড়া বলে মনে হতে পারে। এজন্য পরবর্তীকালে উপনিষদের প্রধান বক্তব্যগুলির সার সংকলন করে, ব্রহ্মসূত্র, বা 'উত্তর মীমাংসা' নামে এক গ্রন্থ লিখলেন 'বাদরায়ণ ব্যাসদেব'। এই ব্রহ্মসূত্রই বেদান্ত দর্শন নামে খ্যাতি লাভ করেছে। বেদান্তদর্শন সম্পূর্ণভাবে উপনিষদেরই দর্শন। তখনকার দিনে লেখার বেশী প্রচলন ছিল না বলে সম্ভবতঃ মনে রাখার সুবিধার জন্য অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটা শব্দ দিয়ে ব্যাসদেব একটা একটা বাক্য বা বাক্যাংশ লিখেন যার নাম সূত্র। ব্রহ্মসূত্রে এরূপ সূত্রই শুধু রয়েছে। যেমন একটা সূত্র হল—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" "যার থেকে এর (বিশ্বের) জন্মপ্রভৃতি হয়েছে।" এখন বিশদব্যাখ্যা ছাড়া এত সংক্ষিপ্ত সূত্রের মর্ম বোঝা অসম্ভব। তাই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার জন্য বিরাট বিরাট পুস্তক—যার নাম ভাষ্য—রচিত হতে লাগল। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক শংকরাচার্য (৭৮৮ খৃঃ—৮২৪ খৃঃ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যে অদ্বৈতবাদই বেদান্ত দর্শনের তাৎপর্য বলে প্রমাণ করলেন। তেমনিভাবে নূতন নূতন ভাষ্যলিখে রামানুজাচার্য (১০১৭ খৃঃ—১১৩৭ খৃঃ) বিশিষ্টদ্বৈতবাদ এবং মধ্বাচার্য (১১৯৯ খৃঃ—১২৭৮ খৃঃ) দ্বৈতবাদ প্রচার করলেন। এছাড়াও বেদান্তদর্শনের অনেক ভাষ্য পরে পরে রচিত হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে প্রথম দু জনের ভাষ্য ও দু টি মতবাদ—অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

ব্রহ্ম সূত্রেকে উত্তর মীমাংসা বলার কারণ বেদের উত্তর অর্থাৎ শেষভাগের কি তাৎপর্য তার মীমাংসা (বিচার) তাতে করা হয়েছে। বেদের পূর্বভাগের অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের—যাগযজ্ঞ আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ের—মীমাংসা (বিচার) যে বইতে মহর্ষি জৈমিনি করেছেন তার নাম হল পূর্ব-মীমাংসা বা সংক্ষেপে মীমাংসা দর্শন।

ক) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি.. ব্রহ্ম (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩।১)

(খ) অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।৫।১৯)

(গ) তম্ অক্রতুঃ পশ্যতি। (কঠোপনিষৎ ১।২।২০)

(ঘ) তরতি শোকম্ আত্মবিৎ। (ছান্দোগ্যউপনিষৎ ৭।১।৩)

বেদান্তদর্শন ও মীমাংসা দর্শন বেদভিত্তিক। এই দুই দর্শনের মতে ঈশ্বর, আত্মা, কর্মফল, পরলোক ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ যা স্বয়ং অনুভব করে বেদের অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন তা, অভ্রান্ত সত্য, চরম প্রমাণ। তবে বেদ অযৌক্তিক কথা বলতে পারেন না। কাজেই বেদের প্রত্যেকটি কথাব যথার্থ তাৎপর্য বের করা এবং তাকে নির্ভুল যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা এই দুই দর্শনের কাজ।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্যও যোগ নামে ভারতের আর চারটী দর্শন আছে যা বেদভিত্তিক না হলেও বেদ-অনুকুল। এরা বেদকে মানেন তবে বেদবাণীর বিশ্লেষণের উপর জোব না দিয়ে যুক্তিবিচার ধ্যানধারণার দ্বারা সত্য-আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এই ছয়টা দর্শনকে একসঙ্গে বলা হয় হিন্দুদের ষড়্দর্শন বা ষট্ (ছয়) আস্তিক দর্শন। এ ছাড়া চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন এই তিনটী বেদবিরোধী দর্শন রয়েছে এদেব বলা হয় নাস্তিক দর্শন। এই নয়টী দর্শন শাখা সম্বন্ধে জানলে মোটামুটী ভারতীয় দর্শন জানা হ'ল বলা যায়। অবশ্য "অপ্রধান ক্ষুদ্রবৃহৎ আরও একাধিক দর্শন'* ও ইতিহাসের বিভিন্নযুগে উদ্ভূত হয়েছে। ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম নিজ নিজ দর্শনকে বহির্দেশ থেকে সঙ্গে নিয়েই ভাবতে এসেছে। সম্ভবতঃ ভারতের মাটিতে ইস্‌লামীয় বা খৃষ্টীয় দর্শনেব উল্লেখযোগ্য নূতন সংযোজন কিছু হয় নি বলেই ভারতীয় দর্শনের বর্ণনায় এদের আলোচনা করা হয় না। কাজেই প্রধান প্রধান ভারতীয় দর্শনের একটা নক্সা এভাবে অঙ্কন করা যেতে পারে।

ভারতীয় দর্শন

আস্তিকদর্শন (বেদ-প্রামাণ্যে বিশ্বাসী) নাস্তিকদর্শন (বেদ প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী)
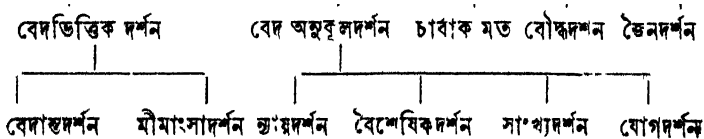
অদ্বৈতদর্শন বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শন দ্বৈতদর্শন

*শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভারতদর্শনসার' পৃঃ ৬৬ দ্রষ্টব্য।

এই সব দর্শন শাখার কাল সম্বন্ধে এটুকু অনুমান করা যায় যে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন বুদ্ধদেব ও মহাবীরের সমসাময়িক কালে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়েছে। অন্যান্য দর্শনগুলি ঐ সময় বা তারও পূর্বে সুরু হয়েছিল মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। সুরু যখনই হোক এরা পরবর্তী শতাব্দী-গুলিতে বহু দার্শনিকের চিন্তা গবেষণার দ্বারা ধীরে ধীরে পুষ্টসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

নাস্তিক দর্শন

নাস্তিক বলতে সচরাচর আমরা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি বা মতকে বুঝাই। নাস্তিক দর্শন বলতে কিন্তু বুঝায় যেসব দর্শন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। আস্তিক দর্শনগুলি বেদের প্রামাণ্য অবিসংবাদী বলে গ্রহণ করে। কিন্তু আস্তিক দর্শনের কোন কোনটা—যেমন সাংখ্য, মীমাংসা-জগৎস্রষ্টারূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না।

জড়বাদী চার্বাকমত

চার্বাকমতকে ঠিক দর্শন বোধহয় বলা যায় না কেন না দর্শনশাস্ত্রের অনেক লক্ষণই তার নাই। যুক্তি বিচারসম্মত আলোচনার পরিবর্তে জিদের জোরে কয়েকটি স্থূল বুদ্ধির কথা এতে জাহির করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন চার্বাক নামীয় একব্যক্তি এই মতের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু বহু বহু মনীষীর মতে মানুষের স্বাভাবিক ভোগলালসার সমর্থনসূচক যেসব মুখরোচক কথা সমাজে প্রচলিত সেগুলিকে একত্র করে বলা হয় চার্বাক (চারু+বাক) মত অর্থাৎ যে মতে চারু (মধুর) বাক্ (বাক্য) রয়েছে। এই মত বলে—ইন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুভব করা হয় তাই সত্য আর সবই ভুল, অনুমান ভুল, বেদ-উপনিষদ্ ভুল, অমল ধবল চরিত্র সম্পন্ন ঋষি-মনীষীদের কথাও ভুল। ঈশ্বর-আত্মা-পরলোক এসব আছে কিনা তার প্রমাণ নাই সুতরাং ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। চেতনাযুক্ত দেহই আত্মা—এছাড়া আত্মা আবার কি? এই মত আরও বলে—যতদিন বাঁচ, স্ফূর্তি করে বাঁচ, ঋণ করেও ঘি খাও। 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' অন্যান্য দর্শনশাখা চার্বাক মতকে সহজেই খণ্ডন করেছেন। বস্তুতঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত ক্ষুদ্র অংশমাত্র জানি—এবং অনেক সময় ভুল করেই জানি। অথচ এই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বাইরে সত্য কিছুই নাই—এই দম্ভোক্তিই যে মতের ভিত্তি তাকে কোন

যুক্তিবাদী মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, যুক্তি বিচারের ধারায় অন্যান্য দর্শন শাখা যেমন গড়ে উঠেছে চার্বাকমত তেমন ভাবে গড়ে উঠেনি, দর্শনের রূপ নেয় নাই।

জৈন দর্শন

তীর্থঙ্করদেব বিশেষতঃ মহাবীর তীর্থঙ্করের বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত এই দর্শন। এদের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চার রকমের উপাদান দিয়ে জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু চৈতন্য নিত্য—কারুর থেকেই সৃষ্টি হয় নি। চৈতন্যময় অসংখ্য আত্মার প্রত্যেকেই অনাদিও অনন্তকাল স্থায়ী। এই জগৎটা জীব এবং অজীবের সমষ্টি। জীব বলতে চৈতন্যময় আত্মা আর অজীব বলতে বাকী জড় সমস্ত কিছুকে বুঝায়। অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ রয়েছে প্রত্যেক আত্মার মধ্যে। আত্মা শুধু মানুষের মধ্যে নয় পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা এমন কি ইট কাঠ পাথরের মধ্যেও রয়েছেন। তবে আত্মার জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ কোথাও বেশী, কোথাও কম প্রকাশিত, কোথাও বা প্রায় অপ্রকাশিত। দেহত্যাগের পর নিজকৃত ভাল বা মন্দ বা মিশ্রিত কর্মানুসারে চৈতন্যময় আত্মা দেহান্তরে যান—যখন যে দেহে যান সে দেহের আকার প্রাপ্ত হন ঠিক যেমন আলো যে ঘরে থাকে সে ঘরের আকার ধারণ করে। আত্মার জ্ঞান, শক্তি আনন্দের এই যে প্রকাশ না হওয়া এটাই তার বন্ধন। সৎচিন্তা, শুভকর্ম, নৈতিক উৎকর্ষ বিশেষতঃ চরিত্র ও অহিংসা—এগুলির দ্বারা জড়ের আবরণ কেটে যায়। আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান শক্তি-আনন্দের সম্যক প্রকাশ হয়—এইটাই আত্মার মুক্তি। জৈনরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে সাধারণের মত বিশ্বাস করেন না তবে ঈশ্বরের মত সর্বজ্ঞ, পরম কারুণিক মহাপুরুষের ধ্যানচিন্তা করাকে মুক্তি লাভের সহায়ক হিসাবে অবলম্বন করেন।

বৌদ্ধ দর্শন

বুদ্ধদেব নিজে সূক্ষ্ম দর্শন চর্চার পরিবর্তে নৈতিক জীবন গঠনের উপর গুরুত্ব দিতেন সর্বদা। কিন্তু বুদ্ধদেবের দেহাবসানের পর যখন প্রতিপক্ষরা বুদ্ধ প্রচারিত নির্বাণ, নির্বাণের সাধন প্রণালী সম্বন্ধে দার্শনিক প্রশ্ন করতে সুরু করলেন তখন বুদ্ধানুগামিবৃন্দ বুদ্ধের শিক্ষাকে ভিত্তি করে বৌদ্ধ দর্শন গড়ে তুললেন। অন্যান্য হিন্দুদর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের যুক্তির লড়াই বেশ কয়েকশ' বছর প্রবল বেগে চলেছিল। এর ফলে উভয় পক্ষের দর্শন নূতন নূতন চিন্তা-গবেষণার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে কল্পনাতীতভাবে। বৌদ্ধগণ জৈনদের,

মতই বেদ বিরোধী। তাঁরা বলেন—বেদে (বেদের কর্মকাণ্ডে) যে হিংসাত্মক পশুবলি প্রভৃতি বিধান রয়েছে তা দিয়ে কখনও শ্রেয়ঃ লাভ হবে না, হবে বুদ্ধবাণীর অনুসরণে।

বুদ্ধদেব কথিত চারটি প্রধান সত্য,—বৌদ্ধদের ভাষায় চারটি আর্যসত্য—বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিষ্ঠাভূমি। এই আর্য্যসত্যগুলি হল—(ক) দুঃখ আছে সুতরাং (খ) দুঃখের কারণও আছে। (গ) দুঃখের নিরোধ আছে (অর্থাৎ কারণ দূর করে দুঃখ দূর করা যায়)। যার নাম নির্বাণ। (ঘ) দুঃখ নিরোধ বা নির্বাণের উপায় অষ্টাঙ্গিক মার্গ—(১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প, (৩) সম্যক বাক্য, (৪) সম্যক কর্ম, (৫) সম্যক জীবিকা, (৬) সম্যক মানসিক ব্যায়াম (৭) সম্যকস্মৃতি (৮) সম্যক সমাধি বা ধ্যান। বৌদ্ধরা বলেন জগতে যা কিছু আছে তার সবই কোন না কোন কারণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যেমন টেবিল কাঠ থেকে হয়েছে, গাছ বীজ থেকে, জল থেকে, বায়ু থেকে হয়েছে। আবার উৎপত্তি যার আছে বিনাশ তার অনিবার্য। উৎপত্তি বিনাশহীন, অক্ষয়, অজর, অমর কিছুই নাই। একটা গাড়ী বল্লে যেমন চাকা, খোল, ইঞ্জিন প্রভৃতির সমষ্টিকে বুঝায় মানুষ বলতে রক্ত-মাংস, চিন্তা-ভাবনা, সুখ দুঃখের সমষ্টিকে বুঝায়। এই সমষ্টিকে আমরা আত্মা বলতে পারি তবে এই আত্মা ক্ষয়হীন, মৃত্যুহীন নয়, বরং প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল। বৌদ্ধরা স্থায়ী আত্মা না মানলেও কর্মফল ও পুনর্জন্মবাদে ষোল আনা বিশ্বাস করেন। দেহ মনের সমষ্টি স্বরূপ একটা আত্মা ধ্বংস হলে সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ আত্মার সৃষ্টি হয় এইভাবে জন্মের পর জন্ম চলে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় নদীতে স্থির জলরাশি রয়েছে কাছে গেলে বুঝা যায়—সেখানে এ মুহূর্তে যে জল-সমষ্টি ছিল পরমুহূর্তে সে জল কোথায় গেছে, অন্য জল তার স্থান পূরণ করেছে। নদীতে স্থায়ী জল নাই, কিন্তু স্থায়ী জল প্রবাহ আছে। সেইরূপ স্থির, স্থায়ী আত্মা নাই কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল আত্মার প্রবাহ আছে। স্থায়ী আত্মা নাই—এ জ্ঞান দৃঢ় হলে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র জীবনের প্রতি সব মোহ, সব তৃষ্ণা বা বাসনা চলে যাবে। বাসনাই দুঃখের কারণ। বাসনার আগুন নিঃশেষে নিভে গেলে যা হয় তাই 'নির্বাণ'। নির্বাণ লাভ হলে আর পুনর্জন্ম হয় না। বৌদ্ধ দর্শনের এটা একটা মোটামুটি কাঠামো হলেও পরবর্তীকালে বৌদ্ধদর্শন নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে, নানারকম মত সৃষ্টি করেছে। বুদ্ধদেব অনেক দার্শনিক প্রশ্ন সম্বন্ধে নীরব থাকতেন। কাজেই যেসব বিষয়ে

বুদ্ধদেব কিছুই বলেন নাই সে সব বিষয়ে বৌদ্ধরা চিন্তা-গবেষণা করে নিজ নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার (বা বিজ্ঞানবাদী) এবং মাধ্যমিক (বা শূন্যবাদী) এই চারটি দার্শনিক সম্প্রদায় বৌদ্ধদের মধ্যে প্রবল। এ চারটিকে আবার দুটি প্রধান দলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়—'হীনযান' দল (সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক) আর 'মহাযান' দল (যোগাচার ও মাধ্যমিক)। যারা নিজের নিজের নির্বাণের জন্য আমৃত্যু সাধনা করা জীবনের লক্ষ্য মনে করেন তাঁরা প্রথম দলের। দ্বিতীয় দল মনে করেন অমিতাভ বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব জগতের প্রত্যেকটি প্রাণীর নির্বাণের জন্য চেষ্টা করেছেন ও করছেন। জগতের সকলের নির্বাণের মহান্ আকাঙ্ক্ষায় বোধিসত্ত্বের মত হয়ে যাওয়া এঁদের জীবনোদ্দেশ্য। বৌদ্ধরা ঈশ্বর না মানলে বোধিসত্ত্বরূপী বুদ্ধকে ঈশ্বরের মতই পূজার্হ মনে করেন এবং সেভাবে তাঁর ধ্যান চিন্তা করেন।

বৈশেষিকদর্শন ও ন্যায়দর্শন

ষড়্দর্শনের মধ্যে কনাদমুনি প্রতিষ্ঠিত বৈশেষিক দর্শন এবং গৌতম মুনির ন্যায় দর্শনের মধ্যে প্রচুর মতের মিল তাই দু'টী এক শ্রেণীভুক্ত। এই উভয় দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এঁদের মতে জগতে অসংখ্য জীবাত্মা—প্রত্যেক প্রাণীদেহে এক একটী জীবাত্মা আছে। জীবাত্মা মাত্রেই নিত্যকালস্থায়ী (eternal), ঈশ্বর বা অন্য কেউই তাদের সৃষ্টি করে নাই। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু—যা আমরা অনুভব করি তা অতিস্থূল ও অনিত্য কিন্তু এদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু-গুলি অনাদিও চিরস্থায়ী। এইসব পরমাণুদিয়ে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বৈশেষিকদর্শন মতে প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে একটা 'বিশেষ' (বিশেষত্ব) রয়েছে যার ফলে একটা পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে স্বতন্ত্র। এই 'বিশেষ' শব্দের থেকে ঐ দর্শনের নাম হয়েছে বৈশেষিক দর্শন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডালটন যে পরমাণু তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুবাদ প্রায় সেই ধরণের। ন্যায়-বৈশেষিক মতে প্রত্যেক জীবাত্মা আজও অমর। এবং প্রত্যেক জীবাত্মাই কর্মফল অনুসারে মৃত্যুর পর দেহান্তরে গমন করে। অজ্ঞান অবস্থায় জীবাত্মা নিজেকে দেহমন বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে, মনে করে আমি স্থূল, কৃশ, দুর্বল ইত্যাদি। জ্ঞান হলে জীবাত্মা বুঝতে পারবে যে সে দেহমন থেকে আলাদা একটী নিত্য পদার্থ। এও বুঝতে পারবে যে এই বিশাল জড়জগৎ ও চেতন জগৎ ছয়টী (বৈশেষিক মতে) বা ষোলটী (ন্যায়মতে) পৃথক পৃথক মৌলিক

পদার্থ দিয়ে তৈরী। এই পদার্থগুলির জ্ঞান লাভ করলেই জীবাত্মার মুক্তি বা অপবর্গ হয়।

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে বিশেষতঃ ন্যায় দর্শনে অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। এই অনুমান অনেকটা এইরূপ। এই জগৎ বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু এইসব উপাদান আপনা আপনি সম্মিলিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছে এরূপ বলা যায় না। এদের সম্মিলিত করার জন্য ঈশ্বররূপ একজন নিমিত্ত কারণ দরকার। যেমন মাটিরূপ উপাদান ছাড়াও কুম্ভকাররূপ একটী নিমিত্ত কারণ (কর্তা) প্রয়োজন হয় একটী কলস তৈরীর জন্য। অর্থাৎ প্রত্যেক কার্যের যেমন একজন কর্তা আছে তেমনি এই জগৎ রূপ কার্যের একজন কর্তা আছেন—তিনিই ঈশ্বর বা পরমাত্মা। এই জগতে সকলে নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে। কিন্তু কর্মফলবাদ একটী অচেতন, জড় নিয়ম। চেতন ঈশ্বর আছেন বলে তাঁর অধ্যক্ষতাবশতঃ কর্ম অনুসারে ফলাফলের যথাযথ বণ্টন হয়ে থাকে।

যে অনুমান দ্বারা ন্যায়দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে সে 'অনুমান' পদ্ধতিকে নিখুঁতভাবে গড়ে তোলা ন্যায় দর্শনের একটা প্রধান বিশেষত্ব। পাশ্চাত্য তর্ক বিদ্যায় এ্যারিস্‌টটলের দান যেরূপ ভারতীয় তর্ক বিদ্যায় ন্যায়দর্শনের দানও সেইরূপ গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায়দর্শনের মতে প্রত্যেক তর্কের বাহ্যিক আকার মোটামুটি এইরূপ—

১) পর্বতে আগুন আছে · প্রতিজ্ঞা

২) কারণ ধূম দেখা যাচ্ছে · · হেতু

৩) যেখানে ধূম দেখা যায় সেইখানেই আগুন দেখা যায়—যথা রান্নাঘর · · উদাহরণ

৪) এই পর্বতে ধূম দেখা যাচ্ছে ····উপনয়

৫) অতএব এই পর্বতে আগুন আছে ·· নিগমন

অনুমান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ভ্রমাত্মক হেতু দ্বারা অনুমান করলে অনুমান যে ভুল সিদ্ধান্ত বা অপসিদ্ধান্তে পৌছবে এই নিয়েও ন্যায়দর্শনে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এরূপ ভ্রমাত্মক হেতুর নাম হেত্বাভাস (হেতুর আভাস)। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলা নিবাসী নৈয়ায়িক দার্শনিক গঙ্গেশ উপাধ্যায় এই অনুমান প্রক্রিয়াকে নানাভাবে পরিমার্জিত করেন। তখন নবদ্বীপ নব্যন্যায়ের চর্চার একটা বিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু একটা কথা

মনে রাখা দরকার অনুমানের এই বিশদ ও সূক্ষ্ম আলোচনা ন্যায়দর্শনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। সেই উদ্দেশ্য হলো —এইরূপ অনুমানের সাহায্যে জগতের ১৬টা পদার্থের (যার মধ্যে জীবাত্মা একটী) সম্যক জ্ঞান লাভ করা এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা জীবের দুঃখ নিবৃত্তি বা মুক্তি লাভ ঘটানো।

সাংখ্য ও যোগদর্শন

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত সাংখ্য ও যোগদর্শন পরস্পরের সঙ্গে বহু সাদৃশ্যযুক্ত এবং অনেক বিষয়ে একই মতের পরিপোষক। সুতরাং এদের এক সঙ্গে আলোচনা করা সুবিধাজনক। সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে 'কপিল' মুনির এবং যোগদর্শনের স্থাপয়িতা রূপে মহর্ষি 'পতঞ্জলি'র নাম বিখ্যাত। তবে এই দর্শনের মূল কথাগুলি সূত্ররূপে রচনার পূর্বে অন্যভাবে প্রচলিত ছিল একপ মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

আমরা দেখেছি ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের মতে স্রষ্টিকর্তা ঈশ্বর জগৎ ও জীবের দেহগুলি সৃষ্টি করেছেন পরমাণু পুঞ্জ থেকে, জীবের কর্মফল অনুসারে। জীবাত্মাগুলিকে অবশ্য তিনি সৃষ্টি করেন নাই—তাঁরা অজর অমর। তেমনি ভাবে অমর হচ্ছে আরও কতকগুলি পদার্থ যেমন—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, কাল, দেশ ইত্যাদি। সাংখ্য যোগদর্শন বলেন—না, এই পরমাণু পুঞ্জ বা মন বা বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় এরা উৎপত্তি রহিত নয়। এদের সকলের উৎপত্তির স্থল একটা আছে যার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি থেকেই সমস্ত জড় পদার্থ এবং মনো-জগতের পদার্থ—অহংকার, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও জাত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যেমন উনবিংশ শতাব্দীর পরমাণু তত্ত্বকে বরবাদ করে বলছে যে পরমাণুগুলি চরম পদার্থ নয়। আসলে সেগুলি শক্তির (energy) সংহত রূপ, সুতরাং একটী শক্তিমহাসমুদ্রই জগতের মূল কারণ। সাংখ্য দর্শনও তেমনি জগতের উৎপত্তি স্থল হিসাবে এক মহাশক্তি সমুদ্রের সন্ধান দিয়েছে—নাম তার 'প্রকৃতি'। কিন্তু লক্ষ্য করার মত পার্থক্য আছে—বিজ্ঞানের শক্তি কেবল বাহ্য জগতের কারণ, সাংখ্যের প্রকৃতি বাহ্য জগতের এবং সঙ্গে সঙ্গে মন বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ও উৎপাদক। তবে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ প্রকৃতির সৃষ্টি হলেও জীবাত্মা প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। ন্যায় বৈশেষিকদের মত সাংখ্যদর্শন স্বীকার করেন যে জীব বা প্রাণী মাত্রের আত্মা জন্মমৃত্যু রহিত। কেহই তাদের সৃষ্টি করেনি, তাদের ধ্বংসও নাই। সাংখ্য যোগদর্শনে এই আত্মার নাম 'পুরুষ'। অসংখ্য 'পুরুষ' এবং একটি প্রকৃতি

এই নিয়ে রচিত হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। স্মরণ রাখা দরকার যে দর্শনে 'পুরুষ' 'প্রকৃতি' বলতে কখনও 'নর' এবং 'নারী' বুঝায় না। সাংখ্যযোগ দর্শনের মতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বিশ্লেষণ করলে পঁচিশ রকমের মৌলিক তত্ত্ব পাওয়া যাবে। অবশ্য নিখুঁত ভাবে বলতে গেলে বলা উচিত দুই বকমের তত্ত্ব। প্রথম ধরণের সত্তা অসংখ্য পুরুষ বা জীবাত্মা। দ্বিতীয় প্রকারের সত্তা হল প্রকৃতি যার থেকে চব্বিশ প্রকারের নিম্নতর সত্তার বিবর্তন (evolution) হয়েছে।*

সাংখ্য দর্শনের বক্তব্য হল জড ও চেতন জগৎ—ঘর বাডী-আকাশ-চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র এমন কি আমাদের শরীর, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি—সবই উৎপন্ন হয়েছে প্রকৃতি থেকে। আমরা, জীবেরা নিজেবা হচ্ছি পুরুষ। পুর্ শব্দের অর্থ নগর , দেহরূপ পুর বা নগরে আমবা বাস কবি তাই প্রত্যেক প্রাণীর নাম পুরুষ। পুরুষেব স্বভাব হ'ল চৈতন্য বা জ্ঞান। চৈতন্য আমাদেব স্বভাব হলেও যে কোনও কারণে আমাদেব অজ্ঞান (সাংখ্যেব ভাষায় অবিবেক) হয়েছে যাব জন্য আমরা মনে করি আমি দেহ, আমি মন, আমি রুগ্ন, স্বাস্থ্যবান্, আমি সুখী, দুঃখী ইত্যাদি। জ্ঞান বা বিবেক হলে আমরা বুঝতে পারব—সুখদুঃখ, রুগ্নতা, স্বাস্থ্য এসব দেহমনেব, এক কথায় প্রকৃতির ধর্ম। আমরা, জীবাত্মাবা, পুরুষরা এর থেকে আলাদা—অজর, অমর, চিরশুদ্ধ, চিরপবিত্র, চিরজ্ঞানময়। নিজেদের এভাবে জানাটাই হলো মুক্তি, সাংখ্যযোগের ভাষায় 'কৈবল্য'। 'কেবল' থেকে 'কৈবল্য' শব্দটা এসেছে। আমি—'কেবল', 'একা', আমি দেহ-মন-প্রকৃতি থেকে পৃথক—এ অনুভবটাই সাংখ্যযোগ দর্শনের মতে জীবনের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার, এই বিবেকজ্ঞান লাভ করার উপায় হল অষ্ট-অঙ্গ-যুক্ত (অষ্টাঙ্গিক) যোগ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটা অঙ্গের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে যোগদর্শনে। মোটামুটি ভাবে বলা যায়—এই দুই দর্শনের তত্ত্বগুলি বিবৃত হয়েছে সাংখ্য দর্শন অংশে এবং তত্ত্বকে অনুভব করার উপায়গুলি, সাধন পদ্ধতিগুলি বিবৃত হয়েছে যোগদর্শন অংশে। অবশ্য সাংখ্য ও যোগ দর্শনে ঈশ্বর সম্বন্ধে পরস্পরের পৃথক মত আছে।

সাংখ্য বলেন, ঈশ্বর আছেন—এটা অনুমানে সিদ্ধ হয় না। সুতরাং ঈশ্বর

---

*বিবর্তনের প্রথম স্তরে বুদ্ধি বা মহৎ, দ্বিতীয় স্তরে মহৎ থেকে অহংকার, তৃতীয় স্তরে অহংকার থেকে মন, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ তন্মাত্র এবং শেষ স্তরে পাঁচ তন্মাত্র থেকে পাঁচ মহাভূত উৎপন্ন হয়েছে।

অসিদ্ধ। ঈশ্বর না থাকলেও ক্ষতি নাই—প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান (পৃথক জ্ঞান) হলেই তো কৈবল্য হল। সাংখ্যকে তাই বলা হয়—নিরীশ্বর সাংখ্য। যোগদর্শন কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন,—বলেন যে সমাধি দিয়ে 'কৈবল্য' হবে সে সমাধি লাভের একটা উপায় হল—ঈশ্বরের ধ্যান করা। যোগ দর্শনকে তাই বলা হয়—সেশ্বর (স+ঈশ্বর) যোগদর্শন।

মীমাংসাদর্শন

পূর্বেই বলা হয়েছে যে মীমাংসা দর্শন ও বেদান্ত দর্শন বেদকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিভাবে দর্শন দুটি কালে কালে বেড়ে উঠেছে তাও আমরা একটু আলোচনা করেছি। কিন্তু এদের প্রতিপাদ্য বিষয় কি? মীমাংসা দর্শনের মতে প্রত্যেক জীব স্বরূপতঃ আত্মা—দেহমন থেকে পৃথক। এই আত্মা সৃষ্ট হয় নাই, মৃত ও হবে না। এক দেহ থেকে গিয়ে কর্ম অনুসারে আত্মা ভাল বা মন্দ নূতন দেহলাভ করেন এবং কর্মের ভালমন্দ ফল ভোগ করেন। সুকর্মের ফলে আত্মা স্বর্গাদি ভোগ করতে পারেন। ঐরূপ স্বর্গাদি ভোগসুখ লাভ করাই পরম পুরুষার্থ। এর সাধন বা উপায় হল বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা। জগৎ সম্বন্ধে মীমাংসা দর্শন বলেন এই জগৎ অনাদি কাল থেকে রয়েছে, অনন্ত কাল থাকবে। প্রলয়ের সময় কারণে বিলীন হবে ঠিকই কিন্তু আবার সৃষ্টি হবে। মীমাংসা দর্শন বহুদেবদেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন তবে সৃষ্টি-কর্তা বলে একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মতে ঈশ্বর জীবের পাপকর্ম বা পুণ্যকর্ম অনুসারে তাদের ভালমন্দ ফল দেন। মীমাংসক বলেন—না, তা নয়। কর্ম একটা প্রাকৃতিক শক্তির মত। একটা ঢিল উপরের দিকে ছুঁড়লে যেমন আপনিই নেমে আসে, কাউকে নামিয়ে দিতে হয় না তেমনি কর্ম আপনিই ভালমন্দ ফল দেয়—অন্য কোনও শক্তি, ঈশ্বর নামক কোনও সৃষ্টিকর্তার অপেক্ষা রাখে না। -

বেদান্তদর্শন

মীমাংসা দর্শনে বেদের কর্মকাণ্ডের সমর্থন রয়েছে। দর্শনের প্রধান প্রশ্ন—ঈশ্বর, জীব, জগৎ প্রভৃতি বিষয়ে এতে আলোচনা নাই। মীমাংসাদর্শন যে স্বর্গলাভের লোভ দেখায় তা বেদান্ত দর্শনের মতে জীবনের চরম লক্ষ্য হতেই পারে না স্বর্গের সুখ নশ্বর। যত উৎকৃষ্ট হোক না কেন একদিন না একদিন তার নাশ হবেই। সুতরাং বেদান্তের লক্ষ্য স্বর্গসুখ নয়—মুক্তি। পূর্বেই বলেছি

বেদান্তের ব্যাখ্যা নানা সম্প্রদায় নানাভাবে করেছেন। এর মধ্যে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদীয় ব্যাখ্যা, রামানুজাচার্যের ব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীয় ব্যাখ্যা এবং মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদীয় ব্যাখ্যা সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রচলিত। জীব, জগৎ ও চরমসত্য বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে এদের মতের অনেক বিষয়ে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। সব সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। উপনিষদের বাণী অনুসরণ করে সে অস্তিত্বের যৌক্তিক সমর্থন তাঁরা করেন। তাঁদের সকলেরই মতে প্রত্যেক জীব স্বরূপতঃ আত্মা—জন্মমৃত্যুহীন, জরারোগহীন এবং স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ থেকে আর ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি থেকে আলাদা। জগতেব জড় যা কিছু আমরা অনুভব করি তা সবই অতি সূক্ষ্ম ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এই পঞ্চমহাভূত (আরও নিভুল ভাবে বলতে গেলে পঞ্চমহাভূতের তামসিক অংশ) থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আর এই পঞ্চমহাভূত ঈশ্বরের মায়া থেকে জাত হয়েছে। এ পর্যন্ত বেদান্তের তিন সম্প্রদায়েরই মোটামুটী একমত।

দ্বৈতবাদেব মতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ থেকে সর্বদাই আলাদা। ঈশ্বর প্রেমময় প্রভু। জীবাত্মাগুলি তাঁর দাস। জীবের কর্মফল অনুসারে ঈশ্বর জগৎটা সৃষ্টি করেছেন কিন্তু জগৎ সৃষ্টির উপাদান—প্রকৃতি বা মায়া—চিরকালই রয়েছে। শুদ্ধচিন্তা ও শুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা জীব ঈশ্বরের উপাসনা করবে, তাঁর সান্নিধ্যে থাকবে, জ্ঞানে, বৈরাগ্যে, প্রেমে, পবিত্রতায় ঈশ্বরের স্বরূপতা, সাদৃশ্য লাভ করবে—এটাই তার মুক্তি, এটাই তার দুঃখ নিবৃত্তি।

বৈশিষ্টাদ্বৈতবাদের মতে জগতে একমাত্র ঈশ্বরই রয়েছেন। বেদ-উপনিষদ্ বলছেন—তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া জগতে দ্বিতীয় কিছু নাই। অতএব জীবাত্মা ও জগৎ ঈশ্বর থেকে পৃথক নয়—ঈশ্বরের মধ্যেই তারা রয়েছে। জীবাত্মা ও জগৎ যেন ঈশ্বরের শরীর। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা, (অর্থাৎ এক একটী জীবাত্মা) এক একটা দেহ মনের মধ্যে থেকে সেই দেহমনকে পরিচালিত করি তেমনি ভাবে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম প্রত্যেক দেহ মন এবং প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যে অন্তর্যামীরূপে বর্তমান থেকে তাদের পরিচালিত করেন। মাকড়সা যেমন নিজের ভিতরের উপাদান দিয়ে জাল তৈরী করে তার মধ্যে বাস করে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সেইভাবে নিজের ভিতরের উপাদান দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করে তারই মধ্যে বাস করেন। এই ব্রহ্মকে শৈবরা শিবরূপে, বৈষ্ণবরা বিষ্ণুরূপে উপাসনা করেন।

জীবাত্মাগুলি ঈশ্বরের অংশ, যেন তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। জীবাত্মা সৎ কর্ম, সৎ চিন্তা, ধ্যান ধারণা করলে তাদের সব দোষ, রাগ-হিংসা-স্বার্থপরতা-আসক্তি ইত্যাদি সব মালিন্য কেটে যায়। সে তখন বিমল আনন্দের অধিকারী হয়, ঈশ্বরের স্বরূপতা লাভ করেন, এটাই তার মুক্তি। যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ, তেমনি ব্রহ্ম ও জীবাত্মা। অগ্নির উত্তাপ ও আলো যেমন প্রত্যেক অগ্নিকণিকায় নিহিত তেমনি ভাবে ব্রহ্মের জ্ঞান প্রেম-আনন্দ প্রভৃতি দৈবগুণ জীবাত্মার মধ্যে সর্বদাই রয়েছে। সৎ কর্মের ও সৎ চিন্তার দ্বারা জীবের এই দেব-স্বভাবের বিকাশ হয়—অসৎ কর্ম ও অসৎ চিন্তা করলে জীবের এই দেবস্বভাব ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

অদ্বৈতবাদী বলেন—জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অংশ শুধু নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন। একটা সসীম বস্তুর আলাদা আলাদা অংশ, সসীম অংশ থাকতে পারে কিন্তু অসীম বস্তুর এরকম অংশের কল্পনা যুক্তিতে টেকে না। অসীমের প্রত্যেকটা অংশই তো অসীম হতে বাধ্য। সুতরাং জীব ও জগৎ বাহ্য দৃষ্টিতে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অংশ বলা হলেও ঠিক ঠিক তাৎপর্য এই যে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন— জীবজগৎ ব্রহ্মই। ব্রহ্মই জগতে একমাত্র সত্তা। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়—'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'। অদ্বৈত বেদান্ত প্রত্যেক প্রাণীকে বলেন – তুমি ছোট নও, তুমি দেহ নও, মন নও, বুদ্ধি নও, জড় নও—তুমি এদের সকলের চেয়ে বড, তুমি সেই চৈতন্য যার চেতনায় দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি সজীব হয়ে রয়েছে। তুমি অসীম ব্রহ্মের, অসীম চৈতন্য-সমুদ্রের অংশ। আর অসীমের অংশ বলে তুমি নিজেও সেই অসীম চৈতন্য সমুদ্র। "তৎ ত্বম্ অসি"– তুমিই সেই (ব্রহ্ম)। যতই তুমি এ কথা বার বার চিন্তা করবে ততই তোমার অন্তরের প্রসুপ্ত ব্রহ্মশক্তি জেগে উঠবে—তুমি অভীঃ হবে, বীর্যবান হবে, জ্ঞানে, পবিত্রতায়, প্রেমে, শক্তিতে, শান্তিতে, মহীয়ান্ হবে।

বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে মায়াবাদ কথাটা সুপ্রচলিত। বেদান্তের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ, জীব এসব মায়ার সৃষ্টি। এ কথাটার ঠিক ঠিক অর্থ আমাদের জানা উচিত। অদ্বৈত বেদান্ত যে জীবজগৎকে 'ভূয়া' বা শূন্য বা আকাশ কুসুমের মত অস্তিত্বহীন বলে উড়িয়ে দেন তা নয়। তাঁরা বলেন— মায়া বা অজ্ঞানের জন্য বস্তুর আসল স্বরূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। আমরা যে নিজেদের ক্ষুদ্র সাড়ে তিন হাত মানুষ মনে করি, এটা মায়া বা

অজ্ঞানের জন্য। জ্ঞান হলে দেখব—আমরা চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম; আর দেখব জগতে জড় বলে কিছু নাই। জগৎটা ব্রহ্মময়। আমার চশমার কাঁচে নীল রঙ মাখিয়ে দিলে সমগ্র জগৎকে নীল দেখি তেমনি আমাদের মনরূপ চশমায় অজ্ঞানরূপ রঙ্ মাখান আছে তাই জগৎটাকে ছোট, বড, জড, চেতন নানাভাবে দেখি। মনরূপ চশমা থেকে যদি নিঃস্বার্থপরতা, পবিত্রতা প্রভৃতি সদগুণের ওষুধ দিয়ে সব অজ্ঞানময়লা, সব রং সাফ্ করে দিই তবে দেখব সব জগৎ চৈতন্যময়, সবই ব্রহ্মস্বরূপ, কেহই ছোট নয়, কিছুই ছোট নয়, হেয় নয়। রামকৃষ্ণদেব কালী ঘরে যেমন দেখেছিলেন—সবই চৈতন্যময়—কোশা কুশি, মন্দির, দরজার চৌকাঠ, কালী প্রতিমা, নিজের দেহ পর্যন্ত সব চৈতন্যময়। একেই বলে ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টি। এ দৃষ্টি হলে মানুষ কাউকে ঘৃণা করতে পারে না, পারে শুধু সবাইকে ভালবাসতে, আর সেবা করতে। আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ বলেন—এই জডজগৎটার মধ্যে আমরা যে ভাবে বস্তু দেখি তা ভ্রম মাত্র, বলেন এখানে নানা বস্তু নাই—আছে একটা শক্তির সমুদ্র। সেই সমুদ্রের খানিকটাকে বলছি চন্দ্র, খানিকটাকে সূর্য, খানিকটাকে সমুদ্র, খানিকটাকে আমার দেহ, খানিকটাকে তোমার দেহ বলছি। অদ্বৈত বেদান্ত আরও একধাপ এগিয়ে বলেন—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই শক্তিসমুদ্র আসলে একটা চৈতন্য-সমুদ্র। সে সমুদ্রের খানিকটাকে শক্তি, খানিকটা প্রাণ, খানিকটা মন, খানিকটাকে "আমি" খানিকটাকে "তুমি" বলে আমরা বহু নাম দিয়েছি মাত্র। বস্তুতঃ জিনিষ যা আছে তা কিন্তু এক—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম (একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম)।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার মত। মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বেদান্তের তিনটি শাখাব প্রত্যেকেই আত্মার মহিমায় বিশ্বাসী। আত্মা ক্ষুদ্র দেহ মন-বুদ্ধি থেকে আলাদা এ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনের সকল শাখাই* একমত। বেদান্তের সকল শাখা* আবার এও বলে যে প্রত্যেক আত্মায় জ্ঞান, শক্তি, পবিত্রতা সর্বদাই হয় প্রকাশিত নয় অপ্রকাশিত ভাবে রয়েছে। একদল (অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী) বলেন—আত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন, একদলের (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর) মতে আত্মা ব্রহ্মের অংশ, অন্যদলের (দ্বৈতবাদীর) বক্তব্য—আত্মা ব্রহ্ম থেকে সর্বদা পৃথক তবে ব্রহ্মের সমান ধর্মবিশিষ্ট। ঈশ্বর বা ব্রহ্মে তিনটি শাখাই বিশ্বাসী হলেও এক শাখার মতে (দ্বৈতবাদ) ব্রহ্ম আর তাঁর সৃষ্টি জগৎ পাশাপাশি

* চার্বাকদের মত অবশ্য অন্যরূপ। তবে চার্বাক মত ঠিক দর্শন কিনা, সে নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

রয়েছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন সৃষ্ট জগৎ ব্রহ্মের মধ্যেই রয়েছে, আর অদ্বৈতবাদী ঘোষনা করেন—সৃষ্ট জগৎ শুধু ব্রহ্মের মধ্যে নয় সৃষ্ট জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মই—ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুই যে নাই।

ভারতসংস্কৃতি ও মানবসংস্কৃতির স্বার্থে ভারতীয় ধর্ম-দর্শনকে পরিপুষ্ট করা আমাদের কর্তব্য।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন যে সহস্র সহস্র বছর ধরে বেঁচে আছে তার কারণ ধর্ম ও দর্শন এখানে কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের চর্চ্চার বিষয় নয়, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ সকলে এগুলিকে প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ করে চলেন বলে। এও আমরা লক্ষ্য করেছি যে যখন ধর্ম ও দর্শন কুসংস্কার মুক্ত হয়ে ঠিক পথে চলে তখন সে বিশুদ্ধ স্রোতধারায় পুষ্ট হয়ে এদেশের জাতীয় জীবনের অন্যান্য অঙ্গগুলির—সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, শিল্প, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রভৃতির—নবজাগরণ সুরু হয়। আবার এটাও সত্য যে এই ধর্ম-দর্শন শুধু যে ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে সাহায্য করেছে তা নয়—সমগ্র পৃথিবীর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে তা যুগ যুগ ধরে নানাভাবে প্রভাবিতও সুসমৃদ্ধ করে আসছে। রাত্রির শীতল শিশির বিন্দু যেমন সকলের অলক্ষ্যে অসংখ্য অসংখ্য বৃক্ষলতাকে নিজের রসধারায় পুষ্ট করে বর্ণাঢ্য পত্রপুষ্প ফল-শস্যের দ্বারা পৃথিবীর বুক ভরে দেয় ভারতীয় ধর্ম-দর্শন তেমনি নীরবে, ধীর, স্থির, শান্ত অথচ অব্যর্থ ভাবে নিজের ও বিভিন্ন দেশের আধ্যাত্মিক চিন্তাকে নির্মলতর, মহত্তর করে তুলেছে।* মানব সভ্যতাকে মহনীয় করে তোলার কাজে ভারতীয় ধর্মদর্শনের দান অপরিমেয়। তাই যদি আমরা ভারতকে ভালবাসি, মানুষ জাতিকে ভালবাসি, ভারত সভ্যতা ও মানব সভ্যতার জন্য গর্ববোধ করি তবে আমাদের একটা পবিত্র কর্তব্য হবে নিজের কল্যাণের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য, বিশ্বের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ধর্ম-দর্শনরূপ বহুমূল্য সম্পদকে সাধ্যমত চিন্তার এবং চর্চ্চার দ্বারা, আলোচনা এবং আচরণের দ্বারা, রক্ষা করা, পুষ্ট করা ও প্রচার করা।

* ভারতে বিবেকানন্দ (উদ্বোধন) দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় সমাজ

মানুষ যেদিন প্রথম সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে শিখল, সেদিন থেকেই মানবসভ্যতার সূত্রপাত হয়। তার আগে সে যখন একা একা থাকত, তখন অন্যান্য প্রাণীর মত সব সময়ই তাকে ঘুরতে হত আহারসংগ্রহের প্রচেষ্টায়, সব সময় সজাগ হয়ে থাকতে হত আত্মরক্ষার জন্য। আত্মরক্ষা ও আহার-সংগ্রহাদির সুবিধা হবে বলেই বোধ হয় দলবদ্ধ হয়ে বাস করার ইচ্ছা মানুষের মনে প্রথম জেগেছিল। তা থেকেই ক্রমে পরিবার, বৃহত্তর পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে।

সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার ফলেই মানুষ পশুপালন ও শস্যোৎপাদন করতে শিখেছে, কর্মবিভাগ করতে শিখেছে; ফলে আহারসংস্থান ও আত্মরক্ষা ছাড়া সে অন্যবিষয়ে মন দেবার মত অবকাশ পেয়েছে জীবনে। তারই ফলে উন্নত প্রণালীতে জীবনযাপন করার বহু উপায় সে উদ্ভাবন করেছে। ক্রমে ক্রমে অধিকতর উন্নত ধরণের বাসগৃহ, পোষাক ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে সমাজে। আবার সমাজবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য বহু প্রকার সামাজিক নিয়ম, দেশশাসনপ্রণালী, ব্যবসায় প্রভৃতিও ক্রমে উদ্ভূত ও উন্নত হয়েছে। দৈহিক প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে মানসিক ক্ষেত্রেও ক্রমোন্নতি সাধিত হয়েছে, যার ফলে সৃষ্ট হয়েছে সাহিত্য, দর্শন, চারুকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি। গভীরতর চিন্তা, পবিত্রতা ও একাগ্রতার ফলে মানুষ ক্রমে নিজেকে আরও সূক্ষ্ম স্তরে উন্নীত করেছে, জগৎ ও জীবনের সূক্ষ্মতম সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে। যার ফলে এসেছে ধর্ম, যা মানুষকে দেহজ ও বুদ্ধিজ আনন্দের চেয়েও উচ্চতর আনন্দের সন্ধান ও আস্বাদ দিয়েছে। মনুষ্যসমাজ মনুষ্যজীবনে এই সর্ববিধ আনন্দের প্রয়োজনকেই স্বীকার করে নিয়েছে।

গোটা পৃথিবী জুড়েই সমাজ এভাবে ক্রমোন্নত হয়ে উঠেছে। গোটা পৃথিবী জুড়েই মানুষের সমাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ নিতে নিতে বর্তমান অবস্থায় এলেও সবত্রই মানুষ সমাজব্যবস্থায় মানুষের এই দেহজ, বুদ্ধিজ ও দেহমনাতীত আনন্দ লাভের উপায়গুলিকে স্থান দিয়েছে, মানুষের বৈষয়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়েছে। জাগতিক উন্নতিপ্রচেষ্টা ও ধর্ম উভয়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে গোটা পৃথিবীর

মানবসমাজ। কোথাও বেশী জোর দেওয়া হয়েছে জাগতিক প্রয়োজনের ওপর, কোথাও বা ধর্মের ওপর—এইটুকু যা পার্থক্য।

মানুষের, শুধু মানুষ কেন, সব প্রাণীরই জীবনের সর্ববিধ প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা আনন্দলাভ ও মৃত্যুকে এড়াবার ইচ্ছা। আমরা সকলেই আনন্দ চাই—যে আনন্দধারায় দুঃখের ছেদ নেই, যে আনন্দ সীমাহীন। আর চাই অনন্তকাল ধরে সে আনন্দ উপভোগ করতে। জীবন থেকে দুঃখকষ্টকে কত কমানো যায়, মৃত্যুকে কতখানি এড়িয়ে যাওয়া যায়, তারই প্রচেষ্টায় মানুষের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং একটা ব্যবস্থার পরীক্ষান্তে সেটার দোষত্রুটির সংশোধন করে বা সেটা ত্যাগ করে অন্য একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। আজও মানব-সভ্যতা ও সমাজের এত উন্নত অবস্থাতেও এই পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সব ব্যবস্থারই মূল লক্ষ্য কিন্তু একটিই—কি করে সব মানুষকে জীবনে অধিকতর আনন্দ দেওয়া যায়।

মানুষ এবং সব প্রাণীরই জীবনের মূল প্রেরণা আনন্দলাভ ও মৃত্যুকে এড়িয়ে থাকা হলেও মনুষ্যেতর প্রাণীর দৈহিক আনন্দের ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা নেই। তবে মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী যে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে না, তা নয়। পিপীলিকা ও মৌমাছির সমাজ তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনবদ্য। তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা, কর্মবিভাগ, সমবেতভাবে বাসস্থাননির্মাণ, আহারসংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রতিরক্ষাদির ব্যবস্থা নিখুঁত, সমবেতভাবে শিশুপালনেরও ব্যবস্থা আছে। তাদের জীবনের প্রয়োজন এবং প্রয়োজনবোধও এখানেই সীমিত। তাই যুগ-যুগ ধরে একই ব্যবস্থা চলে আসছে সে সব সমাজে, তার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্তনের চেষ্টা নেই।

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। তার বুদ্ধির বিকাশ অতুলনীয়। সেজন্য তার জাগতিক প্রয়োজনবোধও ক্রমবর্ধমান। জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের আবিষ্কার ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাই মানবসভ্যতার জাগতিক উন্নতিও গগনস্পর্শী হয়ে উঠছে প্রতিদিন।

মানুষের কাছে এ একটা মহান গৌরব সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু এই জাগতিক উন্নতিই কি মানবসভ্যতার সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়? মানুষ কি কেবল পিপীলিকা-সমাজেরই অতি-উন্নত, অতি-বিস্তৃত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে বিপুল-সমৃদ্ধ একটি অবস্থাকে তার উন্নতির শেষ লক্ষ্য করে সন্তুষ্ট থাকতে পারে কখনো? দেহজ ও বুদ্ধিজ আনন্দলাভই কি তার সমাজব্যবস্থার চরম সার্থকতা হতে

পারে কখনো? তার কাছে এর চেয়েও উন্নত অবস্থা আর কিছুই কি নেই? জন্ম-মৃত্যুর সীমায় সীমিত, প্রকৃতির হাতের পুতুলের মত চালিত একটি অনিত্য সত্তাই কি মানুষের অস্তিত্বের সবটা? জীবনের উভয় প্রান্তে মহাশূন্যতাকে মেনে নিয়ে সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই কি মানুষের পরম পুরুষার্থ?

এ প্রশ্ন জেগেছে মানুষের মনে আদিমকাল থেকেই। পৃথিবীর কোন প্রান্তেই মানুষ নিজেকে এত তুচ্ছ বলে মেনে নিতে চায়নি। দেহাতীত সত্তা মানুষের আছে কি না তা নিয়ে অতি গভীরভাবে সে চিন্তা করেছে, সে সত্তা যদি থাকে তাকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছে। আর পৃথিবীর সব দেশেই কয়েকজন মহামানব প্রত্যক্ষ করেছেন যে, সত্য-সত্যই মানুষ দেহের নাশের সঙ্গে বিনষ্ট হয় না, সে স্বরূপতঃ অমর। তাই পৃথিবীর সর্বত্রই উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের এই স্বরূপ-উপলব্ধির পথকে প্রশস্ত করায় উপায়, ধর্ম, স্থান পেয়ে এসেছে।

আধুনিক যুগে কোথাও কোথাও ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজব্যবস্থা গড়া হয়েছে। তবে মনে হয়, এটা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা মাত্র। মানুষ যে উন্নত অবস্থা থেকে পিছিয়ে এসে কেবল দেহজ ও বুদ্ধিজ আনন্দ নিয়ে বেশীদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারবে, তা ভাবাই যায় না।

ভারতীয় সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ

ভারত কিন্তু অতি প্রাচীন কাল থেকেই স্থির সিদ্ধান্ত করে রেখেছে যে ধর্মহীন সমাজকে মানুষের সমাজ বলা যায় না, মানুষ জীবনে যা চায়—চরম আনন্দ ও শান্তি—ধর্মহীন সমাজ তা কখনো দিতে পারে না। ভারতে কয়েক হাজার বছর পূর্বে সত্যদ্রষ্টাগণ জীবনের চরম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, এবং সেই উপলব্ধিকেই জীবনের পরমপ্রাপ্তি বলে জেনেছিলেন বলেই ভারতীয় সমাজকে তাঁরা ধর্মের ভিত্তির ওপর দৃঢমূল করে গড়ে গেছেন, হাজার হাজার বছরের ঝড-ঝাপটাতেও সে ভিত্তি নড়েনি। তাঁরা দেখেছিলেন, কেবল খাওয়া-পরা প্রভৃতির জন্য ভোগ্য বস্তু বাড়িয়ে গেলেই মানুষ শান্তি পায় না, তৃপ্ত হয় না। যার জীবনে আনন্দের জন্য বাইরের জিনিসের চাহিদা যত কম, জীবনে সে তত বেশী আনন্দ, বেশী শান্তি পায়। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ ভাবে বাইরের জিনিস ভোগ করলে মজা পাওয়া যাবে ততক্ষণ তাকে হাজার বোঝালেও সে তো অন্য কথা শুনবে না! তাই

তাকে উচ্চতর আনন্দের আস্বাদ আগে দিতে হবে। ভারতীয় সমাজের নিয়ামকগন তাই সমাজব্যবস্থার মূলে এই দেহাতীত আনন্দ পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছেন। এরই অন্য নাম সমাজকে ধর্ম-ভিত্তিক করা। ভারতের সমাজব্যবস্থা এমন ভাবে গঠিত, যাতে বাল্যকাল থেকেই মানুষের মন জীবনের এই লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, জীবনের প্রতিটি কর্ম তাকে সমাজের এবং নিজের উভয়েরই কল্যাণের পথে চালিত করে। ভারতীয় সমাজের শিক্ষা, বিবাহ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম, জাতিবিভাগ প্রভৃতি সব ব্যবস্থাই এমনভাবে পরিকল্পিত, যাতে মানুষ জাগতিক উন্নতিও ভালভাবে করতে পারে, সমাজের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে, আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও পশুত্বের স্তর থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে, এবং সেখান থেকে দেবত্বের স্তরে উন্নীত করতে পারে। বলা বাহুল্য, সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে হলে কেবল নিজের স্বার্থ নিয়ে থাকলেই চলে না, অপরের জন্য কিছু স্বার্থত্যাগ সকলকেই করতে হয়, ইচ্ছা, না থাকলেও শাসনের ভয়ে করতে হয়। সমাজ ধর্মভিত্তিক হলে স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগী মানুষের সংখ্যা সমাজে বেড়ে যায়। কাজেই ধর্মভিত্তিক সমাজ জাগতিক দিক থেকেও সর্বাধিক কল্যাণকারী।

বিশ্বের চরম সত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সমাজ নিজস্বতা নিয়ে এখনো বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে যুগোপযোগী করে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হয়, ভারতে তা হয়েও এসেছে। তবে মূল সত্যগুলি, মূল নীতিগুলি কখনো পরিবর্তিত হয় না, সেগুলির মূল্যবোধ পরিবর্তন করা চলে না কখনো। কারণ সেগুলির ওপরেই ভারতীয় সমাজসৌধ গঠিত। সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, পরার্থপরতা, ঈশ্বর বিশ্বাস প্রভৃতিই হল ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তি। সাধারণভাবেও এগুলি মানব-জীবনের উর্ধ্বায়নের অবলম্বন।

যুগে যুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজের ওপর বিভিন্ন বিদেশী সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু কখনো তা করতে পারেনি। ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজ বরং সেগুলির ভেতরকার ভাল জিনিসগুলিকে নিজস্ব করে নিয়েছে।

বর্ণ-বিভাগ

অনেকের বিশ্বাস ধর্ম ধর্ম করেই আমাদের জাতটার সর্বনাশ হল, ভারতীয় সমাজের নিয়ামকগণ ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষগুলোকে দুর্বল, অকর্মণ্য করে

ফেলেছেন। এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল, তা আমরা ভারতীয় সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখতে পাই; তার বর্ণবিভাগে, তার চতুরাশ্রম-বিভাগে গার্হস্থ্যজীবনে কর্তব্য কর্মই সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে। ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করেছে সেই কর্তব্য-সম্পাদনকারীর চরিত্রকে, ভাবকে। গীতায় অর্জুন তাঁর কর্তব্যকর্ম যুদ্ধ করবেন না বলায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিদ্রূপ করেছেন, সমগ্র গীতায় কেবল শিখিয়েছেন কি ভাব নিয়ে কর্তব্য করলে কর্তব্য-সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের অন্তরস্থ দেবত্বকে পূর্ণ বিকশিত করতে পারে। ধর্মব্যাধকেও তাঁর কর্তব্য মাংস-বিক্রয় করা ছেড়ে দিতে হয়নি, সেই কাজ করেই শুধু ভাবের পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিলেন।

একসঙ্গে বহুলোক বাস করতে গেলে কর্ম বিভাগ করতেই হয়, সব দেশের সমাজেই তা করে। এই কর্মবিভাগের ফলেই ভারতীয় সমাজ বর্ণ-বিভাগ এবং ক্রমে তা থেকে জাতিবিভাগ সৃষ্ট হয়েছে। 'বর্ণ' শব্দের অর্থ রং। অনেকে মনে করেন বর্ণবিভাগ হয়েছিল প্রথমে দেহ-বর্ণের ভিত্তিতে। আর্যেরা ছিলেন গৌরবর্ণ, এব' অন্যেরা কৃষ্ণকায়। উভয়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত, গুণগত পার্থক্যও ছিল অনেক। তা থেকেই বর্ণবিভাগের সূত্রপাত। কিন্তু বর্ণ-বিভাগ মূলতঃ গুণগত। সব মানুষের স্বভাব একরকম নয়। কেউ কেউ স্বভাবতই ঈশ্বর চিন্তা ক'রে, শাস্ত্র পাঠ নিয়ে জীবন কাটাতে ভালবাসেন। কেউ আবার স্বভাবতই যোদ্ধৃভাবাপন্ন। কারো ব্যবসায়ের দিকে, কারো বা কৃষিকার্যের দিকে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা। আবার অনেকের ভেতর কোন বিশেষ প্রবণতা নেই, যা-হোক একটা কিছু করে জীবনযাত্রা নির্বাহের মত অর্থোপার্জন করতে পারলেই তারা খুশী। এই সব বিভিন্ন স্বভাবের লোকেরা নিজের মনের মত কাজের দিকেই চিরকাল ঝুঁকে থাকে। আজও সারা পৃথিবীতে তাই ই করে মানুষ, সব ক্ষেত্রে হয়ত সফল হয় না— অধ্যাপনা করার ইচ্ছা থাকলেও বাধ্য হয়ে কেরানিগিরি করতে হয়, ব্যবসায় করার ইচ্ছা থাকলেও হয়ত নানা কারণে তা পারে না। মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে ভিত্তি ক'রে গুণগত কর্ম-বিভাগের ফলেই প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিয়েই থাকতেন, ভগবানলাভের চেষ্টা এবং সমাজে উচ্চভাবগুলির পরিবেশনই ছিল তাঁদের জীবনের প্রধান কাজ। স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকতেন তাঁরা। ক্ষত্রিয়দের কাজ দেশ শাসন, প্রজাপালন, রাজ্যরক্ষা

ইত্যাদি। বৈশ্যগণ ব্যবসায়, কৃষিকার্য, গোপালন, ইত্যাদি করতেন। আর শূদ্রগণ এই তিন বর্ণের কাজের সহায়তা করতেন, এঁদের সেবা করতেন, এদের কাছে চাকরি করতেন। এই গুণগত বিভাগ দেখতে গেলে এখনো জগতের সব দেশেই রয়েছে। তবে ভারতে এই বর্ণবিভাগ ক্রমে বংশগত হয়ে পড়ে, যার ফলে এর ভেতর অনেক গুণের সঙ্গে বহু দোষও এসে পড়েছে। এই চারটি বর্ণ বা জাতি ক্রমে মিশ্রিত হয়ে বহু জাতির সৃষ্টি করেছে।

এই বর্ণবিভাগের সুফল ছিল এই যে, বংশানুক্রমে একই কাজ করায় কাজের দক্ষতা বেড়ে যেত। সব চেয়ে বড় কথা, কর্মকে কেবল অর্থোপার্জনের উপায় মাত্র না ভেবে তাকে সমাজসেবা এবং ধর্মেরও অঙ্গরূপ গ্রহণ করার ফলে সমাজের সকল জাতিই একটা মর্যাদা পেত। কারণ সমাজে জুতো সেলাই করার লোক থেকে শুরু ক'রে ব্যবসা করার, রাজনীতি করার, সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান বজায় রাখার—সব রকম কাজ করারই লোক প্রয়োজন। নাইলে সমাজ চলে না। জাতি বিভাগের ফলে এই কাজগুলি ভাগ করে দেওয়া হল—এই জাতির লোক এই কাজ করবে, অন্যজাতির লোক এ কাজ করতে পারবে না। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কমে যায়।

কিন্তু এর কুফলও অনেক। ব্রাহ্মণের বংশে জন্মালেই যে ব্রাহ্মণের গুণ তার থাকবে, সব সময় তা হয় না। কোন ব্রাহ্মণের বা বৈশ্যের বা শূদ্রের ছেলের ঝোঁক রাজনীতি করার দিকে হতে পারে, কোন শূদ্রের ভেতরও ব্রাহ্মণের গুণ থাকতে পারে, বা যেকোন জাতির মধ্যে কারো কারো দক্ষতা ও স্বাভাবিক প্রবণতা থাকতে পারে ব্যবসা করার দিকে। তখন তারা যদি নিজ নিজ সামর্থ্য ও রুচি মত কর্ম নির্বাচন করতে চায়, জাতিভেদ-প্রথা সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বহু ব্যক্তিগত জীবন বিকশিত হওয়ার অধিকার হারায়, সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্বাভাবিকভাবেই। আর অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে প'ড়ে ব্রাহ্মণত্ব, বৈশ্যত্ব প্রভৃতি আদর্শগুলিও খর্ব হয়ে যায়।

তাই-ই হয়েছিল, এবং যখন থেকে কর্মবিভাগ গুণগত না থেকে বংশগত হল, তখন থেকেই আমাদের সমাজের অবনতিও সুরু হল বলা চলে। মানুষ যখন নিজের গুণ-ও সামর্থ্যানুযায়ী নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার হারাল, তখন থেকেই জাতিবিভাগের ঘৃণ্য কুফল দেখা দিতে লাগল। সমাজের নিয়ামকগণ স্বার্থান্ধ হয়ে সেদিন থেকে জাতির সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত

করে দিলেন—অধিকারবৈষম্যের সঙ্গে ভোগবৈষম্যের পথও উন্মুক্ত হল—নিয়ম হল ব্রাহ্মণের ছেলের ভেতর ব্রাহ্মণের কোন গুণ না থাকলেও, এমন কি সে অমানুষ হলেও তাকে সম্মান করতে হবে , আবার শূদ্রের ভিতর মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটলেও সে সমাজে উচ্চ সম্মান পাবে না, মেধাবী হলেও তার মেধাব নিজস্ব পথে প্রকাশের কোন উপায় থাকবে না। এই অধিকার-তারতম্য যখন অতি প্রবল হয়ে উঠল, জাতি ও সমাজ তখন আদর্শচ্যুত হয়ে প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

আধুনিক যুগে এ ভাব কেটে যাচ্ছে। আজ শুধু ভারত কেন, সারা জগৎ থেকেই এই ভোগও অধিকার-তারতম্য বিদায় নেবার পথ ধরেছে। জাতি-বিভাগেব কুফল ভারতীয় সমাজ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই আজ চলে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণগণ চাকরি ক'বে, জুতোর ব্যাবসায় ক'বেও সমাজে অপাংক্তেয় হচ্ছেন না। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে কোন লোক বিদ্যায় বা কর্মদক্ষতায় বা আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ উন্নত হলে আজ সমাজের সর্বত্রই পূজিত হচ্ছেন। বংশের নয়, গুণেরই সম্মান আজ করছে মানুষ।

বর্ণবিভাগেব প্রথম দিকে তাই-ই ছিল। বৈদিক যুগে, যখন জাতিবিভাগ হয়নি, গুণানুসারে একই পরিবাবের লোক বিভিন্ন কাজ করত। যেমন ব্রাহ্মণ ঋষি বামদেব বলছেন, 'আমি স্তোত্রকার, আমার ছেলে বৈদ্য, আমার কন্যা যব ভাঙে। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় শূদ্রেরা বাজমন্ত্রী ছিলেন, কৃষি এবং শিল্পের কাজও করতেন , অর্থাৎ যোগ্যতা থাকলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ম করতে তাঁদের কোন বাধা ছিল না। পৌরাণিক যুগেও এর দৃষ্টান্ত বিরল নয় , পরশুরাম, দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয়ের কর্ম করেছেন। তবে ততদিনে বর্ণবিভাগ গুণগত না থেকে প্রধানতঃ বংশগতই হয়ে এসেছে।

ভারতীয় সমাজে গুণগত বর্ণবিভাগ আবার ফিরে আসছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজের যে মূল আদর্শটি বর্ণবিভাগের মধ্যেও ওতপ্রোত ছিল, সেটি এখনো ফিরে আসার পথ ধরেনি। সেটি হল চতুরাশ্রম-বিভাগ।

চতুরাশ্রম

আগেই আমরা দেখে এসেছি, ভারতীয় সমাজের মূল লক্ষ্য হল মানুষকে ধর্মলাভের পথে, নিজের স্বরূপ-উপলব্ধির পথে, জগৎ ও জীবনের চরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করার পথে এগিয়ে দেওয়া। কারণ ভারতীয় সমাজের ব্যবস্থাপকগণ

প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এই পথেই মানুষের জীবনের যা চরম চাওয়া—মৃত্যুভয় ও দুঃখকষ্টের হাত থেকে অব্যাহতিলাভ এবং ছেদহীন আনন্দলাভ—তা পূর্ণ হতে পারে . এই পথেই জগতে যথার্থ শান্তি, মৈত্রী ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কারণ মানুষ এই পথে যত এগিয়ে যায় ততই সে নিজের ভেতরেই আনন্দের উৎস খুঁজে পায়, আনন্দের জন্য বাইরের কোন কিছুর ওপর তাকে আর নির্ভর করতে হয় না। কাজেই ভোগ্যবস্তু নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা কাড়াকাড়ি করার প্রয়োজন, যা হল সর্বযুগেই সমাজে দেশে এবং জগতে অশান্তি ও সংঘর্ষসৃষ্টির মূল, তার আর থাকে না। এক কথায় তার স্বার্থপরতা ক্রমে কমে যায়। দেহের সুখ-দুঃখকে এমনকি দেহকেও উপেক্ষা করার মত অবলম্বন সে পায়। মানুষের সমাজকে, মানবসভ্যতাকে উন্নত করার জন্য ব্যষ্টিকে উন্নত ধরণের মানুষে পরিণত করা একান্ত প্রয়োজন। তা না করতে পারলে নিরাপত্তার কোন দৃঢ়ভিত্তিও থাকে না , কোন আইন, কোন নীতিই সে নিরাপত্তা দিতে পারে না। সেদিক থেকে দেখলে ভারতীয় সমাজের এই মূল আদর্শের কোন তুলনাই মেলে না। মানুষের দেহাতীত আনন্দময় সত্তায় উন্নয়নের পথ যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, জড়বাদের দৃষ্টিতে তা কল্পনামাত্র মনে হলেও তা যুগ যুগ ধরে সত্যদ্রষ্টাগণ কর্তৃক পরীক্ষিত হয়ে এসেছে। এই সেদিনও শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের সভ্যতা ও সমাজের মূল ভিত্তি এই সত্য-গুলিকে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করে এগুলির অধুনাতন সমর্থন দিয়ে গেছেন।

এই সত্যগুলিকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে দেখলে তার কিছুই বোঝা যাবে না। এই সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের দৃষ্টিতেই ভারতীয় সমাজব্যবস্থার গুণগুলি দোষরূপে প্রতীয়মান হয়।

এই সত্যের ভিত্তিতেই ভারতীয় সমাজের ব্যবস্থাপকগণ চতুরাশ্রম-বিভাগ করে গেছেন, যাতে সব বর্ণের সব লোকই নিজের আত্মিক উন্নতি এবং সমাজেরও জাগতিক প্রয়োজনসিদ্ধি একই সঙ্গে সমভাবে সাধিত করতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ এই উদ্দেশ্যেই অর্জুনকে বলেছেন, 'যুদ্ধও কর, ভগবানকেও স্মরণ কর।' এরই অধুনাতন সমর্থন শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় : 'সংসারের সব কাজ করবে, তবে তাঁর দিকে মন রেখে করবে, তাঁরই সেবা করছি ভেবে করবে।' স্বামীজীর কথা, 'কর্মকে পূজায় রূপান্তরিত কর ;' নিবেদিতার ভাষ্য, 'আমার

ক্ষেত, কারখানা, পাঠগৃহ, সর্বত্রই মন্দিরের বা সাধুর আশ্রমের পরিবেশ গড়ে তোল।'

ভারতীয় সমাজে সমগ্র জীবনটাই এমনভাবে সাজানো ছিল যাতে ব্যক্তিগত উন্নতিলাভ এবং সমাজসেবা দুই ই অব্যাহত থাকে। এই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারটি ভাগে জীবন ভাগ করা ছিল। প্রত্যেকটিকেই 'আশ্রম' বলা হত—প্রত্যেকটিই যে সাধনাব ক্ষেত্র, একথা স্মরণ রাখার জন্য। সমগ্র জীবনই সাধনা। পূর্ণতালাভের লক্ষ্যে পৌছবার জন্য আজীবন আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।

ছেলেবেলায় বিদ্যাভ্যাস করা প্রয়োজন, যাতে বড় হয়ে সমাজের প্রয়োজনীয় কাজগুলি করাব দক্ষতা লাভ করা যায়। কিন্তু দক্ষতা থাকলেই সে-মানুষ যে সমাজের কল্যাণ করবেই, তার কোন নিশ্চয়তা তো নাই। আজকাল তো আমরা দেখতেই পাই, শিক্ষিত ব্যক্তিবাও অনেকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরেব অকল্যাণ করতে কুণ্ঠিত হন না। সেজন্য পার্থিব বিদ্যালাভের সঙ্গে বিদ্যার্থীর মনে যাতে আদর্শানুরাগ, সাহস, মানবপ্রেম বেড়ে যায়, সে যাতে পরার্থপব, সচ্চরিত্র ও নীতিপরায়ণ হয়, ঈশ্ববিশ্বাসী হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হত সমভাবে। সেজন্য পরা ও অপরা বিদ্যা দুই-ই শিক্ষা দেওয়া হত। এই উভয়বিধ শিক্ষা লাভ সে করত ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে। ছাত্রজীবন তাব অতিবাহিত হত সেখানেই।

তাবপর শিক্ষান্তে সে প্রবেশ করত গার্হস্থ্য আশ্রমে। গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের জন্য ব্রহ্মচর্য আশ্রম ত্যাগকালে গুরু বা শিক্ষক কৃতবিদ্য ছাত্রগণকে যে উপদেশ দিতেন, ভারতীয় সমাজের জীবদানর্শ সেই কথাগুলিতে সুস্পষ্ট।

তৈত্তিরীয় উপনিষদেব সেই কথাগুলির ছন্দানুবাদ এখানে দেওয়া হল :

হবে সত্যবাদী, ধর্ম-অনুষ্ঠানে রত
রবে সদা, শাস্ত্রপাঠে থেকো না বিরত।
নিন্দিত, অভদ্র কর্ম ক'রোনা কখনো,
আমরা আচাযগণও হেন আচরণ
করি যদি, যাহা নয় শিষ্টজনোচিত,
যাহা নয় সদাচার—রহিবে বিরত
তদনুকরণ হতে; শুধু লবে তাহা
আমাদেরও আচরণে সদাচার যাহা।

শ্রেষ্ঠ যাঁরা, উচ্চাসনে তাঁহাদেরে বরি
লইবে সহজভাবে—সে-আসন হেরি
ঈর্ষাবশে দীর্ঘশ্বাস যেন নাহি ঝরে।
যখন করিবে দান, দিবে শ্রদ্ধাভরে।
জটিল জীবনপথে চলিতে চলিতে
কোন আচরণে কিংবা কোন কর্তব্যেতে
সংশয় যদ্যপি জাগে, তাহলে তখন
দেখিবে অপর সব সুধী-র জীবন,
কেবল পণ্ডিত নয়, শক্তি আছে যাঁর
ভাল মন্দ নিজে নিজে করিতে বিচার,
অপরের দ্বারা যাঁরা হন না চালিত,
ন'ন রুক্ষমতি, ন'ন কামনাতাড়িত—
যাঁরা সদা ধর্মকামী, যাঁহারা ব্রাহ্মণ—
ভগবানে স্থিরমতি, তাঁহারা তখন
তোমার সন্দেহ থাকে সেই আচরণ
সেই কর্ম যেভাবেতে করেন সাধন,
তুমিও তাহাই করো। জীবন তাঁদের
আঁধার ঘুচাবে তব জীবন-পথের।
ইহাই শাস্ত্রের বিধি— ইহাই আদেশ,
বেদ-বেদান্তেরো কথা, এই ই উপদেশ।

এখানে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের পূর্বে কৃতবিদ্য ছাত্রকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা সর্বযুগের সকল সমাজের কল্যাণ কামনায় উপদিষ্ট, সর্বযুগের আত্ম-ও সমাজ-কল্যাণকামী যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তির আচরণের দিশারী।

গার্হস্থ্য আশ্রম হল জীবনের সেই অংশ যেখানে মানুষ সমাজের প্রয়োজন মেটায়। তারপর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম। সংসার থেকে দূরে গিয়ে সে তখন শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকবে। সাধারণতঃ কোন তপোবনে গিয়ে বাস করার রীতি ছিল।

দোষ-গুণ

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় গুণের সঙ্গে একটি দোষও আছে। প্রত্যেককে ধর্মসাধনায় এখানে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। জাতিবিভাগ বা চতুরাশ্রম-

বিভাগ সে-পথে কারো বাধা হয় না কখনো। একই জাতির, এমনকি একই পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তির ধর্মসাধনার পথ বিভিন্ন হতে পারে, তাতে বাধা নেই। তীব্র বৈরাগ্য হলে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করতেও বাধা নেই। ব্যক্তিগত ধর্মসাধনায় ভারতীয় সমাজ অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। এই স্বাধীনতার ফলেই ভারতের ধর্মজীবন অতি উন্নত হয়ে উঠেছে।

সামাজিক বিধি-নিষেধের ব্যাপারে কিন্তু ভারতীয় সমাজ মানুষকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। মানুষের খাওয়া-দাওয়া, আচরণ, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে এত বেশী নিয়ম-শৃঙ্খল যে তার ফলে সামাজিক জীবনে মানুষের স্বাধীনতা প্রায় লোপ পেয়েছে। তার কুফল—সমাজের উন্নতির পথ অবাধ হয় নি, প্রয়োজনের সময় যুগোপযোগী করে সে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে নি।

পাশ্চাত্য সমাজে ঠিক এর বিপরীত। সেখানে ধর্মবিষয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার পথে বাধা রয়েছে, কিন্তু সামাজজীবনে অবাধ স্বাধীনতা। ফলে সেখানকার সমাজ খুবই উন্নত, কিন্তু ধর্মজীবন অনুন্নত।

আমাদের আজ সমাজব্যবস্থার উন্নতিকল্পে পাশ্চাত্য সমাজের সদ্‌গুণগুলি গ্রহণ করতে হবে। অনুকরণ নয়, সেগুলিকে নিজস্ব করে নিতে হবে, নিজের মূল ভাবটিকে বজায় রেখে। এতে পুরনো অনেক ব্যবস্থা ভাঙবে, নতুন ব্যবস্থা অনেক গ'ড়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে, ভারতীয় সমাজের যা মূল ভিত্তি —সত্যানুরাগ, পবিত্রতা, ঈশ্বরবিশ্বাস প্রভৃতি —তা যেন অক্ষুন্ন থাকে। তাহলে যথার্থ অগ্রগতি হবে, উন্নত ভারতীয় সমাজ গড়ে উঠবে। অন্যথায় ভয় আছে, ভারতীয় সমাজ বিনষ্ট হয়ে সেখানে পাশ্চাত্য সমাজই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, অথবা স্বামীজীর ভাষায়, আমরা 'ইতোনষ্ট-স্ততোভ্রষ্টঃ' হয়ে যেতে পারি।

জীবনযাত্রাপ্রণালীর কয়েকটি বিষয়

ভারতীয় সমাজব্যবস্থা যে মূল নীতিগুলিকে ভিত্তি করে গঠিত, তা চিরদিনই এক। কারণ যা সত্য, তার পরিবর্তন হয় না। কিন্তু জীবনে তার প্রয়োগের জন্য যে সব সামাজিক নিয়ম, সেগুলি যুগে যুগেই পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার, বিবাহব্যবস্থা প্রভৃতির পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন যুগে।

বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে মুসলমানদের ভারতে আসার আগে পর্যন্ত ভারতে সেলাই-করা পোষাকের ব্যবহার ছিল না, সাধারণতঃ দু'খানি বস্ত্র

পোষাকের জন্য ব্যবহৃত হত—একখানি কোমরে জড়িয়ে পরা হত, দ্বিতীয়খানি পুরুষগণ উত্তরীয়রূপে এবং স্ত্রীলোকগণ বক্ষাবরণরূপে ব্যবহার করত। সেলাই-করা পোষাকের ব্যবহার সুরু হবার পর প্রথম পায়জামা, জামা ও টুপী ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের পোষাক বিভিন্ন রকম হয়েছে।

প্রাচীন চিত্র ও মূর্তি থেকে, দেবদেবীগণের স্তোত্র থেকে যে সব গহনার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বোঝা যায় স্ত্রীলোকেরা বহুবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। মাথার মুকুট থেকে পায়ের নুপূর পর্যন্ত অসংখ্য অলঙ্কারের কথা জানা যায়। সাধারণতঃ সোনা এবং মূল্যবান প্রস্তর অলঙ্কারে ব্যবহৃত হত।

পুরুষেরা অঙ্গুরীয় এবং বাহু ও কর্ণে কুণ্ডল ব্যবহার করতেন। গলায় হারও পরতেন। গলায়, মাথায় ফুলের মালা পরা খুবই প্রচলিত ছিল।

আহার বিষয়ে ভারতীয় সমাজ খুবই সজাগ। যে সব খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তা নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য যুগে যুগে এর পরিবর্তন হয়েছে, প্রয়োজন-বোধে। বৈদিক যুগে, মহাভারতের ভিতরও গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত থাকার নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ভারতীয় সমাজে ইহা অভক্ষ্য হয়েছে। মদ্যপান প্রাচীন কাল হতেই প্রচলিত আছে; কিন্তু এটা যে দূষণীয়, তাও বলা হয়েছে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণাদির পক্ষে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে আবার কতকগুলি খাদ্য ভক্ষ্য এবং কতকগুলি অভক্ষ্য রূপে চলে আসছে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভারতীয় সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। যজ্ঞস্থান, মন্দিরাদি তো বটেই, বাসস্থান এবং দেহকেও সর্বদা পবিত্র বা মালিন্যমুক্ত বা শুচি রাখার দিকে সমাজের দৃষ্টি প্রখর ছিল। মহাভারতের বর্ণনাতে দেখা যায়, পাচক এবং পরিবেশকগণ স্নান করে, শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করে এবং অঙ্গে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য লেপন করে তবে কাজে যোগ দিতেন। পরিবেশকগণ মাল্য-ধারণ করতেন পরিবেশন করতে যাবার আগে। এই পবিত্রতা রক্ষার জন্য হিন্দুসমাজে বহু বিধি-নিষেধ। কিন্তু কালবশে বর্তমানে তা কতকগুলি হাস্যকর প্রাণহীন নিয়মমাত্রে দাঁড়িয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ দু'একটি কথায় বিষয়টি পরিস্ফুট করেছেন; যেমন, শুচিতার জন্যই স্নান করা, কিন্তু "আমাদের জল ঢাললেই হল, তা তেলই বেড়-বেড় করুক, আর ময়লাই লেগে থাকুক।" "ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচতে দিই!"

উৎসব

ভারতীয় সমাজে উৎসবের অন্ত নাই। ব্যক্তিগত জীবনে অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, বিবাহাদি ছাড়াও পূর্বকালের বহুবিধ যজ্ঞ এবং বর্তমানকালের পূজা ও পার্বণাদি বহু লোককে একত্র সমবেত হয়ে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার একটা সুযোগ দেয়। বড় বড় উৎসবে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের যোগ দেবার ব্যবস্থা আছে, সকলে যথোচিত সম্মানিতও হয় সেখানে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শূদ্র, বৈশ্য. প্রভৃতি সর্বশ্রেণার লোকই এসেছিলেন এবং সকলকেই সম্মান ও অর্থাদিদানে পরিতুষ্ট করা হয়েছিল—মহাভারতে এ বর্ণনা পাওয়াযায়। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দুর্গোৎসব উপলক্ষ্য করে সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকই সম্মানিত হতেন, তাঁদের প্রত্যেকের যে পূজার কোন না কোন কাজে অংশ রয়েছে তা অনুভব করতেন। পল্লীগ্রামে সমগ্র গ্রামবাসীদের মধ্যেই একটি আত্মীয়তাবোধ গড়ে উঠত এই উপলক্ষ্যে। আনন্দেরও সমান অংশীদার হতেন সবাই। তাছাড়া যাত্রা কথকতা প্রভৃতিরও খুবই প্রচলন ছিল। সাধারণতঃ কোন পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করে এসব হত বলে জনসাধারণ এগুলির মাধ্যমে আনন্দলাভ ও শিক্ষালাভ দুই-ই করতেন। ভারতের জাতীয় আদর্শকে জনসাধারণের জীবনে সম্প্রসারিত করে দিত এই সব যাত্রা ও কথকতা। আধুনিক যুগের একজন মনীষী, আর্নল্ড টয়েনবী, পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলেছেন, কোন জাতি তার নিজস্ব সভ্যতা নিয়ে কতদিন বেঁচে থাকবে তা সে-জাতির মধ্যে কতজন উচ্চচিন্তাশীল ব্যক্তি জন্মেছেন। তার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সমাজের সর্বস্তরের লোকের কাছে সেই উচ্চচিন্তাগুলি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কিরূপ তার ওপর। আমাদের সভ্যতা ও সমাজের নিয়ামকেরা এ সত্যটি জানতেন। মহাভারতে স্পষ্ট লেখা আছে, "বেদকে পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতির দ্বারা বর্ধিত করবে, নইলে সাধারণ লোক বেদকে প্রহার করবে", অর্থাৎ বুঝতে না পেরে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। ঋষিরা সত্য প্রত্যক্ষ করে তার কথা বেদে লিখে গেছেন—বেদান্তে সেই চরম সত্যগুলি রয়েছে। সাধারণ লোক তা ধারণা করতে পারে না। সেজন্য সেই সত্যগুলিকেই ইতিহাস, উপাখ্যান প্রভৃতির মাধ্যমে পুরাণে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্প ছেলে-বুড়ো সবাই ভালবাসে। সবাই গল্পের আকর্ষণে কথকতা প্রভৃতি শুনতে আসবে, যাত্রা দেখতে আসবে, আর তার ভেতর থেকেই আমাদের সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ সত্যগুলিকে

মনে গেঁথে নিয়েও যাবে। এভাবেই আমাদের দেশে সমাজে ভাব-সম্প্রসারণের সুব্যবস্থা ছিল, যার ফলে এতকাল এত বৈদেশিক ভাবের প্লাবন সত্ত্বেও আমাদের সভ্যতা ও সমাজ কয়েক হাজার বছর ধরে নিজস্বতা নিয়ে বেঁচে আছে। আমাদের সমাজের উৎসবাদি কেবল স্ফূর্তির ব্যাপার নয়, তার সঙ্গে সহজে উচ্চভাব পরিবেশনেরও একটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা।

বিবাহ

ভারতীয় সমাজে বিবাহকে অতি পবিত্র বলে ভাবা হয়। বিবাহিত জীবন কেবল ভোগের জন্য নয়, এর মাধ্যমেও মানুষ যাতে পূর্ণত্বলাভের দিকেই এগিয়ে যেতে পারে, সেই দৃষ্টিতেই বিবাহকে দেখা হয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংযত আচরণ ছাড়া মানুষ কখনো পূর্ণত্বলাভ করতে পারে না, নিজের দেহাতীত আনন্দময় অমর স্বরূপ উপলব্ধি করে জীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে না। সেই দৃষ্টিতে বিবাহিত জীবনকে দেখে আমাদের সমাজে পবিত্রতা ও সতীত্বের আদর্শকে অতি উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি মহীয়সী নারীগণ আজও ভারতীয় নারীত্বের সর্বোচ্চ আদর্শরূপে পূজিতা।

বিবাহের ব্যাপারে ভারতীয় সমাজে বহু বিধি-নিষেধ। বিভিন্ন বর্ণের লোকের পরস্পরের সঙ্গে বিবাহের ফলে বহু জাতির সৃষ্টি হলেও সমাজে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। উচ্চবর্ণের মধ্যেও বিবাহে বহু নিষেধ, গোত্র, প্রবর প্রভৃতি বহু বিষয় সেখানে বিচার্য। গোত্র মানে বংশ। প্রধানতঃ চব্বিশ জন ঋষির বংশধরগণ বিভিন্ন গোত্রের নামে পরিচিত।

আধুনিক যুগে বিবাহের এই বিধিনিষেধের বন্ধন সমাজে শিথিল হয়ে আসছে।

সমাজে নারীর স্থান ও স্ত্রীশিক্ষা

প্রাচীনকালে সমাজে নারীগণ শিক্ষা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে পুরুষের সমানাধিকার পেতেন। অনেকে ত্যাগের জীবন বরণ করে 'ঋষি' রূপে পূজিতাও হয়ে আসছেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষীগণের এবং মেধা, অপালা প্রভৃতি বহু নারী-ঋষির নাম বেদে পাওয়া যায়; রাজর্ষি জনকের সভায় আমন্ত্রিত ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে গার্গী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। পরবর্তী কালেও বহু নারীর ত্যাগের পথ বরণ করার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। রাজা অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা বৌদ্ধভিক্ষুণী হয়ে সিংহলে ধর্মপ্রচারে

গিয়েছিলেন। রাজ্যশাসন-দক্ষতা ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠাও দেখিয়েছেন বহু নারী, প্রভাবতী গুপ্ত, ঝান্সীর রানী, পদ্মিনী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া অসংখ্য ভারতীয় নারী অজ্ঞাত, অখ্যাত থেকে সমাজের সর্বত্র যুগে যুগে ভারতীয় নারীত্বের আদর্শকে জীবনে ফুটিয়ে তুলেছেন পবিত্রতা ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে। তাঁরাই ভারতীয় সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এতদিন। তাঁদের জীবন থেকেই জীবনান্তরে বাহিত হয়ে এসেছে এ আদর্শ। জাতীয় চরিত্রগঠনে তাঁদের দান অপরিসীম, ভারতীয় পরিবারের শান্তিময় পরিবেশরক্ষার কাজেও। এই সব বিমলচরিত্রা উন্নতমনা জননীগণের কোল আলো করেই যুগে যুগে ভারতে অসংখ্য মহামানব এসেছেন। ভারতকে 'মহামানবের সাগরতীর' করে তুলেছেন ভারতের চিরপ্রণম্য আদর্শনিষ্ঠ জননীগণই।

আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির সময় হতেই নারীগণ অবহেলিতা ও লাঞ্ছিতা হন, এবং বহু অধিকার হতে বঞ্চিতা হতে থাকেন। আধুনিক যুগে স্ত্রীশিক্ষার ক্রমপ্রসারের ফলে এসব দোষ ক্রমে কেটে যাচ্ছে। তবে আমাদের সজাগ থাকতে হবে, এই করতে গিয়ে আমরা যেন ভারতীয় জাতির পরম সম্পদ, ভারতীয় সমাজের মহত্ত্বের মূলভিত্তি সংযমের আদর্শকে না হারাই, কবির ভাষায়, পরে যেন আক্ষেপ করতে না হয়, "সোনার বাণিজ্যে আমি মণি দিনু ডালি।' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবের মিলন ঘটাতে হবে আমাদের সর্বক্ষেত্রেই, কিন্তু নিজেদের সব শুভকাবা আদর্শকে অটুট রেখে।

সংযুক্ত-পরিবার

সংযুক্ত-পবিবার আমাদের সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য, যা বর্তমান যুগে ক্রমশঃ লোপ পেতে বসেছে। এব মূলেও রয়েছে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ। অনেকটা বর্তমান সমাজবাদের মূল অর্থনৈতিক আদর্শের মতোই। পরিবারে যারা যা উপার্জন করতে পার, বা অন্যভাবে পরিবারকে সাহায্য করতে পার কর, আর প্রয়োজন যার যা আছে, তাও পরিবার থেকে সাম্যের ভিত্তিতে নাও, তুমি বেশী উপার্জন করতে পার বলে বেশী ভোগ করবে, আর তোমার ভায়ের উপার্জন কম বলে বা সে শারীরিক কারণে অক্ষম বলে, অথবা পিতা বৃদ্ধ অকর্মণ্য হয়েছেন বলে বঞ্চিত হবেন, তা চলবে না। এই সংযুক্ত-পরিবারের ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। তবে মনে হয় ভালর দিকই বেশী। বিশেষ করে, পাশ্চাত্ত্য সমাজে বৃদ্ধ মাতা-পিতার জীবন দুর্বিষহ। নিঃসঙ্গ

জীবন যাপন করতে হয় তাঁদের। ছেলেরা বিবাহের পরই আলাদা হয়ে সংসার করে। আমাদের সমাজে কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতার সম্মান ও স্থান পরিবারে সর্বোচ্চে।

ভারতের আদর্শ 'ত্যাগ ও সেবার' ওপর ভারতীয় সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। এখানে সামাজিক সম্পর্ক পরস্পরের প্রতি কর্তব্যের মাধ্যমে সুসম্বদ্ধ। রাজার প্রজার প্রতি, প্রজার রাজার প্রতি কর্তব্য ; মাতা-পিতার পুত্রের প্রতি, পুত্রের মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য ; প্রতিবেশীর প্রতি, আমাদের পূর্বগ মনীষীদের প্রতি, এমন কি পশুপক্ষীর প্রতিও কর্তব্য—ইত্যাদি কর্তব্যের কথাই আমাদের সমাজনিয়ামকগণ বলে গেছেন। 'দাবী' বলে কিছুই সেখানে নেই। সকলেই যদি নিজ নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে, তাহলে আর দাবীর প্রশ্নই ওঠে না, পরস্পরের কাছ থেকে পরস্পরের যা প্রাপ্য তা এভাবেই পেয়ে যায়, আর অপরের প্রতি নিজের যা কর্তব্য তা পালন না করে কেবল দাবী করার যৌক্তিকতাই বা কোথায় ?

আমাদের বর্তমান কর্তব্য

বর্তমান যুগে বিপুল শক্তি নিয়ে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার, বিশেষ করে ঈশ্বরবিশ্বাসহীন জড়বাদভিত্তিক দেহসর্বস্ব সমাজব্যবস্থার প্লাবন এসে আমাদের সমাজের ওপর তরঙ্গাঘাত করে চলেছে। সে আঘাত আমাদের সমাজব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিতে চাচ্ছে, তার সুদৃঢ় ভিত্তি থেকে সরিয়ে নিতে চাচ্ছে, সমাজব্যবস্থাগুলির মূল্যবোধ পালটে দিতে চাচ্ছে। এখন আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ করতে হবে অতি সতর্ক হয়ে। আমাদের সমাজব্যবস্থায় যেসব দোষ এসেছে সেগুলি বর্জন করতে হবে, পাশ্চাত্ত্য সমাজব্যবস্থার মধ্যে যেগুলি কল্যাণকর সেগুলি গ্রহণও করতে হবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে কখনো যেন আমরা আমাদের সমাজের মূল নীতিগুলিকে বিসর্জন না দিই। তাহলেই আমরা উন্নততর সমাজ গড়ে তুলতে পারব, অথচ তা ভারতীয়ই থাকবে ; সে সমাজ হবে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উন্নতিরই সহায়ক। আমরা যেন মনে না করি যে, কেবল দেহই মানুষের সবটা, অন্যান্য প্রাণীর উন্নতি ও তার উন্নতি একই পথে হতে পারে। পশুত্বকে অতিক্রম করেই আমরা মানুষ হয়েছি, এবং অসংখ্য মানুষ দেবত্বে নিজেদের উন্নীত করে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, মানব-জাতির উন্নতি বলতে দেবত্বের দিকে তার অগ্রগমনই বোঝায়। ভারত মানুষের এরূপ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই

সমাজব্যবস্থাগুলির মূল্যনির্ণয় করেছে, কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তা বলে গেছে। আজ আমরা দৃষ্টিকে জড়ের সীমায় সীমিত ক'রে বিভ্রান্ত হয়ে যেন মানবজাতির উন্নত অবস্থা থেকে পশ্চাৎ-গমনের আদর্শকে বড় আদর্শ ভেবে তার ভিত্তিতে আমাদের সমাজব্যবস্থাগুলির মূল্যনির্ধারণ করতে না যাই। সব কিছু ভাল করে বুঝে তবে যেন কোন প্রাচীন সমাজব্যবস্থাকে বর্জন বা নতুন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে অগ্রসর হই।

ধর্মই আমাদের সমাজের ভিত্তি। যথার্থ ধর্ম মানুষকে নিঃস্বার্থপর ক'রে আদর্শ সমাজসেবক রূপেই গড়ে তোলে, আবার তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের পথেও সহায়ক হয়। এই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে প্রেমের পথেই, ঈশ্বর-জ্ঞানে মানবসেবার পথেই আমাদের সমাজ থেকে ভোগ-ও অধিকার-বৈষম্য দূর করতে হবে, ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়।

জগতের সর্বাধিক উন্নতিশীল সমাজের মতোই আমাদের জাগতিক বিষয়ে উন্নত হতে হবে, আবার সেই সঙ্গে সমাজকে করতে হবে দেবতুল্য মানুষের সমাজ।

গ্রন্থপঞ্জী:

স্বামী বিবেকানন্দের বচনাবলী ছাড়া নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

১। ভারতীয় সংস্কৃতি: স্বামী অভেদানন্দ

২। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস: ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ

৩। Ancient India B G. Gokhale, Ph. D

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা

ভূমিকা—ভারত-ভারতীর জীবনাদর্শ রূপায়ণের উপায় তার শিক্ষা ব্যবস্থা। ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর চরম লক্ষ্য মুক্তি। সুখ-দুঃখ মিশ্রিত জীবন প্রহেলিকার অন্তরালে ফল্গুধারার ন্যায় প্রবহমান সকল শৌর্যবীর্যের আকর মানুষের সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। জন্ম মৃত্যুর অতীত আনন্দময় চৈতন্যঘন সত্তাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। সুপ্ত অনন্তশক্তির আধার এই স্বরূপসত্তাকে উদ্ঘাটিত করাই ভারত-বাসীর লক্ষ্য। কারণ এই স্বরূপ উদ্ঘাটনেই জাগতিক ক্ষুদ্রতা দীনতা থেকে চিরমুক্তি ঘটে। সীমিত সত্তার বাঁধন ভেঙ্গে ভূমার সুখ লাভই মানুষের কাম্য। প্রত্যেক মানুষ তার সামর্থ্য-অনুযায়ী ভূমার সুখলাভে যাতে অধিককৃতকার্য হতে পারে, সেই ব্যবস্থাই করেছে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা।

শিক্ষা ও তার উদ্দেশ্য

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছেন, "সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে, বাইরে নয়। যা'কে আমরা প্রকৃতি বলি, তা একখানি প্রতিচ্ছবির আরশি। আমরা যাকে শক্তি প্রকৃতির রহস্য এবং বল বলি, সমস্তই অন্তর্নিহিত। বহির্জগতে কতকগুলি ধারাবাহিক পরিবর্তন মাত্র। প্রকৃতিতে কোন জ্ঞান নেই, সমস্ত জ্ঞান মানুষের আত্মা থেকে আসে। মানুষ জ্ঞান প্রকাশ করে। তার অন্তরের শক্তিকে উদ্ঘাটিত করে—যা আগে থেকেই অনন্তকাল যাবৎ রয়েছে। মানুষের ভেতর অনন্তশক্তি, অনন্ত পবিত্রতা ও অনন্তগুণ বিদ্যমান। আপাতক্ষুদ্র সীমিত প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে বিরাট সম্ভাবনা। প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। যখন মানুষ 'শিক্ষা' করে, সে প্রকৃত পক্ষে নিজের মধ্যে বিদ্যমান জ্ঞান-আকরের অল্প-অল্প আবিষ্কার করে মাত্র। ধারাবাহিকভাবে-এ আবিষ্করণ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত হবার অনুপ্রেরণা শিক্ষার্থীর ভেতর সঞ্চারিত করাই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

ক্রমবিকাশ—স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে সামান্য কিছু পরিবর্তিত হলেও শিক্ষার মূল তত্ত্বটি প্রায় অবিকৃতভাবে বৈদিকযুগ থেকে আজ অবধি প্রকট হয়ে আছে। এভাবে সকল শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমসূত্রে গেঁথে রেখে জাতির জীবন-জমিতে প্রাণরস সঞ্চার করে চলেছে এ তত্ত্ব। অন্যভাবে বলা চলে, শিক্ষা হচ্ছে একটি উপায়, যার সাহায্যে সমাজ তার ভাবধারা, ঐতিহ্য ও অর্জিত

অভিজ্ঞতা পরবর্তী বংশধরগণকে অর্পণ করে। রক্ষণশীলতা একটি জৈবিক ধর্ম। রক্ষণশীল সমাজ তার নিজ সত্তা অক্ষত ও ঐতিহ্য অটুট রাখার জন্য এবং ভবিষ্যৎ সমাজকে অভীপ্সিত লক্ষ্যে পরিচালনার জন্য নবীনদের প্রয়োজন মত শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করে। যুগযুগান্ত ধরে মানব জাতির অর্জিত অমূল্য সম্পদ বহন করে চলেছে শিক্ষানদী, আর শিক্ষানদী-বাহিত জাতির প্রাণশক্তি আহরণ করে মানুষ ব্যষ্টিজীবনে হয়েছে প্রতিষ্ঠিত, এনেছে অভ্যুদয়, পেয়েছে যোগ্যতার অধিকার, দিয়েছে মুক্তির সন্ধান। অপরদিকে সমষ্টি জীবনে লাভ করেছে পুষ্টি ও সমৃদ্ধি। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে শিক্ষানদী তার নিজস্ব ধারায় বয়ে চলেছে। তার অমৃতরসে পুষ্ট হয়ে মহাকাল যে সাফল্য নগরীর পত্তন করেছে, তার প্রধান সড়ক দিয়ে পরিক্রমা করলে দেখা যাবে ভারতীয় শিক্ষা সম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি, বিশ্বের জ্ঞান সমুদ্রে ভারতীয় জ্ঞান গঙ্গার অবদান কতটুকু, এবং বিশ্ব দরবারে ভারত-ভারতীর স্থানই বা কোথায়?

সুপ্রাচীন কালে ভারতের সমাজ ছিল চারবর্ণে বিভক্ত। 'বৃ' ধাতুর অর্থ বেছে নেওয়া, বরণ করা, যা বরণ করে নেওয়া হয় তাই বর্ণ। জীবিকা অর্জনের জন্য যে বৃত্তি বেছে নিত, তা দিয়ে বর্ণ নির্দ্ধারিত হত। সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন ও ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষ তার বৃত্তি বেছে নিত। এভাবে সৃষ্টি হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ। ব্যক্তিগতক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-এই চার আশ্রমে বিভক্ত ছিল মানুষের জীবন। ব্রহ্মচর্য আশ্রম হল জীবন-প্রস্তুতি বা শিক্ষার কাল, গার্হস্থ্য হল গৃহীরূপে সমাজের সেবা করার কাল, বাণ প্রস্থ, কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে সামাজিক বন্ধন শিথিল করে বিদায় নেবার প্রস্তুতি, সর্বশেষে সকল বন্ধন মুক্ত হয়ে মুক্তি লাভের জন্য প্রচেষ্টা হল সন্ন্যাস। ভারতের জীবন পরিকল্পনাটি ঠিকভাবে বুঝতে না পারলে তার শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের জীবন-বিজ্ঞানাগারে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে যে অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে ছিল, তাকে কয়েকটি যুগে ভাগ করা যাক। বৈদিক যুগ (খৃঃ পূঃ ১০০০ সন পর্যন্ত), উপনিষদ্ ও মহাকাব্যের যুগ (খৃঃ পূঃ ১০০০ থেকে ২০০ খৃঃ) ধর্ম শাস্ত্রের কাল খৃঃ পূঃ ২০০ থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দ) এবং পৌরাণিক যুগ (৫০০ থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দ)।

বৈদিক যুগ—প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ব্রহ্মচর্য ভিত্তিক, দৃঢ়চারিত্রিক ভিত্তির উপর জীবন বুনিয়াদ গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। শিক্ষাদাতা ও শিক্ষার্থীর মধ্যে অতি প্রীতির সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য ছিল শিক্ষা

ব্যবস্থার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোমল মতি বালক গৃহত্যাগ করে গুরুগৃহে উপস্থিত হত শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। শিক্ষার্থী সমিধপাণি হয়ে অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ-বহন করে গুরুর নিকট উপস্থিত হত এবং নিবেদন করত হৃদয়ের আকুতি। বাহ্যলক্ষণাদি দেখে ও নাম গোত্র পরিচয় জিজ্ঞেস করে গুরু উপযাচকের যোগ্যতা বিচার করতেন, যোগ্য বিবেচিত হলে তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতেন গুরুত্বপূর্ণ উপনয়ন" নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। শিশুর পাঁচ বছর বয়সে কোন এক শুভদিনে 'বিদ্যারম্ভ" সংস্কার দ্বারা অক্ষর পরিচয় সুরুহত, অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে পাটিগণিত ও শিখানো হত, কিন্তু সুপরিকল্পিত শিক্ষাদীক্ষা আরম্ভ হত উপনয়নের পর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য — এই তিনবর্ণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল বাধ্যতামূলক। গুরুগৃহে আচার্য ও আচার্যপত্নী শিক্ষার্থীর পিতামাতার স্থান গ্রহণ করতেন এবং শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন্ কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। সেকালে শিক্ষাছিল সম্পূর্ণরূপে গুরুকেন্দ্রিক। ছত্র বা ছাতা যেমন রৌদ্র বর্ষা থেকে রক্ষা করে, শিক্ষার্থী তেমনি আচার্যের পার্শ্বে থেকে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করত, তাই তারা ছাত্র, বিদ্যার্থী, শৈক্ষঃ, শিষ্য ইত্যাদি নামে অভিহিত হত। শিষ্যরূপে গৃহীত হওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীর নাম মানবক। উপনয়ন সংস্কার দ্বারা শিষ্যরূপে গৃহীত হবার পর সে হত অন্তেবাসী। প্রাক্তন-ছাত্রের নাম ছিল প্রান্তেবাসী এবং যে সকল স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী দেশবিদেশে পরিভ্রমণ করে বিদ্যা মধু মাধুকরী করত তাদের বলা হত চরক, শিক্ষা-সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দান করে গৃহে প্রত্যাবর্তনকারী বিদ্যার্থীদের নাম হত উপকুর্বাস, আর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জ্ঞানসাধনাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে আচার্যের সান্নিধ্যেই আজীবন কাটাত।

আচার্যও তিনিই হতেন, যিনি সমাজের আদর্শ-স্থানীয় সৎ, পবিত্র, চরিত্রবান ও জ্ঞাননিষ্ঠ। যে কয়জন শিক্ষার্থীর দায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ সেই কয়জন-কেই তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করে, উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে কোনকিছু গোপন না করে সকল বিদ্যা সমর্পন করাই ছিল আচার্যের ধর্ম। আচার্য ছিলেন চলমান গ্রন্থাগার, তিনি ছিলেন সৃজনী শক্তির উৎস। শিক্ষাদাতার যোগ্যতা অনুসারে শ্রেণী বিভাগ ছিল। শিক্ষাদাতার সাধারণ নাম ছিল অধ্যাপক। বেদের অংশ বিশেষের শিক্ষাদাতাকে বলা হত উপাধ্যায়। প্রাচীন অধ্যাপকগণ যোগ্যতা বলে হতেন প্রাধ্যাপক। বেদ ব্যাখ্যাতাগণঃ প্রবক্তা নামে পরিচিত হতেন। শাস্ত্র ও ধর্মানুষ্ঠানের শিক্ষাদাতাগণকে বলা হত গুরু। গুরুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও

সম্মানিত ছিলেন আচার্য, যিনি সাধারণতঃ সমগ্র বেদ শিক্ষাদানের অধিকারী ছিলেন। শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ প্রাচার্য নামে সম্মানিত হতেন।

শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দিনের পাঠ শুরু হত। আচার্য প্রতি উপদেশের প্রথমে 'ওঁ' এবং শেষে 'ইতি' উচ্চারণ করে পাঠের প্রতিটিশব্দ উচ্চকণ্ঠে সুস্পষ্টভাবে বলতেন। বিদ্যার্থীরা বারংবার চেষ্টা করে উচ্চারণ বিধি সমেত পাঠ আয়ত্ত করত। এখনকার মত পুস্তক না থাকায় সমস্ত পাঠই শুনে শুনে মুখস্থ করতে হত। প্রাথমিক পর্যায়ে মুখস্থ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হত। সাধারণতঃ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা হত। অধ্যাপনার পূর্বে ও পরে গুরু বা আচার্যের চরণ বন্দনা শিষ্যের অবশ্য করণীয় ছিল। প্রতিটি ছাত্রের যোগ্যতা ও প্রবণতা লক্ষ্য করে আচার্য শিক্ষা দান করতেন। সাধারণতঃ দেখা যায় চাব-পাঁচ বছরে বিদ্যারম্ভের পর বিদ্যার্থী গুরুর নিকট গিয়ে অন্ততঃ বার বছর অবশ্য শিক্ষানীয় বিষয়গুলি আয়ত্ত করত। তারপর যোগ্য বিদ্যার্থী "চরণে' (তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ে) পাচ বছর উচ্চশিক্ষা অর্জন করত। বিভিন্ন চৈনিক পরিব্রাজকের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, ছ সাত বছরের শিশুর পাঠ সুরু হত "সিদ্ধিরস্তু" গ্রন্থ দিয়ে। ঐ গ্রন্থে উনপঞ্চাশ বর্ণ ও তিন হাজার শ্লোকে দশহাজার শব্দের সঙ্গে ছাত্রকে পবিচিত হতে হত। দ্বিতীয় গ্রন্থ ছিল, হাজার শ্লোকের পানিনিসূত্র। প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল পঞ্চশাস্ত্র—শব্দবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা (শিল্প ও কলার চর্চা) চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা (Logic) ও অধ্যাত্মবিদ্যা। প্রায় তেরো বছর বয়সে এই অবশ্য শিক্ষিতব্য বিষয় আয়ত্ত কববাব পব বিশেষ শিক্ষা আবম্ভ হত। বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শিক্ষা সুবিস্তৃতভাবে দেওয়া হত। শিক্ষাসমাপনান্তে সাধারণতঃ সমাবর্তন সংস্কারের পর শিক্ষার্থীকে বিদ্বৎসভা বা পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সমবেত পণ্ডিতবর্গের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত। সমাবর্তন উৎসবে শিষ্যের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্তব্য বিষয়ে আচার্য "সত্যং বদ, ধর্মং চর" ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করতেন—

সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ।
সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূতৈ ন প্রমদিতব্যম্।
স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥

(সত্য বলবে, ধর্মানুষ্ঠান করবে। অধ্যয়নে প্রমাদ করবে না। সত্য

থেকে বিচ্যুত হইও না। ধর্ম থেকে বিচ্যুত হইও না। আত্মরক্ষা বিষয়ে অনবহিত হইও না। বিভব লাভার্থক মঙ্গলজনক কার্যে প্রমাদগ্রস্ত হইও না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হইও না।)

দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব।
পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব যান্যনবদ্যানি
কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং
সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি।

(দেবকার্য ও পিতৃকার্যে ভ্রান্ত হইও না। মাতা তোমার দেবতা হউক। পিতা তোমার দেবতা হউক। আচার্য তোমার দেবতা হউক। অতিথি তোমার দেবতা হউক। আমাদের যে সকল কর্ম অনিন্দিত তারই অনুষ্ঠান করবে, অন্যগুলির নয়। আমাদের যা সদাচার তাই তোমার অনুষ্ঠেয়, অন্যগুলির নয়।)

শিক্ষনীয় বিষয়কে উপনিষদ দু'ভাগে ভাগ করেছেন—পরাবিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যা আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধান দেয়। অপরাবিদ্যার অন্তর্গতবেদ, বেদাঙ্গ. দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় জাগতিক জ্ঞাতব্য বিষয়। ত্রিবর্ণের সকলেরই শিক্ষনীয় বিষয় প্রাথমিকস্তরে এক হলেও উচ্চস্তরে এক রকম ছিল না। ব্রাহ্মণকুমার, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা নিজের জন্য এবং অপরের জন্য যজ্ঞসম্পাদন বিধি, সংযম, তপস্যা ও বিধিঅনুসারে দান গ্রহণ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে শিক্ষা লাভ করত। ক্ষত্রিয়কুমারের প্রধান শিক্ষনীয় বিষয় ছিল রাজ্য রক্ষা, প্রজাপালন ও কর্মকুশলতা। তাকে শিখতে হত বেদ, ধনুর্বেদ, নীতিশাস্ত্র চিত্রবিদ্যা, লেখার কৌশল ইত্যাদি। বৈশ্যকুমার আর্থনীতিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হত এবং শিখতো কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য কর্ম। শূদ্র কুমারদের শিক্ষনীয় বিষয় ছিল শিল্প কলা, যন্ত্র-নির্মান পদ্ধতি এবং প্রায়োগিক বিদ্যা। প্রাচীন সাহিত্যে সাতাশ রকমের হাতের কাজ শিক্ষাদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারত যে শুধু ধর্ম আর দর্শন শিক্ষা নিয়েই ব্যস্ত ছিল, এমন নয়। জাগতিক উন্নতির শিক্ষাও তখন সমানভাবে চলত। ভারতেই প্রথম গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভব হয়। যজ্ঞবেদীর নির্মাণ প্রণালী থেকে জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছে বলে স্বামীজী মত প্রকাশ করেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মত রাজনীতি ও অর্থনীতির গ্রন্থ যাজ্ঞবল্ক্য এবং মনুসংহিতার মত আইনের গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারতের মত ইতিহাস ও সমাজ দর্শনের গ্রন্থ জগতে বিরল।

ভাগবতে উল্লেখ আছে, শ্রীকৃষ্ণ মুনি সান্দীপনির পাঠশালায় চৌষট্টি প্রকার বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদ ঋষি সনৎ কুমারের নিকট তাঁর অধীতবিদ্যার যে তালিকা দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য। সনৎ কুমারের প্রশ্নের উত্তরে নারদ বললেন, "আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈবউৎপাতবিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদিনির্ধিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষাকল্পাদিবেদাঙ্গ, পদার্থ-বিদ্যা, জীববিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা ও গন্ধর্ববিদ্যা (রসায়ণবিদ্যা)। শিক্ষা করেছি। সাধারণতঃ শ্রাবণী পূর্ণিমা থেকে পৌষমাস পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ মাস বেদাধ্যয়নের কাল হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল।

মহাকাব্যেরযুগ বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলি যথাক্রমে আশ্রম, চরণ, বিদ্যালয়, শিক্ষালয় নামে পরিচিত ছিল। তাছাড়া ও উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে বা রাজদরবারে আয়োজিত হত বাদানুবাদের সভা, আলোচনাচক্র ইত্যাদি। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে গড়ে উঠেছিল আরণ্য বিশ্ববিদ্যালয়। প্রয়াগে ছিল ভরদ্বাজ মুনির বিশ্ববিদ্যালয়, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের আশ্রমে দশহাজার শিক্ষার্থী বিদ্যাগ্রহণ করেছিল। সরযূনদীরশাখা মালিনী নদীরতীরে কুলপতি কণ্বের আশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিরাট শিক্ষা কেন্দ্র। এ সকল প্রখ্যাত তপোবন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিতব্য বিষয় সমূহে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ-দের আকর্ষণে দূরদূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা হত সমবেত। বিভিন্ন চৈনিক পর্যটকের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল পঞ্চশাস্ত্র— শব্দবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা (শিল্প ও কলার চর্চা), চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা (Logic) ও অধ্যাত্মবিদ্যা। প্রায় তেরোবছর বয়সে একপ অবশ্যশিক্ষিতব্য বিষয় আয়ত্ত করার পর বিশেষ শিক্ষাদান আরম্ভ হত। বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক (Theoritical and Practical) শিক্ষা সুবিস্তৃত ও সুন্দর ভাবে দেওয়াহত। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ ভাবধারার প্রভাবে দেশব্যাপী বৌদ্ধিক বিকাশেরজন্য শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার বিপুল আয়োজন সমাজ ও রাষ্ট্র করেছিল।

বৌদ্ধযুগ—বিদ্যাযজ্ঞ ব্যাপকতরভাবে অনুষ্ঠিত হত বৌদ্ধবিহারগুলিতে। খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশশতকে গান্ধার রাজ্যের তক্ষশীলায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতের পূর্ব প্রান্তে নালান্দা এবং পশ্চিম প্রান্তে বল্লভী বিশ্ববিদ্যালয় দেশবিদেশের বিদ্যার্থীদের বিশেষ আকর্ষণ

ছিল। সে সময়ে হিউয়েন সাঙ্‌ সুদূর চীনদেশ থেকে এখানে এসে নালান্দার প্রবীন শিক্ষক শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর নিকট বিভিন্নশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বিক্রমশীলা, সোমপুরী, উদান্তপুব প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধবিহার গুলিতে ও সমানভাবে বিদ্যাচর্চা চলত। এ সকল শিক্ষা কেন্দ্রে জ্ঞানার্জনের জন্য দূর দূরান্ত থেকে প্রাণভয় উপেক্ষা করে জ্ঞানান্বেষী শিক্ষার্থিগণ আসত চীন কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশথেকে।

স্ত্রীশিক্ষা—পরবর্তীকালে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে বহু বিধিনিষেধ আরোপিত হলেও প্রাচীন ভারতে পুরুষের ন্যায় নারীদেরও শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল সমান অধিকার। ব্রহ্মচর্য পালন করে তারাও শিক্ষা গ্রহণ কবত। মেয়েদের আবাসিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে ছাত্রীশালার উল্লেখ করেছেন, পানিনি। যোগ্যতা অর্জন করে নারী-আচার্য আচার্যা নামে পরিচিতা হতেন। উপনিষদের যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী, জাবালা প্রভৃতি বিদুষী নারী বিশ্বের সারস্বত দরবারে অপ্রতিদ্বন্দী হয়ে ছিলেন।

প্রাচীনকালের শিক্ষা ব্যবস্থাব প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সেকালে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মত অর্থেব বিনিময়ে সাধারণতঃ বিদ্যার লেনদেন হত না। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান পদ্ধতির উল্লেখ প্রথমে মহাভারতেই পাওয়া যায় সেকালে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে শিক্ষাদান করে ঋষি ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বেদজ্ঞ ঋষি মন-প্রাণ দিয়ে অকাতরে বিদ্যাদান করতেন। দানের মধ্যে বিদ্যাদানই শ্রেষ্ঠবলে বিবেচিত হত। রাষ্ট্র এবং সমাজ শিক্ষাদাতা আচার্য ও তার পবিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করত। সমাজে প্রভূত সম্মানের অধিকারী ছিলেন আচার্য। সামাজিক উৎসবানুষ্ঠানে উপযুক্তসম্মানের সঙ্গে বিদ্যালোচনার ব্যবস্থা করে বিদ্যাদীপটি শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাজ জীবনের কেন্দ্রস্থলে প্রজ্বলিত রাখা হত। অনেক রাজা আবার নগরের এক অংশে গুণীজ্ঞানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আবাসস্থলের ব্যবস্থা করতেন, তাকে বলা হত ব্রহ্মপুরী। কখনো কখনো এক একটি গ্রাম শুধুমাত্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অগ্রহার নামে পরিচিত এ সকল গ্রামই ছিল বিদ্যাদানের কেন্দ্র, প্রাচীনকালের অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ।

পরাধীন যুগ—

(ক) মুসলমান রাজত্ব—কালপ্রবাহে ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজন্য-বর্গের শক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে এলে সমাজবন্ধনও শিথিল হয়ে পড়ে, বহিঃশত্রুর

আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা ক্ষীণ হতে থাকে। শক, হূন, পাঠান, মোগল প্রভৃতি বৈদেশিক শক্তি ভারতবর্ষের উপর আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। দশমশতকে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে মোগল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, দেশের সমাজ জীবনে প্রবাহিত হয় নবাগত এক সংস্কৃতিক প্রবাহ।

টোল ও মক্তবকেন্দ্রিক শিক্ষা—

বিদেশীয় মুসলমানগণ তাদের আরবী ফারসী ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করতে থাকলে ভারতের শিক্ষাপ্রবাহ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ভিন্ন পথে চলতে থাকে। মুসলমান শাসকগণ নিজেদের ছেলেমেয়েদেব জন্য মক্তবকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রচলন করে নিজেদের আরবীভাষা, ধর্ম এবং রীতিনীতি শিক্ষা দিতে লাগল, অপরদিকে হিন্দু শিক্ষাবিদ্‌গণ হিন্দু বিদ্যাথিদের জন্য টোলকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করলেন। মুসলমানদের ধর্মস্থান মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা। মসজিদের সংলগ্ন স্থাপিত হত তখন মক্তব সেখানে মুসলমান ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষালাভ করত। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাসকল প্রতিষ্ঠিত হল রাজশক্তির অর্থানুকূল্যে। তুঘলক শাসনকালে, বিশেষতঃ ফিরোজ খাঁ তুঘলকের রাজত্বকালে শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ হয়। ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ঐকালে দেশে ত্রিশটি উচ্চশিক্ষা লাভের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। যদিও ঐ সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তথাপি হিন্দু যুবকরাও ক্রমে সেখানে স্থানলাভ করতে থাকে। মহামতি আকবরের রাজত্বকালে সমগ্র রাজকাযে উর্দু ভাষার প্রচলন বাধ্যতামূলক হওয়ায় ঐ ভাষায় শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। প্রবলপ্রতাপ মুসলমান শক্তির রাজত্বকালে নতুন ধরণের শিক্ষাবাবস্থা চালু হওয়ায় দেশের প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন কি বন্ধও হয়ে যায়। তথাপি প্রাচীন ধারায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা রীতিনীতি প্রায় অক্ষতভাবে চলতে থাকে ব্রাহ্মণদের টোল কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায়। জাতীয় প্রাচীন শিক্ষা ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের অবদানই এদিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী।

ইংরেজ রাজত্ব—বিশাল ধনসম্পদের আকার ভারতভূমি অন্যান্য বিদেশীয়দের মত ইউরোপীয় শক্তিসমূহকেও প্রলুব্ধ করে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাজশক্তি ভারতভূমিকে করায়ত্ত করতে সচেষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বণিকদলই হয়ে উঠল ভারতের সর্বময় কর্তা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮১২

খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবাসীর শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। পর বৎসর হতে কোম্পানী এদেশবাসীর শিক্ষার জন্য সামান্য মাত্র অর্থমঞ্জুর করতে থাকে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেকলে সাহেবের পরামর্শানুসারে বৃটিশ শিক্ষানীতি নির্ধারিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষাদি দেশীয় ভাষায় হলেও উচ্চশিক্ষা ইংরেজীভাষায় প্রচলিত হল এবং ঐতিহ্যগত ভারতীয় ভাষার স্থান অধিকার করল পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান। বৃটিশ শিক্ষানীতি অধিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠে ১৮৫৪ খৃঃ Sir charles Wood এর Despatch বা সুপারিশের ভিত্তিতে এবং কয়েকটি অনুসন্ধান ও পরিচালন ব্যবস্থাপক সমিতির সাহাযো। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়। মধ্যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে দেখা দেয় জাতীয় আন্দোলন। নূতন জাতীয়তাবোধ, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিবিধ পরিবতন ও পরিবর্ধন আনয়নে সচেষ্ট হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হলে বিভিন্ন প্রদেশে জনপ্রিয় সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের প্রয়োজনানুসারে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করলেও অর্থাভাবে এবং বিভিন্ন প্রস্তুতির অসুবিধায় এ প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হয় হয়নি। এর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে প্রস্তুত হল ব্যাপক পরিকল্পনা। "সার্জেণ্ট রিপোর্ট" নাম নিয়ে প্রকাশিত হল সে পরিকল্পনা।

বৃটিশ শাসনকালে এদেশে যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয় তা নামমাত্র পরিবর্তিত হয়ে স্বাধীনোত্তর কালেও রাজমর্যাদায় চলে আসছে। এর কার্যকারিতা ও মূল্যায়ণ করলে সংক্ষেপে বলা যায়—এ শিক্ষা ব্যবস্থায় সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভাব, দেশের প্রয়োজন মিটাবার যোগ্যতার অভাব, দেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য ও অবহেলা করা—এ সকল বিরুদ্ধভাবের সমন্বয়ের ফলে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় তার নিজস্ব স্বকীয়ত্ব প্রতিফলিত হয় নি, এমন কি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সুসমঞ্জস মিলন সাধিত হয় নি। সর্বোপরি পরিকল্পনায় ভারতের সামগ্রিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখার অভাবে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মান উন্নয়নে শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। একথা অনস্বীকার্য যে, এ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়াতে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার এদেশের বিদ্যার্থীদের কাছে উন্মুক্ত হয়। দীর্ঘ কয়েকশ বছরে পরাধীন-সমাজ-জীবনে যে জড়তা ও গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠে। ইউরোপীয়দের চেষ্টায় এ দেশের প্রাচীন গৌরবের বস্তু সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, চারুবিদ্যা

প্রভৃতি উদ্ধার লাভ করে পুনরায় আদরনীয় হয়ে উঠে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে লেনদেনের ফলে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে আসে বহুবিধ পরিবর্তন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্র জীবনে সাধিত হয় বহু কল্যাণকর সংস্কার। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এ শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তাদের আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত করা হয়েছে। ভারতীয় সমাজের দিকে লক্ষ্য না দেওয়াতে তৈরী হয়েছে কিছু কেরানী আর মোসাহেব বাবুর দল। স্বামিজী বারবার যে মানুষ গড়ার শিক্ষার (Manmaking education) কথা বলে গেছেন, তা হচ্ছে না। নিজেকে ভুলে আজ সমাজ হয়েছে পুরানুকরণে তৎপর। স্বাধানভাবে চিন্তা করতেও আজ ছাত্রগণ অপারগ। পরীক্ষা-পাশের পর চাকুরী লাভ আর কেরানীদল বৃদ্ধিই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে আজ। এ সম্বন্ধে স্বামিজীর বিখ্যাত উক্তিটি প্রণিধান-যোগ্য—"আমাদের চাই কি জানিস্? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর Science (বিজ্ঞান) পড়ানো, চাই technical education (কারিগরী শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে, লোকে চাকুরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।" এ বিষয়ে আরেকটা দিক লক্ষ্য করা দরকার, দীর্ঘকাল পরাধীন ভারতের হিন্দুসমাজ "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে শিক্ষাব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরেছিল, যে শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রকে তার দুঃসময়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে ভারতীয়তার প্রদীপকে জ্বেলে রেখেছে, সে শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়েছে। বৃটিশ শাসনের অবসানে দেখা যায় দেশের কর্ণধারগণ স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনপন্থী কয়েকটি সংস্কৃত টোলের হাতে সেই সনাতন ধারাকে রক্ষার ভার অর্পণ করেই কর্তব্য শেষ করতে চান। তাতে কোন ভাবেই দেশের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। স্বামিজী দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, গুরুগৃহে বাস আর আজকের জড়বিজ্ঞানের সমন্বয় করতে পারলেই দেশে মানুষ তৈরী হবে। "আর সেই জন্যই 'গুরুগৃহ বাস' ইত্যাদি চাই। চাই western science-এর সঙ্গে বেদান্ত, আর মূল মন্ত্র ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়।

স্বাধীনোত্তর যুগ—

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক স্বাধীনতা করায়ত্ত হওয়ায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠনের সমস্ত দায়িত্ব ও সুযোগ উপস্থিত হয় দেশীয় নেতৃবৃন্দের উপর।

পরপর কয়েকটি কমিশন ও কমিটি স্থাপন করে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের চেষ্টা চলেছে। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে বিখ্যাত কোঠারী কমিশন ১৯৬৬ সালে সুচিন্তিত অভিমত পেশ করেছেন। সমাজ জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন হওয়া দরকার। তাই দেশের জনসাধারণের জীবন, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রেখে আনতে হবে শিক্ষাবিপ্লব। যাবতীয় সামাজিক রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ঔষধ শিক্ষা; স্বামী বিবেকানন্দের এই সুচিন্তিত অভিমত অবলম্বন করে শিক্ষাশক্তির সাহায্যে জাতীয় জীবন সংগঠনের চেষ্টায় নিরত হতে হবে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার দ্রুত উন্নয়ন, কৃষি ও সহযোগী বিজ্ঞানগুলির দ্রুত প্রসারণ করতে হবে, আনতে হবে শিক্ষার সাহায্যে জাতীয় ও সামাজিক সংহতি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যদিয়েই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আধুনিকতার মধ্য দিয়ে ভারতীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে হবে, সামাজিক নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ভারতের প্রাণনদী আধ্যাত্মিকতার পুষ্টিসাধন-দ্বারা জাতীয় জীবনকে বলিষ্ঠ করতে হবে, নবভারতের অন্যতম স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের এই ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ। সংকল্প নিয়েই এগিয়ে চলেছেন দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ। যুগস্রষ্টা ঋষির সুমহতী বাণীর প্রতিধ্বনি শোনা যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মনীষিগণের সুচিন্তিত ভাষণে।

ভারত-ভারতীয় প্রাণপাখীকে বলিষ্ঠ ও শৌর্যশালী করে ভারতের বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারলেই ফিরে আসবে ভারতে হৃত ও লুপ্ত গৌরব, বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে যে ঐশ্বর্যদান করে ভারত মহীয়ান হয়ে আছে—সে ঐশ্বর্য পুনরায় লাভ করে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারবে।

প্রাচীন ভারতীয়-সাহিত্য

যে সমস্ত স্তম্ভের উপর নির্ভর ক'রে কোনও দেশের সংস্কৃতি-সৌধ গ'ড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে সাহিত্য প্রধান। তাই কোনও দেশের সংস্কৃতি বা কৃষ্টির আলোচনা করতে গেলে, সেই দেশের সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক হ'য়ে পড়ে।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা করব এবং প্রাচীন ভারতীয়-সাহিত্য রচিত হ'য়েছে প্রধানতঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায়। এই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা সমূহের অন্যতম। কেবল প্রাচীনতম ভাষা বলেই নয়, এই ভাষায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা এবং বিভিন্ন গ্রন্থের গুণগত উৎকর্ষ সমগ্র ভারতবাসীর গৌরবের সামগ্রী।

ব্যাপক অর্থে সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার প্রত্যেক বিষয়েই পুস্তক রচিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ভাষায়। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, নাটক, কথা, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্যতত্ত্ব, সঙ্গীতবিদ্যা প্রভৃতি মানব চিন্তার কোনও দিকই প্রাচীন ভারতীয় ভাষার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বৈদেশিক আক্রমণে, কালের গ্রাসে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের বহু সাধনার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখনও বহু গ্রন্থ পর্বত গুহায়, মন্দির জঠরে বা অন্য কোথায়ও প্রকাশের আশায় প্রতীক্ষমান। কিন্তু যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, তা যে কোনও দেশের যে কোনও কালের যে কোনও জাতির গৌরবের এবং গর্বের বস্তু।

ভারতীয় সভ্যতার মূল,—'ধর্ম'। তাই এ দেশে সাহিত্যও রচিত হয়েছে প্রথমে ধর্মকে কেন্দ্র করেই। 'বেদ' ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থ। 'বিদ্যতে অনেন ইতি বেদঃ।' এর অর্থ—

"যে শব্দরাশি দ্বারা জ্ঞানাভিন্ন ও সত্তাভিন্ন দেবপ্রমাণক •পরব্রহ্মস্বরূপ সুখকে বিচারপূর্বক লাভ করা যায় তাহাই বেদ।"

উল্লিখিত অর্থটি বিদ্‌ধাতুর সকলপ্রকার অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ ভেদে বিদ্‌ধাতু চারটি—জ্ঞানার্থক, লাভার্থক, সত্তার্থক এবং বিচারার্থক। বেদের

অংশ দুটি (১) মন্ত্র (২) ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ পদ্যে রচিত। এক শ্রেণীর মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। আর এক শ্রেণীর মন্ত্রে দেবতার কাছে পুত্র, পশু, স্বর্গ ইত্যাদির প্রার্থনা জানানো হয়েছে। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত। 'ব্রহ্ম' শব্দের একটি অর্থ 'মন্ত্র'। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভাগে বিভিন্ন মন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং ঐ সকল মন্ত্রের বিভিন্ন যজ্ঞে বিনিয়োগের (প্রয়োগ) কথা আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ

প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণ মনে করেন, বেদ অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় শব্দের অর্থ, যা পুরুষ কর্তৃক রচিত নয়। ভাগ্যবান মনস্বী ঋষিগণ দুশ্চর তপস্যাদির দ্বারা বেদকে দর্শন করেছেন মাত্র। সুতরাং বেদ কর্তৃহীন এবং অনাদি।

সমস্ত ঋষিই কিন্তু আবার বেদ দর্শন করেন নি। ঋষিদের উপদেশের দ্বারা কেউ কেউ বেদ মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছেন। এই সব ঋষিদের ঋষিত্ব শ্রবণ দ্বারা হ'য়েছিল। এবং শ্রবণ দ্বারা বেদ মন্ত্র মানব মনে বিধৃত হ'তো বলেই বেদের অপর নাম শ্রুতি।'

শ্রুতি

বেদের মন্ত্রভাগের কথা উল্লিখিত হ'য়েছে। এই মন্ত্রভাগ আবার তিনটি সংহিতায় বিভক্ত। সংহিতা শব্দের অর্থ সংগ্রহ (compilation)। ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রগুলি পূর্বে অবিভক্তই ছিল। কিন্তু সমাজে যাগযজ্ঞের প্রচারবাহুল্যের ফলে মন্ত্রসকল বিভাজনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

যজ্ঞে প্রথম দিকে চারজন ঋত্বিকের প্রয়োজন হ'তো। (১) হোতা। ইনি মন্ত্রপাঠ দ্বারা দেবতার আহ্বান ক'রতেন। হোতার পাঠ্য মন্ত্রগুলি যাতে সংগৃহীত হয় তার নাম ঋক্ সংহিতা। (২) অধ্বর্যু। ইনি আহুত দেবতার উদ্দেশ্যে 'মন্ত্রপাঠ দ্বারা' অগ্নিতে দ্রব্যাদি আহুতি দিতেন। অধ্বর্যুর পাঠ্য মন্ত্রসকল যাতে সংগৃহীত হয় তাঁর নাম যজুঃ সংহিতা। (৩) উদ্গাতা। ইনি দেবতার প্রীতির জন্যে মন্ত্রে স্বরারোপ ক'রে গান করতেন। যে সংহিতায় উদ্গাতার গেয় মন্ত্রসকল সঙ্কলিত হয়, তারই নাম সাম সংহিতা। চতুর্থ ঋত্বিক হোতা প্রভৃতি তিন ঋত্বিকের ভ্রম প্রমাদাদির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। ইনি 'ব্রহ্মা' নামে পরিচিত ছিলেন। অথর্ব সংহিতা নামে অপর একটি সংহিতাও বিদ্যমান। এই অথর্ব সংহিতায় ঋক্ ও যজুঃ 'এই উভয় মন্ত্রই দৃষ্ট হয়'। এবং এটি গীতিযোগ্যও নয়।

ঋক, সাম যজুঃ ও অথর্ব

সুতরাং বেদের মন্ত্রভাগ ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব—এই চার সংহিতায় বিভক্ত। সাধারণে এই চার নামে চার বেদ বলে থাকে।

শাখা

বেদ গুরু শিষ্য পরম্পরায় অধীত হ'তো। ফলে কালক্রমে বেদের বহু শাখার বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। যেমন ঋক্ বেদের শাকল শাখা, বাস্কল শাখা প্রভৃতি। সামবেদের কৌথুমী শাখা, যজুর্বেদের চরকশাখা, কঠশাখা, কণ্বশাখা, অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখা, শৌণক শাখা ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধ।

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা, যাগযজ্ঞাদির ক্রিয়াপ্রণালীনির্দেশ ইত্যাদির জন্যে বেদের প্রতিটি শাখাধ্যায়িগণেরই একটি করে 'ব্রাহ্মণ' ছিল। এবং এই 'ব্রাহ্মণ'কে অবলম্বন ক'রেই সেই শাখাধ্যায়ী আর্যগণের যাগযাজ্ঞাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হ'তো।

ব্রাহ্মণ

ঋক্ বেদের ব্রাহ্মণ দুটি (১) ঐতরেয় (২) কৌষীতকি। যজুর্বেদের (৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং (৪) শতপথ ব্রাহ্মণ। সাম বেদের (৫) তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ (৬) জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ এবং অথর্ব বেদের (৭) গোপথ ব্রাহ্মণ। এই সাতখানি 'ব্রাহ্মণ'ই অধিক পরিচিত।

আরণ্যক ও উপনিষৎ

'ব্রাহ্মণে'র শেষ অংশ 'আরণ্যক' নামে পরিচিত। গার্হস্থ্যাশ্রম শেষে অরণ্যে নিভৃতে 'আরণ্যক'গুলি পঠিত হতো বলেই তাদের উক্ত নামের সার্থকতা। আরণ্যকের শেষভাগ 'উপনিষৎ'। উপনিষৎ সমূহে পরব্রহ্মতত্ত্ব বিচারিত হয়েছে।

বিভিন্ন বেদের আরণ্যকগুলির মধ্যে ঋক্ বেদের ঐতরেয় এবং সাঙ্খ্যায়ন। যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় এবং বৃহদারণ্যক। সাম বেদের কোনও ব্রাহ্মণের কোনও আরণ্যক পাওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন বেদের সকল শাখার ব্রাহ্মণেরই হয়ত আরণ্যক ছিল না। বেদের অন্তিম এবং সার ভাগ উপনিষৎ। বেদের এই উপনিষৎ ভাগ পরমব্রহ্মের তত্ত্বান্বেষণে নিমগ্ন। বেদের জ্ঞান কাণ্ডের মধুরতম ফল এগুলি।

বহু উপনিষদের নাম পাওয়া গেলেও প্রাচীন এবং প্রামাণিক বোধে শঙ্করাচার্য বারখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন। অনেক পণ্ডিত গুরুত্ব বোধে মৈত্রায়ণীয় উপনিষৎটি যুক্ত করে মোট তেরখানি প্রধান উপনিষৎ বলে স্বীকার করে থাকেন। এইগুলি বেদানুসারে ঐতরেয় এবং

কৌষীতকি। ছান্দোগ্য এবং কেন। তৈত্তিরীয়, কঠ, মৈত্রায়ণীয়, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক এবং ঈশ। প্রশ্ন, মণ্ডুক এবং মাণ্ডুক্য।

বেদাধ্যয়নের সহায়তাকারী শাস্ত্র বেদাঙ্গ নামে খ্যাত। এই শাস্ত্র সংখ্যায় ছয়টি। তাই এদের ষড়ঙ্গও বলা হয়। বেদাঙ্গের নাম শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, এবং জ্যোতিষ। 'শিক্ষা' নামক বেদাঙ্গে বেদের নিভুল উচ্চারণ পদ্ধতি বিবৃত হ'য়েছে। বিস্তীর্ণ এবং জটিল যজ্ঞপ্রণালীর সুসংবদ্ধ সূত্রাকারে সংক্ষিপ্ত সারই 'কল্প'। কল্পসূত্র তিনটি। শ্রৌত, গৃহ্য এবং ধর্ম। 'ব্যাকরণ' শব্দশাস্ত্র। ব্যাকরণজ্ঞানভিন্ন বাক্যের যোগ্যতাদি জ্ঞান অসম্ভব। সুতরাং বেদবাক্যের অর্থবোধের জন্য ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গ প্রয়োজন। বেদাঙ্গান্তর্গত প্রাচীন ব্যাকরণ বর্তমানে লুপ্ত। বৈদিক শব্দের অর্থ এবং তার বিশ্লেষণ আছে 'নিরুক্ত' নামক বেদাঙ্গে। যাস্কের নিরুক্তই বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। 'ছন্দঃ' নামক বেদাঙ্গ ছন্দ বিষয়ক। 'জ্যোতিষ' কালবিজ্ঞান শাস্ত্র। জ্যোতিষ শাস্ত্রের সঙ্গে যাগযজ্ঞাদির নিবিড় সম্বন্ধ। জ্যোতিষের আশ্রয় ব্যতীত কোনও বিশেষ দিনে চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থানাদি জানা সম্ভব নয়। ফলে বিশেষ দিনে বিশেষ ক্ষণে যজ্ঞাদির আরম্ভও অসম্ভব। ফলে জ্যোতিষ একটি অপরিহার্য বেদাঙ্গ রূপে আলোচিত হ'য়েছে বৈদিক যুগে। বেদের এই ষড়ঙ্গ সূত্রাকারে রচিত।

বেদাঙ্গ

প্রথম মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। তন্মধ্যে রামায়ণকে বলা হয় আদিকাব্য। রামায়ণের রচয়িতা আদি কবি বাল্মীকি। নিষাদের শরে ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষ ক্রৌঞ্চটি নিহত হওয়ায় বাল্মীকির মনে যে করুণাঘন ভাব উদ্বেল হয়ে ওঠে, তাই শ্লোকে প্রথম রূপ পরিগ্রহ করে।

রামায়ণ

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

[হে ব্যাধ, তুমি কখনও প্রতিষ্ঠা পাবে না। যেহেতু ক্রৌঞ্চমিথুনের কামমোহিত একটি তুমি বধ করেছ।]

রাম ও রাবণের যুদ্ধই রামায়ণের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের নানাবিধ আদর্শ রামায়ণে বিধৃত রয়েছে বলে এর প্রভাব ভারতীয় জীবনে অপরিসীম। আদর্শ রাজা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ পিতা, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ বন্ধু, এমন কি আদর্শ ভৃত্যের পরিচয় রামায়ণেই লাভ করা যায়। আদর্শ

রাজ্য বলতে ভারতবাসী আজও রাম রাজ্যের স্বপ্ন দেখে। বস্তুতঃ একটি গ্রন্থের এমন সর্বব্যাপী প্রভাব অন্য কোনও দেশে পরিদৃষ্ট হয় নি। বাল্মীকিকে সার্থক আশীর্বাদ ক'রেছিলেন ব্রহ্মা—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

[যতদিন পৃথিবীতে পর্বত এবং নদীসমূহ বর্তমান থাকবে, ততদিন লোকে প্রচারিত থাকবে রামায়ণ কথা।]

রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে পরিপূর্ণ এবং এর শ্লোক সংখ্যা প্রায় চব্বিশ হাজার। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। রামায়ণের আদি এবং উত্তরাকাণ্ড পরবর্তীকালে মূল রামায়ণে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। তাঁদের মতে অযোধ্যাকাণ্ড থেকে যুদ্ধ কাণ্ড বা লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্তই মূল রামায়ণ। প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলার কারণ এই যে উক্ত অংশের রচনাশৈলী ও ভাষার পার্থক্য। তাছাড়া, প্রথম এবং সপ্তম কাণ্ডেই রামকে নারায়ণের অবতাররূপে চিত্রিত করা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য অংশে রাম আদর্শ মানব—'নরচন্দ্রমা।

মহাভারত

মহাভারত ব্যাসদেবের রচনা। মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে লিখিত এবং এর শ্লোক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এই জন্য মহাভারতের অপর নাম শতসাহস্রী সংহিতা। হরিবংশ নামে মহাভারতের একটি পরিশিষ্ট বিদ্যমান। এর শ্লোক সংখ্যা ১৬, ৩৭৪।

কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ মহাভারতের মূল বর্ণনীয়। কিন্তু মূলে আখ্যান ভাগ ছাড়া অন্যান্য বহু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে মহাভারতে। তাই মহাভারত সম্বন্ধে বলা হয়—

"যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই, ভারতে।"
[যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্র চিৎ]

মহাভারতে মূলকাহিনী ছাড়াও বহু কাহিনী বর্ণিত আছে। মহাভারতকে একটি গল্পের ভাণ্ডার বলা যায়। মহাভারতের এই প্রাসঙ্গিক কাহিনীগুলি মানব জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই কাহিনীগুলির মধ্যে রাজা যযাতির উপাখ্যান, নল ও দময়ন্তীর উপাখ্যান, বিদুলার উপাখ্যান, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, কদ্রু ও বিনতার উপাখ্যান, সাবিত্রী ও সত্যবানের উপাখ্যান, শিবির উপাখ্যান

ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় জনগণের জীবনে এবং পরবর্ত্তী ভারতীয় সাহিত্যে এই কাহিনীগুলির প্রভাব অসামান্য।

শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা মহাভারতেরই অংশ এবং ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই তিনের সমন্বয় গীতা। হিন্দু দর্শনের প্রকৃষ্টতম ফল এটি। হিন্দু দর্শনের মতবাদগুলি সরলভাবে শ্লোকে বিবৃত হয়েছে এখানে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রারম্ভে বিপক্ষে আত্মীয় ও গুরুজনদের দেখে বিষণ্ণ ও বিচলিত অর্জুনকে পাণ্ডবসখা-শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন, তাই গীতার উপজীব্য বিষয়।

গীতা

মহাভারত জাতীয় সাহিত্য। জাতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় জাতির সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা—এক কথায় জাতির পরিচয়। ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার অতুলনীয় আকর এই মহাভারত। এ্যানি বেসান্তের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলি—

"The Mahabharata is the greatest poem in the whole world. There is no other poem so splendid as this, so full of what we want to know, and what it is good for us to study." মহাভারত সত্যই মহান ভারতের পরিচয়বাহী।

রামায়ণ ও মহাভারতের পর আসে পুরাণের কথা। পুরাণের মূল অর্থ পুরা কাহিনী। সাধারণ লোকেরা উচ্চদার্শনিক তত্ত্ব বুঝতে পারত না ব'লে গল্পের মাধ্যমে তাদের কাছে ধর্মের মূল ভাবটিকে উপস্থাপিত করবার জন্যেই পুরাণের জন্ম।

পুরাণ

পুরাণের লক্ষণ এই ভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌॥

অর্থাৎ পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ। সর্গ (সৃষ্টি) প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর নতুন সৃষ্টি) বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশ বর্ণনা) মন্বন্তর (মনুগণের শাসন কাল) এবং বংশানুচরিত (নৃপতিগণের বংশের ইতিহাস)।

তবে কোনও কোনও পুরাণে এই পাঁচটি বিষয়ের অধিক বিষয় দেখতে পাওয়া যায়।

এক এক পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন দেবতার যে কোনও

একজনের উপাসনার উপর প্রাধান্য দেওয়া হ'য়েছে। এটিও পুরাণগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মৎস্য পুরাণে পুরাণ সমূহের চারিটি বিভাগ লক্ষিত হয়। (১) রাজসিক (ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে রচিত পুরাণ সমূহ) (২) সাত্ত্বিক (বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত পুরাণ রাজি) (৩) তামসিক (শিবের উদ্দেশ্যে লিখিত পুরাণ) এবং (৪) সংকীর্ণ (এখানে সরস্বতী ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হ'য়েছে)।

সাধারণতঃ পুরাণগুলিকে মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। মহাপুরাণগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং প্রধান। উপপুরাণগুলি অপ্রধান। মহাপুরাণের সংখ্যা আঠার। এদের নাম: (১) ব্রহ্মা (২) বিষ্ণু (৩) শিব (৪) লিঙ্গ (৫) ভাগবত (৬) মার্কণ্ডেয় (৭) ভবিষ্য (৮) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত (৯) বরাহ (১০) স্কন্দ (১১) বামন (১২) মৎস্য (১৩) কূর্ম (১৪) ব্রহ্মাণ্ড (১৫) অগ্নি (১৬) পদ্ম (১৭) গরুড় (১৮) নারদীয়।

উপপুরাণগুলিও সংখ্যায় আঠার। যথা: (১) সনৎকুমার (২) নরসিংহ (৩) বায়ু (৪) শিবধর্ম (৫) আশ্চর্য (৬) নন্দিকেশ্বর (৭) উশনস (৮) কপিল (৯) বরুণ (১০) শাম্ব (১১) কালিকা (১২) মহেশ্বর (১৩) কল্কি (১৪) দেবী (১৫) পরাশর (১৬) মরীচি (১৭) ভাস্কর বা সূর্য এবং (১৮) নারদ।

'চণ্ডী' নামে পরিচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য হিন্দুগণের এক অতি প্রিয় ধর্ম পুস্তক এবং ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুগণের প্রত্যহ পাঠ্য। এখানে আদ্যাশক্তির মহিমা কীর্ত্তিত হ'য়েছে। দ্বাদশস্কন্ধে এবং প্রায় আঠার হাজার শ্লোকে রচিত 'ভাগবত' পুরাণ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। বৈষ্ণবগণের নিকট এই গ্রন্থ অতিশয় শ্রদ্ধেয় এবং প্রামাণ্য. এই গ্রন্থের প্রধান বিষয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবন। বিষ্ণু পুরাণ এবং বায়ু পুরাণও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

পুরাণগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য্য। প্রাচীন রাজবংশ। সমূহের ইতিহাস রচনা করতে গেলে পুরাণগুলিই আমাদের প্রধান অবলম্বন। তাছাড়া, ভারতীয় দর্শন, ধর্মমত, আচার-বিচার, সাধনার কথাতে পুরাণগুলি পরিপূর্ণ। এই সব দিক দিয়েও এদের মূল্য অস্বীকার করবার নয়।

পুরাণগুলি এককালে জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল; কারণ যখন সমাজে স্ত্রীজন, শূদ্র বা আচারহীন ব্রাহ্মণদের বেদে অধিকার ছিল না, তখন পুরাণপাঠ, পুরাণশ্রবণ ইত্যাদির দ্বারা তাদের জীবন যাত্রা নিয়ন্ত্রিত

হতো। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং ধর্মজীবনে পুরাণগুলি যুগ যুগ ধ'রে প্রভাব বিস্তার করেছে।

অনেকের ধারণা মহাকাব্য ও পুরাণের যুগ শেষ হওয়ার পর সংস্কৃত ভাষায় কোনও মৌলিক সাহিত্য রচিত হয় নি। কিন্তু ভাসের নাটকাবলী, অশ্বঘোষের রচনা সমূহ, আর্যশূরের রচনাবলী, তন্ত্রাখ্যায়িকা প্রভৃতি সংশয়হীন-ভাবে প্রমাণ করে যে সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

কলিদাস পূর্ব যুগ

কালিদাস-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের রাজা কনিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি 'বুদ্ধচরিত' 'সৌন্দরানন্দ,' 'সারিপুত্ত প্রকরণ', বজ্রসূচী, 'গণ্ডীস্তোত্রগাথা' 'সূত্রালঙ্কার' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। তবে' 'বুদ্ধ চরিতে'র

অশ্বঘোষ

রচয়িতা হিসাবেই অশ্বঘোষ সমধিক প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনের রচিত 'বুদ্ধচরিত'। আঠারটি সর্গে রচিত 'সৌন্দরানন্দে'র আখ্যান বস্তু হ'লো বৈমাত্রের ভ্রাতা নন্দের (নামান্তর সুন্দরের)—অনিচ্ছাসত্বেও বুদ্ধদেব কর্তৃক স্বধর্মে দীক্ষা। 'গণ্ডীস্তোত্রগাথা' স্রগ্ধরা ছন্দে উনত্রিশটি শ্লোকে রচিত একটি গীতি কবিতা। 'সারিপুত্তপ্রকরণে' সারিপুত্ত ও তাঁর বন্ধু মৌদ্গল্যায়ণের কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

বিষ্ণুশর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র'ও খুব সম্ভবতঃ কালিদাস-পূর্ব যুগের রচনা। গল্পসাহিত্যের এটি বিশিষ্ট সম্পদ। বহু ভাষায় 'পঞ্চতন্ত্রে'র অনুবাদও হ'য়েছে। গুণাঢ্যের 'বৃহৎ কথা'ও কালিদাস-পূর্ব যুগের রচনা। 'বৃহৎ কথা' আর পাওয়া যায় না। তবে 'বৃহৎকথার' বহু কাহিনী সোমদেব পরবর্ত্তী কালে তাঁর 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন।

ভাস

কালিদাস পূর্ববর্ত্তী যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার ছিলেন ভাস। বহুদিন থেকে ভাসের নাম মুখে মুখে চলে আসছিল কিন্তু তাঁর রচিত নাটকের অস্তিত্ব ছিল অজ্ঞাত। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবাঙ্কুরে ভাস রচিত তেরখানি নাটক আবিষ্কার করেন। এই নাটকগুলির নাম—স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ, পঞ্চরাত্র, চারুদত্ত, দূতঘটোৎকচ, অবিমারক, বালচরিত, মধ্যমব্যায়োগ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ, প্রতিমানাটক, অভিষেক নাটক ও দূতবাক্য। এদের মধ্যে অভিষেক নাটক ও প্রতিমানাটক রামায়ণের ঘটনাকে অবলম্বন

ক'রে রচিত। মহাভারতের ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত মধ্যমব্যায়োগ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার ও উরুভঙ্গ। 'বালচরিত' রচিত হ'য়েছে 'হরিবংশের' কৃষ্ণ-উপাখ্যানকে আশ্রয় করে। স্বপ্নবাসবদত্তা, চারুদত্ত, প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ এবং অবিমারক ভাসের কল্পনাশ্রিত। সম্ভবতঃ 'কথাসরিৎ সাগরের' অন্তর্গত আখ্যায়িকালম্বনে রচিত।

কিন্তু এই তেরখানি নাটক ভাসের রচনা কি না—এই বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিল পণ্ডিতদের মধ্যে। কারণ এই নাটকগুলির প্রস্তাবনায় কোথায়ও ভাসের নামোল্লেখ নেই। নবাবিষ্কৃত নাটকগুলি যে ভাসেরই রচনা, তা' একদল পণ্ডিত স্বীকার ক'রতে সম্মত হলেন না। কিন্তু পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রীর মতে এই গুলি সব ভাসের রচনা। এই মতবিরোধের আজও অবসান হয় নি।

ভাসের নাটকগুলির মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্তা'ই কবিত্বগুণে এবং নাট্যগুণে শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র বিয়োগান্ত নাটক "উরুভঙ্গ"।

কালিদাস

ভারতীয় পদ্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস। কালিদাস অশ্বঘোষ ও ভাসের পরবর্ত্তী। প্রসিদ্ধি আছে তিনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন। কালিদাসের জীবনী সম্বন্ধে কিংবদন্তী ব্যতীত আমাদের প্রায় কিছুই জানা নেই। কবি নিজের সম্বন্ধে কোথাও কিছুই লিপিবদ্ধ ক'রে যান নি। কালিদাসের আবির্ভাব কালনির্ণয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ বর্ত্তমান। তবে অনেকে তাঁকে গুপ্ত রাজগণের স্বর্ণযুগের কবি ব'লে অনুমান করেন। খুব সম্ভব তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কালিদাসের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে ঋতুসংহার, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, ও রঘুবংশ সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথম দুটি অর্থাৎ ঋতুসংহার ও মেঘদূত খণ্ডকাব্য। অপর দুটি মহাকাব্য। এ ছাড়া কালিদাসকে নলোদয়, পুষ্পবাণ-বিলাস, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গাররসাষ্টক, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতৃ রূপেও মনে করা হয়। কিন্তু এইগুলি কালিদাসের রচনা কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কালিদাস 'বিক্রমোর্বশী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নামক তিনটি নাটকও রচনা করেন। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের খ্যাতি সর্বাধিক। কালিদাসের রচনায় কোথায়ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা

যায় না। তাঁর ভাষা কোমল ও মধুর। অলঙ্কার প্রয়োগে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। "উপমা কালিদাসস্য"--এই শব্দদুটি যুগ যুগ ধ'রে কালিদাস সম্বন্ধে উচ্চারিত হয়ে আসছে।

কালিদাসোত্তর যুগে লিরিক কাব্য।

কালিদাসোত্তর যুগে কাব্যের ক্ষেত্রে অমরু ও ভর্তৃহরির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। অমরুশতক (সপ্তম শতাব্দী রচনা কাল) শৃঙ্গাররস প্রধান একটি বিখ্যাত শতক কাব্য। ভর্তৃহরির 'শৃঙ্গারশতক,' নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক সুপ্রসিদ্ধ। কোনও পণ্ডিত এই ভর্তৃহরিকে বাক্যপদীয় রচয়িতা ভর্তৃহরি ব'লে অনুমান করেন। এই প্রসঙ্গে বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক' ও 'ময়ূরের সূর্যশতক' উল্লেখনীয়।

বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভায় পাঁচজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। এঁরা হলেন গোবর্ধন, জয়দেব, ধোয়ী, শরণ এবং উমাপতি ধর। শরণ, উমাপতি ধরের বৃহৎ কোনও রচনা এখন পাওয়া যায় না। তবে গোবর্ধনের আর্যসপ্তশতী প্রেমকে বিষয় ক'রে আর্যাছন্দে রচিত সাতশত শ্লোকে অতি সুন্দর কাব্য গ্রন্থ। ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের অনুকরণে দ্বাদশসর্গে রাধাকৃষ্ণের শাশ্বত প্রেমকে উপজীব্য ক'রে জয়দেব রচনা করেন কান্তকোমল পদাবলী 'গীতগোবিন্দ'। ধ্বনিঝঙ্কারে, অনুপ্রাসের সার্থকতায় এবং সঙ্গীতময়তায় গীতগোবিন্দ ভারত প্রতিভার এক অমূল্য সম্পদ। গীতি কবিতা হিসাবে কালিদাসের মেঘদূতের পরেই জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে গীতগোবিন্দের স্থান। ধোয়ীর 'পাবনদূত' মেঘদূতের অনুকরণে রচিত। জানা যায় 'সত্যভামাকৃষ্ণসংবাদ নামে ধোয়ী অপর একটি কাব্যও রচনা করে ছিলেন।

লিরিক কাব্য হিসাবে বিল্‌হণের (একাদশ শতকের শেষভাগ থেকে দ্বাদশশতকের প্রথম ভাগ) 'চৌরপঞ্চাশিকা', কাশ্মীর রাজ জয়াপীড়ের সভাকবি দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনিমত', ঘটকর্পর রচিত ঘটকর্পরকাব্যও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।' 'চৌরপঞ্চাশিকার অবলম্বনেই পরবর্ত্তী কালে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া বৌদ্ধ কবি ধর্মকীর্ত্তি (৭ম শতাব্দী) এবং অষ্টমশতাব্দীর দার্শনিক প্রবর শঙ্করাচার্যও অনেকগুলি সার্থক লিরিক জাতীয় রচনার স্রষ্টা।

কালিদাসোত্তর যুগে মহাকাব্য প্রণেতৃরূপে যশস্বী হয়েছেন ভারবি,, ভট্টি, কুমারদাস, মাঘ ও শ্রীহর্ষ।

অষ্টাদশসর্গে রচিত ভারবির (৬ষ্ঠ শতাব্দী) কিরাতার্জুনীয় সুধীগণের

অতি প্রিয়। অর্জ্জুন কর্তৃক কিরাতবেশী মহাদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করে পাশুপত অস্ত্র লাভ—মহাভারতের এই কাহিনীকে অবলম্বন ক'রেই কিরাতার্জ্জুনীয় রচিত। অর্থগৌরবের জন্য ভারবির প্রসিদ্ধি। কিন্তু তাঁর ভাবের গৌরব উপলব্ধি করা পাঠকদের পক্ষে আয়াস সাধ্য। তাই বলা হয় "নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ।" ভারবির বাক্য নারিকেল ফলের মত। অর্থাৎ উপরের খোসা এবং পরের শক্ত আবরণ অতিক্রম করলে যেমন নারিকেলের সুস্বাদু শাঁস এবং সুমিষ্ট জল লভ্য, তেমনি ভাষার আপাত রুক্ষতা অতিক্রম না করা পর্যন্ত ভারবির কাব্য সৌন্দর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

কালিদাসোত্তর যুগ। মহাকাব্য

বাইশটিসর্গে রচিত ভট্টিকাব্যের (নামান্তর 'রাবণবধ') রচয়িতা ভট্টি। অনেকে বলেন এই ভট্টি এবং বাক্যপদীয় প্রণেতা ভর্তৃহরি একই ব্যক্তি। কাব্যের সুষমার মধ্যে এখানে পরোক্ষভাবে ব্যাকরণ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে পঞ্চবিংশতি সর্গে রচিত জানকীহরণ কুমারদাসের (৬ষ্ঠ শতাব্দী) রচনা। তাঁর কাব্যে উচ্চকল্পনাশক্তির পরিচয় নেই বটে, তবে তাঁকে বলিষ্ঠ বর্ণনামূলক কবি বলা যায়। মাঘ (অষ্টম শতাব্দী) বিংশতি সর্গে তাঁর শিশুপাল বধ মহাকাব্য রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল নিধন কাহিনীই এই কাব্যের বিষয় বস্তু।

মহাভারতের নল ও দময়ন্তীর চিত্তাকর্ষক কাহিনীকে অবলম্বন করে শ্রীহর্ষ (দ্বাদশ শতাব্দী) তাঁর মহৎ সৃষ্টি 'নৈষধ চরিত' রচনা করেন। অতিরঞ্জিত বিবৃতি তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ ত্রুটি। কবি ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে খ্যাতিমান। তিনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও অন্যান্য বহু বিষয়ে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

নাটকের ক্ষেত্রে কালিদাসের পরে খ্যাতি অর্জন করেছেন শূদ্রক, হর্ষবর্ধন শীলাদিত্য, বিশাখদত্ত, ভট্টনারায়ণ, ভবভূতি, রাজশেখর, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র প্রভৃতি নাট্যকারগণ।

দশ অঙ্কে রচিত শূদ্রকের (ষষ্ঠ শতাব্দী) মৃচ্ছকটিক নাটক, চারুদত্ত ও বসন্ত সেনার প্রণয় কাহিনী। এই নাটকের চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজ যে শুধু রাজকুমার এবং রাজকুমারীদের নিয়েই নয়, আদর্শ বা কল্পনা ছাড়া জীবনে যে একটা বাস্তব দিক আছে, বৈচিত্র্য এবং বহুমুখীনতাই যে মানব

নাটক

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, শূদ্রকের নাটকেই প্রথমে আমরা এই সত্যের সন্ধান পাই। তাঁর নাটকেই সমাজের নীচশ্রেণীর মানুষের সাক্ষাৎ বহুল পরিমানে পাওয়া যায়। স্থানেশ্বর অধিপতি হর্ষবর্ধন (৭ম শতাব্দী) রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা এবং নাগানন্দ শীর্ষক তিনখানি নাটকের রচয়িতা। ঘটনা বিন্যাসে চরিত্র চিত্রণে এবং নাটকের পরিণতিতে রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকার মধ্যে বহুসাদৃশ্য আছে। দুটি নাটকেরই নায়ক একব্যক্তি উদয়ন। নাগানন্দ নাটকটি কথাসরিৎ সাগরের বিখ্যাত কাহিনী জীমূতবাহনের অপূর্ব আত্মত্যাগকে আশ্রয় করে রচিত। রত্নবলী নাটকে শ্রীহর্ষ নিজেকে নিপুণ কবি বলেছেন। কথাটি অসত্য বা অসার নয়।

বিশাখদত্ত (৭ম শতাব্দী) সাত অঙ্কে 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক রচনা করেন। নাটকটি স্ত্রীভূমিকা বর্জিত। চাণক্য কি ভাবে নন্দরাজের বিচক্ষণ মন্ত্রী রাক্ষসকে স্বপক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই রাজনৈতিক কূট কৌশল এবং জটিলতাকে কেন্দ্র করেই 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক।

ভট্টনারায়ণ (৮ম শতাব্দী) 'বেণীসংহার' নামে একটিমাত্র নাটকের রচয়িতা। নাটকটি ছয় অঙ্কে মহাভারতের কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ কল্পে ভীম দুঃশাসনকে বধ করেন এবং সেই রক্তে দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করেন। নাটকটি বীররসাশ্রিত এবং ওজস্বীভাষায় লিখিত।

কালিদাসের পরে সংস্কৃত সাহিত্যে একটি বিরাট নাম—ভবভূতি। (অষ্টম শতাব্দী)। ভবভূতি তিনখানি নাটকের স্রষ্টা। মালতীমাধব, মহাবীর চরিত এবং উত্তর রাম চরিত। মন্ত্রীকন্যা মালতী ও শিক্ষার্থী মাধবের প্রণয় কাহিনী হলো মালতীমাধব নাটকের বিষয় বস্তু। বুদ্ধোত্তর যুগে তদানীন্তন ভারতের সুন্দর প্রতিচ্ছবি এই নাটকে মেলে। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের পূর্বভাগ বর্ণিত হয়েছে মহাবীর চরিত নাটকে এবং উত্তর ভাগ বর্ণিত হয়েছে উত্তর রাম চরিতে। প্রকৃতির রুদ্র এবং কমনীয় রূপের বর্ণনায় ভবভূতি সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সমাস বহুল দীর্ঘ বর্ণনা এবং হাল্কা রসের অভাব ভবভূতির বড় ত্রুটি। করুণ রস চিত্রণে ভবভূতি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে নিঃসংশয়ে সর্বাতিক্রমী।

বালরামায়ণ, বালভারত, কর্পূর মঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা—এই চারখানি রাজশেখরের (দশম শতাব্দী) নাটক। নাটকগুলি অত্যন্ত কৃত্রিম কিন্তু কবি নিজেকে মহৎ কবি বলে দাবী করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণনাটক প্রবোধ চন্দ্রোদয়। এটি একটি রূপক ধর্মী নাটক। এই নাটকটিই একমাত্র উদাহরণ যেখানে মন, বুদ্ধি, বিবেক ইত্যাদি চরিত্ররূপে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকটির রচনা রীতিও সরল। প্রবোধ চন্দ্রোদয় শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের (১১শ শতাব্দী) রচনা।

এছাড়া মুরারির 'অনর্থরাঘব', ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক, দামোদরগুপ্তের মহানাটক স্বকীয়তার দাবী রাখে। সংস্কৃতের নাট্য ধারা আজও বহমান।

গদ্য কাব্যের রচয়িতা বলতে আমরা সাধারণতঃ দণ্ডী, সুবন্ধু এবং বাণভট্টকেই বুঝি।

দণ্ডী দশকুমার চরিতের রচয়িতা। এই দণ্ডী (৭ম শতাব্দী) কাব্যাদর্শ রচয়িতা দণ্ডী কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ বর্ত্তমান। দণ্ডী সার্থক গদ্য রচনাকার। দীর্ঘ সমাস, শ্লেষ বা অর্থহীন শব্দের দ্বারা তিনি রচনা অযথা ভারাক্রান্ত করেন নি। 'দশকুমার চরিতে তৎকালীন ভারত সমাজের বেশ সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। বাসবদত্তার স্রষ্টা সুবন্ধু (৭ম শতাব্দী) সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান কথাকার। তাঁর রচনায় বিরোধাভাস ও শ্লেষের প্রাচুর্য রয়েছে। গদ্যলেখকগণের মধ্যে বাণভট্ট (৭ম শতাব্দী) নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁর রচনা দুটি—হর্ষচরিত ও কাদম্বরী। হর্ষচরিতে বাণভট্ট মহারাজ হর্ষবর্ধনের জীবনের অনেকটা কাহিনী বিধৃত করেছেন। রচনা ইতিহাসাশ্রয়ী। কাদম্বরী বাণভট্টকে খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়েছে। ভাষার উপর তাঁর আধিপত্য অনস্বীকার্য। তাঁর নির্বাধ কল্পনাশক্তি এবং অননুকরণীয় বর্ণনাভঙ্গিতে পাঠক এক স্বপ্নময় পরিবেশে উপস্থিত হয়। মনে হয় কাদম্বীর পূর্বভাগ বাণভট্ট রচনা করেন এবং উত্তরভাগ রচনা করেন তার সুযোগ্য পুত্র ভূষণভট্ট। শ্রেষ্ঠ গদ্যকার রূপে বাণভট্ট সুধীগণের দ্বারা স্বীকৃত।

গদ্যকাব্য

চম্পূকাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বিশ্বনাথ ব'লেছেন—গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে। অর্থাৎ যে কাব্য গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে রচিত হয়, তাকেই চম্পূ বলে। কথা এবং আখ্যায়িকাতে গদ্যের সঙ্গে পদ্য মিশ্রিত থাকে। কিন্তু চম্পূকাব্যে গদ্যের থেকে পদ্যের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী।

চম্পূকাব্য

উপকথাকে আশ্রয় ক'রেই সাধারণতঃ চম্পূকাব্য সৃষ্ট হয়। মাঝে মাঝে অবশ্য অন্য বিষয় অবলম্বনেও চম্পূকাব্য রচিত হয়েছে দেখা যায়। চম্পূ সাহিত্যে

ত্রিবিক্রম ভট্টের (১০ম শতাব্দী) নলচম্পূ বা দময়ন্তী কথা প্রাচীনতম। জৈন সোমদেব রচিত 'যশস্তিলক চম্পূ', হরিচন্দ্রের 'জীবন্ধর চম্পূ', ভোজরাজের রামায়ণচম্পূ, অনন্তভট্টের ভারতচম্পূ, নারায়ণের স্বাহাসুধাকরচম্পূ, কেশব ভট্টের নৃসিংহচম্পূ, শঙ্করের শঙ্করচেতোবিলাসচম্পূ, নীলকণ্ঠের নীলকণ্ঠবিজয়চম্পূ ইত্যাদি বহু কাব্য এই ধরণের সাহিত্যের অন্তর্গত।

গল্প শুনবার চিরন্তন আকর্ষণ থেকে গল্প সাহিত্যের সৃষ্টি। সুকুমার মতি রাজপুত্রগণকে অল্প সময়ের মধ্যে অর্থশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী ক'রে তুলবার জন্য বিশেষতঃ শিশুদের পশুপাখির গল্পের মাধ্যমে নীতি শিক্ষা দেওয়াই ছিল এ জাতীয় সাহিত্যের উদ্দেশ্য। গল্পসাহিত্যের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই এর রচনাকাল। বিষ্ণুশর্মা নামে কোনও ব্রাহ্মণ এটি রচনা করেন। পঞ্চাশটিরও অধিক ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ হয়েছে। 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' 'পঞ্চাখ্যানক'—'পঞ্চতন্ত্রের'ই সংস্করণ মাত্র। গল্পসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে, গুণাঢ্যের 'বৃহৎ কথা'; বুদ্ধস্বামীর 'বৃহৎ কথা' 'শ্লোক সংগ্রহ', ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' নারায়ণ ভট্টের হিতোপদেশ প্রধান। তাছাড়া সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, বেতালপঞ্চবিংশতি শুকসপ্ততিকথা, পুরুষ পরীক্ষা, প্রবন্ধ কোষ, প্রবন্ধ চিন্তামণি প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গল্পসঙ্কলন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী ক'রেছে।

গল্পসাহিত্য

হিতোপদেশের রচয়িতা নারায়ণ বাঙ্গালী এবং 'হিতোপদেশ' গ্রন্থও বাঙলা দেশেই অধিক জনপ্রিয়।

ভক্তিমূলক কাব্য বা স্তোত্র সাহিত্য ভারতের এক বিশেষ সম্পদ। শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কবি-ভক্তগণ স্তোত্র সাহিত্য রচনার কৃতিত্বের অংশভাগী। এমন কি বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যকেও এই প্রসঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তাঁর রচিত 'মোহমুদ্গর' চর্পটপঞ্জরিকা, 'শিবাপরাধক্ষমাপণ', দশশ্লোকী, আত্মাষট্‌ক, (নির্বাণষট্‌ক), আনন্দলহরী ইত্যাদি ভাব, ভাষা ও ভক্তির দিক থেকে উল্লেখ্য। মধুসূদন সরস্বতীর আনন্দমন্দাকিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ভক্তিরসের এক অসীম ভাণ্ডার। জয়দেবের গীতগোবিন্দের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। জগন্নাথের অমৃতলহরী, সুধালহরী, গঙ্গালহরী, করুণালহরী এবং লক্ষ্মীলহরী সুপ্রসিদ্ধ।

ভক্তিমূলক কাব্য

নীলকণ্ঠের 'আনন্দসাগর স্তব' মীনাক্ষীদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত। শিবমহিম্নস্তোত্র অত্যন্ত জনপ্রিয়। পরবর্তীকালের রূপ গোস্বামীর স্তবমালা এবং পদ্যাবলী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। জৈন ভক্তদের মধ্যে মানতুঙ্গের 'ভক্তামরস্তোত্র' সিদ্ধসেন দিবাকরের কল্যাণমন্দির বিখ্যাত। চতুর্বিংশিকাও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। অসংখ্য বৌদ্ধস্তোত্রও বিদ্যমান। তন্মধ্যে রামচন্দ্রের 'ভক্তিশতক' বজ্রদত্তের লোকিতেশ্বরশতক, সর্বজ্ঞ মিত্রের আর্যতারাস্রগ্ধরাস্তোত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে।

ঐতিহাসিক কাব্য

সংস্কৃতসাহিত্যে ঐতিহাসিক কাব্য খুব বেশী নয়। ঐতিহাসিক কাব্য বলতে আমরা এমন সব গ্রন্থ বুঝি যাদের মধ্যে ইতিহাস ও কাব্য উভয়ই রয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে বাণভট্ট মহারাজ হর্ষবর্ধনের জীবনকে বিষয়বস্তু করে 'হর্ষচরিত' রচনা করেছেন। কনৌজাধিপতি যশোবর্মন কর্তৃক গৌড়েশ্বরের পরাজয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহ'। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত পদ্মগুপ্ত বা পরিমলের নবসাহসাঙ্কচরিত উল্লেখযোগ্য। এটি কবির পৃষ্ঠপোষক ধারাধিপতি নবসাহসাঙ্কের রাজত্বকালে লিখিত। এ ছাড়া বিল্‌হণের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', হেমপালের 'কুমারপালচরিত', সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামপালচরিত', সোমেশ্বর দত্তের 'কীর্তিকৌমুদী', অরি সিংহের সুকৃতসঙ্কীর্তন, শম্ভুর রাজেন্দ্রকর্ণপুর প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ এই শ্রেণীর কাব্যের কলেবরের পুষ্টিসাধনে সহায়ক হয়েছে। রাজা কুমার পালের জীবনী অবলম্বনে লিখিত 'কুমারপালচরিত' সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাতেই রচিত হওয়ায় 'দ্ব্যাশ্রয়কাব্য' নামেও পরিচিত। উল্লিখিত ঐতিহাসিক কাব্যসমূহের মধ্যে ইতিহাস থেকে কাব্যত্বই সমধিক। কাব্যত্বকে ছাপিয়ে ইতিহাস প্রধান হয়ে উঠেছে একমাত্র কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে। 'রাজতরঙ্গিণী' কাশ্মীরের ইতিহাস। রচনা কাল একাদশ শতাব্দী।

দর্শন

আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দর্শনকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। আস্তিক দর্শক নামে পরিচিত সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত—এই ষড় দর্শনই ভারতের গৌরবস্থল। আস্তিক মতাবলম্বিগণ বেদকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। কিন্তু নাস্তিকগণ বেদ মানেন না। বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত বা চার্বাকদর্শন নাস্তিকদর্শন। এই সকল দর্শনের অধিকাংশই পূর্বে সূত্রাকারে রচিত

হয়েছিল। পরে সূত্রের টীকা, টিপ্পনী, টীকার টীকা ইত্যাদি রূপে প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় এক বিশিষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। দার্শনিক লেখকগণের মধ্যে শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, বাচস্পতি মিশ্র, কুমারিলভট্ট, শবরস্বামী বিজ্ঞানভিক্ষু, গদাধর, মথুরানাথ, জয়ন্তভট্ট, উদয়নাচার্য, মধুসূদন সরস্বতী ইত্যাদি ভারত মনীষার এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ইত্যাদি চিন্তার ক্ষেত্রেও ভারতীয় জীবনে উষর নয়। ধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান মনুসংহিতা। এর পর যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা এবং পরাশর সংহিতার নাম করতে হয়।

ধর্মশাস্ত্রাদি

রঘুনন্দন রচিত 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' আজও বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্মজীবন এবং গার্হস্থ্য জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। চাণক্য বা কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র সুপ্রসিদ্ধ। বাৎস্যায়নকৃত 'কামসূত্র' কামশাস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

দণ্ডী বলেছেন, "কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে।" কাব্যের উৎকর্ষজনক ধর্মই অলঙ্কার। ভরত প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র' অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ—প্রথম গ্রন্থ নয়।

অলঙ্কার

'নাট্যশাস্ত্র' পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায়, এ শাস্ত্রের তখন যৌবনাবস্থা। কবে এ শাস্ত্রের জন্ম হয়েছিল এবং কী করে সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, সব কিছুই আজ অন্ধকারের গর্ভে নিহিত। 'নাট্যশাস্ত্রের' রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। দণ্ডীর (ষষ্ঠ শতাব্দী) 'কাব্যাদর্শ', ভামহের (৭ম শতাব্দী) 'কাব্যালঙ্কার', বামনের (৮ম শতাব্দী) 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। আচার্য ভামহ শব্দ এবং অর্থ উভয়কেই সমান প্রাধান্য দিয়েছেন। ভারতীয় কাব্য চিন্তার উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক আচার্য অভিনব গুপ্ত (১১শ শতাব্দী)। ইনি আনন্দবর্ধন (৯ম শতাব্দী) কৃত "ধ্বন্যালোকের" সুবিখ্যাত 'লোচন' নামক টীকার স্রষ্টা এবং কাব্য চিন্তার ক্ষেত্রে ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠাতা। এ ছাড়া মহিমভট্টের 'ব্যক্তিবিবেক', কুন্তকের 'বক্রোক্তিজীবিত' মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশ', বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ, জগন্নাথের রসগঙ্গাধর ইত্যাদি অলঙ্কার শাস্ত্র তথা সাহিত্য তত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারত মনীষার এক একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন।

ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ছয়টি বেদাঙ্গের অন্যতম ব্যাকরণ। ব্যাকরণকে বেদপুরুষের মুখ বলা হয়েছে 'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।'

ব্যাকরণ

সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণশাস্ত্র আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের সর্বপ্রথম মনে

পড়ে পাণিনি ও তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের কথা। যদিও পাণিনির পূর্বে শাকটায়ন, সেনক, গালব, গার্গ্য, আপিশলি, স্ফোটায়ন ইত্যাদি বহু আচার্য ব্যাকরণশাস্ত্রের আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু প্রাক্-পাণিনীয় ওই সকল বৈয়াকরণদের কোনও গ্রন্থই আজ আর পাওয়া যায় না।

পাণিনি পৃথিবীর অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। তাঁর জন্মকাল খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ শাস্ত্রের এক অমূল্য সম্পদ। পাণিনি সূত্রের ত্রুটি সংশোধন করে কাত্যায়ন (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) 'বার্ত্তিক' রচনা করেন এবং তাঁর পরে পতঞ্জলি (খ্রীঃ পূঃ ১৫০) পাণিনি ব্যাকরণের সম্পূর্ণতা সাধন করেন তাঁর 'মহাভাষ্য' রচনা দ্বারা। কেবল মাত্র ব্যাকরণ হিসাবে নয়, সাহিত্য হিসাবেও 'মহাভাষ্য' অপূর্ব গ্রন্থ। ভর্ত্তৃহরির 'বাক্যপদীয়' ব্যাকরণকে অনেকটা দর্শনরূপে গ্রহণ করে রচনা করা হয়েছে। এবং এই বাক্যপদীয় রচয়িতা ভর্তৃহরির 'মহাভাষ্যদীপ্তি' অতীব উল্লেখ্য গ্রন্থ। অষ্টাধ্যায়ীর টীকা 'কাশিকা'। রচনাকার বামন ও জয়াদিত্য নামক দুই বৌদ্ধ বৈয়াকরণ।' কাশিকার টীকা সুবিখ্যাত 'ন্যাস' (নামান্তর কাশিকাবিবরণ-পঞ্জিকা) রচনা করেন জৈন বৈয়াকরণ জিনেন্দ্রবুদ্ধি। ইনি বাঙালী ছিলেন। প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ্ ভট্টোজি দীক্ষিতের (১৭শ শতব্দী) 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' ছাত্রছাত্রীগণের নিকট সুবিদিত। ভট্টোজি 'অষ্টাধ্যায়ী'র সূত্রগুলিকে নূতন ভাবে সজ্জিত করেছেন। সিদ্ধান্তকৌমুদীর উপর লিখিত জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর 'তত্ত্ববোধিনী' টীকা বিখ্যাত।

পাণিনি সম্প্রদায় ব্যতীত বোপদেবের মুগ্ধবোধসম্প্রদায়. অনুভূতিস্বরূপাচার্যের সারস্বত সম্প্রদায়, পদ্মনাভের সৌপদ্ম সম্প্রদায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পাণিনির পাশে এই সব সম্প্রদায় চন্দ্রের পাশে নক্ষত্রের মত। রূপ গোস্বামীর হরিনামামৃতে ধর্মের ও ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে ব্যাকরণকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা। রাধা ও কৃষ্ণের নামকে ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দরূপে গ্রহণ করেছেন বৈষ্ণবদার্শনিক শ্রীরূপ গোস্বামী।

কোষ গ্রন্থ হিসাবে অমর সিংহ প্রণীত অমর কোষের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে অমরকোষ রচিত হয়। ঐ সময়ে ওইরূপ একটি গ্রন্থ রচিত হওয়া কম বিস্ময়ের কথা নয়।

জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে রচিত সংস্কৃত পুস্তকের সংখ্যা পর্যাপ্ত না হলেও নিতান্ত নগণ্য নয়।

সুতরাং মানব চিন্তার এবং মনীষার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটেছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার পদচারণা। ন্যূনপক্ষে পাঁচ হাজার বছর আগে যে ভাষায় সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছিল, আজও সে ধারা সমান বেগবতী না হলেও সম্পূর্ণ গতিহীন নয়। সাময়িক পত্র থেকে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় আজও প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে বৈদিক ও সংস্কৃত উভয়কেই বুঝতে হয়। বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃতের মধ্যে বেশ কয়েকটি মৌলিক পার্থক্যও বিদ্যমান। তথাপি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা বলতে এখানে 'সংস্কৃত'ই বার বার ব্যবহার করা হয়েছে।

ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে মনে জাগ্রত হয়। এক কথায় হয়তো এর উত্তর—আত্মানুসন্ধান। ভারত-আত্মার চিরন্তন প্রশ্ন—জীবনের রহস্য কি? কী-ই বা জীবনের পরিণতি? কী ভাবে জীবন হয়ে উঠবে সার্থক ও সুন্দর? এই চিরন্তন প্রশ্ন, এই শাশ্বত জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন আমাদের পূর্বপুরুষগণ মননের মাধ্যমে। সেই প্রশ্নের উপলব্ধি-লব্ধ উত্তর রূপায়িত হয়েছে ভারতীয় সাহিত্যে যুগ যুগ ধরে। আর্য ঋষিদের উপলব্ধিগত সামগ্রী জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যুগে যুগে সাহিত্যের রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন এক এবং উত্তরও এক। যে উপলব্ধি বেদে একভাবে প্রকাশিত হয়েছে, দর্শনে আর এক ভাবে রূপায়িত হয়েছে, রামায়ণ মহাভারত পুরাণে অন্য ভাবে তার প্রকাশ হয়েছে। গল্পের মধ্য দিয়ে তত্ত্ব হয়েছে হৃদয়গ্রাহী এবং জাতি ধর্মনির্বিশেষে সর্বজনগ্রাহ্য। অবশ্য সাহিত্যের মাধ্যমে আদর্শ পুরুষ এবং আদর্শ নারী সৃষ্টি করতে গিয়ে ভারতীয় কবি ও সাহিত্যিকগণ অনেক সময় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাংক্ষাকে সম্যক্ মর্যাদা দিতে পারেননি। অনেক সময় রাজা-রাণী এবং রাজকীয় আড়ম্বরের মধ্যে আবৃত হয়েছে সাধারণ মানুষের মিছিল। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে মানবিকতাকে অস্বীকার করা হয়েছে কদাচিৎ।

ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

কোনও জাতির সংস্কৃতি সৌধ প্রায় অতীত গরিমার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এবং এই সাহিত্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী। সুতরাং আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের পূর্বভূমিকারূপে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য অবশ্যই আলোচনীয়।

দেবনাগরী লিপিতে সংস্কৃত ভাষা লেখা হয়ে থাকে। দেবনাগরী লিপি ব্রাহ্মীলিপি জাত। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন ব্রাহ্মী লিপি পহ্লবী লিপি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। ব্রাহ্মী লিপি ভারতবর্ষেরই নিজস্ব সম্পদ।

লিপি

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে সমাপ্ত হলো। ভারতের প্রাচীন ভাষা বলতে কেবলমাত্র সংস্কৃতকে বুঝলে জ্ঞান একদেশদর্শী হতে বাধ্য। যেহেতু তামিলও ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন ভাষা এবং এই ভাষার ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দী থেকে লক্ষ্য করা যায়।

তামিল ভাষার প্রাচীনতম পুস্তক তিরুবল্লুবরের 'ত্রিক-কুরল' বা সংক্ষেপে শুধুমাত্র 'কুরল'—যাকে 'তামিল বেদ' বলা হয়ে থাকে। 'কুরল' নৈতিক ও ভক্তিমূলক উপদেশে ভরা। এটি নিঃসন্দেহে একটি সার্বজনীন ধর্মগ্রন্থ। 'কুরল' রচিত হয় খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে। তামিল আলোয়ারেরা তামিল ভাষায় বহু বিষ্ণু স্তোত্র রচনা করেছেন। তাঁদের রচিত বিষ্ণুস্তোত্রসমূহ 'নলিয়ারাপ্রবন্ধম্' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই স্তোত্রগুলিতে আলোয়ারদের প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'তিরুমুরাহ' এগারোখানি পুস্তকের সমষ্টি। এবং এর অষ্টম পুস্তকের নাম তিরুভাষকম্। মানিক ভাসগর এর রচয়িতা। মানিক ভাসগরের রচিত শৈব স্তোত্র তামিল দেশের শিব মন্দিরে প্রত্যহ গীত হয়ে থাকে।

তামিল

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ও তামিলের পর স্বভাবতঃই মধ্যভারতীয় আর্যভাষার (পালি ও প্রাকৃত) কথা মনে আসে। পালি সম্বন্ধে এক বৌদ্ধ পণ্ডিত বলেন—

"To a student of the ancient history of India, the study of Pali is as important as that of Sanskrit and Prakrits"—

যে ভাষায় বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়েছিলেন এবং যে ভাষায় ত্রিপিটক রচিত তাই পালি ভাষা। পালি সাহিত্য বৌদ্ধ ধর্ম সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ত্রিপিটকের বিনয় পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়ম সমূহ বিধৃত হয়েছে। সুত্তপিটকে বুদ্ধের ধর্ম মত এবং অভিধম্মপিটকে বৌদ্ধ ধর্মমতের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুত্তপিটকের পঞ্চম নিকায়ে (Collection) দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ধম্মপদ' বুদ্ধদেবের মহান উপদেশ সমূহে পরিপূর্ণ। বৌদ্ধগ্রন্থাদির মধ্যে ধম্মপদ সর্বাধিক সমাদৃত

পালি

এবং এটি পদ্যে রচিত। থের (স্থবির) থেরী (স্থবিরা) গাথা—পালি সাহিত্যের দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ধর্মীয় ভাব ও কাব্যিক মূল্যের মিশ্রণে থের গাথা এবং থেরী গাথা উচ্চস্তরের সাহিত্য হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই গ্রন্থদ্বয়ে আছে থের ও থেরী (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী) দের আত্মজীবনী। কী অবস্থায় বুদ্ধদেবের সংস্পর্শে তাঁরা এলেন এবং তাতে কী তাঁদের লাভ হলো। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আর্তি চিত্তের প্রশান্তির জন্য এবং অভীপ্সা নির্বাণ। থের থেরীগাথায় এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। গল্প গ্রন্থ হিসাবে 'জাতক' সুপ্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেবের পূর্বজীবনের ইতিহাস 'জাতক'। এছাড়া মিলিন্দ পঞ্হ, ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, বুদ্ধবংশ, অবদানশতক, দিব্যাবদান, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, প্রজ্ঞাপারমিতা শ্রেণীর গ্রন্থ ইত্যাদি বহু গ্রন্থ পালি সাহিত্যে আছে। ধর্ম সম্বন্ধী এবং বুদ্ধ জীবনী মূলক গ্রন্থাবলম্বনেই পালি সাহিত্য। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট পালি গ্রন্থ বিরল।

পালি ভাষার কাছে আমাদের বাংলা ভাষা বেশী ঋণী। বহু বাংলা শব্দ পালি শব্দ জাত। পালির অধিকাংশ শব্দ আবার সংস্কৃতশব্দজ।

প্রাকৃত ভাষা জনসাধারণের ভাষা। "প্রাকৃতজনানাং ভাষা প্রাকৃতম্।" অনেকে অবশ্য বলেন যা প্রকৃতি বা স্বভাবের দ্বারা সিদ্ধ তাই প্রাকৃত। আবার প্রাকৃতের এইরূপ সংজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে—"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্, তত্র ভবম্, তত্র আগতং বা প্রাকৃতম্। অর্থাৎ প্রকৃতি (জননী) সংস্কৃত। সংস্কৃত থেকে যা জাত বা আগত তাই প্রাকৃত।

প্রাকৃত ও অপভ্রংশ

প্রাকৃতের অর্থ নিয়ে মতভেদ থাকলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সুদূর বৈদিক যুগ থেকে প্রাকৃতই হয়তো জনসাধারণের কথ্য ভাষা ছিল। শিষ্টজনের ভাষা অবশ্য সংস্কৃত। সংস্কৃত নাটকেও দেখা যায় নারী এবং অন্যান্য সাধারণ চরিত্রের ব্যক্তিগণ প্রাকৃতে কথাবার্তা বলেন। রাজা, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সংস্কৃতে বাক্যালাপ করে থাকেন। নাটকের এ বৈশিষ্ট্য থেকে এ কথা অনুমান করা যায়, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ যেমন প্রাকৃত বুঝতেন, তেমনি সাধারণ জনের কাছেও সংস্কৃত অবোধ্য ছিল না। সংস্কৃত ও প্রাকৃত হয়তো সমাজে পাশাপাশি বর্তমান ছিল। প্রাকৃতের বহু বিভাগ আছে। বিভাগেরও উপবিভাগ দৃষ্ট হয়। বৈয়াকরণগণ প্রাকৃতের শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, চূলিকা পৈশাচী ও অপভ্রংশ—এই সাত ভাগে ভাগ ক'রে থাকেন।

বিভিন্ন প্রাকৃতের লক্ষণাবলী বররুচির 'প্রাকৃতপ্রকাশে', হেমচন্দ্রের 'প্রাকৃত ব্যাকরণে' এবং মার্কণ্ডেয়ের 'প্রাকৃতসর্বস্বে' পাওয়া যায়।

সংস্কৃত নাটকে বা অন্যান্য প্রাকৃত গ্রন্থে যে প্রাকৃতের ব্যবহার করা হয়েছে তা কিন্তু সংস্কৃতের মত কঠোর নিয়মানুগ। তাই গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রাকৃত সাহিত্যিক প্রাকৃত।

জৈন ধর্মপ্রচারক মহাবীর জনগণের তৎকালীন কথ্য ভাষা অর্ধমাগধীতে ধর্মপ্রচার করেছিলেন (ভবগং চ নং অদ্ধ মাগহীএ ভাসাএ ধম্মমাইকখই)। আমাদের বাঙলা ভাষাও প্রত্যক্ষ ভাবে অর্ধমাগধী প্রাকৃত থেকে জাত।

জৈনদের অধিকাংশ আগম গ্রন্থাদি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। তা ছাড়া প্রাকৃতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কাব্য, নাটক, স্তোত্রাদি বহু পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতীয় কবিগণ বিভিন্নভাবে প্রাকৃত ভাষার প্রশংসা করেছেন। যেমন রাজশেখর তাঁর প্রাকৃত নাটক কর্পূরমঞ্জরীতে বলেছেন—

পরুসা সক্করবন্ধা পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।
পুরিস মহিলাণং জেত্তিঅ-মিহন্তরং তেত্তিঅ-মিমাণং ॥

অর্থাৎ সংস্কৃতভাষা কর্কশ (পরুষ) এবং প্রাকৃত ভাষা সুকোমল। পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে প্রভেদ সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে সেই প্রভেদ।

আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহে সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষা সমূহের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার জননী প্রাকৃত ভাষা এবং এই খানেই প্রাকৃত ভাষার গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব। তবে খ্রীষ্টির দ্বাদশশতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃতই ছিল ভারতীয় চিন্তার প্রধানতম বাহন। এবং এই চিন্তার ফসল সংস্কৃত সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম মহৎ সাহিত্য।

—

ভারতের বিজ্ঞান সাধনা

"সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মলয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি . বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি . আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ."

(—জীবনানন্দ)

ভারতের প্রাণপুরুষ কোন উষাকালে যে তাঁর রথের বল্গা হাতে তুলে নিয়েছিলেন। আজও সে রথচক্র ধাবিত হয়ে চলেছে চির-সারথির নির্দেশে। সে উষাকাল কিন্তু আজও আমাদের কাছে এক বিদিশার নিশায় আচ্ছন্ন। জ্ঞানে-পুণ্যে-ত্যাগে-প্রেমে যে ভারত তাঁর ক্ষমাসুন্দর চোখে ধরণীর ধূলায় গৈরিক রাগে রঞ্জিত, সেই ভারতের ইতিহাসের আদিবিন্দু হারিয়ে গেছে পৌষের নীরব জ্যোৎস্নায়। তাই ভারতের বিজ্ঞান সাধনা কোন লগ্নে যে শুরু হয়েছিল তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ইতিহাসের দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে ওঠার পর বৈদিক ঋষির শাশ্বত আহ্বান 'হে অমৃতের পুত্র' আমাদের চোখের মায়া-অঞ্জন সরিয়ে দেয়।

বৈদিক ঋষির প্রশ্নের উত্তরে নারদ সবিনয়ে জানিয়েছিলেন যে বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র (mathematics), দৈববিদ্যা, কালবিদ্যা (Chronology), তর্কশাস্ত্র (logic), রাজনীতি (Politics), দেববিদ্যা (Terminology), ব্রহ্মবিদ্যা (Philosophy), ভূতবিদ্যা (metallurgy), ক্ষত্রবিদ্যা (অস্ত্র-শাস্ত্র ও যুদ্ধ), নক্ষত্রবিদ্যা (astronomy), গন্ধর্ববিদ্যা (fine Arts) ইত্যাদি বিদ্যাগুলি তাঁর অধিগত। নারদের মুখে এতগুলি বিজ্ঞানের উল্লেখ দেখে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে—তবে কি ভারতের বিজ্ঞান-সাধনা এর বহু আগেই শুরু হয়েছিল? বৈদিক সভ্যতার কাল, ঐতিহাসিকদের মতে, মোটামুটি খৃষ্টপূর্ব ৪০০১ থেকে ১০০০ অব্দ পর্যন্ত। প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ রচনার কাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৪০০০ অব্দের মধ্যে।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কর্তা বলে নিউটনের নাম প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁর জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেই বৈদিক ঋষি বলে গিয়েছেন যে সূর্য ও

বিভিন্ন গ্রহের আকর্ষণ শক্তির জন্যই এরা সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে (ঋগ্বেদ ১০।১৪৯।১, ১।৩৫।২)। গ্যালিলিওর আগেও যে তাঁর মত বৈদিক ঋষির জানা ছিল, তারও প্রমাণ পাই ঋক্ বেদে (১০।২২।১৪)—ক্ষা (পৃথিবী) শুক্রম্ (সূর্যের) পরি (চারদিকে) প্রাদক্ষিণিৎ (প্রদক্ষিণ করেন)।

পশ্চিমী বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারগুলি যে এত আগেই ভারতীয়দের জানা ছিল, এটা রীতিমত বিস্ময়কর। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করে নিতে হয় যে বহু বৎসর যাবৎ নিরলসভাবে বিজ্ঞান সাধনা না করলে এই সব তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করা যায় না। তাই ঐতিহাসিকেরা পিছিয়ে গেলেন আরো প্রায় এক হাজার বছর, দেখালেন যে খৃষ্টপূর্ব ৩২৫০ থেকেই ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় এক প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল—হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো। এযুগে বিজ্ঞানচর্চা সুসংবাদিত।

বছর পাঁচেক আগে আরেকটি তথ্য আমাদের আরও বিস্মিত করলো। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যুগ্ম-পরিচালক প্রধান শ্রী বি, বি, লাল হদিশ দিলেন আরো প্রাচীন সভ্যতার। গুজরাটে কাম্বে উপসাগরের কাছে লোথালে দুই কিলোমিটারের বেশি লম্বা একটি পোতাশ্রয়কে (Ship harbour) মাটি খুঁড়ে বের করলেন তিনি, বললেন, এটি সিন্ধু সভ্যতারও পূর্ববর্তী যুগের। চললো অনুসন্ধান। লোথাল, রূপার, আলমগীরপুর, কালিভাঙ্গানে এই যুগের সভ্যতার নিদর্শন মিললো প্রচুর। এই সভ্যতার কাল কত? কম করেও খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর নিশ্চয়ই। সে যুগে পোতাশ্রয় যখন ছিল, তখন বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকের উন্নতির পরিমাপ সহজেই করা যায়। শুধু তাই নয়, এই বিজ্ঞান গড়ে উঠতে নিশ্চয়ই আরও বেশ কয়েকশ' বছর লেগেছিল। বর্তমান যুগের মত এত দ্রুতবেগে বিজ্ঞানের উন্নতি প্রাচীন যুগে হত না। তাই বলতে পারি, আজ থেকে অন্তত ৭০০০ বছর আগে থেকেই ভারতের বিজ্ঞান সাধনা শুরু হয়েছিল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক জগতে যে প্রাচীন গ্রীসের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, সেই গ্রীসে বিজ্ঞানের উদ্ভব খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মাত্র। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে বহু বৈজ্ঞানিককে প্রাণের বিনিময়ে বিজ্ঞান সাধনার মূল্য ক্রয় করতে হয়েছে। এই সেদিনও গ্যালিলিও-ডারউইনকে কাঁটার মালায় লাঞ্ছিত হতে হয়েছে বিজ্ঞান সাধনার জন্য। ভারতের ইতিহাসে কিন্তু আজ এই সাত হাজার বছরের মধ্যে এমন কোন

বৈজ্ঞানিকের সন্ধান পাওয়া যায় না যাকে সমাজের লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয়দের মনোবৃত্তি এতে সহজেই বোঝা যায়।

প্রাচীন ভারতে অনুসৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে সমস্ত পদ্ধতি পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রত্যক্ষীকরণ (Perception), পর্যবেক্ষণ (observation), পরীক্ষা (experiment), পর্যবেক্ষণের হেত্বাভাস (Fallacy of observation and paradox), অনুমান (inference) ও প্রকল্প (hypothesis)— এই ছয়টির বহুল ব্যবহার ছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগ

গুজরাটে কাম্বে উপসাগরের কাছে রূপার, আলমবীরপুর, লোথাল, কালিভাঙ্গানে আবিষ্কৃত সভ্যতার কথা ভূমিকাতেই বলেছি। এই সভ্যতায় নগর পরিকল্পনা, গৃহ-নির্মাণ, স্থাপত্য, পোতাশ্রয় নির্মাণ, কারিগরী বিদ্যা ইত্যাদিতে ভারতীয়দের পারদর্শিতার কথা জানা গেছে। কৃষিকার্যও সেযুগে অত্যন্ত উন্নত। মিঃ স্টুয়ার্ট পিগটের মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতেই প্রথম ধানের চাষ শুরু হয় (Prehistoric India, Ps. 143)। তামা ও পেতলের ব্যাপক ব্যবহার, চাকার সাহায্যে গাড়ী চালানো ইত্যাদির নিদর্শন ও পাওয়া গেছে।

এর পরবর্তী যুগে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৩২৫০ থেকে শুরু হয় সিন্ধুসভ্যতা। মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ দেখে জনৈক ইংরেজ পর্যটক বলেছিলেন, তিনি যেন ল্যাঙ্কাশায়ারের মত আধুনিক কালের কোন শিল্পপ্রধান নগরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বিচরণ করছেন। নগর পরিকল্পনা, গৃহনির্মাণ ও স্থাপত্যবিজ্ঞানে ভারত তখন অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়েছিল। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিজ্ঞান-সম্মত-পন্থার ব্যাপক ব্যবহার যা এখানে দেখা গিয়েছে তা ব্যাবিলন-মিশর বা অন্য কোথাও দেখা যায়নি। কৃষিকার্যে গবাদি পশুর সাহায্যে ধান-গম-বালি-খেজুর-শাকসব্জি ও নানারকম ফল উৎপন্ন করা হত। তুলো ও পশমের সুতো তৈরী ও তার সাহায্যে কাপড় তৈরীতে এ যুগের তাঁতীরা পারদর্শী ছিল। পলিমাটি-বালি অভ্র-চুনের সাহায্যে নানারকম মৃৎপাত্র এবং চীনামাটির বিভিন্ন বাসনের নিদর্শনও মিলেছে। ধাতুর মধ্যে সোনা-রূপো-তামা-পেতল ও সীসের ব্যবহারের ব্যাপকতা দেখা যায়। সোনার নানারকম গয়না, যেমন গলার হার-আংটি-নোলক-তাবিজ-পায়ের অলংকার প্রচুর পাওয়া গেছে। ০.৮৭৫০ গ্রাম

থেকে শুরু করে ১০৯৭০ গ্রাম পর্যন্ত নানা মাপের বাটখারা পাওয়া গিয়েছে এই সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে। ধাতু ও কাঠ-নির্মিত দাঁড়িপাল্লাও পাওয়া গেছে। ডঃ ম্যাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ০·২৬৪ ইঞ্চিকে একক ধরে তখনকার যুগে দৈর্ঘ্য মাপা হতো এবং দশমিক পদ্ধতিকে তৎকালীন অধিবাসীরা কাজে লাগাত। শূন্যের (০) আবিষ্কার যে ভারতীয় বিজ্ঞানের কৃতিত্ব একথা আজ সর্ববাদী সম্মত। The Vedic Age গ্রন্থে (P. 178) রমেশচন্দ্র মজুমদার ও পালুসকর সে যুগে ব্যবহৃত কতগুলি ওষুধের উল্লেখ করেছেন যার সাহায্যে পেটের অসুখ, বাত, ডায়বেটিস, যকৃতের রোগ এবং চোখ-কান-গলার অসুখ সারানো হত।

এই সমস্ত থেকে দেখা যায় যে ভারতীয় বিজ্ঞান সে যুগে স্থাপত্য, কৃষি, পশুপালন, বয়ন, সিরামিক্‌স্, মেটালার্জি, দশমিক পদ্ধতিতে ওজন, চিকিৎসা-বিদ্যা ইত্যাদিতে প্রভূত উন্নতি করেছিল। মহেঞ্জোদড়োর ভগ্নস্তূপ থেকে সে যুগে প্রচলিত লিপির নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রায় চারশ' বিভিন্ন চিহ্ন ও তিনশ' প্রতীক আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজ পর্যন্ত সে লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার লিপি থেকেই ব্রাহ্মী বর্ণমালা উদ্ভূত এবং এই সিন্ধু উপত্যকার লিপি ফিনিশীয়, সাবীয় ও সাইপ্রাশ দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীদের সাইপ্রিয়ট লিপির বর্ণমালাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল (The Script of Harappa and Mohenjodaro and its connection with other Scripts—by G. R. Hunter)।

এই সিন্ধু সভ্যতা যে কেবল ঐস্থানেই আবদ্ধ ছিল তা নয়, একদিকে উত্তর ও দক্ষিণ বেলুচিস্তান এবং অন্যদিকে বক্‌সার ও পাটনা পর্যন্ত ছিল এর বিস্তৃতি। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির সঙ্গে তৎকালীন ভারতীয়েরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন বহির্বিশ্বে—এরও প্রমাণ পাওয়া গেছে (Man makes himself P, 168--V. Gordon Childe)।

ভারতের প্রাণপুরুষ এমনিভাবেই তাঁর বিজ্ঞানের আলোকে চারদিক আলোকিত করে এক নবদিগন্তের সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর এমনি করেই গড়িয়ে চললো দিন-মাস-বছর।

"মহাকাল উর্ণনাভ ক্লান্তিহীন জাল বুনে চলে।" সিন্ধুসভ্যতা নব নব রূপে চলে এগিয়ে।

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে,
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে,
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।"

(—রবীন্দ্রনাথ)

আরো নবীনরূপে এগিয়ে এল বৈদিক সভ্যতা।

বৈদিক যুগ

বিজ্ঞান সাধনার ব্যাপারে বৈদিক যুগকে আমরা দুইটি ভাগে ভাগ করতে পারি। খৃষ্টপূর্ব ২৫০০—১০০০ অব্দ পর্যন্ত প্রথম পর্যায় ও খৃষ্টপূর্ব ১০০০—৫০০ অব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্য্যায় ব্যাপ্ত। বৈদিক যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান বেদ। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের মূল ভিত্তি বেদান্ত দর্শন যা উপনিষদকে আশ্রয় করে রয়েছে, তা এ যুগেরই দান। এই উপনিষদ সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর পদার্থ বিদ্যায় নোবেল প্রাইজ বিজয়ী বৈজ্ঞানিক শ্রোডিংগার বলেছেন—"Al' philosophy succumbs again and again to the hopeless conflict between the theoretically unavoidable acceptance of Berkeleian idealism and its complete uselessness for understanding the real world. The only solution to this conflict, in so far as any is available to us at all, lies in the ancient wisdom of the Upanishads. (My view of the world pg. 31)।

এখন প্রশ্ন উঠবে, বেদ উপনিষদে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক চেতনার নিদর্শন পাওয়া যায় তা কি ঠিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য? এখানে মনে রাখতে হবে তৎকালীন যুগে ঋষিরা তাঁদের প্রজ্ঞাদৃষ্টির সাহায্যে যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তাই-ই বেদের বিষয়বস্তু। তাই বেদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার নিদর্শন প্রচুর থাকলেও তথাকথিত বিজ্ঞান চর্চার সাহায্যে এ প্রাপ্ত নয়। কিন্তু সাধারণ লোকেদের মধ্যেও চলেছিল বিজ্ঞান চর্চার এক ধারা যার ভিত্তি ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। এই বিজ্ঞান সাধনার মধ্যে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের চমকপ্রদ নিদর্শন মেলে।

গণিত : আধুনিক জ্যামিতিতে পিথাগোরাসের সূত্র বলে যেটি বিখ্যাত সেটি পিথাগোরাসের জন্মের আগেই এদেশে প্রচলিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে রচিত শূলসূত্রে রয়েছে—"দীর্ঘ চতুরস্রাক্ষয়ারজ্জুপশ্বোমানো তির্যঙ্‌মানোচ যৎ পৃথগ্‌ভূতে কুরু তস্তদুভয়ং করোতি" অর্থাৎ দীর্ঘ চতুষ্কোণের (আয়তক্ষেত্রে) কর্ণের উপর অংকিত বর্গক্ষেত্র চতুষ্কোণের পাশের ও নীচের দুই বাহুর উপর অঙ্কিত দুইটি বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান। খৃষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের শতপথ ব্রাহ্মণেও এই উপপাদ্যের নিদর্শন মেলে। যজ্ঞের বেদী নির্মানের জন্যই জ্যামিতির বহুল প্রয়োগ এযুগে দেখা যায়। বর্গ, আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, রম্বস, বৃত্ত, উপবৃত্ত ইত্যাদি রচনা এবং এসমস্তের area, ইত্যাদির মান নির্ণয়ের বহু সূত্র পাওয়া যায়। ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল h (a + b)/2 সূত্রটিও এযুগে জানা ছিল। জ্যামিতিকে তখন অবশ্য 'শুল্ব' নামে অভিহিত করা হত।

পাটীগণিতে (arithmatic) যেখানে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ও গ্রীকেরা ১,০০,০০০ (১০৫) এবং রোমানরা ১০,০০০ (১০৪) পর্যন্ত সংখ্যা গুণতে পারতেন সেখানে ভারতীয়েরা পরার্ধ (১০১৪) পর্যন্ত সংখ্যা গুণতে পারতেন। সংখ্যার নানারকম শ্রেণীও (Series) দেখা যায়। পিঙ্গল রচিত 'ছন্দ সূত্রে' (খৃষ্টপূর্ব ২০০) শূন্যের ব্যবহার দেখা যায়। শূন্যের (০) অবিষ্কার ভারতীয়দের অন্যতম বিস্ময়কর কৃতিত্ব। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ২৪, ৪৮, ৯৬,.... ৪৯১৫২, ৯৮৩০৪, ১৯৬৬০৮, ৩৯৩২১৬ এবং বৃহদ্দেবতায় ২ + ৩ + ৪ + ··· + ১০০০ = ৫০০৪৯ ইত্যাদি শ্রেণী দেখা যায়। বৌধায়ন সূত্রে একটি ফর্মূলা পাওয়া যায় ১ + ৩ + ৫ + ...(২ + ১) – (ক + ১)। Arithmatical Progression, Geometrical Progression-এর সাহায্যে অংক করা হত। দশমিক ও ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ প্রচলিত ছিল।

$\sqrt{2}$ = ১.১১৪২১৫৬ বৈদিক যুগে এবং ১.৪১৪২১৩ আধুনিক মতে

$\left(\frac{\text{বৃত্তের পরিধি}}{\text{ব্যাস}}\right) = \pi =$ ৩.১৪১৬ ,, ,, ,, ৩.১৪১৫৯

বীজগণিতে (Algebra) একঘাত-দ্বিঘাত সমীকরণ এবং নির্ণেয়-অনির্ণেয় সহ-সমীকরণ সমাধানের পরিচয় মেলে। ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) নানা কাজে ব্যবহার করা হত।

জ্যোতির্বিদ্যা : আকর্ষণ শক্তির সাহায্যে সূর্য পৃথিবীকে নিজের চারিদিকে

ঘোরায়। বারো মাসে বছর, পৃথিবী গোলাকার, সূর্যের সাতটি রঙ, চন্দ্রের নিজের কোন আলো নেই ও সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল, সাতাশটি নক্ষত্র-মণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে চন্দ্রের গতি, বুধ-শুক্র-পৃথিবী-মঙ্গল-বৃহস্পতি-শনি সূর্যের থেকে পরপর দূরত্বে অবস্থিত, ৩৬৫ দিনে বছর এই সমস্ত তথ্যই বৈদিক যুগে জ্ঞাত ছিল।

চিকিৎসাবিদ্যা: ভেষজ (medicine), শল্য (surgery) ও স্বাস্থ্য-বিদ্যা (hygiene)—এই তিনটি শাখায় চিকিৎসা বিদ্যার চর্চা বৈদিক যুগে হত। কায়তন্ত্র (সাধারণ চিকিৎসা বিদ্যা), শল্যতন্ত্র (Surgery & mid wifery), শালাক্যতন্ত্র (Ear-nose-throat remedies), কৌমারভৃত্য (শিশু চিকিৎসা), ভূতবিদ্যা (Psychiatry), অগদতন্ত্র (বিষ ও বিষক্রিয়ার চিকিৎসা), রসায়নতন্ত্র (বার্ধক্যে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি), বাজীকরণতন্ত্র (পুনর্যৌবন প্রদান সম্বন্ধীয়), স্ত্রীরোগ (Gynochology), পশু চিকিৎসা (Veterenary) এবং নবনাসিকা প্রস্তুতবিদ্যা (Plastic surgery)-এই এগারোটি বিষয় নিয়ে চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্রদের পড়তে হত। চিকিৎসকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ভরদ্বাজ, আত্রেয়, ধন্বন্তরী, সুশ্রুত, জীবক ও চরক। সুশ্রুত ছিলেন অস্ত্র চিকিৎসক। প্রায় ১২১টি যন্ত্র তিনি ব্যবহার করতেন এবং টনসিল, চোখের ছানি, ভ্রূণ, হার্নিয়া, ভগন্দর, গলা, কান ইত্যাদির অস্ত্রোপচারে দক্ষ ছিলেন। ডঃ জেনারের বহু আগেই ভারতে বৈদিক যুগে বসন্তের টীকার প্রচলন ছিল মেষ ও গোপালকদের মধ্যে (A short history of Aryan Medical Science, pg. 179—Bhagarat Sinhjee)।

উদ্ভিদ বিদ্যা: গাছের মূল মাটির জল শোষণ করে এবং তা তাপ ও বায়ুর সাহায্যে কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে পাতায় পৌঁছে খাদ্যে পরিণত হয়ে গাছের পুষ্টিসাধন করে—একথা পাশ্চাত্যে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে হার্ভে ও হেল্‌স্ আবিষ্কার করলেও এঁদের বহু পূর্বেই বৈদিক যুগে ভারতীয়েরা একথা জানতেন। বীজ সংগ্রহ ও নির্বাচন, উপযুক্ত জমি নির্ণয়, বপন, বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম, কলম-কাটা (grafting), চারা লাগানো, চারা গাছের যত্ন, সার দেওয়া, বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শস্য বপন, পীড়িত গাছের চিকিৎসা, উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ ও লক্ষণ নির্দেশ—এইসব বিষয়ে বিশদ আলোচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। বীজরুহ (by seeds), মূলজ (by roots), স্কন্ধজ (by cuttings), স্কন্ধে রোপনীয় (by graftings), অগ্রবীজ (by apices), পর্ণযোনি (by

leaves) এবং সৌনরুচক গাছের উল্লেখ। স্ত্রী পুরুষ উভয়বিধ গাছের নাম, ভেষজ গুণানুসারে ১১০০ রকম গাছের নামও এযুগে দেখা যায়।

রসায়ন বিদ্যা: জৈব ও অজৈব যৌগিক পদার্থ (organic and inorganic compounds) সম্বন্ধে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এবং ভস্মীকরণ (calcination), অধঃপাতন (distillation), স্বেদন (steam distillation), ঊর্ধ্বপাতন (sublimation) ও স্তম্ভন (fixation) প্রক্রিয়ার ব্যবহার এযুগের বৈশিষ্ট্য। ঔষধ তৈরীতে পারদ, আর্সেনিক ও লোহার প্রয়োগ বহুল প্রচলিত ছিল। খনি থেকে ধাতু নিষ্কাসন ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তা শুদ্ধ করা, ক্ষার (alkali) ও ক্ষারীয় বিদাহী (alkaline caustics) পদার্থের নির্মাণের নিদর্শনও দেখা গেছে।

পদার্থ বিদ্যা: পদার্থ বিজ্ঞানে এযুগের বৈশিষ্ট্য-

(ক) সমস্ত পদার্থই বহুসংখ্যক অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি।

(খ) বাতাসের মধ্যে দিয়ে তরঙ্গের আকারে শব্দের প্রসারণ হয়।

(গ) আলোক ও তাপ একই শক্তির বিভিন্নরূপ।

মোটামুটিভাবে বৈদিক যুগে এই সমস্ত উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। এযুগের শ্রেষ্ঠ দান উপনিষদে অবশ্য আরো উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৈদিকোত্তর যুগ

"উড়ুক উড়ুক তারা পৌষের জ্যোৎস্নায়
নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব ; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং
মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন
জ্যোৎস্নার ভিতর।" —জীবনানন্দ

বৈদিক যুগ এতদিন ঐতিহাসিকের চোখে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলেই নির্দিষ্ট ছিল। আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে ইতিহাসের পংক্তিভোজনে সে স্থান পেয়েছে। তাই বৈদিক যুগের বিজ্ঞান সাধনা 'কল্পনার হাঁস' নয়, কষ্টি পাথরে ঘষে নেওয়া ঐতিহাসিক সত্য। এযুগের রেশ কিন্তু চলল এরপরেও

বহুদিন। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতের বৈদিকোত্তর যুগের বিস্তৃতি প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে।

গণিত ঃ গণিতশাস্ত্রে আর্যভট্ট (৪৭৬ খৃঃ), বরাহমিহির (৫০৫ খৃঃ), ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮ খৃঃ), শ্রীপতি (৯৬১ খৃঃ), শ্রীধরাচার্য (৯৯১ খৃঃ), ভাস্করাচার্য (১১১৪ খৃঃ) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা নিঃসন্দেহে তৎকালীন যুগে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ছিলেন। আর্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্তের অবদানে পাই বর্ণমালার সাহায্যে অজ্ঞাত রাশির নির্দেশ, negative ও positive সংখ্যার গুণ ও ভাগ। power ও exponent-এর ব্যবহার, একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ডিগ্রীর অনির্ণীত সমীকরণ, involution ও evolution-এর নিয়মাবলী, Arithmatic ও Geometric Progression ইত্যাদি।

নিউটন লেবনিজের বহু আগেই ভাস্করাচার্য Differential Calculus নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে সফলকাম হন।

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ যেখানে } ax^2 + bx + c = 0$$

এই দ্বিঘাত সমীকরণের আধুনিক সমাধান শ্রীধরের। একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ আর্যভট্টের মতে $by - ax = c$। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ইউরোপীয় গণিতজ্ঞ ব্রাউনকের আগেই ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য, শ্রীপতি দ্বিঘাত অনির্ণেয় সমীকরণে জানান যে—

$Nx^2 + 1 = y^2$-এর সমাধান $x = \frac{2m}{m^2 \sim N}$, $y = \frac{m^2 + N}{m^2 \sim N}$, m যে কোন মূলদ সংখ্যা। সাইন-কোসাইনের বহু আধুনিক সূত্রের আবিষ্কারক বরাহমিহির।

জ্যোতির্বিদ্যা ঃ জ্যোতির্বিদ্যায় আর্যভট্ট, বরাহমিহির, লাটদেব, সিংহাচার্য, প্রদ্যুম্ন, বিজয় নন্দী, ব্রহ্মগুপ্ত, মঞ্জুল, শ্রীপতি, ভাস্করাচার্য প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আর্যভট্টের মৌলিক দান—

(ক) Apse-এর সাহায্যে গ্রহের Orbit নির্ণয়ের বিশুদ্ধ সমীকরণ।

(খ) গ্রহগুলির ভ্রমণবৃত্তের কেন্দ্র পৃথিবীর ভ্রমণবৃত্তের কেন্দ্র থেকে ভিন্ন হওয়াতেই গ্রহগুলির গতি অসম বলে মনে হয়।

(গ) ক্রান্তিবৃত্তের কোন এক বিন্দুর প্রকৃত উচ্চপাত ও নিম্নপাত বিষয়ক সমীকরণ।

(ঘ) চন্দ্রের কক্ষে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে তার ব্যাস-কোণের পরিমাণ।

(ঙ) চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে নানান তথ্য।

(চ) প্রতি বছরে দিনের সংখ্যা ৩৬৫.২৫৮৬৮০৫।

ব্রহ্মগুপ্তও নানান তথ্যের আবিষ্কর্তা। ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' এবিষয়ে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

রসায়ন ঃ এ বিষয়ে চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ট, নাগার্জুন প্রমুখ উল্লেখ-যোগ্য। খনি থেকে ধাতু-নিষ্কাশন ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার শুদ্ধিকরণের উপায় ভারতীয়েরা খৃষ্টপূর্ব ৩০০ বছর আগেই জানতেন। খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেই calcination, distillation. Steam distillation, sublimation, fixation, organic and inorganic compounds preparation বহুল প্রচলিত ছিল। নাগার্জুনের 'লোহাশাস্ত্র', 'রসরত্নাকর', 'কক্ষপুটতন্ত্র', 'আরোগ্যমঞ্জরী', গোবিন্দ ভাগবতের 'রসহৃদয়' (১১শ শতাব্দী), 'রসার্ণব' (১২শ শতাব্দী), সোমদেবের 'রসেন্দ্র চূড়ামণি (১২-১৩শ শতাব্দী), যশোধরের 'রসপ্রকাশ সুধাকর' (১৩শ শতাব্দী), 'রসকল্প' (ঐ) ও বিষ্ণুদেবের 'রসরাজ- লক্ষ্মী' (১৪শ শতাব্দী) তৎকালীন যুগের ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্র গ্রন্থ।

পদার্থবিদ্যা ঃ শক্তির নিত্যতা (Conservation of energy), পরিবর্ত্তন (transformation) ও অপব্যয় (dissipation) এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত অভিব্যক্তিবাদ (Principle of evolution) সম্বন্ধে নানান তত্ত্ব খৃষ্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল এদেশে। গর্গ, পরাশর কাশ্যপ, বৎস প্রমুখের লেখায় পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে নানান তথ্য পাওয়া যায়। বরাহমিহির বাইশটি বিভিন্ন মণি ও সেগুলির ধর্ম (properties) লিপিবদ্ধ করেন। তিনি শিলাদারণ (Scaring of hard rocks), শস্ত্রপান (hardening of steel), বজ্রলেপ (preparation of cement) সম্বন্ধে নানান আলোচনা করেছেন। তাঁর কালে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাচ ও ইস্পাত তৈরী হত। ১৭৫ মণ ওজনের ২৪ফুট উঁচু বিখ্যাত লৌহস্তম্ভটি (দিল্লীর কুতুব-মিনারের কাছে) খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। এ ধরণের বিশাল লৌহস্তম্ভ ঢালাই করা ইউরোপেও অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে সম্ভব ছিলনা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আজ এই ষোলশ' বছর পরেও স্তম্ভটিতে কোনরকম মরচে পড়েনি। এছাড়া যে সমস্ত বিষয়ে উন্নতি দেখা যায়, তা হচ্ছে—

(ক) আলোকের প্রতিফলন (reflection) ও প্রতিসরণ (refraction) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা।

(খ) আলোকের রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemical effects)

(গ) লেন্সের ফোকাস্ বিষয়ক (Focus) নীতিগুলি

(ঘ) তারের কম্পন (Vibrationt of Strings) সম্বন্ধে সূত্রাদি

(ঙ) চৌম্বক আকর্ষণ (magnetic attraction)

(চ) পদার্থের গতি (motion of particles)

(ছ) তড়িৎ বিজ্ঞান (electricity)

উদ্ভিদ বিদ্যা ঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গধর-পদ্ধতির অন্তর্গত উপবন বিনোদ খণ্ড' উদ্ভিদবিদ্যার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। বীজের মধ্যে যে সমস্ত organ এবং tissue থাকে তার পরিচয়, উদ্ভিদের ক্ষতিকারক কীটাদি এবং নানারকম রোগ ও তা উপশমের উপায়, নানা ধরণের তুলা উৎপাদন ইত্যাদির ব্যাপক প্রয়োগ এযুগে ছিল।

চিকিৎসা বিদ্যা ঃ অস্ত্রোপচারের নানান পদ্ধতি ও অস্ত্রাদি প্রয়োগই শুধু নয়। বিপাক, সংবহন, রক্তবাহ, স্নায়ুর ক্রিয়া, ভ্রূণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, বংশগতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও বাস্তব প্রয়োগ এযুগের বৈশিষ্ট্য। হাসপাতাল ও পশু-চিকিৎসালয় বহুস্থানে ছিল।

কারিগরি বিদ্যা ঃ ইঞ্জিনিয়ারীংয়ে যে সমস্ত বিষয় পড়ান হত ছাত্র-ছাত্রীদের তার মধ্যে কয়েকটি ছিল—

(ক) ধাত্বাদিনাং সংযোগ-অপূর্ব-বিজ্ঞানম্—নতুন ধরণের ধাতব যৌগিক প্রস্তুত বিদ্যা (metallurgy)

(খ) তড়াগ-বাপি-প্রসাদ-সমভূমি ক্রিয়া—পুকুর, কূপ প্রস্তুত করা, জমি সমতল করা ও গৃহনির্মাণ (Architecture)

(গ) উপকরণ ক্রিয়া, যন্ত্রপ্রয়োগ বা যন্ত্রমাতৃকা—যন্ত্রবিদ্যা (Mechanical engineering)।

(ঘ) নৌকা-রথাদি কৃতিজ্ঞানম্—নৌকা, রথ ও অন্যান্য যানবাহন তৈরী করার বিদ্যা।

(ঙ) কৃত্রিম স্বর্ণ-রত্নাদি ক্রিয়া জ্ঞানম্—কৃত্রিম সোনা ও রত্নাদি প্রস্তুত বিদ্যা।

(চ) কাচ-পাত্রাদি করণ-বিজ্ঞানম্—কাচ পাত্র নির্মাণ বিদ্যা (ceramics)

(ছ) জলানাং সংচেনং সংহরণম্—জল-সেচ বিদ্যা (irrigation)

(জ) লৌহাদি সারশাস্ত্র অস্ত্র কৃতিজ্ঞানম্—লৌহ অস্ত্রাদি নির্মাণ বিদ্যা (Gun-shell making)

অন্যান্য বিষয়ঃ উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও বিবর্তন তত্ত্ব, আবহ-বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা বিষয়েও বহু উন্নত ধরণের চিন্তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

॥ আধুনিক যুগ ॥

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করে এলাম বেশ কয়েক হাজার বছরের ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীর নাগরিক হয়তো বলে বসবেন—'আরে ওতো অতীতের কথা, বর্তমানের খবর বলো'। ভারতের প্রাণপুরুষ কিন্তু মরেন নি। শত দুঃখ-কষ্ট আর ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও বিজ্ঞানের আলোক রেখেছিলেন জ্বালিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন—"প্যারিস সভ্য জগতে এক কেন্দ্র……নানা দিগ্‌দেশ সমাগত সজ্জন সঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালি প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়…? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভা-মণ্ডলীর মধ্যে হতে এক যুবা যশস্বী…আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন। সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস। একা যুবা…বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশচন্দ্র বসু—ভারতবাসী…ধন্য বীর।" (বাণী ও রচনা ৬ : ১৪২)

যে **জগদীশ বোসের** প্রশংসায় স্বামীজী পঞ্চমুখ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই ভারতীয় বিজ্ঞানের আধুনিক পথিকৃৎদের মধ্যে প্রথম (১৮৫৮—১৯৩৭)। বেতার আবিষ্কার, যন্ত্রের সাহায্যে গাছের প্রাণের স্পন্দন দেখানো। ক্রিসকোগ্রাফ (গাছের বৃদ্ধিকে এক কোটি গুণ বড় করে দেখানোর যন্ত্র) আবিষ্কার ইত্যাদি

বিজ্ঞানের জগতে তাঁর দান। তাঁর লিখিত বইগুলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে Response in the living and non-living, Plant Response এবং The motor mechanism of plants. কলকাতায় বিজ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র 'বোস রিসার্চ ইন্‌স্‌টিটিউট' তাঁর অন্যতম কীর্তি।

শ্রীনিবাস রামানুজনকে (১৮৮৭—১৯২০) দেখে মনে হয়েছিল বুঝি আর্যভট্টই আবার ফিরে এসেছেন। স্কুল-কলেজে ভাল ছাত্র বলে পরিচিতি না থাকলেও তাঁর মধ্যে যে গাণিতিক প্রতিভা ছিল তার পরিচয় পেয়ে তাঁকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। থিওরী অব্‌ নাম্বারস্‌-এ তাঁর দান বিশ্ববিশ্রুত এবং এর ফলে তাঁকে রয়াল সোসাইটীর ফেলো (FRS) নির্বাচিত করা হয়।

১৯৩০ সনে পদার্থ বিজ্ঞানে প্রাইজ বিজয়ী হয়ে স্যার **চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন্‌** (১৮৮৮—১৯৭০) বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের এক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কোন একরঙা আলোর গতিপথে একাধিক পরমাণু বিশিষ্ট কোন অণু রাখলে ঐ সমস্ত পরমাণুর সঙ্গে কয়েকটি মাত্র আলোকরশ্মির সাক্ষাৎ সংঘাত হয় এবং এতে সংঘর্ষপ্রাপ্ত আলোকরশ্মিগুলির রঙ বদলে যায়। আলোর রঙ তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নিভর্র করে বলে বলা যায় যে সংঘর্ষপ্রাপ্ত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাল্‌টে যায়, অর্থাৎ এখানে বেড়ে যায়। এই বেড়ে যাওয়ার অর্থ প্রতি সেকেণ্ডে আলোর কম্পন সংখ্যা কমে যাওয়া, অর্থাৎ শক্তি কমে যায়; তাহলে বহু পরমাণু বিশিষ্ট কোন পদার্থের অণুর সঙ্গে সংঘাতে আলো তার শক্তি খানিকটা হারিয়ে ফেলে। এই ক্ষয়িত শক্তি কোথায় যায়? রামন দেখালেন যে সংঘর্ষের সময় পরমাণুগুলিই এই শক্তি শোষণ করে এবং এই শোষণের পরিমাণ ও প্রকৃতি, অণুটির পরমাণু সংস্থানের উপরে নিভর্রশীল। অতএব শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ ও প্রকৃতি জানা গেলে, রামনের পদ্ধতিতে যা জানা খুবই সহজ, অণুর পরমাণু সংস্থান বের করা যাবে। অণুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আলোর এই রঙ-পাল্টানো অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিই Raman Effect এবং আহত তিন রঙা রশ্মি Raman Ray বলে পরিচিত।

১৯৪৩ সনে তিনি ব্যাঙ্গালোরে Raman Research Institute গড়ে তোলেন। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি অসংখ্য পুরস্কার জয় করে নিয়ে এসেছেন। Molecular Diffraction of Light, Mechanical Theory of Bowed Strings and Diffraction of X-rays, Theory of

Musical Instruments, Physics of Crystals ইত্যাদি বহু বই তিনি রচনা করেছেন।

প্রশান্ত মহলানবীশ-কে (১৮৯৩—) পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের জনক বললেও অত্যুক্তি হয় না। গণিতের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের নতুন নতুন সূত্রই শুধু নয়, দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পরিসংখ্যানের ব্যবহারিক প্রয়োগ কৌশল আবিষ্কার (Fractile Graphic Analysis) তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব যার ফলে ১৯৫৫ সনে ভারত সরকারের প্ল্যানিং কমিশনে তাঁকে সদস্য নির্বাচন করা হয়। ১৯৩৩ সনে তিনি 'সংখ্যা' নামে পরিসংখ্যানের একটি পত্রিকা শুরু করেন এবং ১৯৫৫ সনে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

পৃথিবীর মানুষের কাছে নক্ষত্রের ভাষা শুনিয়েছেন **মেঘনাদ সাহা** (১৮৯৩—১৯৫৬)। আকাশের তারাগুলি যে আলো পাঠায় সেই আলোক প্রিজম আর গ্রেটিংয়ের সাহায্যে ডিকম্পোজড্ করে নিযে যে বিভিন্ন রেখা পাওয়া যায় সেগুলির উপরে Saha Equation প্রয়োগ করে ঐসব তারাদের অনেক অজানা কথা জানা যায়। এছাড়াও Thermodynamics এবং Kinetic theory of Gases ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ভারতে জাতীয় কংগ্রেসে National Planning, স্বাধীন ভারতে পঞ্জিকা সংস্কারে তাঁর ভূমিকা বৈশিষ্ট্যজনক। তাঁর লেখা বই A Treatise on Heat কলেজের ছাত্র মহলে সুপরিচিত। এ ছাড়াও A Treatise on the Theony of Relativity, On a Physical Theory of Solor Corona, A Treatise on Modern Physics বইগুলিও বিখ্যাত। Saha Institute of Nuclear Physics-এর প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব।

আচার্য **সত্যেন্দ্রনাথ বসু** (১৮৯৪—) নোবেল প্রাইজ না পেয়েই পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হিসাবে নাম কিনেছেন। আধুনিক নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে সমস্ত মৌলিক পদার্থকে আজ দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়—প্রথমটি হচ্ছে Fermions এবং দ্বিতীয়টি আচার্য বোসের নামে Bosons. এছাড়া তাঁর নামের সঙ্গে আইনস্টাইনকে জড়িয়ে Bose-Einstein Statistics একটি বিশ্ব বিখ্যাত সূত্র। ম্যাক্সওয়েল ও বোল্জম্যান গ্যাসীয় পরমাণুর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ফোটনের (Photon) ব্যবহার নির্ণয় করার জন্য যে সূত্র তৈরী করেছিলেন, আচার্য বসু সেটির ভুল বের করেন। তাঁর এই কাজকে আইন-স্টাইন স্বাগত জানান এবং এরপরে দু'জনের মিলিত গবেষণায় Bose Einstein

Statistics-এর সাহায্যে নির্ভুল সূত্র আবিষ্কৃত হয়। বসু দেখালেন যে গ্যাসীয় পরমাণুর ক্ষেত্রে ফোটনগুলির মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায় না। Field theory-র সূত্র আবিষ্কারে আইনস্টাইন যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন বসু (১৯৫৩-৫৫) এই ক্ষেত্রে নিজের গবেষণা নিয়ে এগিয়ে আসেন। ফেলো অব্ রয়েল সোসাইটী হওয়া ছাড়াও বর্তমানে তিনি জাতীয় অধ্যাপক। Light Quanta Statistics, Affine Connection Co-efficients ইত্যাদি বই তাঁর রচিত। ১৯২৪-২৫ সনে ম্যাডাম কুরী এবং ১৯২৫-২৬ সনে আইনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করে তিনি উভয়েরই বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিলেন।

কে. এস. কৃষ্ণণের (১৮৯৬—১৯৬১) মৌলিক দানের মধ্যে বিখ্যাত তিনটি :—

(১) অণুর মধ্যে প্রবেশ করার গোপন পথ অবিষ্কার।

(২) ক্রিস্ট্যালের চৌম্বক ধর্ম ও অন্তর গঠনের মধ্যে সংযোগ আবিষ্কারের বাস্তব পন্থা।

(৩) গ্রাফাইট ক্রিস্ট্যালের ইলেকট্রনের ক্ষেত্রের ম্যাপ অঙ্কন।

১৯৪৭-৬১ পর্যন্ত তিনি Atomic Energy Commission-এর সভ্য এবং ১৯৫৫-৫৭ পর্যন্ত International Council of Scientific Union-এর সহ সভাপতি ছিলেন। এছাড়া ১৯৪০ সনে রয়েল সোসাইটীর ফেলো নির্বাচিত হন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে **হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা** (১৯০৯—১৯৬৬) একটি বিশ্বখ্যাত নাম। সেকেণ্ডারী কসমিক'রে-সমূহের মধ্যে যেগুলি দুর্বল, অর্থাৎ ১০-১৫ সে. মি. চওড়া লেড-ব্লক ভেদ করতে পারে না, সেগুলির আবিষ্কারই (cascade theory) তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। এছাড়া 'ভেক্টর থিওরী অব্ দ্য মেসন'-এর উন্নতি বিধান, Bhava-type theories ইত্যাদি নানারকম আবিষ্কার নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। ১৯৪২-৪৫ সনে তিনি Cosmic Ray Research unit-এর অধ্যাপক ও Tata Institute of Fundamental Research-এর পরিচালক। ১৯৪৭-৬৬ পর্যন্ত ভারতের এ্যাটমিক কমিশনের চেয়ারম্যান, ১৯৫৪-৬৬ পর্যন্ত ভারত সরকারের Department of Atomic Energy-র সেক্রেটারী ইত্যাদি নানান পদে অধিষ্ঠিত থেকে Nuclear Physics-এ বহু অবদান তিনি রেখে

গেছেন। ১৯৪১ সনে FRS হন। তাঁর রচিত Quantum Theory, Elementary Physical Particles, Cosmic Radiation বইগুলি বিশেষ মূল্যবান।

কোন নক্ষত্র যখন জ্বলতে জ্বলতে ভেতরের জ্বালানি হাইড্রোজেন প্রায় ফুরিয়ে আসে তখন তা আয়তনে ছোট হয়ে পড়ে আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের অবস্থায় আসে পরিবর্তন। অভ্যন্তরীণ অংশটি তখন প্রবল চাপের সৃষ্টি করে নক্ষত্রের বাইরের অংশের উপর। এই সময়ে নক্ষত্রটি তার বহিরাংশের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও চাপ বজায় রাখে কিছুটা শক্তি ক্ষয় করে আর এই শক্তিক্ষয় করে সে তার পরিধির পরিবর্তনের মাধ্যমে। **এস. চন্দ্রশেখর** (১৯১০—) দেখালেন সে নক্ষত্রের ভেতরের অংশটির (core) ভর সূর্যের ১.৪ গুণের চেয়ে কম হলেই এই পরিধি পরিবর্তন হয়। মহাকাশে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্ষেত্রেও তিনি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব রেখেছেন এবং বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক হলেও ভারতবর্ষ থেকেই ১৯৩০ সনে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ হন। Introduction to the Study of Stellar Structure, Principles of Stellar Dynamics, Radiative Transfer, Hydro-dynamics and Hydro-magnetic Stabilitv পুস্তকগুলি রচনা করা ছাড়াও Astrophysics Journal এর বর্তমান সম্পাদক তিনি। রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হবার আগে ও পরে বিভিন্ন দেশের বহু পুরস্কার তাঁর ঘরে এসেছে।

ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা (১৯২২—) ১৯৬৮ সনে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পান। বর্তমানে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। DNA অর্থাৎ ডি অক্সিরিবোনিওক্লোয়িক্ এ্যাসিড জীবকোষের সেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ যাদের বিভিন্ন কায়দায় সাজিয়ে একটি মালা তৈরী হয়। এই সাজানোর উপরেই নির্ভর করে DNA-র গুণাগুণ। খোরানা সম্পূর্ণ কৃত্রিম পদ্ধতিতে এমন একটি ক্ষুদ্র DNA তৈরী করেছেন যার সাহায্যে একটি আকাঙ্ক্ষিত জৈবিক উপাদান (t-RNA) তৈরী করা সম্ভব হয়েছে যার কাজ জীবকোষে প্রোটিন উৎপাদন করার সময় প্রোটিনের মূল উপাদান যে সমস্ত এ্যামিনো এ্যাসিডের প্রয়োজন তাদের সংগ্রহ করা। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তিনি আরেকটি চমকপ্রদ আবিষ্কার করেছেন। তিনি ল্যাবরেটরীতে তৈরী করেছেন অপেক্ষাকৃত সরল DNA অণু যার খোরানো

সিঁড়ির মত জড়ানো ডবল ফিতেয় আছে ৭৭-নিউক্লিওটাইড গঠন। যদিও এর তুলনায় মানুষের কোষের DNA গঠিত লক্ষ লক্ষ নিউক্লিওটাইড দিয়ে জটিলভাবে, তবুও খোরানার পদক্ষেপ বিজ্ঞান-জগতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলেছে। মানুষের একটি দেহ-কোষে আছে ৪৬টি করে ক্রোমোজম্ যেগুলির মধ্যে আছে আবার দেড়লক্ষ জীন। এই জীনকেই বলা হয় DNA যা ক্রোমোজমের মধ্যে থেকে কোষকে পরিচালন করে। তাই এই DNA-কে আয়ত্তের মধ্যে আনার অর্থ কৃত্রিম মানুষ সৃষ্টির পথে আসা। খোরানা সেই পথেরই সন্ধান দিয়েছেন।

এঁরা ছাড়াও পরিসংখ্যানবিদ্ রাজচন্দ্র বসু। পদার্থবিজ্ঞানী দৌলৎ সিং কোঠারী ও জয়ন্ত নারলিকর। জীববিদ্যা বিশারদ জে. বি. এস. হ্যালডেন, রসায়ন বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জীববিজ্ঞানী ভৈরবচন্দ্র মুখার্জী, মনোবিজ্ঞানী হেমেন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ বিশ্ব-দরবারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন।

উপসংহার

ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য সত্যানুসন্ধান, চিন্তার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক স্বাধীনতা এযুগে দেখা যায় তাইই ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বিজ্ঞানচর্চায়। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ক্ষেত্রেই তাই সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় বিজ্ঞান স্বাভাবিকগতিতে এগিয়ে চলেছে। গ্রীক ও পরে আরব দেশীয় বৈজ্ঞানিকদের উপরে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রভাব সুপরিস্ফুট। অবশ্য বিদেশী সভ্যতার কাছেও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিষয়ে ঋণী, বিশেষত মধ্যযুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিজ্ঞানের মধ্যেই বহুল আদান-প্রদানের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে বিজ্ঞানচর্চার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় এদেশের মাটিতেই—একথা আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেখেছি। মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কারই যে ভারতীয় বিজ্ঞানের কাছে নতুন কিছু নয়, একথাও আমরা প্রসঙ্গক্রমে নানানস্থানে দেখেছি। ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান সাধনার প্রকৃত মূল্যায়ন আজো সম্ভব হয়নি। উপনিষদের মধ্যে রূপকাকারে বিজ্ঞানে বহু তত্ত্ব ও তথ্য লুকিয়ে আছে। সেসব এ প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। সুষ্ঠুভাবে সে কাজ করবার জন্য চাই সংস্কৃতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক

ও ঐতিহাসিকদের একযোগে একটি বিশেষ সংস্কার প্রবর্তন। ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবিষয়ে আমাদের কাছে পথিকৎস্বরূপ। ভারতীয় বিজ্ঞানের মাঝেই পাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল বিজ্ঞানের এক মহামিলনের সুর।

"চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়। কিন্তু উহা বুঝিতে গেলে আমাদিগকে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে হইবে।"

—বিবেকানন্দ

"সকল ধর্মমত এবং শিল্পকলা ও বিজ্ঞান একই বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা। এদের প্রত্যেকটিরই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজীবনকে মহত্তর করে তোলা এবং নিছক দৈহিক অস্তিত্বের রাজ্য থেকে ব্যক্তি-মানবকে উদ্ধার করে তাকে মুক্তিপথগামী করা। —আইনস্টাইন

গ্রন্থপঞ্জী :

(১) বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা—ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার
(২) বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন
(৩) প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চা——শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
(৪) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

ভারতীয় শিল্পের পরিচয়

—ভূমিকা—

পৃথিবীর ইতিহাসে কোন জাতি কত সভ্য ও সংস্কৃতিবান তার স্বাক্ষর থাকে তার শিল্প ও সাহিত্যে। মিশরীয়, গ্রীক, প্রভৃতি প্রাচীন সুসভ্য জাতিগুলির পরিচয় তাদের প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্যের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারত-শিল্পও সুপ্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীক শিল্পের সমসাময়িক। কালক্রমে প্রাচীন মিশর ও গ্রীসের অবলুপ্তি ঘটেছে। গ্রীসের সাহিত্য ও শিল্পবোধকে গ্রহণ করে পরবর্তী কালে অবশ্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে নব-জাগরণ ঘটেছে। কিন্তু প্রবল প্রাণশক্তি সম্পন্ন ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্প শতাব্দীর পর শতাব্দী নানা সংঘাত ও বিপর্যয় সহ্য করে আজো প্রাণবন্ত। শক, হুনদল, মোগল, পাঠান যেমন ভারতের সমাজ দেহকে পুষ্ট করেছে তেমনি গ্রীক, রোমক, পারসীক প্রভাবে তার শিল্প-চেতনাও নবরূপ ধারণ করেছে। কিন্তু ভারত শিল্পের মূল কথাতো বস্তুর অবিকল অনুকৃতি নয়; আত্মার বিকাশ, বস্তু অতিরিক্ত ভাবের প্রকাশই (ideality) তার উপজীব্য। বস্তুকে স্বীকার করে তার অন্তর্নিহিত রূপলোককে উন্মোচিত করেছেন ভারতীয় শিল্পী। তাই ভারতীয় শিল্পীকে বলা হত রূপদক্ষ। এই ভারতীয় শিল্পীরা একাধারে সাধক ও দার্শনিকও, তাই ভারতীয় শিল্প সাধনার শ্রেষ্ঠ ফসল অজন্তা-চিত্রকলার জন্ম কোন রাজ দরবারে হয়নি, হয়েছে অরণ্যঘেরা পার্বত্য-গুহার নিজন ধ্যান কক্ষে। ভারতবর্ষে শিল্পচর্চা ধর্মাচরণেরই অঙ্গীভূত ছিল। ভারতীয় শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ, আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতীক দেবদেবীর মূর্ত্তি, চিত্র-শিল্পে ও ভাস্কর্যে, রূপায়িত করে চরিতার্থ হয়েছে। নটরাজের নৃত্যপর চরণ ছন্দে, অঙ্গুলি মুদ্রায়, মুখভঙ্গিমায় চিরকালের শিল্প-সৌন্দর্য সংহত। ভারতীয় শিল্পী কোথাও একে ছেনির ঘায়ে পাথরের বুকে ফুটিয়ে তুলেছেন—কোথায় তুলিতে এঁকেছেন আবার কোথাও ধাতু গালাই করে ছাঁচের মধ্যে ঢেলেছেন। ভারত-সংস্কৃতির প্রতীকরূপে এই নটরাজ সমুদ্র পেরিয়ে গেছেন—সুমাত্রা, জাভা, বলী, বোর্ণিও, সঙ্গে গেছেন ধ্যানস্থ বুদ্ধ—ভারতের সাম্য, মৈত্রী, করুণার দূতরূপে।

সুদীর্ঘ ছয়হাজার বর্ষব্যাপী ভারতীয় শিল্পসাধনা প্রধানতঃ তিনটি ধারায় বিভক্ত—সে তিনটি ধারা হল (১) **স্থাপত্য** (২) **ভাস্কর্য** ও (৩) **চিত্রকলা।** এই ত্রিধারার ত্রিবেণী সঙ্গমেই কালজয়ী ভারত-শিল্পের সৃষ্টি। শিল্পরসিক সাধারণ পাঠক ও কোমলমতি ছাত্রদের বোঝবার সুবিধার জন্য স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হল।

স্থাপত্য শিল্প

প্রাসাদ, প্রাকার, মন্দির, মসজিদ, বিহার, চৈত্য, স্তূপ যে রীতি বা ঢংএ তৈরী হয় তাকেই স্থাপত্যরীতি বলে। একেক দেশে একেক রীতির স্থাপত্যকলা দেখা যায়। বিভিন্ন যুগে সে রীতিরও রকমফের ঘটে। ভারতবর্ষের স্থাপত্যরীতির যে রূপ সিন্ধু-সভ্যতার আমলে ছিল, পরবর্তীকালে গ্রীক ও পারসীক প্রভাবে তার রূপান্তর ঘটে। তাই আবার গুপ্ত রাজাদের আমলে ভাস্কযশিল্পের অলংকরণে স্বমহিমায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে বহির্ভারতে বিস্তার লাভ করেছে।

ভারতীয় সভ্যতার সুপ্রাচীন ধারাটি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রত্ন-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগ পার হয়ে এসেছে। কিছু পাথরের অস্ত্রশস্ত্রে ভারতীয় আদিবাসীদের সহজাত আদিম শিল্পবোধের ছাপ আছে মাত্র। আর তাদের বাসগৃহ, পবত গুহার দেওয়ালে, দেখা যায় কিছু অপরিণত হাতের রেখাচিত্র। ভারতবর্ষের মহাদেব পর্বতের গুহাগাত্রে এমনি কতকগুলি রেখাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। পণ্ডিতেরা অবশ্য এগুলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় স্থাপত্যের প্রথম সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায় সিন্ধুনদতীরের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। প্রায় ছয় হাজার বছর আগে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা নগরীর পাকা ইটের তৈরী প্রাসাদ, বাঁধানো মস্ত চওড়া রাস্তা ও স্নানাগারের নির্মাণ পরিকল্পনার মধ্যে ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে।

সিন্ধুযুগ

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরীতে শুধু স্থাপত্যকলার পরিচয়ই পাওয়া যায় নি। ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে।

চিত্রকলার উৎসের সন্ধানও মিলেছে এই দুই নগরীর শিল্পবস্তুর অলংকরণের মধ্যে। ভাস্কয ও চিত্রকলা পর্যায়ে সিন্ধু-সভ্যতার ভাস্কর্য ও চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

সিন্ধু-সভ্যতার পরবর্তী কালকে বৈদিক যুগ বলে চিহ্নিত করা চলে। এই কালে আর্যরা বেদ রচনা করেন। বৈদিক সাহিত্যে তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম, শিল্পকলার আলোচনা ও বর্ণনা থাকলেও সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনের মত বৈদিক যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার কোন নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে ভারতীয় শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে এই যুগকে 'অন্ধকার যুগ' বলা চলে। হয়তো এমন দিন আসবে যেদিন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কোন মনীষী বৈদিক যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য আবিষ্কার করে জগৎকে স্তম্ভিত করে দেবেন।

বৈদিকযুগ

বৈদিক যুগের শেষের দিকে রচিত রামায়ণ, মহাভারত গ্রন্থে অনেক প্রাসাদ মন্দিরের বর্ণনায় অবশ্য ভারতীয় শিল্পকলার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। কিন্তু সে আমলের কোন 'পাথুরে প্রমাণ' আমাদের হাতে আসেনি। দিল্লীতে (ইন্দ্রপ্রস্থ) পাণ্ডবদের দুর্গ বলে যা দেখানো হয় তা অনেক পরবর্তী কালে নির্মিত।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তাঁর সংস্কার মুক্ত উদার চিন্তার প্রভাব পড়ে ভারতীয় সমাজ ও ধর্মসাধনায়। বড় বড় জনপদ গড়ে ওঠে বুদ্ধ-আবির্ভাবের কালে। কাশী, কোশল, পাঞ্চাল, গান্ধার কুরু, অঙ্গ, মগধ প্রভৃতির নাম শোনা যায়। এই জনপদগুলির স্থাপত্য কীর্তির কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই। শুধু মগধের (বিহার) গিরিব্রজ বা রাজগৃহের (রাজগীর) পাথরের বিশাল প্রাকারটি সে যুগের স্থাপত্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অনেকে বলেন প্রাকারটিতে পারসীক প্রভাব আছে। এখানে নাকি জরাসন্ধ রাজত্ব করতেন। ভীমের সঙ্গে তাঁর মল্লযুদ্ধের ক্ষেত্রটি আজও দেখা যায়।

মৌর্য আমলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন চন্দ্রগুপ্তের রাজ-প্রাসাদ। এটি ছিল কাঠের তৈরী। রাজসভার দেওয়ালে, স্তম্ভে যে কারু কার্য ও অলংকরণ ছিল তা ছিল সোনার অথবা রূপার। পাটলীপুত্র নগরীর প্রাচীর-স্তম্ভ ও তোরণ সবই ছিল কারুকার্য খচিত কাঠের তৈরী। গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমে অবস্থিত নগরীটি ছিল স্থাপত্য শিল্পের অনুপম নিদর্শন। সম্প্রতি মাটি খুঁড়ে পাটলিপুত্রের এক বিশাল প্রাকার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নগরীটির বর্ণনা পাওয়া যায় গ্রীকদূত

মৌর্যযুগ

মেগাস্থিনিসের Indica গ্রন্থে। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্যের (চাণক্য) অর্থশাস্ত্র থেকেও ভারতীয় নগর পরিকল্পনার কথা জানা যায়।

মহামতি অশোকের আমলে কাঠের স্থলে পাথরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কাজ সুরু হয়। তিনি মধ্য এশিয়া ও পারস্য থেকে প্রস্তর শিল্পী এনে প্রাসাদ ও স্তম্ভ নির্মাণ করান। এদের প্রভাব পড়ে ভারতীয় শিল্পীদের উপর। অশোক পাথরের স্তম্ভে ও গিরি গুহার গাত্রে বৌদ্ধ ধর্মের উপদেশ খোদাই করিয়ে ছিলেন।

অশোকের রাজত্ব কালেই মধ্যভারতে (ভূপাল) সাঁচীর সুবিখ্যাত স্তূপটি নির্মিত হয়। প্রথমে এটি ছিল ইটের তৈরী পরে পাথরে নির্মিত হয়।

অশোক হিন্দু সাধুদের নির্জনে সাধন ভজন করার জন্য গয়া শহরের কাছে বরাবর পাহাড়ে 'ন্যগ্রোধ' ও 'সুদামা" গুহা খনন করান।

বরাবর পর্বতের লোমশ মুনির গুহা প্রখ্যাত। এর তোরণটি পদ্মপাতার মত। তোরণের মাথায় একসারি হাতীর মিছিল ও জাফ্রীর নক্সা আশ্চর্য সুন্দর।

অশোকের তৈরী রাজপ্রাসাদগুলির ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্যের সৌন্দর্যে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধের সাধনপীঠ বুদ্ধগয়ায় (উরুবিল্ব) অশোক একটি স্তূপ নির্মান করান। এই স্তূপ সম্পর্কে দু' একটি কথা বলা দরকার। এই স্তূপগুলি একটি গোলাকৃতি বেদীর উপর তৈরী হত। বেদীর উপর অর্ধবৃত্তাকার অংশটিকে "অণ্ড" বলা হয়। এই "অণ্ড"টির উপরে চার চৌকোনা প্রাচীর ঘেরা জায়গাটির নাম "হর্মিকা"। এই হর্মিকার মাঝে একটি 'ছত্র' থাকে। সাধারণ পূজার্থী যাতে স্তূপ প্রদক্ষিণ করতে পারে তার জন্য স্তূপের চারিদিকে রেলিং ঘেরা পথ থাকে।

অশোকের তৈরী বুদ্ধগয়ায় স্তূপটি ধ্বংস হয়ে গেলে সেখানে বর্তমানের প্রসিদ্ধ মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই মন্দিরটি গুপ্তযুগে নির্মিত। খ্রীষ্টজন্মের শদুই বছর আগে মধ্যভারতের প্রসিদ্ধ ভারহুত স্তূপটি নির্মিত হয়। রাজা কুমারভদ্র পাল এর স্রষ্টা। পাথরের তোরণ ও প্রাকার গুলিতে স্থাপত্য কৌশলের অনুপম নিদর্শন বিদ্যমান।

শুঙ্গ যুগ

স্তূপ-স্থাপত্যের কথা বলতে গিয়ে তার ভাস্কর্য ও শিল্পের অলংকরণের কথা বাদ দেওয়া যায় না। ভাস্কর্য পর্যায়ে ভারহুত, সাঁচী, বুদ্ধগয়ার মন্দিরের ভাস্কর্যের আলোচনা করা হবে।

পশ্চিমঘাট পাহাড়ের কয়েকটি জায়গায় খৃঃ পুঃ ২য় শতাব্দীতে নির্মিত কয়েকটি গুহা মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে পুনা নগরীর কাছে ভাজা চৈত্যগৃহটির স্থাপত্য প্রশংসনীয়। পাহাড়ের গা কেটে এই চৈত্যটি তৈরী। একটি আটকোনা স্তম্ভ এই গুহা মন্দিরটির ছাদকে ধরে রেখেছে। ঐ পশ্চিমঘাট পর্বতের কারলি চৈত্যগৃহটি সবচেয়ে সুন্দর। ১২৪ ফুট লম্বা উপাসনা গৃহটির দুপাশে ১৫টি করে কারুকাষ মণ্ডিত থাম আছে। এই থামগুলি চৈত্যের ছাদটিকে ধরে রেখেছে। এক বিদেশী প্রখ্যাত শিল্প সমালোচকের মতে এইটিই নাকি ভারতবর্ষের "একমাত্র নিজস্ব বৈশিষ্টযুক্ত ছাদ"।

কুষাণ যুগ

ভারত শিল্পের এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ কুষাণ আমল। এই আমলে গ্রীক প্রভাবে ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও কারুশিল্পের এক অভিনব রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরিত শিল্পকলা 'গান্ধার শিল্প' নামে সুপরিচিত। কুষাণ নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। প্রধানতঃ দুটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কুষাণশিল্পের বিকাশ ঘটে। প্রথমটির কেন্দ্র প্রাচীন গান্ধার দেশ, তক্ষশিলা প্রভৃতি। এখানকার, শিল্পকলাই গান্ধার শিল্প। দ্বিতীয়টি মথুরা নগরী, এখানকার শিল্পাদর্শে বিদেশী প্রভাব থাকলেও মূল উৎস ছিল ভারতীয়। আর দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন রাজাদের অধিকৃত অন্ধ্রদেশ ছিল ভারতীয় শিল্প সাধনার তৃতীয় কেন্দ্র।

কুষাণ যুগের স্থাপত্য হিসাবে 'কণিষ্কের তৈরী ১৮ তলা স্তূপটি বিখ্যাত। এর মাথায় মস্ত এক তামার ছাতা ছিল। এই স্তূপের কথা চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তক্ষশিলার প্রাসাদ মন্দির ও মঠে গ্রীক প্রভাব দেখা যায়।

মথুরার স্থাপত্য বিদেশী শত্রুরা ধ্বংস করে দেয়, এখন কয়েকটি পাথরের প্রাচীর ও শিলাস্তম্ভ অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মথুরা শিল্পই প্রথম বিদেশী প্রভাব কাটিয়ে ভারতীয় ভাবের বাহক হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ ভারতে গুণ্টুর জেলার (অন্ধ্র) অমরাবতীর স্তূপ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অনুপম নিদর্শন।

গুপ্তরাজাদের আমলকে ভারতীয় শিল্পের স্বর্ণ যুগ বলা হয়। এই আমলেই ভারতীয়শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

গুপ্ত যুগ

ভারতীয় স্থাপত্যকলা গুপ্তযুগের পূর্বে গুহা খনন কার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই আমলের হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরগুলি ভারতীয় স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শনরূপে গণনীয়। ধর্মীয়

জীবন-দর্শনের গভীরতা ভারতীয় শিল্পীমনকে কত ব্যাপকভাবে যে প্রভাবিত করেছিল তার শৈল্পিক প্রকাশ এই মন্দিরগুলি। গুপ্তযুগের মন্দিরগুলিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে।

(ক) প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলির প্রধান লক্ষণ এর অলংকরণ শূন্যতা এই মন্দিরগুন্দির মাথায় কোন শিখর বা চূড়া নেই। এগুলি চারকোণা, ভিতরে গর্ভগৃহে দেব-বিগ্রহের স্থান, সামনে মণ্ডপ। চারটি থাম মণ্ডপের ছাদটিকে ধরে আছে। মধ্যভারতের সাঁচীস্তূপের কাছে চতুর্থ শতাব্দীতে তৈরী "সপ্তদশ-সংখ্যক মন্দির" এই জাতীয় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

(খ) মধ্যভারতের অজয় গড়ের নাচনার পার্বত্য মন্দির ও নাগোদ রাজ্যের শিবমন্দির দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে। এই মন্দিরগুলিতে গবাক্ষ বা জানালা আছে। মণ্ডপে ওঠার জন্য একসারি সিঁড়ি আর গর্ভগৃহের চারদিকে প্রদক্ষিণ পথ থাকে। মূল মন্দিরের দুপাশে দুটি ছোট ছোট মন্দির দেখা যায় এটি গুপ্তস্থাপত্যের এক বিশেষ রীতি। এই ধরণের ছোট মন্দির নালন্দাতে দেখা গেছে। আর পাওয়া গেছে ২৪ পরগনার বেড়াচাঁপায়।

(গ) গুপ্তযুগের মন্দির স্থাপত্যে কিছুকাল পরে শিখর বা চূড়ার দেখা পাওয়া যায়। চূড়াওয়ালা মন্দিরগুলির মধ্যে ঝাঁসি জেলার দেওগড়ের পাথরের তৈরী দশাবতার মন্দির ও কানপুরের ভিতরগাঁওএর ইটের মন্দির বিখ্যাত। এই দশাবতার মন্দিরের চড়া প্রায় ৫০ ফুট উঁচু ছিল। মন্দিরটির ভিত্তিমূলের প্রস্তরে রামায়ণের কাহিনী খোদাই করা আর চারিদিকেই মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি আছে। মন্দিরের দেওয়ালগুলিতে পৌরাণিক কাহিনী খোদিত। এই তিন ধরণের মন্দির স্থাপত্য ছাড়াও বুদ্ধগয়ায় মন্দিরটিও গুপ্ত-স্থাপত্যকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ—উচ্চবেদীর উপর চারকোণা মন্দিরটি অবস্থিত। সারি সারি স্তম্ভ ও শিখর গবাক্ষের অলংকরণ অপূর্ব সুন্দর।

শোলাপুরের ত্রিবিক্রম মন্দির ও গুণ্টুর জেলার কপোতেশ্বর মন্দির ভারতীয় গুহা-স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরী। এসব মন্দিরের ছাদ অর্ধ গোলাকার। আইহোলীর দুর্গামন্দিরের দুটি মণ্ডপ আছে—এই মণ্ডপ দুটির ছাদ কারুকার্য খচিত স্তম্ভের উপর ধরা আছে—দুদিকের সিঁড়ি দিয়ে মন্দির থেকে মাটিতে নামা যায়। দেবতাস্থান বা গর্ভগৃহের উপরে শিখর ক্রমশঃ সরু উঠে গেছে—তাতে অলংকৃত জানালা আছে। পরবর্তীকালের মন্দির স্থাপত্যের উপর এর প্রভাব অপরিসীম। মন্দিরের মত স্তূপ স্থাপত্যের

ত্রিমূর্তি : এলিফ্যান্টা গুহা

অজন্তা শিল্প

আঙ্কোরথম (ওঁকার ধাম)
(কাম্বোজ)
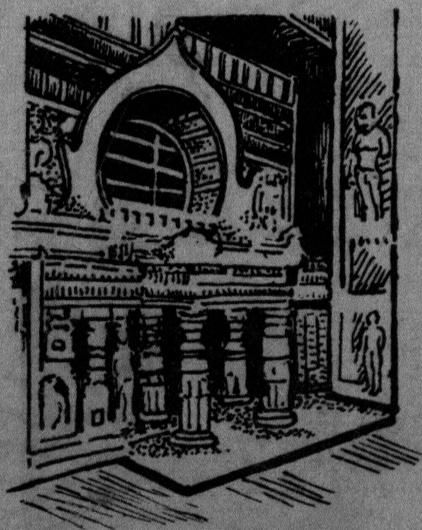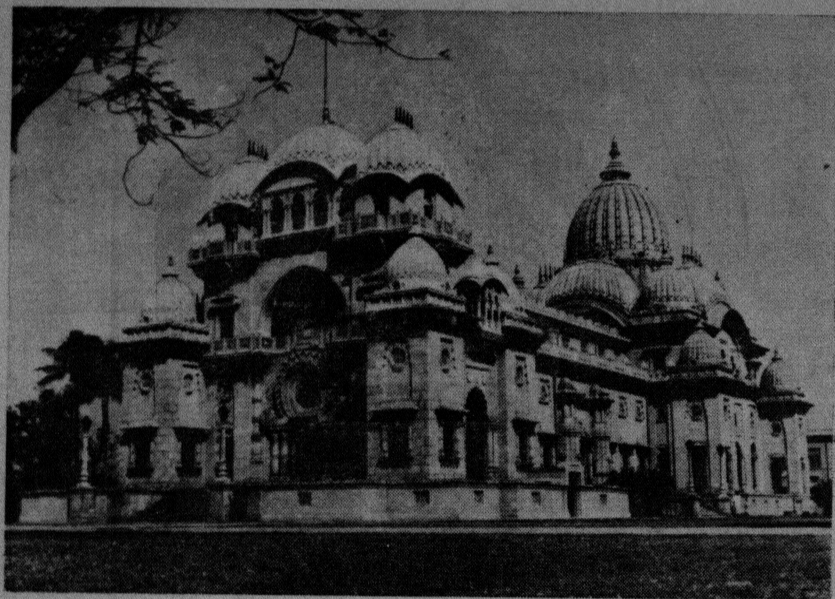
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির : বেলুড় মঠ
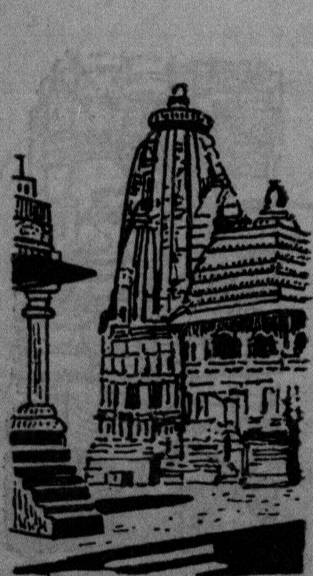
খাজুরাহ স্থাপত্যশিল্প

বুদ্ধগয়ার মন্দির

জগন্নাথ মন্দির : পুরী

মীনাক্ষী মন্দির : মাদুরা

জটেশ্বরনাথের মন্দির : মহানাদ (হুগলী)
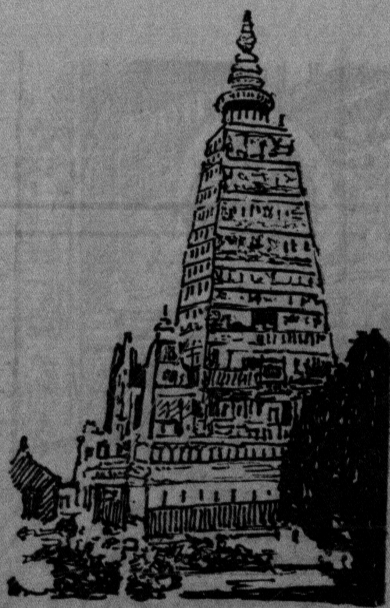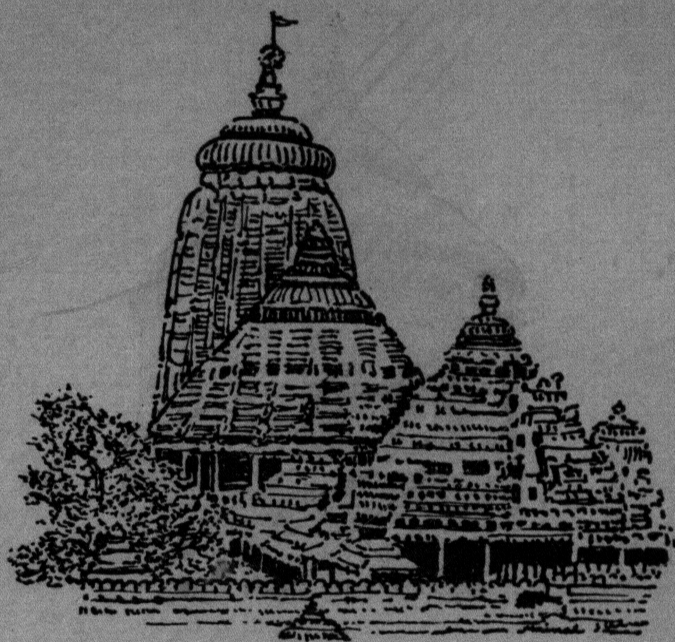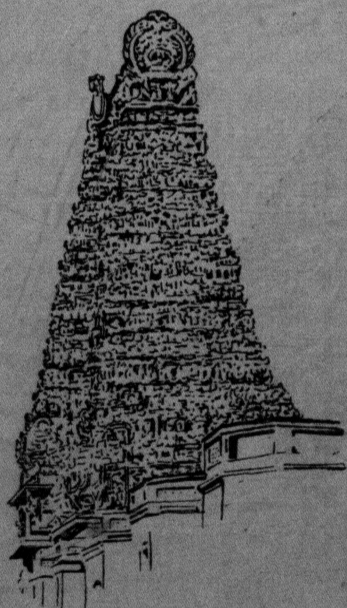
বাঁকুড়ার আটচালা মন্দির : বিষ্ণুপুর

বৃহদীশ্বরের মন্দির : তাঞ্জোর
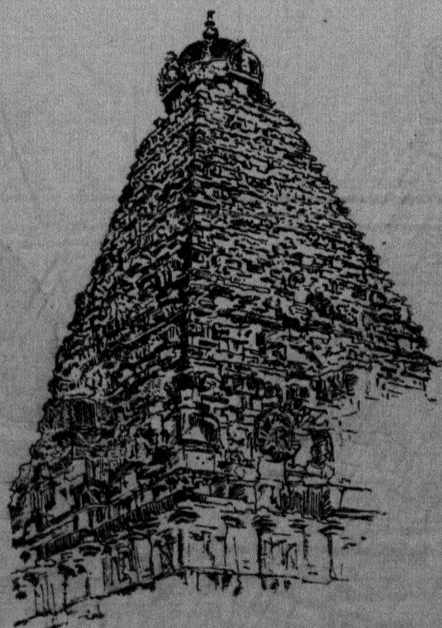
জন্যও গুপ্তযুগ বিখ্যাত। সারনাথের ধামেক স্তূপটি সুপরিচিত। এটি প্রায় একশ পঞ্চাশ ফুট উঁচু ছিল। স্তূপটির তিনটি স্তর—নীচের ও উপরের অংশ ইটের তৈরী শুধু মাঝের অংশ পাথরের। এই অংশে আটটি কুলুঙ্গী আছে তাতে বোধকরি দেবমূর্তি রক্ষিত হ'ত।

গুপ্তযুগেও পাহাড়ের পাথরে গা কেটে মঠ ও মন্দির তৈরী হয়েছে। এই জাতীয় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উদয়গিরি ও অজন্তায় দেখা যায়। তবে উদয়গিরি, ভাস্কর্যকলার দিক থেকে অতি উন্নত। আর অজন্তা, শুধু ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-কলার দিক থেকে নয়—চিত্র ও অলংকরণ শিল্পসৃষ্টিতেও সারা জগতের বিস্ময়ের বস্তু। অজন্তার উনিশ নং গুহাটির স্থাপত্যরীতি সত্যই অপূর্ব। পদ্মের পাপড়ীর মত একটি বৃহৎ চৈত্য-গবাক্ষ ও তার পাশে দাঁড়ানো দুটি যক্ষ মূর্তি, তার নিম্নে একসারি ছোট ছোট জানালা,—এর তলায় চারটি স্তম্ভের উপর ধরে রাখা একটি মণ্ডপে—সুপরিকল্পিত স্থাপত্যচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। চৈত্যগৃহের ভিতরে রয়েছে একটি বেদীর উপর ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি।

অজন্তার বিহারগুলির বৈশিষ্ট্য তার অলংকৃত স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলি পাহাড়ের পাথর কেটে তৈরী, এর উপর লতা, পদ্ম, ঘট, গন্ধর্ব মূর্তি খোদাই করা আছে।

গুপ্তযুগের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে,—স্থাপত্য-ভাস্কর্যকলার যে বিকাশ হয় তার পিছনে রয়েছে গুপ্তযুগের শিল্পপ্রেরণা।

ভাস্কর্য শিল্প

দেবমূর্তি, মনুষ্যমূর্তি, জীবজন্তু, লতাপাতা, ফুল ইত্যাদি যখন শিল্পী পাথর খোদাই করে আপন প্রতিভায় সৃষ্টি করেন তখন তাকে বলা হয় ভাস্কর্যশিল্প। মন্দির, মঠের পাথরের প্রাচীরে ভাস্কর্যের অনুপম অলংকরণ দেখা যায়। ধাতু গলিয়ে ছাঁচে ঢালাই করে নানা মূর্তি তৈরীও এই পর্যায়ে পড়ে। ছাঁচে তৈরী পোড়া মাটির শিল্পও ভাস্কর্যের

সিন্ধুনদ তীরে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরীতে ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসাবে পাওয়া গেছে পাথরের তৈরী আর ছাঁচে ঢালাই করা ব্রোঞ্জের মনুষ্যমূর্তি। এইসব পাথরের মূর্তির গঠন পারিপাট্য গ্রীক ভাস্কর্যের সহিত তুলনীয়। তবে গ্রীক

ভাস্কর্য যেখানে দেহশক্তির প্রকাশক সেখানে সিন্ধুনদ তীরের ভারতীয় ভাস্কর্য তার আত্মভাবকে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে প্রকাশ করেছে। এছাড়া ছাঁচে তোলা সীলমোহর যা পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় দেবমূর্তি, জীবজন্তু, মানুষ ও গাছপালা উৎকীর্ণ। এই সিন্ধু-শিল্পীরাই প্রথম দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্তি চুনা পাথরের সীলমোহরে খোদাই করেন। পোড়ামাটির মূর্তি নির্মাণে এই শিল্পীরা ছিলেন অসাধারণ দক্ষ। পোড়ামাটির মহিষ, ষাঁড়, গরু, মেষ প্রভৃতির চেহারা দেখে মনে হয় শিল্পীদের অঙ্গ-সংস্থান (Anatomy) জ্ঞান ছিল গভীর। সীলমোহরে যে লিপি তাঁরা উৎকীর্ণ করে রেখে গেছেন আজো তার পাঠোদ্ধার হয় নি। হলে ভারতীয় সভ্যতার এক নূতন দিক আলোকিত হবে। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে শিল্পীরা শিশুদের আনন্দ দেবার কথা ভোলেন নি। তাই মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা থেকে পাওয়া গেছে নানারকম পশুপাখীর মাটির খেলনা আর নানা ধরণের বিচিত্র মুখোশ। স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে যেমন কোন পাথুরে প্রমাণ বৈদিক যুগে পাওয়া যায় নি তেমনি এ আমলের ভাস্কর্যেরও কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নি।

সিন্ধু-সভ্যতার আমল

বৈদিক আমল

পর্বতগাত্রে খোদিত সম্রাট অশোকের লিপি ও স্তম্ভগুলির কারুকার্যই বোধ করি মৌর্যযুগের ভাস্কর্যের আদি নিদর্শন। অশোকের স্তম্ভগুলি চুনারের বেলে পাথরে তৈরী। বৈশালী, সারনাথ ও সাঁচীর স্তম্ভগুলির ভাস্কর্য বিখ্যাত। স্তম্ভগুলির দুটি অংশ—একটি স্তম্ভদণ্ড অপরটি স্তম্ভশীর্ষ। স্তম্ভশীর্ষে সিংহ, হাতী, ঘোড়া, ষাঁড় বা ধর্মচক্র প্রভৃতি উৎকীর্ণ হ'ত। মূর্তিগুলির গঠন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন যেন জীবন্ত। মৌর্য যুগের ভাস্কর্যে দেশী, বিদেশী দুটি ধারা দেখা যায়। দেশী শিল্পীদের ভাস্কর্যে অলংকরণ বেশী—একটু আদিম ভাব আছে, পালিশ কম। ত্রিহুতের নন্দনগড়ের সিংহ স্তম্ভটি এই জাতীয়। কিন্তু সারনাথের চার সিংহওয়ালা স্তম্ভটির গঠন অপূর্ব। সিংহের কেশর, মুখ, চোখ, পেশী সবেতেই বেশ দীপ্তভাব ফুটেছে। কাচের মতন মসৃণ ভাবে পালিশ করা হয়েছে ভাস্কর্যটি। মনে হয় এতে পারসীক প্রভাব পড়েছে। সিংহ মূর্তির নীচেই ধর্মচক্র আছে, সারনাথের এই সিংহস্তম্ভের আদর্শেই আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের সীলমোহর তৈরী হয়েছে।

মৌর্য আমল

মৌর্যযুগের পোড়ামাটির ভাস্কর্যের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ

থাকবে। স্তম্ভ, প্রাসাদ, পর্বতলিপির স্রষ্টা তো সম্রাটগণ। কিন্তু জনসাধারণের শিল্প প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল পোড়ামাটির শিল্পের মধ্যে।

উত্তর ও পূর্ব ভারতের সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শন পাওয়া যায়। এই শিল্পে মূর্তির মুখের অংশটুকু ছাঁচে তোলা হ'ত। সাজসজ্জা ও অলংকারগুলি আলাদা ভাবে হাতে তৈরী করে মূর্তির গায়ে লাগানো হ'ত। পাটনায় যাদুঘরে রক্ষিত একটি বালকের পোড়ামাটির মূর্তি আজও শিল্প জগতের বিস্ময়।

স্থাপত্যকলার আলোচনা কালে ভারতে সাঁচী ও বুদ্ধগয়া স্তূপের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলির সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার। কারণ এই স্তূপ-গুলির মধ্যে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার এক অপূর্ব

শুঙ্গ আমল

সমন্বয় ঘটেছে। ভারহুতের স্তূপের চারিপাশের তোরণ ও বেষ্টনীগুলিতে জীবজন্তু, লতাপাতার নক্সা ও সেযুগের অনেক ক্রিয়া-কাণ্ডের চিত্র খোদাই করা আছে। তবে এই খোদাই কাজগুলো হয়েছে গভীরভাবে।

ভারহুত স্তূপের ভাস্কর্যে বুদ্ধদেবের জন্ম-বৃত্তান্ত ও জাতকের গল্প অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্তূপ প্রাচীরে ও স্তম্ভে যক্ষ, যক্ষিনী, ও গ্রাম্য দেবতার মূর্তিও উৎকীর্ণ হয়েছে অনুপম নৈপুণ্যের সহিত। ভারত শিল্পের ইতিহাসে মূর্তি গড়ার প্রচেষ্টার সুরু এই ভাবে হয়েছে।

পরবর্তীকালে ভারহুত স্তূপের তিনটি সমান্তরাল পাথরের ফলকযুক্ত তোরণের সার্থক অনুকৃতির রূপায়ন দেখা যায়—সাঁচী স্তূপের তোরণে।

ভারহুত স্তূপের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। স্থানীয় অশিক্ষিত লোকেরা তার ইট পাথর খুলে নিয়ে গিয়ে তাদের ঘর বাড়ী বানিয়েছে। ভারহুত স্তূপের পাথরের তোরণ ও প্রাচীর বেষ্টনীর কিছু অংশ কলিকাতার যাদুঘরে দেখে লোকে বিস্ময়ে হতবাক হয়। বুদ্ধগয়ায় মন্দিরের ভাস্কর্যে একটা জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এই মন্দিরের পাথরের প্রাচীরে জাতকের যে কাহিনী খোদিত আছে বা যেসব হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে সেগুলি গভীর ভাবে খোদাই করা। পূর্ণ মূর্তি গড়ার পর্বে বুদ্ধগয়ার উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি একটা ধাপ মাত্র। সেই জন্য ভারত ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের বিশেষ মূল্য আছে।

মধ্য প্রদেশের ভূপাল শহরের কাছে প্রখ্যাত সাঁচী স্তূপ। সাঁচী স্তূপের

তোরণের যে অনুপম ভাস্কর্য জগৎবাসীর বিস্ময় তা ভারহুত ও বুদ্ধগয়ার ভারতীয় ভাস্কর্যের সুপরিণত রূপ। তোরণের পাশে দুটি অলংকৃত স্তম্ভ। সেই স্তম্ভের মাথায় তিনটি হাতীর মূর্তি। আর হাতীর মূর্তির পাশে সুগঠিত নারী মূর্তি নানা ভঙ্গিমায় উৎকীর্ণ। ভারতীয় ভাস্কর্যে এই ধরণের মূর্তি এই প্রথম দেখা গেল।

ভারহুত, বুদ্ধগয়া ও সাঁচীর ভাস্কর্যের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে হাতুড়ি ও ছেনির ঘায়ে এখানে পাথরের বুকে সাহিত্যের ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছে। অশিক্ষিত জনসাধারণ যেন পাথরের বুকে খোদাই করা গল্প-চিত্র দেখে সহজেই জাতকের গল্প ও বুদ্ধদেবের জীবনকথা বুঝতে পারে।

সাঁচী স্তূপের সৃষ্টি খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে হলেও, এগারো ফুট উচ্চ, পাথরের বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা সুবিশাল এই স্তূপটির অনেক সংস্কার ও পরিবর্তন করেন দাক্ষিণাত্যের হিন্দু সাতবাহন রাজারা। পরবর্তীকালের ভারতীয় শিল্পীদের প্রেরণার উৎস সাঁচী স্তূপের ভাস্কর্য। সাঁচীর ভাস্কর্যের আদর্শেই উড়িষ্যায় উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির ভাস্কর্যের সৃষ্টি। উড়িষ্যার পরাক্রান্ত সম্রাট খারবেলের সময় উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পর্বতে জৈনদের বিহারগুলি খোদিত হয়েছে।

কুষাণ আমল

শুঙ্গ ও সাতবাহন রাজাদের আমলে ভারত-শিল্পের জাগরণ ঘটে নানা ক্ষেত্রে আর তাই কুষাণ রাজাদের সময় বিচিত্রভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যায়। কুষাণ যুগ ভারত শিল্পের এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। এই আমলে ভারতের তিনটি ক্ষেত্রে ভারত-শিল্পের বিকাশ ঘটে।

(ক) পেশোয়ার, তক্ষশীলা, কপিশা প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রীক শিল্পের প্রভাবে "গান্ধার শিল্পের" জন্ম ঘটে। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর থেকে ভারত ও গ্রীসের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ঘটে। গ্রীক রাজা মিলিন্দ ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতিবশতঃ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে এদেশে বসবাস করেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন গ্রীক শিল্পীর দল। ফলে গ্রীক শিল্পধারার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পধারার মিশ্রণে এক অভিনব শিল্পধারার জন্ম হয়। আগেই বলা হয়েছে এই ধারাই 'গান্ধার শিল্প' নামে পরিচিত। গ্রীক ধারায় দৈহিক সৌন্দর্যকে প্রকাশ করা হয়। আর ভারতীয় শিল্পে অন্তরের ভাবকে রূপায়িত করা হয়। এই দুই শিল্পধারার মিলনে যে অভিনব ভারত-শিল্প-শৈলী গড়ে-

ওঠে তা পরবর্তীকালের শিল্পধারাকে প্রভাবিত করেছে। গান্ধার শিল্পীরাই প্রথমে বুদ্ধদেবের মূর্তি নির্মাণ করেন। তবে এ মূর্তিগুলিতে কোন দেব-ভাবের প্রকাশ ছিল না। এগুলির সহিত গ্রীক দেবমূর্তি ও গ্রীক রাজ-পুরুষদের চেহারার মিল বেশী।

(খ) মথুরা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কুষাণ আমলে ভারতীয় শিল্প-ভাস্কর্যের যে নববিকাশ ঘটে তাতে বিদেশী প্রভাবের ক্রমশঃ হ্রাস ঘটে ভারতীয় ভাব ও আদর্শ প্রধান হয়ে ওঠে। এই যুগের বুদ্ধ-মূর্তির মধ্যে দেহ লাবণ্যের সহিত যুক্ত হয়েছে দিব্যভাব। দেখে হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগে। মথুরার "কাটরা" থেকে পাওয়া সিংহাসনে বসা বুদ্ধমূর্তিটি এই জাতীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই মূর্তিটিকে আদর্শ করেই মনে হয় ভারতীয় শিল্পীরা পৌরাণিক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করেছেন। বেদে দেবদেবীর ধ্যানরূপ থাকলেও সে আমলের কোন পাথুরে দেবমূর্তি পাওয়া যায়নি। সিন্ধু সভ্যতার আমলেই কিছু পাথুরে মূর্তি পাওয়া গেছে মাত্র।

গ্রীক শিল্পধারার পর রোমক শিল্পধারার দ্বারা ভারতীয় শিল্প প্রভাবিত হয়েছিল। তারপর পারসীক প্রভাব পড়ে ভারত-শিল্পে। কনিষ্কের মস্তকহীন মূর্তিটিতে তার প্রমাণ আছে। এসব সত্ত্বেও বলা যায় সমস্ত বিদেশী প্রভাব আত্মস্থ করে মথুরা-শিল্পের মধ্যে দিয়েই খাঁটি ভারত-শিল্পের বিকাশ ঘটেছে আর তাই গুপ্তযুগে অসামান্য শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা হয়েছে।

গ) উপরিউক্ত দুটি ধারা ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন রাজাদের আমলে ভারত শিল্পের এক বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছিল। এই আমলের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি গুন্টুর জেলার (অন্ধ্র) অমরাবতী স্তূপ। প্রথমে এটি মাটি ও ইট দিয়ে তৈরী হয়েছিল, তারপর নীলাভ সাদা চূণা পাথরের ভাস্কর্যে সুশোভিত হয়। স্থানীয় অজ্ঞলোকেরা এর পাথর পুড়িয়ে চূণ তৈরী করে এর বেশীর ভাগ নষ্ট করে ফেলে।

একটি চিত্র থেকে বোঝা যায় কারুকার্য খচিত প্রাচীর দিয়ে এটি ঘেরা ছিল। ভিতরের চারটি বেদীর উপর ধর্মচক্রযুক্ত চূড়া ও স্তূপের গায়ের অলংকরণের বেষ্টনী অপূর্ব সুন্দর। শ্বেত পাথরের গায়ে বুদ্ধ জীবনের ঘটনাবলী চিত্রিত। উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি পেলব লাবণ্যযুক্ত ও প্রাণবন্ত—মথুরার ভাস্কর্যের আর একধাপ ক্রমোন্নতি এখানে পরিলক্ষিত হয়। এই ভাস্কর্যের একটি বিশেষ

বৈশিষ্ট্য-ধর্মচক্র, ফুল, লতা,পাতা, হাঁস, পাখী, হাতী ইত্যাদির অলংকরণ ছাড়াও এতে ফণাযুক্ত সর্পও উৎকীর্ণ হয়েছে। এটি প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার কথা স্মরণ করায়। অমরাবতী ছাড়া গুন্টুর জেলার নাগার্জুনকোণ্ডার স্তূপ ভাস্কর্যও অতুলনীয়। নাগার্জুনকোণ্ডার ভাস্কর্যগুলি গভীর ভাবে খোদাই করা। বুদ্ধ জীবনী ও জাতকের গল্প-চিত্র এই স্তূপে খোদিত আছে। এখানে উৎকীর্ণ বুদ্ধদেবের দেহ ভঙ্গিমার কমনীয় রূপটির অনুকরণ করেছে সুদূর সিংহল ও ইন্দোচীনের শিল্পীরা।

গুপ্ত রাজাদের পরাক্রমে বিদেশী শত্রু শক হুনদল পরাজিত ও বিধ্বস্ত হলে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে সাহিত্যের মত ভারতীয় শিল্পেরও সমৃদ্ধি ঘটলো বিস্ময়কর ভাবে। দেশের সীমা ছাড়িয়ে শ্যাম, ব্রহ্ম, সিংহল, বলী, বোর্নিও সুমাত্রা, জাভা, চম্পা, কম্বোজে ভারতীয় শিল্পের বিস্তার ঘটলো।

গুপ্ত আমল

ভারতীয় শিল্প, পাথরে ভাস্কর্য ছাড়াও চিত্রে, পোড়ামাটির ভাস্কর্যে ও ধাতু মূর্তি সৃষ্টিতে অনুপম সার্থকতা লাভ করলো। দাক্ষিণাত্যের পল্লব ও চালুক্য রাজাদের শিল্প কীর্তিতেই শুধু নয়—সারা ভারতের শিল্প সৃষ্টিতে গুপ্ত যুগের শিল্পীদের প্রভাব বিদ্যমান। শিল্পশাস্ত্রের আদর্শ, ভারতীয় ভাব ও বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী শৈল্পিক আঙ্গিকের সার্থক সমন্বয়ে এই যুগের শিল্প কালজয়ী হয়েছে। গুপ্ত শিল্পের সাধন ক্ষেত্র ছিল দুটি—প্রথমটি মথুরা ও দ্বিতীয়টি সারনাথ।

মথুরার ভাস্কর্যগুলি তৈরী হত লাল পাথরে আর সারনাথের ভাস্কর্য সৃষ্টিতে চুনারের বেলে পাথরের প্রয়োজন হত। মথুরার ভাস্কর্যে গান্ধার শিল্পের প্রভাব কুষাণ যুগেই শেষ হয়ে তা ভারতীয় ভাব ও আদর্শ প্রকাশক হয়ে উঠেছিল। গুপ্তযুগে ভারতবর্ষ হিন্দু ধর্মালোচনার ও পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে এক নূতন জীবনাদর্শের সন্ধান পায়। তার প্রভাব সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীতের মত ভাস্কর্যেও পড়ে। নূতন আঙ্গিকে ভারতীয় শিল্পীরা বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করতে সুরু করেন। মথুরার বিষ্ণুমূর্তিটির মধ্যে পৌরুষ ও সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটেছে।

তবে সারনাথে গুপ্তযুগে যে শৈল্পিক সাধনা ঘটে তা তুলনাহীন। মথুরার ভাস্কর্যে বিদেশী ও আদিম প্রভাবের ছায়ামাত্রও যদি থেকে থাকে সারনাথে তা একান্ত অনুপস্থিত। সারনাথের ভাস্কর্যে সুষমা, সৌন্দর্য ও

পেলবতার অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে। এমন নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর ভাস্কর্য শিল্প জগতে দুর্লভ। সারনাথের যোগাসনে বসা বুদ্ধমূর্তির তুলনা নেই। এটি ভারতীয় শিল্পের অমূল্য ঐশ্বর্য। গুপ্তযুগের অন্যান্য ভাস্বর্যের মধ্যে ভীলসার (বিদিশা) গন্ধর্ব-দম্পতি ও বরাহমূর্তি দুটি অনবদ্য। বাংলা দেশের সুন্দরবনের কাশীপুর গ্রাম থেকে পাওয়া কষ্টি পাথরের সূর্য মূর্তিটি প্রসিদ্ধ।

গুপ্তযুগের ধাতু ভাস্কর্যও প্রখ্যাত। ভাগলপুরের সুলতানগঞ্জের ধাতুময় বুদ্ধমূর্তিটির সংঘাতির (উত্তরীয় বস্ত্র) বাঁকানো রেখার ভাঁজের আড়ালে বুদ্ধের দেহের পেলব রেখা ও দাঁড়ানোর মধুর ভঙ্গিটি অতুলনীয়। এটি বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের যাদুঘরে আছে।

এছাড়া বরোদা শহরের কাছ থেকে পাওয়া জৈন মহাপুরুষ জীবন্তস্বামীর ধাতু মূর্তিটিও অনুপম।

পাথরের ও ধাতুমূর্তির ভাস্কর্য ছাড়াও পোড়ামাটির ভাস্বর্যের জন্য গুপ্তযুগ বিখ্যাত। পোড়ামাটির শিল্পের একটা প্রাচীন ঐতিহ্য ভারতবর্ষে আছে। এটিকে লোকশিল্পও বলা যায়।

গুপ্তযুগের সোনা ও রূপার মুদ্রাগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শিল্প কর্মের স্বাক্ষর আছে। বীণা বাদনরত, বাজদণ্ডধারী সম্রাটদের বা লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ মুদ্রাগুলির শিল্প মূল্য যথেষ্ট।

চিত্রকলা

রেখা, রং ও তুলির সাহায্যে দেবদেবী, মনুষ্য, জন্তু, গাছ, পাতা, ফুল বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে ভাবরূপ শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কাগজে, মাটির ফলকে, কাঠের গায়ে, কিংবা পাথরের দেওয়ালের গায়ে ফুটিয়ে তোলেন, তাকেই চিত্রশিল্প বলা হয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে আঁকা কতকগুলি রেখা চিত্রের দেখা পাওয়া গেলেও সেগুলিকে ঠিক চিত্রকলার মর্যাদা দেওয়া যায় না।

সিন্ধু উপত্যকায় যে শৈল্পিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কলা ছাড়াও চিত্রকলার নিদর্শন রয়েছে।

সিন্ধু যুগ

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোন দেওয়াল চিত্রের দেখা মেলেনি, শুধু পোড়ামাটির তৈজসপত্রের গায়ে আঁকা আলংকারিক চিত্রের নমুনা পাওয়া গেছে।

গাঢ় কমলা, কালো, হলদে, সাদা রং দিয়ে ফুল, পাখী, মাছ, জন্তু, নক্‌সা ও আলপনা আঁকা মাটির ফলকের সন্ধান মিলেছে।

মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত সীলমোহরে উৎকীর্ণ ষাঁড়ের দেহের গঠনে, দোলান গলকম্বলে, সাবলীল গতিভঙ্গির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পবোধের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেয়েদের গহনা তৈরীর ব্যাপারে সিন্ধু উপত্যকার সুপ্রাচীন শিল্পীরা বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। হার, বালা, তাগা, আংটি যা পাওয়া গেছে তার নিদর্শনের মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্পবোধের যে পরিচয় তাঁরা রেখে গেছেন তা দেখে মনে হয় পরবর্তীকালের ভারতীয় শিল্প সাধনার মূল উৎস বোধকরি সিন্ধু-শিল্পীদের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

বৈদিক যুগ

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বৈদিক যুগের যেমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না তেমনি চিত্রকলারও কোন নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

মৌর্য যুগ

মৌর্য যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কলার পরিচয় পাওয়া যায় স্তম্ভ, রাজপ্রাসাদ ও পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে। আলাদা করে কোন চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া না গেলেও স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও পোড়া মাটির অলংকরণের মধ্যে অঙ্কন শিল্পের কিছু পরিচয় রয়ে গেছে।

শুঙ্গ যুগ

মৌর্যযুগে শিল্পকলা ছিল রাজ-অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। শিল্পীরা স্বাধীনভাবে তাঁদের ধ্যানধারণাকে রূপদান করতে পারতেন না। শুঙ্গ, কাণ্ব ও দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজাদের আমলে ভারতীয় শিল্পীদের স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ ঘটে। তবে এই কালের শিল্পকলা স্তূপ-ভাস্কর্যের সঙ্গে যুক্ত।

মহাভারতে, জাতকে, চিত্রকলার উল্লেখ থাকলেও সে যুগের চিত্রের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। মধ্যভারতের যোগীমারা গুহা চিত্রগুলি খৃষ্টীয় প্রথম শতকে অঙ্কিত বলে অনেকে অনুমান করেন। প্রায় এরই সমসাময়িককালে প্রখ্যাত অজন্তা গুহার দশম চৈত্যগৃহে জাতকের গল্পের ও নবম গুহায় পূজার্থীদের শোভাযাত্রার যে চিত্র আছে তার শৈল্পিক সৌন্দর্য অনুপম। এই গুহাতেই, গভীর জঙ্গলে বিশ্রামরত হস্তীযূথের চিত্রটি এই আমলের চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

আগেই বলা হয়েছে কুষাণ আমলে ভারতবর্ষে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এক
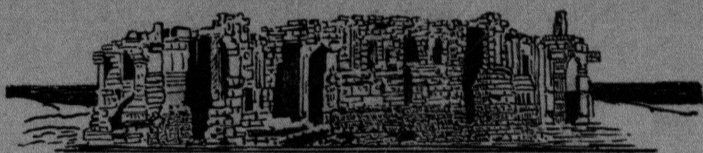
সোমনাথ মন্দিরের ভগ্নভিত্তি

নালান্দা মহাবিহার
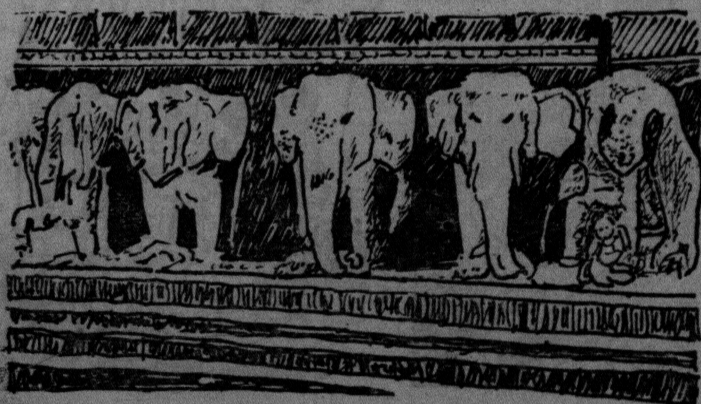
কৈলাস মন্দির ভাস্কর্য : ইলোরা
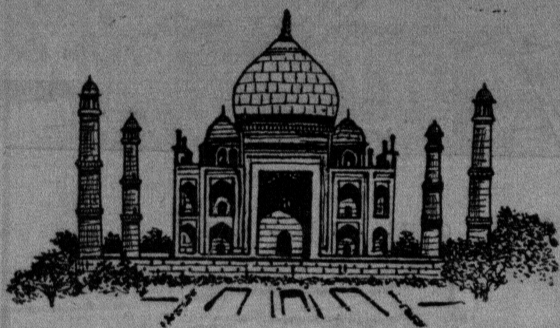
তাজমহল ঃ আগ্রা

আকবরনামার গ্রন্থ চিত্র

আদিবাসী সাঁওতাল নৃত্য

ভবতারিণীর মন্দির : দক্ষিণেশ্বর
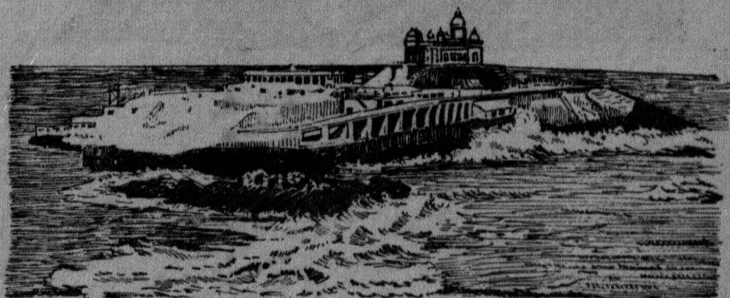
বিবেকানন্দ শিলা মন্দির : কন্যাকুমারী
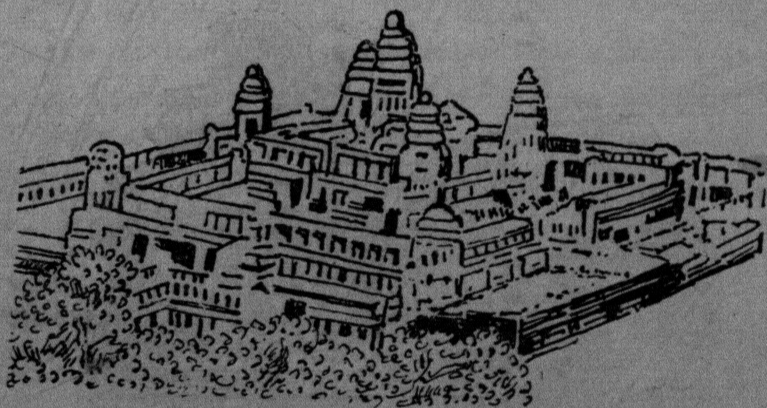
আঙ্কোরভাট মন্দির : ইন্দোচীন (কাম্বোজ)
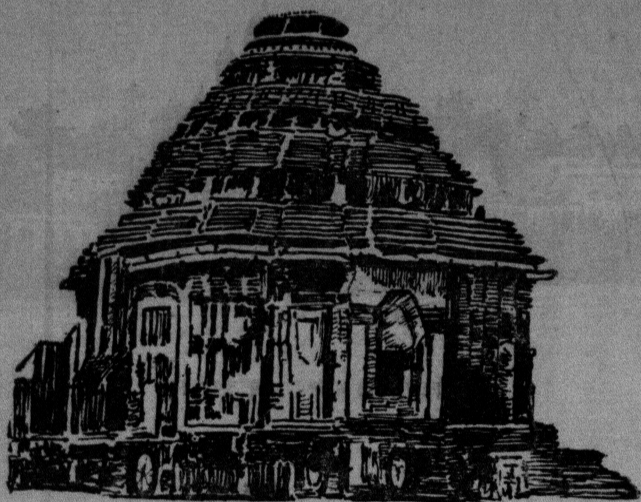
সূর্য্যমন্দির : কোনারক
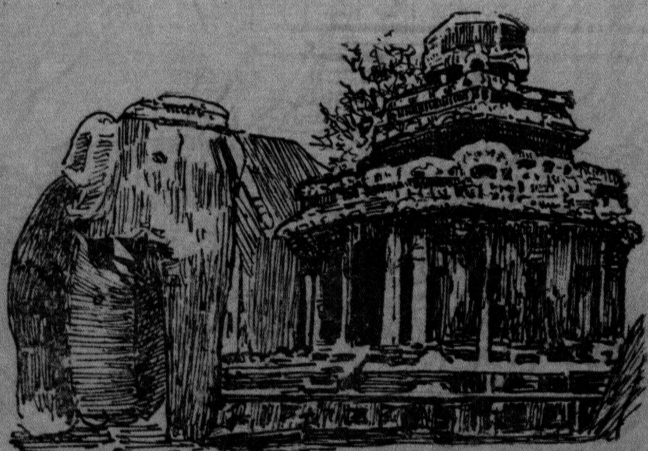
মন্দির স্থাপত্য : মহাবলীপুরম্

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। গ্রীক, রোমক ও পারসীক প্রভাবে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের রূপান্তর ঘটে। এক প্রাণবন্ত শিল্পের জন্ম হয়। এই শিল্পাদর্শে ভারতীয় শিল্পীরা পাথরের বুকে বুদ্ধের জীবনচিত্র অপরূপ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। মথুরার শিল্পীদের রচিত যক্ষিণী মূর্তিতে চিত্রচাতুর্য ব্যক্ত হয়েছে। আর দাক্ষিণাত্যের অমরাবতীর স্তূপের শ্বেতপাথরে উৎকীর্ণ চিত্রে—বুদ্ধদেবের নীলগিরি নামক পাগলা হাতাকে বশ করার দৃশ্যটি দেখানো হয়েছে। পাথরের প্রাচীরে খোদিত দুর্গ জয়ের চিত্রটিও অনুপম। নাগার্জুনকোণ্ডা স্তূপের রাজকীয় মিছিল কি নৃত্যগীতের আসর চিত্র দুটিও অতুলনীয়। এগুলি ভাস্কর্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও এগুলির চিত্র সৌন্দর্য অল্প নয়।

কুষাণ যুগ

তবে তুলির সাহায্যে রঙ্ ও রেখায় রূপের যথার্থ অভিব্যক্তি ঘটেছে অজন্তা গুহার চিত্রগুলিতে। অজন্তা গুহায়—স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। অজন্তা গুহা অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতা হতে বোম্বাই যাত্রার রেলপথের জলগাঁও স্টেশন থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অজন্তার বিখ্যাত গুহাগুলি অবস্থিত। "অজন্তা" নামটির উৎপত্তি ইংরাজী এজেণ্ট (Agent) শব্দ থেকে। ব্রিটিশ আমলে Agent to Governor General-এর অফিস ছিল কাছেই। ইন্দ্রিয়াদ্রি বলে একটি পাহাড়ের গা কেটে অজন্তার গুহাগুলি তৈরী। মোট উনত্রিশটি গুহার মধ্যে চারটি চৈত্য ও পঁচিশটি বৌদ্ধ বিহার। এগুলি ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাযাপনের জন্য নির্মিত। স্থবির অচল এর নির্মাণ শুরু করেন। খ্রীষ্টজন্মের পর সাতশত বছর ধরে গুহাচিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছে। কয়েক শতাব্দী ভারতবাসী ভুলেই ছিল অজন্তার গুহাচিত্রের কথা। গত শতকের গোড়ার দিকে কয়েকজন ইংরাজ সামরিক কর্মচারী জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলে বন্য জন্তুর ভয়ে এই অজন্তার গুহাতে আশ্রয় নেন। সকালে সূর্যালোকে গুহার চিত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বাইরের জগৎকে সে কথা জানান। এই অজন্তার চিত্র কপি করতে সিষ্টার নিবেদিতা, শিল্পী নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারকে পাঠিয়ে ছিলেন।

গুপ্ত যুগ

অজন্তাগুহার চিত্রগুলি পাথরের দেওয়ালে জলরংএ আঁকা। কিন্তু রংএ বিশেষ ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো থাকায় দীর্ঘদিনেও ম্লান হয়নি। আগে ষোলটি গুহায় চিত্র ছিল, এখন মাত্র ছটি গুহায় চিত্র আছে।

অজন্তার চিত্র বিশ্বের বিস্ময়। অজন্তা চিত্রের আগে ভারতে কোন সার্থক চিত্রকলার দেখা মেলে না। অথচ অজন্তার চিত্রের রং ব্যবহারের নিপুণতা দেখে মনে হয় প্রাচীন ভারতে চিত্রশিল্পের বিকাশ হয়েছিল কিন্তু কোন কারণে তা লুপ্ত হয়েছে। অজন্তার চিত্রে লাল, সবুজ, গিরিমাটি, সাদা ও কালো রংয়ের ব্যবহার দেখা যায়। গুপ্তপূর্ব যুগের আঁকা ছবিগুলির রং মেটেমেটে, মোটেই উজ্জল নয়। কিন্তু গুপ্তযুগের চিত্রগুলি বর্ণাঢ্য। এই সময়ে আঁকা রাজসভা, যুদ্ধযাত্রা ও নৃত্য-গীতের ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। অজন্তার চিত্রগুলি মূলতঃ ধর্মীয়, তা সত্ত্বেও বিলাসলীলার ছবিগুলিতেও শিল্পীরা সংযম ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কাল্পনিক পাখী, ফুল, লতা, পাতা ও জন্তুর সমাবেশকে পদ্ম-মৃণালের ছন্দায়িত বাঁধনে বেঁধে এক অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছেন। অমরাবতীর ভাস্কর্যের ধারার চিত্ররূপ যেন ধরা পড়েছে অজন্তায়। এ যুগের ছবিগুলি রংএ ও রেখায় প্রাণবন্ত।

রাজারাণীর গায়ের রং কোথাও বেগুনে, কোথাও হলদে। দাসদাসীদের রং ইণ্ডিয়ান রেড দিয়ে আঁকা। কৌতুকচিত্রও আছে। লোভী ব্রাহ্মণের ফোক্‌লা মুখে ছাগল দাড়ী যেন জীবন্ত। তবে প্রথম গুহার বোধিসত্ত্বের চিত্রটি অতুলনীয়! মুখে শান্তি ও করুণা, হাতে পদ্মফুল। ঝলমলে সোনালী কিরীটের কি উজ্জ্বল দ্যুতি!

সতেরো নং গুহার মাতা ও পুত্রের ছবিখানির তুলনা নেই। বালকের মুখে কি নির্মল সরলতা আর মার মুখে কি পরিপূর্ণ সমপর্ণের ভাব। এ ছাড়া গন্ধর্ব দম্পতি ও রাজকীয় শোভাযাত্রার চিত্র দুটিও দর্শককে বিস্ময় বিমুগ্ধ করে।

আশ্চর্যের কথা অজন্তার গুহার চিত্রশিল্পের ঐতিহ্য একেবারে অবলুপ্ত; কোথাও এর অনুকরণের চিহ্ন বড় চোখে পড়ে না। অথচ সমসাময়িক কালে গোয়ালিয়রের কাছে বাঘগুহা (অজন্তা থেকে মাত্র একশ পঞ্চাশ মাইল) অজন্তার মত চিত্রাবলীতে সমুজ্জ্বল।

অজন্তার চিত্রে রং ও রেখার প্রাধান্য। বাঘ গুহাচিত্রে আলোছায়ার খেলা। ছবিগুলিতে তুলির দাগ নেই। মনে হয় তেল রংএ আঁকা। এক একটি কাহিনী পর পর কয়েকটি ছবির সাহায্যে দেখানো হয়েছে। অজন্তার চিত্রগুলি ধর্মীয় চিত্র। জাতকের গল্প ও বুদ্ধ জীবনই তার মূল উপজীব্য। কিন্তু বাঘ গুহার ছবিগুলি মহাযানী বৌদ্ধদের আঁকা হলেও এতে বুদ্ধদেবের ছবি নেই। নৃত্য, গীত, শোভাযাত্রার ছবিই বেশী।

গুপ্তযুগের অবসানে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিচিত্র বিকাশ হয়েছিল ; অবশ্য এর পেছনে গুপ্তযুগের শিল্পকলাই প্রেরণা সঞ্চার করেছে।

ভারতশিল্পের ইতিহাসে উড়িষ্যায়, গুপ্তশিল্পের প্রেরণা নিয়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে অতুলনীয় প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল তার কথা কিছু বলা দরকার।

উড়িষ্যার মন্দির

গুপ্তযুগের পর ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কলা উড়িষ্যার স্তূপ ও মন্দিরের মধ্যে দিয়ে অভিনব ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কটকের কাছে রত্নগিরির বৌদ্ধ স্তূপ ও সংঘারাম দুটি মহাযান ও বজ্রযান সম্প্রদায়ের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। বৌদ্ধস্তূপটি ইটের তৈরী আর সংঘারাম দুটী বহু তলা বিশিষ্ট।

উড়িষ্যার স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি। উত্তর ভারতের নাগর বা চূড়াওয়ালা মন্দির তৈরীর রীতিকে নতুন ভাবে গ্রহণ করে, উড়িষ্যায় যে নতুন রীতির মন্দির তৈরী হয় তাতে দুটি অংশ দেখা যায়। প্রথম অংশটিকে বলা হয় "রেখদেউল", এতে চূড়াওয়ালা মন্দিরটি থাকে। দ্বিতীয় অংশে থাকে মণ্ডপ, সেটিকে "জগমোহন" বলে। উড়িষ্যার স্থাপত্যে মন্দিরের বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে। যে বেদিকায় দেব-মূর্তি থাকে তাকে বলে "পিষ্ঠ"। পিষ্ঠ থেকে মন্দিরেব চূড়া পর্যন্ত উঠে যাওয়া অংশের নাম "বাড়"। বাড় ও শিখরের মধ্যের নাম 'বরণ্ড'। মন্দিরের চূড়ায় থাকে "আমলক শিলা"—এই শিলার উপর থাকে ধ্বজা বা আয়ুধ। শিব মন্দির হলে ত্রিশূল, বিষ্ণু মন্দির হলে চক্র। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির মধ্যে পরশুরামের মন্দিরটির পাঁচ অংশে বিভক্ত শিখরটি অপূর্ব সুন্দর। এর গবাক্ষ ও অলংকৃত দেওয়াল সমন্বিত আয়তাকার জগমোহনটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শন।

ভুবনেশ্বরের চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের ছাপ আছে। উড়িষ্যায় এই জাতীয় মন্দিরের নাম 'খাখরা'। নবম শতাব্দীতে তৈরী মুক্তেশ্বরের মন্দির উড়িষ্যার স্থাপত্যের বিবর্তনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। মন্দিরটি কারুকার্য করা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মকরাকৃতি গোপুরম্ (তোরণ) দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হয়।

"রাজারানীর মন্দিরে" পশ্চিম ও মধ্যভারতের স্থাপত্যের ছাপ পড়লেও এটি উড়িষ্যার নিজস্ব স্থাপত্য রীতিতেই গড়ে উঠেছে।

তবে বিশালতায় ও স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিপুণতায় ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ শিবের মন্দিরটি অতুলনীয়। এটি উড়িষ্যার স্থাপত্যকে এক পরিপূর্ণ সাফল্যের দিকে নিয়ে গেছে। পাথরের প্রাচীরের মাঝখানে প্রশস্ত চত্বরের মধ্যে সুবিশাল শিব মন্দিরটি স্বমহিমায় দণ্ডায়মান। চারিদিকের দেওয়ালে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর ভাস্কর্য বিদ্যমান।

পুরীর জগন্নাথের মন্দিরটি লিঙ্গরাজ মন্দিরের তুলনায় আকারে উচ্চ ও সুবৃহৎ হলেও ভাস্কর্য ও অলংকরণের ক্ষেত্রে অধিক উৎকর্ষ দাবী করতে পারে না। এই মন্দিরটিতে নাকি বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব আঠারো বৎসরের অধিক কাল জগন্নাথ ক্ষেত্রে কাটিয়ে ছিলেন। মন্দিরটির চারটি অংশ ভোগমণ্ডপ, জগমোহন, শ্রীমুখশালা ও মনিকোঠা। জগমোহনের ডানদিকের গরুড়স্তম্ভে হাত রেখে জগন্নাথ দর্শন করতেন শ্রীচৈতন্য।

অষ্টমশতক থেকে একাদশশতক উড়িষ্যার মন্দির সৃষ্টির শ্রেষ্ঠকাল। একাদশশতকে তৈরী কনারকের সূর্য্যমন্দিরটিতে উড়িষ্যার মন্দির শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ ঘটেছে। এই মন্দিরের গর্ভগৃহ ও জগমোহন একই সঙ্গে বর্তমান, এমনটি আর কোথাও নেই। মন্দিরের দুদিকে রয়েছে সূর্য্যরথের চব্বিশটা চাকা, সামনে সাতটি ঘোড়া সেই রথ টানছে। রথের চাকায় ও ঘোড়াগুলির ভাস্কর্যের অনুপম সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখলে বিমোহিত হতে হয়। ভারত শিল্পের এক অনবদ্য সৃষ্টিরূপে এইগুলি বিশ্বশিল্পের বিস্ময় হয়ে আছে।

পূর্বভারত শিল্প

গুপ্ত আমলের শিল্পের প্রভাব উড়িষ্যার শিল্প বিকাশে যেমন সহায়তা করেছে পূর্বভারতের (বঙ্গ ও বিহার) পাল রাজাদের আমলের শিল্পসৃষ্টিরও প্রেরণা হয়েছে। বাংলার পাল রাজাদের পর সেন রাজাদের আমলের শিল্পধারা পাল-শিল্প ধারারই নামান্তর।

বৌদ্ধ পাল রাজাদের উদারতায় বাংলার হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ সব শিল্পীর সমবেত চেষ্টায় ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে।

পাল আমলের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কীর্তি পাটনার নিকটবর্তী নালন্দা

মহাবিহার। নালন্দার পাল ভাস্কর্যগুলি কষ্টি পাথরে তৈরী। গঠন প্রণালীতে গুপ্তযুগের মহিমা না থাকলেও এর অলংকার প্রবণতা প্রশংসনীয়। পাথরের বুকে লাবণ্য ও কোমলতা সৃষ্টি এ শিল্পের বৈশিষ্ট্য।

উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ভাস্কর্য—পাথরের মূর্তিগুলির মৌখিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ হতে প্রাপ্ত পাথরের মূর্তি ও পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যগুলির বিশেষত্ব আছে। এই ফলকে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যগুলি শিল্পশাস্ত্রের নিয়ম মেনে না চললেও এর মধ্যে এমন সজীবতা আছে দেখে অবাক হতে হয়। এই ফলকগুলিতে তৎকালীন প্রচলিত অনেক লোককথাও উৎকীর্ণ আছে। কোথাও ব্যাধ শিকার কাঁধে নিয়ে ফিরছে, দড়িবাঁধা হাতীকে ইঁদুরেরা দড়ি কেটে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। শিবঠাকুর ত্রিশূল নিয়ে বসে আছেন, এছাড়া রামায়ণের কাহিনী ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পের ফলকও আছে।

পালযুগে ধাতু শিল্পেরও চর্চা হত। এ যুগের অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামের অষ্টধাতু নির্মিত ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর মূর্তিটি পাল-সেন শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পালযুগের এই ধাতু শিল্পধারা নেপাল ও তিব্বতের শিল্পসৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

স্থাপত্যশিল্পেও পালযুগের শিল্পীরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নালন্দা, ওদন্তপুরী, সোমপুর, বিক্রমশীলা, রক্তমৃত্তিকা (মুর্শিদাবাদ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার এই পাল আমলেই নির্মিত হয়। এশিয়া বিখ্যাত নালন্দা বিহারের বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরাটত্ব সত্যই বিস্ময়কর। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় দশহাজার ছাত্র এখানে এসে পড়াশোনা করতেন। এই বিহারের আয়তাকার প্রাঙ্গণের চারিদিকে কক্ষগুলি সজ্জিত ছিল। একটি বহুতল বিশিষ্ট মন্দিরের সন্ধানও এখানে পাওয়া গেছে। বাঙালী শীলভদ্র, অতীশ দীপংকর এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন। চীনা পর্যটক হুয়েনসাং শীলভদ্রের কাছে পাঠ নিয়েছিলেন। তাঁর বিবরণী থেকে নালন্দার সুবিশাল স্থাপত্যের কথা জানা যায়।

খ্যাতিতে সমান না হলেও পাহাড়পুরের (উত্তরবঙ্গ) সোমপুর মহাবিহার নালন্দার চেয়েও আকারে বড় ছিল। এই বিহারে ছিল ১৭৭টি কক্ষ। এই বিহারের মধ্যে অবস্থিত বিশাল মন্দিরটির স্থাপত্যের বিশেষত্ব আছে।

মন্দিরটি স্তরে স্তরে উপরে উঠে গেছে। এই মন্দিরটির সঙ্গে ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপের মন্দিরের সাদৃশ্য দেখে মনে হয় পালযুগে দঃ পূঃ এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

বাংলাদেশের নাগররীতির শিখরযুক্ত মন্দিরগুলির মধ্যে স্থাপত্যকলার জন্য উল্লেখযোগ্য মন্দির হচ্ছে বর্ধমানের বরাকরের কাছে বেগুনিয়ার মন্দির। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির ও সুন্দরবন অঞ্চলের মণি নদীর তীরবর্তী 'জটার দেউল' প্রভৃতি ইটের মন্দির উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মত পালযুগের চিত্রকলাও উন্নত ছিল। মহাযানী বৌদ্ধদের পুঁথিতে এযুগের চিত্রের নিদর্শন আছে। এই পুঁথিচিত্রের সহিত অজন্তার গুহাচিত্রের বেশ মিল আছে। পালযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা হলেন ধীমান, বীতপাল, মঙ্গলদাস, মহীধর প্রভৃতি।

উত্তরভারত শিল্প

উত্তর ভারতের শিল্প নিদর্শন কাশ্মীরের উস্কুরের ও হারওয়ালের বৌদ্ধ-স্তূপের মধ্যে রয়েছে। এই শিল্পে গান্ধার অঞ্চলের শিল্পপ্রভাব পড়েছে। উস্কুরের স্থাপত্যকীর্তি বিশাল। সুউচ্চ স্তূপ একটি চারকোণা বেদীর উপর স্থাপিত। চারিদিকে ওঠার সিঁড়ি। স্তূপের কাছে দুটি বেদীর উপর চৈত্যগৃহে বুদ্ধদেবের মূর্তি ছিল। বর্তমানে এই শিল্পকীর্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত। উত্তর ভারতের (কাশ্মীরের) শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি মার্তণ্ডের (সূর্য) মন্দির অষ্টমশতকে রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের সময় তৈরী। একটি বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরটি স্থাপিত। চারিদিকে ছোট ছোট মন্দিরের সারি। তিনটি প্রবেশ পথের মুখে মণ্ডপ। মণ্ডপ ও গর্ভগৃহের মাঝে পূজার ঘর। মন্দির দেওয়ালে ও স্তম্ভে গান্ধার স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ এই মন্দিরের শিল্প সৌন্দর্যের প্রতি শিষ্যা নিবেদিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শ্রীনগরের কাছে পাণ্ড্রেথানের শিবমন্দিরটি কাশ্মীর-স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন রূপে গণ্য। মন্দিরটিতে মার্তণ্ড-মন্দিরের স্থাপত্যের ছাপ লক্ষণীয়। মন্দিরের চারকোণে চারিটি গন্ধর্ব মূর্তি ও ছাদের মধ্যভাগে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম উৎকীর্ণ আছে। উত্তর ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য বহিরাগত শত্রুর আক্রমণে বারবার বিনষ্ট হয়েছে।

পশ্চিমভারত শিল্প

প্রধানতঃ রাজস্থান ও গুজরাটেই পশ্চিম ভারতের শিল্প নিদর্শনগুলির দেখা মেলে।

রাজস্থানের চিতোরে অতি প্রাচীন শিখরযুক্ত মন্দিরে গুপ্তযুগের প্রভাব দেখা যায়। রাজপুতানার শিল্পে স্বকীয়তা আত্মপ্রকাশ করে অষ্টম শতাব্দী থেকে। রাজস্থানের মন্দিরে মধ্য ভারতের মত একাধিক আমলক শিলার ব্যবহার হতো না।

যোধপুরের ওসিয়া গ্রামের সূর্য মন্দির রাজস্থানী স্থাপত্য ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শনরূপে গণ্য। নাগররীতির শিখরযুক্ত মন্দিরটি উঁচু বেদীর উপর নির্মিত। রাজস্থানী মন্দিরের স্তম্ভ নির্মাণ প্রণালী পরবর্তীকালে পাঠানদের তৈরী মসজিদে গৃহীত হয়েছে।

আবু পাহাড়ের জৈন মন্দিরগুলিতে রাজস্থানী শিল্পধারার উৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে। বড় মন্দিরটী ১৪৪৪ স্তম্ভ দিয়ে তৈরী। জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথ ও নেমিনাথের মন্দির দুটি বিখ্যাত। স্থাপত্যের বিচারে উল্লেখযোগ্য না হলেও ভিতরের ভাস্কর্য ও অলংকরণের সূক্ষ্মতা প্রশংসনীয়। মন্দিরের ভিতরের শ্বেতপাথরের চন্দ্রাতপের অলংকরণের অতি সূক্ষ্মকাজ শিল্পীরা কেমন করে করলেন ভেবে স্তম্ভিত হতে হয়।

চিতোরের জয়স্তম্ভ ও রাণা কুম্ভের কীর্তিস্তম্ভ রাজস্থানী শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড়ে ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন আছে। জাম নগরের মন্দির, জুনাগড়ের বিশ্বেশ্বর মন্দির, সূত্রপদের মন্দির, ও ভীমনাথের "রণকদেবী" মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রশংসনীয়।

গুজরাটের মোধেরায় সূর্যমন্দির শোলাঙ্কী স্থাপত্যরীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

গুজরাটের প্রভাসপত্তনে সোমনাথ মন্দিরটি ইতিহাস বিখ্যাত। মনে হয় দশম শতাব্দীতে এটি নির্মিত। সুলতান মামুদ ধনরত্নের লোভে মন্দিরটি ধ্বংস করেন। মন্দিরটি বারবার বিদেশী আক্রমণে ধ্বংস হলেও বারবার এটি পুনর্গঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় আরবসাগরের তীরে সোমনাথের নূতন মন্দির সুনির্মিত হয়ে আধুনিককালের ভারতশিল্পের নিদর্শনরূপে গণ্য হয়েছে।

গৌরবময় গুপ্তযুগের অবসানে তার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার প্রেরণায়

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে। অজন্তার চিত্রশিল্পের ধারা পালযুগে এসে শেষ হয়। তারপর মোগল চিত্রের বিকাশ ঘটে। এই মোগল চিত্রের বিকাশের পূর্বে গুজরাটের প্রাচীন পুঁথিচিত্রের সৃষ্টি হয়। এগুলির শিল্পমূল্য খুব বেশী না হলেও এগুলিকে অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে আমাদের দেশে পটশিল্পের সৃষ্টি শুরু হয়। কাজেই পটশিল্পের সৃষ্টিতে গুজরাটের পুঁথিচিত্রের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

মধ্যভারত]শিল্প

ভারত-শিল্পের ইতিহাসে মধ্যভারতের শিল্পের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর ভারতের নাগররীতির মন্দির স্থাপত্যের নব রূপায়ণ ঘটেছে মধ্যভারতে। কলচুরি, চন্দেল্ল ও পরমার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্য-ভারতের শিল্প-ভাস্কর্যের উৎকর্ষ ঘটেছে। রায়পুরের ইটের তৈরী লক্ষণ মন্দিরটির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অতুলনীয়।

কলচুরী রাজাদের তৈরী মন্দিরগুলির মধ্যে নর্মদা, শোন ও মহানদীর উৎস স্থানে নির্মিত অমরকণ্টকের মন্দিরগুলি বিখ্যাত। এই মন্দিরগুলি ‘পঞ্চরথ’ শ্রেণীর।

মন্দিরের প্রাচীর পাঁচটি অংশে বিভক্ত বলে একে পঞ্চরথ মন্দির বলা হয়। অমরকণ্টকের সুন্দর কর্ণ মন্দিরটি কিন্তু সপ্তরথ শ্রেণীর।

অমরকণ্টক-স্থাপত্য অনুসরণ করে তৈরী সোহাগপুরের বিরাটেশ্বর শিবের মন্দিরটি স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালের মধ্যভারতের মন্দির স্থাপত্যের এটি আদর্শস্বরূপ।

গোয়ালিয়রে প্রতিহার রাজাদের তৈরী তেলীকা মন্দির ও বিদিশায় পরমার রাজাদের নির্মিত উদয়েশ্বর মন্দির বিখ্যাত।

তবে মধ্যভারতের মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চরমোৎকর্ষ দেখা যায় দশম শতাব্দীতে তৈরী ছত্রপুর জেলার খাজুরাহ গ্রামে চন্দেল্ল রাজাদের মন্দির-গুলিতে। রাজারা জৈন ও হিন্দু ধর্মের প্রতি সমান উদার ছিলেন। মন্দিরগুলি উঁচু বেদীর উপর নির্মিত। মন্দিরে গর্ভগৃহ, মণ্ডপ ও প্রবেশ পথ পরপর সাজানো আছে। মণ্ডপের ছাদ গোলাকার। চারিটি স্তম্ভের উপর কারুকার্য খচিত কড়ি ছাদকে ধরে রেখেছে। মন্দিরের সামনে থেকে সিঁড়ি মণ্ডপ পর্যন্ত উঠে গেছে।
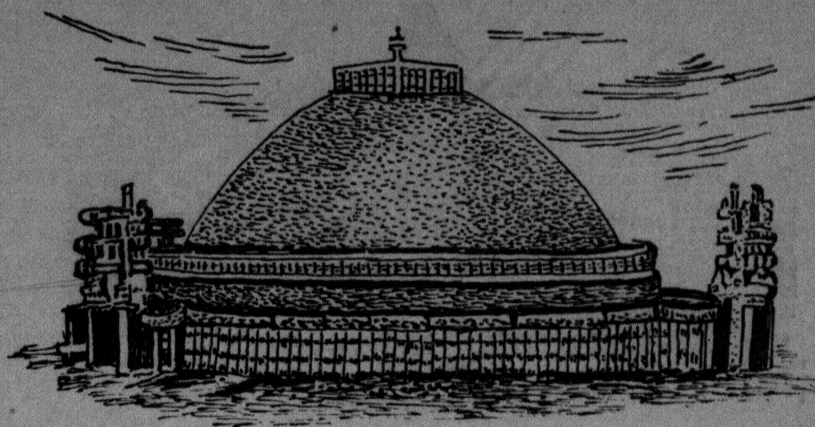
সাঁচীস্তূপ : ভূপাল
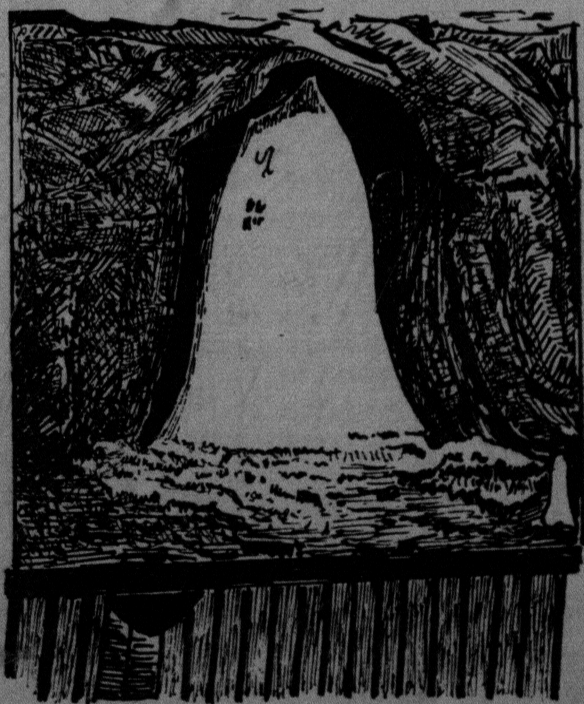
তুষারলিঙ্গ : অমরনাথ (কাশ্মীর)

বরবুদুর : যবদ্বীপ
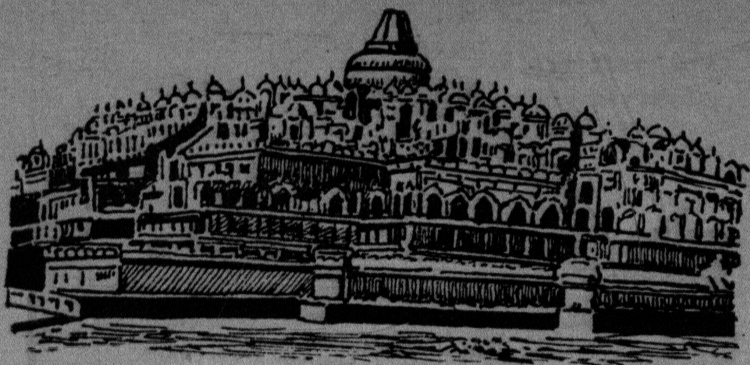
বুদ্ধ
তুনহুয়াং গুহার চিত্র : চীন

বোধিসত্ত্ব : গান্ধার শিল্প

খাজুরাহের মন্দিরগুলির মধ্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বৈচিত্র্যে মহাদেবের মন্দির বিখ্যাত। হিন্দু মন্দিরগুলির প্রাচীরে যেমন নানা দেবদেবীর চিত্র আছে, জৈন মন্দিরগুলির দেওয়ালেও তেমনি জৈন তীর্থঙ্করদের চিত্র খোদিত আছে।

সূক্ষ্ম ভাস্কর্য মণ্ডিত শিখর, মন্দির প্রাচীরের অলংকরণ ও সুঠাম মূর্তির জন্য মন্দিরগুলি প্রাচীন ভারতের এক শ্রেষ্ঠ শিল্প-ঐশ্বর্য বলে গণনীয়।

তবে মধ্যভারতের ভাস্কর্য উড়িষ্যার ভাস্কর্যের মত ভাব ও লাবণ্যময় নয়।

দক্ষিণভারত শিল্প

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ী সভ্যতার ও সংস্কৃতির এক বিশেষ ভূমিকা আছে। তেমনি ভারতীয় শিল্পের পরিচয় দিতে গিয়ে দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্যের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। উত্তর ভারতে প্রাসাদ, মঠ, মন্দির, বিহার, বিদেশী শত্রুর আক্রমণে বারবার বিধ্বস্ত হয়েছে। সে তুলনায় দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঐশ্বর্য অনেক পরিমাণে রক্ষা পেয়েছে। তাই ভারত শিল্পের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে দক্ষিণ ভারতের গুহা, চৈত্য, মঠ, বিহার ও মন্দিরের সহিত ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন আছে। ভারতে ধর্মকে কেন্দ্র করেই মূর্তিশিল্প, অঙ্কন শিল্প, মন্দির ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রসার ঘটেছিল দাক্ষিণাত্যে, কাজেই বিভিন্ন ধর্মীয় শিল্পীরা আপন আপন শিল্প শৈলীর সহিত দ্রাবিড়ী স্থাপত্য ভাস্কর্যের সংমিশ্রণে যে অনবদ্য শিল্পৈশ্বর্য রচনা করেছেন তা কালজয়ী হয়ে আছে।

বিভিন্ন রাজকুলের পৃষ্ঠপোষকতায় দাক্ষিণাত্যের শিল্পের পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধি ঘটেছে।

চালুক্য রাজাদের আমল

গুপ্তযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কলার প্রভাব পড়েছিল দাক্ষিণাত্যের মন্দির গঠনে। ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে চালুক্য রাজাদের রাজধানী বাদামী, (কর্ণাট) আইহোলি, পট্টডকল প্রভৃতি স্থানে মন্দির তৈরী হয়েছিল। এর মধ্যে আইহোলির মন্দিরে গুপ্তযুগের স্থাপত্যের প্রভাব আছে।

পট্টডকলের বিরূপাক্ষ মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে দক্ষিণী রীতির মন্দির। প্রাচীর ঘেরা অঙ্গন, উঁচু শিখর ও কারুকার্য খচিত মণ্ডপ ও গোপুরম্ (মন্দিরের প্রবেশ পথ) চালুক্য স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন।

বাদামীর মন্দিরের চিত্রকলায় গুপ্তরীতির ছাপ আছে। বাদামীর মালেগিত্তি শিবালয়ের ভাস্কর্য সৃষ্টি যখন চলছে ঠিক সেই সময়েই বৌদ্ধ পর্যটক হুয়েনসাং মহারাষ্ট্র দেশ পরিভ্রমণ করছিলেন।

রাষ্ট্রকূট রাজাদের আমল

চালুক্যরাজ্য, অষ্টম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট রাজাদের করায়ত্ব হয়। এঁদের আমলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি অজন্তার নিকটবর্তী ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির। এই মন্দিরের স্থাপত্য পরিকল্পনা আশ্চর্য। একটি আস্ত পাহাড় কেটে খোদাই করে সুবিশাল মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটি একটি সুউচ্চ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এক সার হাতী বেদীটিকে ধারণ করে আছে। মন্দিরের দেওয়ালেও স্তম্ভে 'সীতাহরণ,' 'রাবণের কৈলাস ধারণ' ইত্যাদি কাহিনী খোদিত। নৃত্যরত নটরাজের মূর্তিটি বিশ্বের ভাস্কর্য কলার বিস্ময়।

বোম্বাই শহর থেকে তিনক্রোশ পশ্চিমে আরব সাগরের মধ্যে এলিফাণ্টা দ্বীপ। এখানে দুশো পঞ্চাশ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর এলিফাণ্টা গুহা অবস্থিত। গুহাটি দৈর্ঘে একশ ত্রিশ ফুট, এটি কয়েকটি সুবিশাল স্তম্ভের উপর ভর দিয়ে আছে। পর্বত খোদিত করে ইলোরার মতই 'এলিফাণ্টার গুহা' মন্দিরটি তৈরী। এর ভাস্কর্যে শিব-পার্বতীর লীলা প্রকট। গর্ভগৃহে বিশ্ববিখ্যাত ত্রিমূর্তি অধিষ্ঠিত। এতে শিবের তিনটি রূপ দেখানো হয়েছে। মুকুট ও কুণ্ডল শোভিত সামনের শান্ত মুখটি "সদ্যোজাত" ভাবের দ্যোতক, দক্ষিণের মুখে রুদ্রভাব প্রকাশ পেয়েছে বলে তা "অঘোর"। কমনীয় ভাব প্রকাশক "বামদেব" মুখটি রয়েছে বামদিকে। মূর্তিটির আকার বিরাট, বুক থেকে মুকুটের শিরোভাগ পর্যন্ত আঠারো ফুট উঁচু। এটির মত বড় মূর্তি পৃথিবীর ভাস্কর্যে বিরল।

পল্লব রাজাদের আমল

চালুক্যদের প্রায় সমসাময়িক কালে ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত পল্লব রাজাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কীর্তি সৃষ্টি হয়। অন্ধ্র বা সাতবাহন রাজাদের তাঁরা যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। পল্লব শিল্পের দুটি ধারা।

(ক) পাহাড়ের গা কেটে বা বিশাল প্রস্তর কুঁদে মন্দির নির্মাণ।

(খ) স্বয়ং সম্পূর্ণ মন্দির তৈরী।

মহাবলিপুরমের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের স্রষ্টা পল্লব রাজগণ।

মাদ্রাজ সহরের পনেরো ক্রোশ দক্ষিণে সমুদ্রতীরে পাহাড়ের গা কেটে তৈরী মন্দিরটি রয়েছে মহাবলিপুরম্ নামক স্থানে। এই মহাবলিপুরম্ ছিল দৈত্যরাজ বলীর রাজধানী। বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন তিনি। বিষ্ণুর অনন্তশয়ান মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন মহাবলীপুরমে। এখানে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে মহাবলিপুরম্ বন্দর রূপে খ্যাতি লাভ করে। দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার দেশে দেশে ভারত-শিল্পের প্রচার হয়েছিল এখান থেকেই। পল্লবশিল্প ইন্দোনেশীয় শিল্পের প্রেরণা।

মহাবলিপুরমের স্থাপত্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম: খোদিত গুহামণ্ডপ, দ্বিতীয়: দ্রাবিড়ীয় রীতিতে তৈরী "রথম", তৃতীয়: খোলা পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ স্থাপত্য-ভাস্কর্য।

গুন্টুর, নেলোর প্রভৃতি জায়গায় খোদিত গুহা-মণ্ডপ দেখা যায়। মহাবলিপুরমের বরাহ ও মহিষাসুর মণ্ডপ প্রসিদ্ধ। রথ-মন্দিরের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পঞ্চপাণ্ডবের নামে পরিচিত পাঁচটি মন্দির। তবে ধর্মরাজ রথ-মন্দিরটি একটি মাত্র অতি বিশাল প্রস্তর কুঁদে তৈরী। দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীর বেষ্টিত মন্দিরের গোপুরম্ বা তোরণ দ্বারগুলিতে পল্লব রাজাদের চৈত্যগৃহের স্থাপত্যের প্রভাব পড়েছে। মহাবলিপুরমের শিল্পীর সৃষ্ট নরনারীর মূর্তিগুলি অনবদ্য। দক্ষিণ ভারতের মধ্যে মহাবলিপুরমের ভাস্কর্যকে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। এখানকার শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা রাজা-রাজড়া ও অভিজাতদের ছোট গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন নি। চলমান সমাজ জীবনের প্রাণ প্রবাহকে তাঁরা ছেনি, হাতুড়ির সাহায্যে পাথরের বুকে চিরস্থায়ী করে রেখে গেছেন। পৌরাণিক চিত্রেরও অভাব নেই এখানে। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ গো-দোহন করছেন, গঙ্গা আকাশ থেকে মর্ত্যে নামছেন, নাগনাগিনীরা বদ্ধাঞ্জলি হয়ে জলে ভেসে যাচ্ছেন, গন্ধর্ব বধূ, অরণ্যের পশু, হাতীর দল, তার সঙ্গে বিড়ালের ইঁদুর ধরার খেলা চিত্র, বানর বানরীর উকুন বাছা, চোখের সামনে এক মায়ালোকের দ্বার খুলে দেয়। সার্বজনীন প্রীতিভাবযুক্ত শিল্পবোধ থাকলেই এমন সৃষ্টি সম্ভব। সমুদ্রতীরবর্তী সুবিখ্যাত মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল অষ্টম শতকের প্রথম দিকে। প্রধান মন্দিরের কাছে শিব ও বিষ্ণুর আরো দুটি ছোট মন্দির আছে। এই দুটি মন্দিরেই প্রথম পাথর কুঁদে মন্দির তৈরীর আদর্শ ত্যাগ করে বিশুদ্ধ দক্ষিণী প্রথার স্থাপত্য শিল্পের সূচনা হয়।

পল্লব রাজধানী কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির-স্থাপত্যের আদর্শেই পরবর্তীকালের দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দির তৈরী হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এই কাঞ্চীর মন্দিরেই প্রথম গোপুরম্ তৈরী হয়। ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে পল্লব রাজারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

চোল রাজাদের আমল

পল্লব রাজাদের পর শক্তি ও সমৃদ্ধিতে চোল রাজারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এঁদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সৃষ্টির কাল।

চোল-স্থাপত্য কীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দির। এটি প্রখ্যাত চোলরাজা রাজরাজ চোলের তৈরী। এর তের তলায় বিভক্ত মন্দির চূড়াটি দু'শো ফুট উচ্চ। পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু একটি পাথর কেটে মন্দির বিগ্রহটি নির্মিত। এই মন্দিরে প্রাচীন চিত্রকলার নিদর্শন আছে। এই মন্দিরের অতি নিকটেই সুব্রহ্মণ্যম বা কার্তিকের মন্দির, এটিতে চোল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে।

রাজরাজ চোলের পরাক্রান্ত পুত্র রাজেন্দ্র চোলের আমলে সিংহল ও ব্রহ্মদেশে ভারতীয় আধিপত্য স্থাপিত হলে সেখানেও ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিস্তার ঘটে।

রাজেন্দ্র চোল তাঁর নূতন রাজধানী গঙ্গইকোণ্ডচোলপুরমে একটি প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করেন, এটিতে শিবের পৌরাণিক কাহিনীগুলি শৈল্পিক নৈপুণ্যের সহিত খোদিত আছে। চোল আমলে ধাতু শিল্পেরও উৎকর্ষ ঘটে; নটরাজ শিবের বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যরত মূর্তিগুলির সৃষ্টিতে এই কালের শিল্পে জীবন সঞ্চার হয়।

পাণ্ড্য রাজাদের আমল

গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের Indica গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখ আছে। পাণ্ড্য রাজাদের স্থাপত্য শিল্পে পল্লব স্থাপত্যের প্রভাব আছে। আর ভাস্কর্যে পড়েছে চালুক্য রীতির ছাপ। গোপুরমের উন্নতি বিধানে এঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি জাতবর্মন সুন্দরপাণ্ড্য, চোল শক্তিকে বিনষ্ট করেন। এঁর তৈরী শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণু মন্দির ও চিদম্বরমের নটরাজ মন্দির সুবিখ্যাত। দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে

বিশাল ও বিস্তৃত মন্দির শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণু মন্দির। এর তোরণটি ন'তলা, এটি একশ চৌষট্টি ফুট উচ্চ।

মন্দিরের শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহ আসলে বিষ্ণুর। এটি শেষশয্যায় শায়িত দশহাত দীর্ঘ, নীল পাথরে তৈরী বিষ্ণুমূর্তি। অনেকে বলেন শুধু পাণ্ড্য রাজারা নয়, চোল, হয়শাল, নায়ক নৃপতিরাও এর উন্নতি বিধান করেছেন। মন্দিরের প্রাচীরের বেড় দু' মাইল, এত বড় বিস্তৃত দেউল আর কোথাও দেখা যায় না। মন্দিরটির আকার ওঁকারবৎ, চূড়ায় চারটি সোনার কলস, চারটি বেদের প্রতীক! বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজ আচার্য এই মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের কালে এখানে এসেছিলেন। চারমাস প্রতিদিন কাবেরী নদীতে স্নান করে মন্দিরে কীর্তন করতেন। এই বিশাল মন্দিরে দ্রাবিড় স্থাপত্যের প্রভাব বর্তমান।

হয়শাল রাজাদের আমল

মহীশূর অঞ্চলে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে হয়শাল রাজারা রাজত্ব করতেন। নরম পাথরের উপর সুন্দর ভাস্কর্য সৃষ্টির জন্য তাঁদের আমল বিখ্যাত। বেলুরের বিষ্ণুমন্দির ও হালেবিডের শিবমন্দিরটি হয়শাল শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই দুই মন্দিরের ছিদ্রযুক্ত স্তম্ভগুলি দেখলে মনে হয় যেন হস্তীদন্ত বা চন্দন কাঠের তৈরী।

হালেবিডের মন্দিরে প্রাচীরে উৎকীর্ণ হাতীর মিছিল, হাঁসের ঝাঁক, অশ্বারোহী যোদ্ধা, সিংহের দল প্রভৃতির ভাস্কর্য অনুপম। ভিতরে দেবমূর্তির অলংকরণের সূক্ষ্মতা দর্শনীয়। দক্ষিণ মহীশূরের সোমনাথপুরায় কেশব মন্দিরে স্থাপত্যের একটু বিশেষত্ব আছে। যে তিনটি মন্দিরের সমন্বয়ে কেশব মন্দির গঠিত সেগুলি একটি বেদীর উপর অবস্থিত। মন্দিরের চূড়া একটি গোলাকার ছাতার মত।

হয়শাল শিল্পে, স্বর্ণকারের কারুকার্যের ঠাসবুনানি আছে কিন্তু সারল্য ও সুষমা কম।

নায়ক রাজাদের আমল

দক্ষিণী স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলার শেষ পৃষ্ঠপোষক মাদুরার নায়ক রাজারা। এঁরা সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন। এঁদের বিশেষ কৃতিত্ব এঁরা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজবংশীয়দের সৃষ্ট মন্দিরগুলিকে নূতন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের

অলংকরণে সজ্জিত করেন। এঁদের আমলেই শ্রীরঙ্গম্ ও চিদম্বরম্ মন্দিরের বহু স্তম্ভ ও মণ্ডপ নির্মিত হয়। নায়ক রাজাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মাদুরার মীনাক্ষি মন্দির। এগারোটি গোপুরম্ আছে মন্দিরটিতে। মন্দিরের স্তম্ভগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। প্রতিটি স্তম্ভে পৌরাণিক কাহিনী বা দেবদেবীর মনুষ্য প্রমাণ মূর্তি উৎকীর্ণ। এমন কতকগুলি স্তম্ভ আছে যাতে আঘাত করলে সঙ্গীতের স্বরলিপির অনুরণন ঘটে। মন্দির প্রাচীরে হরপার্বতী লীলার সুবৃহৎ ভাস্কর্য দেখে বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত হতে হয়। মীনাক্ষি মন্দিরটি যেন রূপ ও সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এই মন্দিরটির জন্যই মাদুরার এত খ্যাতি। বিদেশী পর্যটকরা মাদুরাকে তাই বোধকরি 'এথেন্সের' সহিত তুলনা করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মাদুরাকে বলেছেন 'দক্ষিণের মথুরা'। আসলে মীনাক্ষি মন্দিরটি দ্রাবিড় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের একটি অনুপম নিদর্শন। সুন্দরেশ্বর শিবের পত্নী মীনাক্ষির নামে মন্দিরটি উৎসর্গীকৃত। নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত বহু নৃত্যভঙ্গিমার ভাস্কর্য মন্দির দেওয়ালে খোদিত আছে। নৃত্য শিক্ষার্থীর কাছে মীনাক্ষি মন্দিরটি তীর্থস্বরূপ।

রাজা তিরুমল নায়কের পৃষ্টপোষকতায়. স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে। তিনিই মীনাক্ষি মন্দিরের 'বসন্ত-মণ্ডপটি' নির্মাণ করেন। তাঁর বিশাল রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হিন্দু স্থাপত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলেও, ঐশ্লামিক স্থাপত্যের কিছু চিহ্ন এতে আবিষ্কার করা যায়।

ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত যেখানে মহাসাগর স্পর্শ করেছে তার কাছেই রামেশ্বরের সুবিশাল শিবমন্দির তার ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীরামচন্দ্র এর লিঙ্গবিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহলের রাজা পরাক্রম বাহু এই মন্দিরটি তৈরী করেন দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে। কেউ বলেন রামনাদের রাজারাই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। রামেশ্বরের এই মন্দির বহু শতাব্দী ধরে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে গণ্য। শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমা পথে এখানে এসেছিলেন। শ্রীমা সারদামণি দেবী এখানকার শিবকে সোনার বেলপাতা দিয়ে পূজা করে গেছেন।

এই পুণ্যতীর্থে এসেছিলেন হিন্দুধর্মের পরিত্রাতা আচার্য শংকর। আর গত শতকের শেষ ভাগে নবভারতের স্রষ্টা. স্বামী বিবেকানন্দকে রামেশ্বরে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাঁর বাণী রামেশ্বরের মন্দিরে উৎকীর্ণ আছে। রামেশ্বর মন্দিরের চারটি তোরণ ও প্রধান মন্দিরের প্রাঙ্গণে কয়েকটি মন্দির, নায়ক রাজাদের

তৈরী। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলির মধ্যে ব্যাপ্তিতে বড় শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির। মানাক্ষি মন্দিরের সৌন্দর্যের খ্যাতি ভুবনবিদিত। আর নীলাম্বু বেষ্টিত রামেশ্বরের মন্দিরের হাজার স্তম্ভযুক্ত অলিন্দের ভাস্কর্য ও অলংকরণ অপেক্ষাকৃত কম হলেও এর মহীয়ান রূপ মনে এক সম্ভ্রমের সৃষ্টি করে—ভাব গাম্ভীর্যে এ মন্দির তুলনাহীন।

বিজয়নগরের শিল্প

বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্যটি গড়ে ওঠে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি চর্চার জন্য তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ স্থান বলে বিজয়নগরের খ্যাতি হয়েছিল। নগরটি ষাট মাইল লম্বা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। বিদেশী পর্যটকেরা একে রূপকথার রাজ্য বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে এই রূপকথার রাজ্য "হাম্পি" বলে একটি সামান্য গ্রামে পরিণত। গ্রামটি মহীশূরের কাছে অবস্থিত। স্থাপত্যকীর্তির প্রমাণ হিসাবে এখন বিজয়নগরের রাজাদের কয়েকটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। আর রয়েছে 'বিট্‌ঠল স্বামীর' মন্দির ও হাজার রামমন্দির।

বিট্‌ঠল স্বামীর মন্দিরটিতে তিনটি অলংকৃত তোরণ আছে। মন্দির মণ্ডপটির স্তম্ভগুলির কারুকার্য অতুলনীয়। স্তম্ভের গায়ে নানা পৌরাণিক কাহিনীর ভাস্কর্য উৎকীর্ণ।

সারাসেনিক শিল্প

দক্ষিণ ভারতে যখন হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনুপম বিকাশ ঘটেছে তখন উত্তর ভারতের স্থাপত্যরীতিতে একটি নূতন ভাবধারার উন্মেষ হয়েছে। সেই ধারাটা হল—ইণ্ডো-সারাসেনিক (Indo-Saracenic)। মুসলমান শিল্পের সহিত সুপ্রাচীন ভারতীয় শিল্পধারার মিশ্রণে এর উদ্ভব। এই শিল্প ধারার বিশেষত্ব হল এক নতুন ধরনের খিলান ও গম্বুজ নির্মাণরীতি। ইসলামের ভারত আক্রমনের পূর্বে হিন্দু স্থাপত্যে এ ধরনের রীতি দেখা যায়নি।

ভারতে মুসলমান অধিকারের প্রথমদিকে অর্থাৎ পাঠান আমলে মুসলমান স্থাপত্যরীতির দেখা পাওয়া যায় না কারণ হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে তার অলংকৃত পাথর দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা হত। দেবদেবীর পিছন দিকটায় আরবী

অক্ষরে কোরানের অনুশাসন খোদাই করে মসজিদের প্রাচীরে গেঁথে দেওয়া হ'ত। পাঠান সুলতানদের প্রাসাদ ও মীনার ইত্যাদি নির্মাণ করতেন হিন্দু স্থপতিরাই ; কাজেই তাঁদের তৈরী স্তম্ভ ও প্রাসাদে হিন্দুরীতিরই দেখা মেলে। দিল্লীর কুতুবমিনারটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইলতুত্‌মিসের তৈরী আজমীরের মসজিদ স্থাপত্যে হিন্দু মুসলিম শিল্পধারার মিশ্রণ ঘটেছে। আলাউদ্দীনের তৈরী 'আলাই দরজার' খিলানই প্রথম মুসলমান শিল্পরীতিতে গাঁথা হয়। এটিই পরবর্তী কালের খিলান তৈরীর প্রেরণা। তোগলক বংশের সুলতানদের প্রাসাদ, সমাধিসৌধ অনেকাংশে হিন্দু প্রভাব মুক্ত।

পাঠান আমল

সুলতানী আমলের শেষদিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মুসলমান শিল্পরীতি গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে জৌনপুর, মালব, পাণ্ডুয়া, গুজরাট, গোলকুণ্ডা, ও বিজাপুরের স্থাপত্য শিল্পের নাম আছে।

তা সত্ত্বেও হিন্দু স্থাপত্যরীতিকে একেবারে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। এর প্রমাণ পঞ্চদশ শতকে তৈরী জৌনপুরের 'অটল মসজিদ', এটিতে হিন্দু ও মুসলমান শিল্পরীতির অপূর্ব মিলন ঘটেছে।

গুজরাটি হিন্দু শিল্পীদের শ্বেতপাথরের উপর জাল বা জাফ্‌রীর কাজ সে যুগে অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছিল। আমেদাবাদের সৈয়দ মসজিদের জালির কাজে হিন্দু শিল্প প্রভাব আর জুম্মা মসজিদের স্তম্ভে জৈন স্থাপত্য প্রভাব পড়েছে।

বাংলার সেন রাজাদের গৌড়ে হিন্দু স্থাপত্য ধ্বংস হলেও অনেক প্রাসাদ ও মসজিদের ভগ্ন প্রাচীরে হিন্দু ভাস্কর্য ও দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। মনে হয় হিন্দু আমলের মন্দির ও প্রাসাদের প্রস্তর নিয়েই নবাবী আমলের প্রাসাদ ও সৌধ নির্মিত হয়েছে।

মুসলমানী গৌড়ের প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে বড় 'সোনা মসজিদ', 'দাখিল দরজা' বিখ্যাত। এই দুটির স্তম্ভ-স্থাপত্য, শিল্প ও ভাস্কর্য, হিন্দু মন্দিরের মতন। কেবল মীনারগুলিতে মুসলমানী স্থাপত্যরীতির ছাপ আছে। এছাড়া 'ফিরোজ মিনার,' 'চিকা মসজিদ', 'লোটন মসজিদের' শিল্পকীর্তি বিখ্যাত। লোটন মসজিদের ইট 'এনামেল' করা। এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। পাণ্ডুয়ার 'আদিনা মসজিদে' একসঙ্গে দশ হাজার লোক নামাজ পড়তো, এ ধরণের মসজিদ বাংলাদেশে আর নেই।

মুসলমান স্থাপত্যকলা দাক্ষিণাত্যে এক বিশেষ রূপধারণ করেছিল।

বিজাপুরের আদিলশাহের সমাধিসৌধের গোলগম্বুজ মুসলমানী স্থাপত্যের এক সুন্দর উদাহরণ। সুলতানী স্থাপত্যে বলিষ্ঠতা থাকলেও তার মধ্যে শৈল্পিক লাবণ্যের অভাব ছিল। পরবর্তীকালের মোগল স্থাপত্যে সুষমা ও কমনীয়তা আসে।

ভারতশিল্পের ইতিহাসে মোগল শিল্পকলার অধ্যায় উজ্জ্বল ও গৌরবময়।

মোগল আমল

ঔরঙ্গজেব ছাড়া সব মোগল সম্রাটই ছিলেন শিল্পকলার অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক।

বাবরের তৈরী মসজিদ প্রাসাদ সব বিলুপ্ত হলেও হুমায়ুনের নির্মিত দুটি মসজিদে (একটি আগ্রায় অপরটি পাঞ্জাবে) পারসীক প্রভাব দেখা যায়।

শেরশাহের (পাঠান হলেও এঁর শাসনকাল মোগল যুগের অন্তর্ভুক্ত) সাসারামের সমাধিসৌধে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যকলার মিশ্রণ ঘটেছে।

আকবরের রাজত্বকালেই মোগল শিল্পের বুনিয়াদ পাকা হয়। তাঁর আমলে তৈরী হুমায়ুনের সমাধিসৌধে হিন্দু ও পারসীক শিল্পের প্রভাব পড়েছে। ফতেপুর সিক্রীতে আকবর যে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন তাতে হিন্দু ও পারসীক স্থাপত্যের মিলনে তৈরী 'দেওয়ানীআম', 'দেওয়ানীখাস', 'বীরবলের প্রাসাদ' ও 'যোধাবাঈ বেগমমহল' আজও টিকে আছে। আকবরের পরিকল্পিত প্রায় সব স্থাপত্যই লালপাথরে তৈরী।

নূরজাহান তাঁর পিতা ইতিমাদ্দৌলার যে সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন তার স্থাপত্যকলাই পরবর্তীকালের মোগল স্থাপত্যশিল্পকে প্রভাবিত করেছে।

শাহজাহানের আমলেই মোগলশিল্প চরমোৎকর্ষ লাভ করে। আকবরের স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ছিল দৃঢ়তা আর শক্তির প্রকাশ কিন্তু শাহজাহানের সৃষ্টিতে দেখা গেল সুষমা, কমনীয় লাবণ্য। লালপাথর ছাড়াও শাহজাহান ব্যবহার করলেন শ্বেতপাথর। দিল্লীর 'লালকেল্লা,' 'দেওয়ানীআম', 'দেওয়ানীখাস,' 'রংমহল,' তাঁর সৌন্দর্য প্রীতির নিদর্শনরূপে আজও বর্তমান। তিনি লালকেল্লার মত লাহোর দুর্গেও দেওয়ানীখাস নির্মাণ করেন। লালকেল্লার কাছে সুউচ্চ 'জুম্মা মসজিদ' শাহজাহানের কীর্তি।

শাহজাহানের একটি প্রখ্যাত শিল্পকীর্তি হল 'ময়ূর সিংহাসন'। দিল্লী লুণ্ঠনকালে নাদীরশা এটি পারস্যে নিয়ে যান। তারপর এটির আর খোঁজ

মেলেনি। এটি তৈরী করতে বহু কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। হীরামুক্তা খচিত এমন মূল্যবান সিংহাসনে পৃথিবীর আর কোন সম্রাট বসেননি। এখন চিত্র দেখে এই সিংহাসনটির গঠনের কথা জানা যায়।

মোগল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি শাহ্‌জাহানের বিস্ময়কর কীর্তি 'তাজমহল'। এটি শাহজাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের সমাধিসৌধ। শ্বেতপাথরের এটি একটি জীবন্ত কবিতা। একুশ বছর পরিশ্রম করে বাইশ হাজার শ্রমিক এটি তৈরী করে। পারস্য দেশীয় স্থপতির নির্দেশে এটি নির্মিত হয়। হিন্দু ভাস্কর শিল্পীরা এর সূক্ষ্ম কারুকার্যের দায়িত্ব নেন।

ঔরঙ্গজেবের আমলে মোগল শিল্পকলার অধঃপতন ঘটে।

মোগলদের আধিপত্য অস্বীকার করলেও রাজপুতানা, মোগল স্থাপত্য-শিল্পের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অম্বর ও উদয়পুরের প্রাসাদ ও মন্দিরে মোগলরীতির ছাপ পড়েছে।

বাংলার মন্দির শিল্প

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাংলাদেশের মন্দির গঠনে দেখা যায় মোগল-রীতির চেয়ে পাঠান স্থাপত্যশৈলীই বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। গৌড়ের 'কদম রসুল' ও 'লোটন মসজিদের' অনুকরণে মন্দির তৈরী শুরু হয়। ইটের তৈরী মন্দিরের গায়ে পোড়া মাটির ছাঁচের (Terracotta) ভাস্কর্য যুক্ত করে বাঙালী শিল্পীরা শিল্প-সুষমা সৃষ্টি করতেন।

বাংলার মন্দিরের চারটি রূপ দেখা যায়—(১) সবভারতীয় মন্দির স্থাপত্য (২) বাংলার কুটির বা চালাঘরের অনুকরণে তৈরী মন্দির (৩) বহু শিখর বা চূড়াবিশিষ্ট রত্নমন্দির (৪) রেখ বা নাগররীতির মন্দির।

বাঙালীর কুটির দোচালা, চারচালা কখনো বা আটচালারও হয়ে থাকে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে এই জাতীয় চালাঘরের (Hut-Type) আদর্শে তৈরী মন্দির দেখা যায়। দুটি দোচালা মন্দিরকে একত্র করে 'জোড় বাংলা' মন্দিরও তৈরী হ'ত। এর একটা উৎকৃষ্ট নমুনা বিষ্ণুপুরের 'জোড় বাংলা' মন্দিরটি। লালজী ও রাধাশ্যামের মন্দির চারচালা আদর্শে তৈরী। পাঁচাল গ্রামের শিবমন্দিরটি আটচালা।

শ্যাম রায়ের মন্দিরটিতে পাঁচটি আর মদনগোপাল ও শ্রীধরের মন্দির দুটিতে নটি রত্ন বা চূড়া আছে।

পুরুলিয়া জেলার বড়মের 'রেখদেউল', বাঁকুড়ার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির ও ২৪ পরগণার সুন্দরবনের জটার দেউলে' নাগররীতির প্রভাব স্পষ্ট।

হুগলীর বাঁশবেড়ের 'হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির' স্থাপত্যে তন্ত্রের প্রভাব আছে। তেরটি মিনারে শোভিত পাঁচতলা মন্দিরটিতে পাথর ও কাঠের কারুকাজ অপূর্ব। বাঁশবেড়ের বিষ্ণুমন্দির, বড়নগরের রাণীভবানীর শিবমন্দির ও বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের মন্দিরের পোড়ামাটির ভাস্কর্য অনুপম।

প্রতিভাবান বাঙালী মন্দির-শিল্পীরা সর্বভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের সহিত বাংলার নিজস্ব চালাঘর ও রত্ন মন্দিরের একটা সমন্বয় করেছিলেন।

মোগল চিত্রকলা

ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য যেরূপ সমৃদ্ধ ও উন্নত, চিত্রকলা কিন্তু সেই অনুযায়ী উৎকর্ষ লাভ করেনি।

অজন্তার কালজয়ী চিত্রাবলী ভারতীয় শিল্পের স্থায়ী ঐশ্বর্য। কিন্তু অজন্তার ঐতিহ্য ও আদর্শ গ্রহণের উপযোগী প্রতিভাবান শিল্পীর বোধকরি অভাব ঘটায় পরবর্তী কালে উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্প সৃষ্টি আর হয়নি বললেই হয়। অথবা অজন্তা পরবর্তী কালের চিত্র-সম্পদ বিদেশী আক্রমণে অবলুপ্ত। সে যাই হোক অজন্তার পর মোগল আমলেই ভারতীয় চিত্রশিল্পের নতুন এক গৌরবের যুগ আসে। মধ্যবর্তী কালে পালআমলে পুঁথিচিত্রের ও পরে গুজরাটি পটরচনার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ক্ষীণ ধারাটি প্রবহমান ছিল। গুজরাটি পটের অনুসরণে রাজস্থানেও পটশিল্পের প্রবর্তন হয়। এই রাজস্থানী পটশিল্পীরা মোগল চিত্রশৈলীর প্রভাবে পড়েন।

রাজপুত ও মোগল চিত্রের আঙ্গিক (form) এক হলেও বিষয়বস্তু (content) স্বতন্ত্র। মোগল চিত্র বাদশাহী দরবারের আর রাজপুত চিত্রের বিষয়বস্তু রামায়ণ, মহাভারত, রাধাকৃষ্ণের জীবন থেকে গৃহীত। তবে কৃষ্ণকে রাজপুত শিল্পীরা মোগল রাজপুত্রের পোষাক আর এই রাধাকে ঘাগরা পেশোয়াজ পরিয়েছেন।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন চিত্রশিল্পের অনুরাগী। তিনি সমরখন্দ ও হিরাট থেকে বহু চিত্রশিল্পী ভারতবর্ষে এনেছিলেন।

হুমায়ুনও পারস্যদেশের দুজন বিখ্যাত চিত্রকরকে এদেশে আনেন। কিন্তু মোগল চিত্রকলার বিকাশে সম্রাট আকবরের দানই সমধিক। তিনিই পিতার

আনীত চিত্রশিল্পী মীর-সৈয়দআলী ও আবদুল সামাদের কাছে হিন্দু শিল্পীদের ছবি আঁকা শেখার ব্যবস্থা করে দেন। দেশী শিল্পীদের চিত্রে ভারতীয় ও পারসীক শিল্পধারার মিশ্রণ ঘটে। এই অভিনব মিশ্র রীতিতেই মোগল আমলের চিত্রকলার জন্ম। আকবর হিন্দুশিল্পীদের সমাদর করতেন। তাঁর আমলে হিন্দু মুসলমান শিল্পীদের নিয়ে একটি শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। আকবর এঁদের দিয়ে নিজের জীবনের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর প্রসিদ্ধ জীবনকথা 'আকবর নামা'য় আঁকিয়েছেন। মহাভারত ও নল-দময়ন্তীর কাহিনীর চিত্রাবলীও এই আমলে অঙ্কিত।

মোগল চিত্রের একটা বড় ত্রুটি পরিপ্রেক্ষিতের (Perspective) অভাব। ব্যাপারটা হচ্ছে ছবির সামনের পেছনের সব বস্তুই একই সমতলে আঁকা। মোগল চিত্রগুলির আয়তন হ'ত ক্ষুদ্র তাই সম্রাটরা চিত্রগুলিকে Album-এ রেখে অবসর সময়ে দেখে উপভোগ করতেন।

জাহাঙ্গীরের সময়েই মোগল চিত্রকলার উৎকর্ষ চরম শিখরে পৌছায়। এই সময়ের আঁকা প্রতিকৃতি চিত্রগুলি ভারত শিল্পের সম্পদ। হাতীর দাঁতের উপরও এই সময় ছবি আঁকা সুরু হয়। পাখীর চিত্রগুলি মোগল যুগের এক বিশেষ শিল্পসৃষ্টি। আতস কাঁচ দিয়ে দেখলে পাখীর গায়ের ছোট ছোট পালকগুলিও স্পষ্ট দেখা যায় এমনি আশ্চর্য নিপুণ ছিল এগুলির তুলির কাজ। স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরকে পাশ্চাত্ত্য শিল্পীর আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি উপহার দেন। এর পর থেকেই মোগল চিত্রে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব দেখা যায়। শাহজাহান স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অনুরাগী হলেও চিত্রকলার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল কম। তাঁর পর থেকেই মোগল চিত্রকলার অবনতি সুরু হয়।

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই মোগল চিত্রকলা কয়েকটি বিশেষ রীতিতে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রীতির কথা বলা হল।

মোগল দরবারের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে রাজস্থানের মধ্যে জয়পুর চিত্রশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। জয়পুরী রীতিতেই প্রথমে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীর ছবি আঁকা হয়। প্রতাপ সিংহ, পৃথ্বীরাজ, মানসিংহ প্রভৃতির ছবি জয়পুরীশিল্পীরাই প্রথমে অঙ্কন করেন।

মোগলসাম্রাজ্যের পতনের কালে বহু মোগল শিল্পী পাঞ্জাবের পাহাড় অঞ্চলের হিন্দুরাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে গুজরাটি ও

রাজস্থানী রীতির পট আঁকিয়েরা মোগল অঙ্কন প্রণালী শিক্ষা করে এক নূতন রীতিতে ছবি আঁকতে সুরু করেন। এই রীতির শৈল্পিক বিকাশ ঘটে "কাংড়া" রাজ্যে। পরবর্তীকালে চিত্রশিল্পের এই বিশেষ রীতিই 'কাংড়া শিল্প' নামে ভারতবিখ্যাত হয়। এই চিত্রের লক্ষ্য সারল্য, সাবলীলতা ও রঙের ঔজ্জ্বল্য। কাংড়া শিল্পীরা পৌরাণিক ছবিগুলিতে রংএর ঔজ্জ্বল্য যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি দৈহিক সৌন্দর্যও ফুটিয়েছেন আশ্চর্যভাবে। এই শিল্পীরা মহাভারত, রামায়ণের কাহিনী ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণলীলা ও হরপার্বতীর কাহিনী নিয়ে ছবি এঁকেছেন। এই চিত্রগুলিতে কমলা ও লাল রংএর মাঝামাঝি এক নতুন ধরণের রংয়ের ব্যবহার করেছেন। সোনার কাজও ঐ ছবিগুলির মধ্যে খুব পাওয়া যায়। মোগল শিল্পীদের অনুকরণে কাংড়া শিল্পীরা, কিছু প্রতিকৃতি এঁকেছেন। সমাজ ও লোকজীবন নিয়েও তাঁদের ছবি আঁকতে দেখা যায়। রাঠোরবংশীয় রাজপুত রাজারা ছিলেন কাংড়া চিত্রের পৃষ্ঠপোষক। পরবর্তীকালে কাংড়া ও মোগল চিত্ররীতির সংমিশ্রণে 'কাশ্মীরীরীতির' জন্ম।

'রুমী চিত্ররীতির' সূচনা হয় জাহাঙ্গীরের আমলে। এই রীতিতে দেখা যায় মোগল চিত্রশিল্পের উপর ইউরোপীয় প্রভাব এসে পড়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই ভারতীয় চিত্রশিল্পে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বেড়ে উঠতে থাকে। কারণ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতির অবনতি সুরু হয়—আর ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় আদব কায়দা, সাজ পোষাকের সহিত নতুন ধরণের সাহিত্য, শিল্পেরও আমদানী হয়।

নব্য-ভারতীয় চিত্রকলা

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে সমাজে-ধর্মে সাহিত্যে নবজাগরণ ঘটে। কিন্তু চিত্রশিল্পের নবজন্মের জন্য শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এই কালে ভারতীয় চিত্র জগতে রবি বর্মার নাম সুপরিচিত ছিল। তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু ভারতীয় হলেও আঙ্গিক ছিল পাশ্চাত্ত্যের। তাই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর অবনীন্দ্রনাথ যেদিন 'ভারতমাতা' চিত্র আঁকলেন (১৯০২) সেদিন থেকেই সুরু হল ভারতীয় চিত্রশিল্পের নবজাগরণ। অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য রীতিতেই চিত্র অঙ্কন শিখেছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ সুপ্রাচীন ভারতীয় শিল্পের প্রতি

শ্রদ্ধান্বিত হন। ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ভারতশিল্পের বোদ্ধা স্বামী বিবেকানন্দের প্রযত্নে। আগেই বলা হয়েছে নিবেদিতার আগ্রহেই অবনীন্দ্র-শিষ্য তরুণ শিল্পী নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, অজন্তার গুহাচিত্র নকল করতে গিয়ে ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। পরবর্তী কালে অবনীন্দ্র শিষ্যদের হাতেই আধুনিক ভারতের চিত্রকলার অগ্রগতি ঘটেছে। আর যামিনী রায় প্রমুখ প্রতিভাবান শিল্পীদের তুলি, সেই চিত্রশিল্পের ধারাকে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যে প্রাণবান ও উজ্জ্বল করে বিশ্বস্বীকৃতির জয়মাল্য অর্জন করেছে।

উপসংহার

ভারতশিল্প একদিন ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সহযাত্রী হয়ে সুদূর সাগর পারের দেশ যবদ্বীপ, সুমাত্রা, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পায় উপনীত হয়েছিল। তার প্রমাণ বোরোবুদুর, (যবদ্বীপ) আঙ্কোর ভাট, (কম্বোজ) মি-সন (চম্পা) আনন্দমন্দির (ব্রহ্ম) প্রভৃতি কালজয়ী শিল্প-ঐশ্বর্য।

এছাড়া আফগানিস্তানের ব্রহ্মযান গুহার দেওয়ালচিত্রে, তিব্বতের মঞ্জুশ্রী মূর্তিতে, মধ্য-এশিয়ার বেজেকলিক গুহা মন্দিরের চিত্রে, চীনের তুনহুয়াং গুহার বুদ্ধচিত্রে, কোরিয়ার বুদ্ধমূর্তিতে, জাপানের হরিয়ুজি মঠের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধের প্রাচীর চিত্রে, সিংহলের সিগিরিয়া পাহাড় চিত্রে ও নেপালী ধাতুমূর্তিতে ভারতীয় শিল্পকলার সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপম ফলশ্রুতি ভারতীয় শিল্প বিশ্ব সভ্যতার শাশ্বত সম্পদ।*

---

* এই নিবন্ধটির পরিপূরক হিসাবে "বৃহৎ-ভারত সংস্কৃতি" প্রবন্ধটি পঠনীয়।

* দুটি প্রবন্ধের উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সব মনীষীর রচনা থেকে গৃহীত তাঁরা হলেন : রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অবনীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, ডুরাণ্ড, ফার্গুসন, হ্যাভেল, ক্র্যামরিশ, কুমারস্বামী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমেশ মজুমদার, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি এবং আরো অনেক অখ্যাত লেখক। এঁদের ঋণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি।—লেখক।

সংগীত-নৃত্য-নাট্য

এক অঙ্গে তিন রূপ :

সংগীত-নৃত্য-নাটক। এক শরীরের তিন শাখা।

ভেবে দেখুন সেই প্রথমে মানুষের কথা যার সামনে হারমোনিয়ম নেই; পায়ে নেই নূপুর, গায়ে নেই ঝলমলে রাজার পোষাক। কিন্তু তখনো সেই মানুষ নাচত, গাইত, অভিনয় করত।

সেই নৃত্যগীতের মহানাটকে অভিনেতারা শুধু বিনোদনের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করত না। বস্তুতঃ এই অভিনয় ছিল জীবনযাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন। সংস্কৃতির সেই পর্বে জীবনচর্চা ও সংস্কৃতিচর্চা প্রায় অভিন্ন ছিল। সংগীত মানে আবেগের আকুল প্রকাশ। তার সাফল্যে মেঘ জল দেয়, বনে দাবানল জ্বলে ওঠে, চোখে আসে অশ্রু। নৃত্য মানে পরিমিত ছন্দে অঙ্গবিক্ষেপ। তার সাফল্যে কাঁধে কাঁধ মেলে, দেহে আসে উদ্দাম শক্তি; শিকার সহজলভ্য হয়। আর অভিনয় মানে নৃত্য-গীত-আবৃত্তির সমন্বয়ে কোন ঘটনার প্রতিফলন। সে কাল অনুকরণের কাল। আকাশ, গাছ, নদী, মেঘ ফুল পশুপাখীর বিচিত্র অনুকরণে মত্ত সেকালের মানুষ। প্রকৃতি তাকে সাজিয়ে দিল সুরে, ছন্দে, ভাষায়। সেই মানুষ প্রয়োজনে, আনন্দে গড়ে তুলল তার আপন সংস্কৃতি।

ভারতীয় সংস্কৃতি : বিকাশ ও বিস্তৃতি :

মহেনজোদারো হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাক্ষ্য এই যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে ও ভারতভূখণ্ডে সংগীতের মান সমুন্নত ছিল। সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ খৃঃ পূঃ ৩০০০—২৫০০ অব্দে। গবেষকের উক্তিতে পাওয়া যায়, '...এটা বেশ বুঝতে পারা যায় যে নাচ গান ছাড়া ও সে যুগে কণ্ঠসংগীতের অনুশীলন হত। তন্ত্রীযুক্ত বীণা প্রভৃতি এবং চামড়ার তৈরী মৃদংগ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তো ছিলই।[১] '...বাঁশীর সাতটি ছিদ্র, বীণার গড়ন, চামড়ার বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র এবং নর্তক নর্তকীর নৃত্যভংগী দেখলে এটা অনুমান করা কঠিন হবে না যে তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতায় যে চরম বিকাশ তাদের হয়েছিল,

---

১. Pre Historic Civilization of the Indus Valley : রায় বাহাদুর দীক্ষিত

আরও কয়েকশত বা কয়েকহাজার বছর লেগেছিল সে অবস্থায় উন্নীত হতে।[২] এই প্রামাণ্য তথ্যের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। সংগীত শাস্ত্রবদ্ধ হবার পরও স্তর দুটি সুস্পষ্ট ছিল—লৌকিক ও শাস্ত্রীয়। বর্তমান মার্গ-সংগীত যে লোকদেহে লীন ছিল সে কথা লিখিত সত্য। ভরত, মাতংগ, নারদ, শাংর্গদেব প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের সংগীতশাস্ত্রবিদ সংগীতের নানা রীতি প্রকৃতির বিচার বিভাগ করে গেছেন। তাঁদের ধারাবাহিক আলোচনা থেকে এই সূত্রগুলো সাজানো যেতে পারে।

প্রথমতঃ কণ্ঠনিঃসৃত সর্বপ্রকার শব্দই সংগীতে গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ কণ্ঠের সব স্বর সংগীতের স্বর নয়। এর জন্য নির্দিষ্ট অবস্থান আছে। স্বরের প্রয়োগপ্রনালী অনুসারে মোটামুটি সাতটি মৌলিক স্বরের নাম—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ (সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি)।

দ্বিতীয়ত : এই সুরমণ্ডলীর বিবিধ প্রয়োগবৈচিত্র্যের রীতিবদ্ধ উচ্চারণে ছয়রাগ, ছত্রিশ রাগিনীর সৃষ্টি। কখনো স্থান, কখনো পশু পাখী, কখনো স্রষ্টার নাম অনুসারে এইসব সংগীতের নামকরণ হয়েছে।

তৃতীয়ত : প্রথমাবধিই বৈদিক ও লৌকিক—দুই রীতিতেই গান গীত হয়ে আসছিল। একটি ধারা গ্রাম-গেয়। গ্রামীন জনসমাজ বহুমুখী ক্রিয়াকর্মে সংগীতানুষ্ঠান করতেন। গ্রাম গেয় গানই পরে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত রূপ নিয়ে মার্গসংগীত বা শাস্ত্রীয় (ক্ল্যাসিক্যাল) সংগীতে পরিণত হয়েছে।

লোকসমাজ থেকে রাজদরবারে :

ভারতীয় জনসমাজ ক্রমশ : লোকশাসন থেকে রাজশাসনে বিবর্তিত হওয়ায় সংগীতচর্চার ও রূপ বদল হল। রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে গুণী সংগীত শিল্পী লোকায়তন থেকে উঠে এলেন রাজদরবারে। চতুর্থ শতাব্দীর গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজদরবার সংগীতের রাজকীয় অনুগ্রহ লাভের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' সংগীতানুশীলনের একটি সমৃদ্ধ নিদর্শন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন খিলজির মুসলমান রাজসভা ভারতীয় সংগীতচর্চার স্মরণীয় আসর। ধ্রুবপদগায়ক বৈজুবাওরা, হিন্দুস্থানী মার্গ সংগীতের প্রধান স্রষ্টা গোপাল নায়কের জীবনভর সাধনার পাদপীঠ আলাউদ্দীনের রাজদরবার।

---

২. সংগীত ও সংস্কৃতি : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

রাজকীয় আশ্রয় পেয়ে নিশ্চিন্ত ও উৎসাহিত শিল্পীকুল নির্বিঘ্নে সংগীতানুশীলনের অবারিত সুযোগ লাভ করলেন। ফলে রাগ ও সুরের পরিমার্জন ও শোধন হল নানাভাবে। নিম্নোক্ত শ্রেনীর সংগীত রাজদরবারের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে কালোত্তীর্ণ হয়েছে।

ধ্রুবপদ ঃ সর্বাধিক প্রাচীন রীতির হিন্দুস্থানী সংগীত। প্রাক্-মুসলমান যুগে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুদের কণ্ঠে লালিত হয়ে অদ্যাবধি স্বকীয় মহিমায় মণ্ডিত হয়ে আছে। ধ্রুবপদ (পরবর্তী কালে নামান্তরে ধ্রুপদ) এর রচনা বিস্তৃত এবং চার অংশে বিন্যস্ত—অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। আলাউদ্দীনের রাজদরবারের বৈজুবাওরা, গোপাল নায়েক; আকবরের রাজদরবারের তানসেন; বাংলার বিষ্ণুপুর রাজদরবারের রামশংকর, যদুভট্ট প্রভৃতি এই দরবার কেন্দ্রিক সংগীত সাধনার সার্থক শিল্পী।

খেয়াল ঃ ধ্রুপদ রীতির গান। স্বরবর্ণের দ্রুততাল ও লঘু অলংকারের ব্যবহার এই গানের বৈশিষ্ট্য। মোগলবাদশাহদের পার্থিব ভোগমুখী ইচ্ছা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ধ্রুপদের ধ্যানগম্ভীর মহিমা ছেড়ে খেয়ালের লঘু ঔজ্জ্বল্যের দিকে ওস্তাদরা অধিক মনযোগী হলেন। অষ্টাদশ শতকে দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদশাহের দরবারে সদারংগ, নিয়ামৎ খাঁ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে গোয়ালিয়র ঘরানার মহম্মদ খাঁ খেয়ালের প্রভূত সমৃদ্ধি সাধন করেন।

সংগীতের লোকধারা ঃ

শাস্ত্রসম্মত সযত্ন সংগীতানুশীলন যেমন একদিকে রাজসভাকে কেন্দ্র করে বিশিষ্ট ঘরানায় পরিণত হচ্ছে অন্যদিকে পল্লীর লোকজীবনের নানা আনন্দ-বেদনার রুদ্ধ আবেগ স্বতোৎসারিত হচ্ছে বিচিত্র ভংগীতে। বলাবাহুল্য সংগীতের এই ধারায় সযত্ন অনুশীলন নেই; সুরচিত কোন নিয়মতন্ত্র মেনেও চলেনি এই লোক সংগীত। এর সুর সহজ ও সোচ্চার। সম্মিলিত কণ্ঠে এ সংগীত সবলে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে। সহগামী বাদ্যযন্ত্র ও অতি সরল। যেখানে দরবারের রাজকীয় আড়ম্বরে ওস্তাদের হাতে বহুতারের সেতার আপন সুরজাল বিস্তার করে চলেছে, সেখানে পল্লীর অনাদৃত প্রান্তরে বাউলের কণ্ঠে উদাত্ত সুরের তীব্র আবেগ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একতারার একটি মাত্র তারের অনুরননে। লোকায়ত সংগীত কোথাও ধর্মসাধনাকে অবলম্বন করে প্রচারিত হয়েছে, কোথাও বা নিত্যজীবনচর্চার দুঃখ সুখ সংগীতে সুরলাভ করেছে।

ভজন ঃ ষোড়শ শতাব্দীতে রাজপুত রমণী মীরাবাঈ এই ভজন সংগীতের প্রথম উদ্‌গাতা। ভাষায় ও সুরে নিরলংকার এই সংগীত ভক্তিমূলক। তুলসী দাস, কবীর, মীরাবাঈ, সুরদাস, দাদু, ত্যাগরাজ প্রভৃতি ধর্মসাধকগণ যে আবেগাকুল ভজনগীতির প্রবর্তন করেন তার জনপ্রিয়তা ও আবেদন এযুগেও বর্তমান।

কীর্তন ঃ বাংলা দেশের বৈষ্ণব আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই কীর্তন-গানের প্লাবন বাংলার সংগীত আন্দোলনের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। প্রধানতঃ গৌরাঙ্গলীলা ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলীই কীর্তনের উল্লেখযোগ্য দিক।

এছাড়া ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে সুরে কথায় সমৃদ্ধ ও বিচিত্র অসংখ্য লোকসংগীত ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে আপন আপন ঐশ্বর্য নিয়ে বেঁচে আছে।

প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য ঃ

এক ঃ সুরে ও বাণীতে প্রধানতঃ স্বরযন্ত্রের সাতটি মৌলিক বিন্যাসে ভারতীয় সংগীত প্রমূর্ত। সা—রে—গা—মা—পা—ধা—নি—যথাক্রমে সাতটি মৌলিক স্বর-বিন্যাসের সংক্ষিপ্ত নাম।

দুই ঃ আরোহী, অবরোহী, স্থায়ী ও সঞ্চারী—সংগীত ক্রিয়ার এই চারটি পর্য্যায়।

তিন ঃ তালপ্রধান স্বরন্যাস এই সংগীতের প্রাণ।

চার ঃ চর্মনির্মিত বাদ্যযন্ত্র সংগীতের তাল ও ছন্দকে সুবিন্যস্ত করে।

পাঁচ ঃ তারের যন্ত্রে অনুরনিত সুরসৃষ্টি ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের এক বিশেষ সম্পদ।

ছয় ঃ লোকজীবনের আবেগ থেকে যে বিচিত্র সংগীতের উদ্ভব হয়েছে তাতে সুরের কোন শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় নি। ভারতীয় লোকসংগীতে কথা-অংশ সুরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

সাত ঃ ঋতু বিভাগের বৈচিত্র্য অনুযায়ী ভারতীয় সংগীতের রাগ বিভাগ লক্ষ্যণীয়। যেমন—গ্রীষ্মে 'দীপক', বর্ষায় 'মেঘ', শরতে 'ভৈরব', হেমন্তে 'মালকোষ', শীতে 'শ্রী', বসন্তে 'হিন্দোল' প্রভৃতি বিভিন্ন রাগ বিবিধ ঋতুপর্যায়ের উপযোগী বলে নির্ধারিত।

আট ঃ মানবিক আবেগ ও প্রকৃতির রূপবিন্যাসের বৈচিত্র্য অনুযায়ী

বিভিন্ন রাগকে বিভিন্ন সময় বিভাগের উপযুক্ত বলে স্থির করা হয়েছে। যেমন—ভোরে ললিত, ভৈরব; সকালে জৌনপুরী, টোরী; দুপুরে সারং; সন্ধ্যায় পূরবী, কল্যাণ; রাত্রে পুরিয়া, ছায়ানট; নিশীথে মল্লার, দরবারী, বাগেশ্রী, বেহাগ প্রভৃতি প্রহর উপযোগী রাগের উল্লেখ করা যেতে পারে।

অবশ্যি যুগে যুগে বিভিন্ন ওস্তাদ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর মিশ্রণে নূতনতর রাগ রাগিণী সৃষ্টি করেছেন। ওস্তাদবর্গ অনুকারীদের যে বিশেষ ভংগীতে সংগীত শিক্ষা দিয়েছেন তারই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতীয় সংগীতজগৎ বিভিন্ন ঘরানায় (School) বিভক্ত।

ভারতীয় সংগীতের বিবর্তন :

ভারতীয় সমাজবিবর্তনের সংগে সংগীতের বিকাশ ও প্রয়োগ বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়েছে। শাস্ত্রীয় সংগীত তার বিশুদ্ধতা রক্ষণে বিশেষ সচেষ্ট হলেও পরবর্তী যুগে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা যতই বিশ্বের বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসেছে ততই বহিরঙ্গের কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রসংগীতে। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের ব্যাপকতা ও ভারতীয় সংগীতের আত্মমগ্নতার একটি সুন্দর মিলন ঘটেছে রবীন্দ্রসংগীতে। আধুনিক ভারতীয় সংগীতে এরূপ একটি প্রবণতা ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ব্যবহারগত দিক থেকে বলা যায় ভারতীয় সংগীত সামাজিক আবেগ প্রকাশের এক নূতন মাধ্যম রূপে আবির্ভূত হলো উনবিংশ শতাব্দী থেকে। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গানের প্রচণ্ড উন্মাদনা ও জনচিত্তে তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া থেকে ভারতীয় নবোদ্ঘাটিত সাংস্কৃতিক মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীন ভারতের জাতীয়-সংগীত এই বিকশিত বৈশিষ্ট্যের সার্থক দৃষ্টান্ত।

ভারতীয় নৃত্যকলা

'যেমন ফুলফোটা বা চারাগাছের পরিনতির মধ্যে প্রকৃতি তার নিজের নিগূঢ় গতিবেগের অনুসরণ করে, নৃত্যকলাও সেই রকম অপরিমেয় গতির ছন্দকে রূপ দিচ্ছে ইংগিত মূলক মুদ্রাতে। সাহিত্য যেমন ভাষার যোগে আত্মপ্রকাশ করে, ছবি যেমন রং ও রেখার ভিতর নিজেকে ধরা দেয়, নৃত্যকলাও সেই রকম সুর ও তালের যোগে স্বরূপ নেয়।'[৩]

পুরাকালে নৃত্যবিদেরা নাচকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন—তাণ্ডব ও লাস্য। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিমূর্ত চিন্তাটি তাঁরা নৃত্যে রূপ দিয়েছিলেন। সুতরাং ভারতের নৃত্যকলা জীবনের স্থূল আনন্দের সীমা ছেড়ে আধ্যাত্মিক প্রেরণাতে উদ্বোধিত হয়েছিল। তাঁদের সমগ্র বিশ্বচেতনার ধ্যানরূপ ছিলেন নটরাজ শিব।

নৃত্যকলার শাস্ত্রসম্মত রূপটি ক্রমশঃ রীতিবদ্ধ হয়ে এক একটি বিশেষ ক্ল্যাসিকাল নৃত্যপর্য্যায়ে উন্নীত হল। এই পর্য্যায়ের নৃত্যে সমস্ত দেহভংগিমা বিশেষভাবে সংবেদনশীল হয়ে উঠে। ভরতনাট্যম, কত্থক, মনিপুরী, কথাকলি বিশিষ্ট ভারতীয় নৃত্যশিল্প। এই নৃত্যশৈলীর মৌলধর্ম হল মুদ্রা। হস্তের অংগুলী সঞ্চালনের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের সংগে গ্রীবা ও মুখাবয়বের নিপুণ সংযোজনের ফলে বিশেষ ভাবদ্যোতনা প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। শিল্পীর নৃত্যভংগী তখন দেহাতীত ভাবলোকের উদ্বোধন করে। নৃত্য তখন বিশেষ ভাবজগতে নিয়ে যায় দর্শককে। নৃত্য দেহলীলায় মানবমনের অপ্রকাশিত ভাবকে ব্যক্ত করে, স্পষ্ট করে তোলে।

নৃত্যকলার অন্য ধারা লোকসমাজের সহজ আনন্দ উদ্যমকে অবলম্বন করে পরিবর্ধিত হয়েছে। যেকালে ক্ল্যাসিকাল নৃত্য শহরকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিপ্রধান হয়ে উঠেছে, সেকালে পল্লীর মানুষের দলবদ্ধ নৃত্য ভারতের আঞ্চলিক লোকবৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হচ্ছে। লোকনৃত্য গড়ে উঠেছে যুগে যুগে আপন আনন্দে সমাজের সামগ্রিক জীবনকে পূর্ণতা দেবার জন্য। লোকনৃত্য দর্শক ও নর্তকের মধ্যে এক গভীর একাত্মতা সৃষ্টি করে তোলে।

কয়েকটি বিশিষ্ট লোকনৃত্যের নাম—

ছৌ, ভাদু, টুসু, ঝুমুর, লেটো, জারি (পশ্চিম বংগ), বিহু, ঢুলিয়া (আসাম) ; নাগা (নাগাভূমি) ; রামলীলা, ঝারনী, ঝুমুর, শিকার (বিহার) ; গরবা, রাস, (গুজরাট) ; মাথুরী, কুম্মি, সিদ্ধি (অন্ধ্র) ; তিয়াট্টম, ভেলাকলি (কেরল) ; হাফিজা, বচা, ধুমল (জম্মু ও কাশ্মীর) ; গাওরিচা, লাজিম, দশাবতার (মহারাষ্ট্র) ; লুড়ি, ঝুমার, ভাংরা, গিধহা (পাঞ্জাব) ; গীদার, রসিয়া, ভালার (রাজস্থান) ; নাচুয়া, কাজরী, ঝুলা (উত্তর প্রদেশ) ; মন্দিরা (বোম্বাই) ; কারগম (মাদ্রাজ) ; কাবুই (মনিপুর)।

ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল নৃত্যের প্রধান চারটি শাখা—ভরত নাট্যম, কত্থক, কথাকলি ও মনিপুরী।

ভরত নাট্যম ঃ 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ধ্রুবরীতির ছন্দোময় রূপ ভরত নাট্যম। ভরত নাট্যমের নৃত্যপদ্ধতির মূলভাবধারা ধর্মভিত্তিক ও দেবতাকেন্দ্রিক। শিবতাণ্ডব থেকে এর জয়যাত্রার সূচনা। সুব্বারায়া, নাটুবান, দীক্ষিতার, শ্যামশাস্ত্রী প্রভৃতির অবদানে ভরত নাট্যম সমৃদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ আয়ার, শ্রীমতি রুক্মিনী দেবী, শ্রীমতি বালাসরস্বতী, শ্রীমতি শান্তারাও, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি এই ধারার সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী।

কথক ঃ কথক নৃত্যধারায় বৈষ্ণব দর্শন ও ইসলামীর সংস্কৃতির সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন দেখা যায়। সাধারণভাবে কথক নৃত্যধারায় লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর—এই দুটি ঘরানা প্রচলিত। ঠাকুরপ্রসাদ, নবাব ওয়াজীদ আলি শাহ, বিন্দাদিন (লক্ষ্ণৌ ঘরানা) এবং ভানুজী, হরিপ্রসাদ, জয়লাল (জয়পুর ঘরানা) প্রভৃতি কথকের স্মরণীয় স্রষ্টা। পরবর্তীকালে শ্রীমতি মেনকা, বিরজু মহারাজ, গোপীকৃষ্ণ, শ্রীমতি সিতারা, দময়ন্তী যোশী, শোহনলাল, চিত্রেশ দাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কথকশিল্পী।

কথাকলি ঃ ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে কথাকলি প্রায় সম্পূর্ণ বিদেশী প্রভাবমুক্ত প্রাচীন নৃত্যশিল্প। কথাকলি মূলত দৃশ্যকাব্য। এতে বাদক ও ও সংগীত শিল্পীর গীত মিলিতভাবে পরিবেশিত হয়। ধর্মকাহিনী ভিত্তিক এই নৃত্যে রূপসজ্জা অপরিহার্য্য। কথাকলি শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে মহাকবি ভাল্লাথোলের নাম চিরস্মরনীয়। এই নৃত্যকে জনপ্রিয় করার জন্য যাঁদের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে আছেন রমন পিল্লাই, কৃষ্ণকুট্টি, শংকরণ নাম্বুদ্রি, গোপীনাথ, বালকৃষ্ণ মেনন ও কেলু নায়ার প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ।

মণিপুরী ঃ মণিপুরী নৃত্যে নাট্যের ও নৃত্যকলার আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটেছে। রাধাকৃষ্ণের কাহিনী ভিত্তিক এই নৃত্যের সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা অন্য নৃত্যধারায় দুর্লভ। মণিপুরী নৃত্যে সুরচন্দ্র প্রভৃতি রাজন্যবর্গ এবং আমুবী সিং, বিপিন, নদীয়া সিং প্রভৃতির অবদান উল্লেখযোগ্য।'[৪]

এ প্রসঙ্গে উড়িষ্যার দেবদাসী নৃত্যের কথা উল্লেখযোগ্য। দেবতার তুষ্টিসাধনের জন্য আপন দেহমনের সমস্ত সুষমা নিঃশেষে নিবেদন করতেন মন্দিরের দেবদাসীরা। লোকচক্ষুর অগোচরে উড়িষ্যার মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীগণের এই নিবেদন-নৃত্য আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। 'সামগ্রিক

নৃত্য ঃ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী।

ভারতের নৃত্যকলা ঃ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়।

বিচারে বলা যায় যে ভারতীয় মার্গনৃত্যের মহৎ গুণগুলি ওড়িষী নৃত্যধারায় বিদ্যমান। পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারক, উদয়গিরির মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ কাব্যিক লাবণ্যময় রূপকর্মসমৃদ্ধ এই নৃত্যছন্দকে প্রাণবন্ত করে ভারতবর্ষে জনপ্রিয় করেছেন শ্রীমতি ইন্দ্রানী রহমান। সাম্প্রতিক কালের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন মিনতি দাস, মায়াধর রাউথ, প্রিয়ম্বদা মহান্তি, সংযুক্তা মিশ্র প্রভৃতি।'[৫]

ভারতীয় নৃত্যকলার বিবর্তন

রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত নৃত্যশিল্পে ভারতীয় ঐতিহ্য ও বিদেশী নৃত্যশৈলীর আশ্চর্য মিলন সাধিত হয়েছে। এই নৃত্যে শাস্ত্রীয় জটিলতা সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। নৃত্যের লীলাভংগীতে একটি দীর্ঘ বক্তব্যকে রূপায়িত করতে গিয়ে নৃত্যলীলা নাট্যকলার অতি সন্নিকটে এসে গিয়েছে। নৃত্যের মুদ্রা, সংগীতের সুর ঘটনার নাটকীয় প্রবাহ—এই তিনের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য এক অনুপম শিল্প। বিশ্বভারতীর শিক্ষায় ও সংগঠনে ভারতের অন্যান্য শহরাঞ্চলে রবীন্দ্র-নাট্যের প্রসারলাভ ঘটেছে।

নৃত্যে আধুনিক যুগের সার্থক সূচনা করেছেন শিল্পী উদয়শংকর। তাঁর নৃত্য প্রযোজনায় কথাকলির নাটকীয় বৃত্ত, ভরতনাট্যমের ইংগিতময়তা, কথ্থকের ক্ষিপ্রচটুল চন্দ, মনিপুরীর গীতিধর্মী ব্যঞ্জনা ও লোকনৃত্যের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রভৃতি এক সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। তাঁর শিল্পীজীবনের বিকাশে রোদেনষ্টাইন, শ্রীমতি আনা পাভলোভা, শ্রীমতি সিমকীর অবদান উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় নাট্যশিল্প

নাট্যকলা প্রাচীন যুগের ভারতীয় সুকুমার শিল্পের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নাটকের পরিচয় ছিল দৃশ্যকাব্য রূপে এবং একে বলা হত নাট্যবেদ। 'এমন কোন জ্ঞান নেই, শিল্প নেই, বিদ্যা নেই, কৌশল নেই, কর্ম নেই যা এই নাট্যে দেখা যায় না।' প্রাচীন শাস্ত্রবিদ ভর্তৃহরির এই মন্তব্য থেকেই ভারতীয় নাট্যকলার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

৫. ভারতের নৃত্যকলা : গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়।

নাটকের (তখনকার সংজ্ঞা অনুযায়ী দৃশ্যকাব্যের) প্রথম সূত্রপাত সম্পর্কে মতান্তর রয়েছে। ঋক্ বেদের পুরূরবা-উর্ব্বশী, যম-যমী প্রভৃতি সংবাদসূক্ত, সাধারণ লোকসমাজে প্রচলিত পুতুলনাচ, বিদেশী গ্রীক্ দৃশ্যকাব্য—প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষক সিদ্ধান্ত করেছেন।

ভারতীয় নাট্যের প্রকৃতি

পৃথিবীর সব প্রাচীন নাটকের মতো ভারতের প্রাচীন নাটকও মহাকাব্যের কাহিনীকে অবলম্বন করেছে। তবে হাস্যরসপ্রধান নাটকের জন্য কখনো কখনো সমসাময়িক ঘটনাকে গ্রহণ করা হত। ভারতীয় নাট্যশিল্পের মূল উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। বীর, করুণ, হাস্য, শান্ত, বীভৎস, শৃঙ্গার, অদ্ভুত, ভয়ানক ও বাৎসল্য—এই নয়টি ভাব মানব মনের মৌলিক অনুভূতির পরিচায়ক। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব প্রভৃতি বিভিন্ন নাট্যক্রিয়া সার্থকভাবে সাধিত হলে নাটক রসোত্তীর্ণ হবে। এবং তখন মানবমন এক গভীর অলৌকিক আনন্দে উদ্বোধিত হবে। তাই অতি করুণ চরিত্রের অভিনয়ে দর্শকের চোখ অশ্রুসিক্ত হলেও তার চরম অনুভূতি পরম আনন্দের। যেহেতু 'বিশ্বচরাচর আনন্দ থেকে উদ্ভুত',—এই কথাই ভারতীয় দর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত, অতএব প্রাচীন ভারতের নাট্যশিল্পে ট্র্যাজিডি বা করুণ রসাত্মক নাট্যরচনা কখনো মুখ্য হয়ে উঠেনি।

নাটকের প্রকরণে পূর্ণাঙ্গ নাটক পাঁচ থেকে দশ অংকে বিভক্ত। নায়ক হবেন নানা গুণের আধার। মূলত তাঁর চরিত্রের সামগ্রিকতা সাধনের জন্য খল, বয়স্য, নায়িকা, প্রতিনায়ক, পার্শ্বচর ও অন্যান্য গৌণচরিত্রসমূহ গৃহীত হত। অভিনয়ের জন্য রঙ্গভূমি সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হত।

তাতে থাকত নেপথ্যগৃহ, যবনিকা, রংগপীঠ এবং দর্শকদের জন্য স্থান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন সূত্রধার। শাস্ত্রজ্ঞ, মানব চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, যন্ত্রসংগীতে নিপুন ব্যক্তিই কেবল এই সূত্রধার হবার উপযুক্ত হতেন। বিদূষক, সাধারণ নট এবং অন্যান্য কারুশিল্পীরা তাঁর অধীনে পরিচালিত হতেন। নাট্যাভিনয়ের আরম্ভে সূত্রধার নান্দীপাঠ করতেন। দেব, দ্বিজ,

মৃচ্ছকটিক (শূদ্রক রচিত) দশাংক নাটক।

অভিজ্ঞানশকুন্তল (কালিদাস রচিত) সপ্তাংক নাটক।

বিক্রমোর্বশী (কালিদাস রচিত) পঞ্চাংক নাটক।

নৃপতির স্তুতি, রচয়িতা ও নটকুলের প্রতি আশীর্বাণী উচ্চারিত হত এই নান্দীপাঠে। নাট্যারম্ভের পূর্বে নটনটী এসে নাটকের বিষয়বস্তু বলে যাচ্ছে— এরূপ রীতিও আছে।

প্রাচীন নাট্যে দৃশ্যপটের কোন স্থান ছিল না। উপস্থাপিত চরিত্রগুলোকে দর্শকের বোধগম্য করবার উদ্দেশ্যে নটনটীদের নানারূপ সাজসজ্জার জন্য অঙ্গরচনার প্রয়োগ ছিল। অভিনয়ের এই পর্য্যায়ের নাম আহার্য্য অভিনয়। সংলাপের স্পষ্ট উচ্চারণকে বলা হয় বাচিক অভিনয়। এই অভিনয়ে চরিত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী গদ্য ও পদ্য এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষা ব্যবহৃত হত। হৃদয়াবেগের স্বতোস্ফূর্তির জন্য নানারূপ বিধিবদ্ধ অংগভংগীর প্রয়োগ হত। এই পর্যায়ের অভিনয়ের নাম আঙ্গিক অভিনয়। অভিনেয় চরিত্রের মূল তাৎপর্যটিকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করার পর অভিনেতা যখন সার্থকভাবে আপন উপলব্ধিকে দর্শকমনে সঞ্চারিত করেন তখন সেই অভিনয়কে—সাত্ত্বিক অভিনয় বলা হয়।

ক্রমপরিণতি

বৈদিক যুগের শেষভাগ থেকে (খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতক) ভারতীয় নাট্যকলা একটি সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছিল বলে অনুমিত হয়। বৌদ্ধযুগে নাট্যকলার চর্চা অব্যাহত ছিল। গুপ্তযুগে কালিদাস (৫ম খৃষ্টাব্দ) ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের অবিস্মরণীয় স্রষ্টা। মধ্যযুগে মোগল আমলে নানা ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে নাট্যকলার বিকাশ ব্যাহত হয়। পরবর্তী বৃটিশ আমলে ভারতীয় নাট্যকলার পুনর্বিকাশ ঘটে। কিন্তু ততদিনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ভারতের নাট্যশিল্পকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নানা পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে রচিত যাত্রা বা অনুরূপ লোকনাট্যের অভিনয় ভারতের জনসমাজের একটি অনিবার্য আকর্ষণ ছিল। নগরসৃষ্টি ও নাগরিক পরিবেশে পাশ্চাত্ত্য নাট্যপ্রকল্পের অনুকরণে থিয়েটারের প্রবর্তন যেদিন থেকে হল সেদিন থেকে লোকনাট্য তার পূর্ব প্রতিষ্ঠা ও আভিজাত্য হারাতে আরম্ভ করল। আসরের স্থান নিল ষ্টেজ। পুরাণ কাহিনীর স্থান নিল সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস। আলো, মঞ্চস্থাপত্য ও অভিনয়-কলায় নানা যান্ত্রিক কৌশলের প্রাধান্য ভারতীয় নাট্যশিল্পে একটি মৌলিক পরিবর্তন এনে দিল। আধুনিক সিনেমা-শিল্প এই বিচিত্র ও বহুমুখী পরিবর্তনের আশ্চর্য সমন্বয়।

এ যুগের সমাজ : এ যুগের সংস্কৃতি

ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির শৈশব ও কৈশোর যে সমাজের আশ্রয়ে ও আগ্রহে পরিবর্ধিত সে সমাজ মূলতঃ সামন্তশাসিত। সেকালে ধনপতিদের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে শিল্পকলা, বিশেষতঃ সংগীত-নৃত্য কোথাও কোথাও আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলেছিল। এবং লোকসমাজের সংগীত-নৃত্য থেকে শাস্ত্রীয় সংগীত-নৃত্যের ব্যবধান অধিকতর হ'ল। ভাবতে মুসলমান শাসনে কখনো কখনো সংগীত, নৃত্য ও চারুকলার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে শাসকের ধর্মান্ধ সংস্কারের বিরোধিতায়। আবার এ যুগেই সংগীত-নাটক বিপুল পৃষ্ঠপোষকতা ও উদাব অনুগ্রহ লাভ করেছে। রাজকীয় মর্য্যাদায় ভূষিত হয়েছেন গুণী শিল্পী।

ব্রিটিশ শাসন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যে সেতুবন্ধনের সুযোগ করে দিল তার অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য পরিণতি লক্ষণীয়। নূতন নগর পত্তন ও তার ফলে নগরসংস্কৃতি একদিকে যেমন স্বদেশীয় ধর্মবোধ, লোকাচার, শিক্ষা ও শিল্পের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হলো না, অন্যদিকে বিজাতীয় রুচি, আচাবের ব্যর্থ অনুকরণের ফলে একটি কৃত্রিম সংস্কৃতির সৃষ্টি হল। সংগীত-নৃত্য-নাট্যের বিভিন্ন স্তরে এযুগের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা গেল।

তথাপি সংস্কৃতির নবনির্মানে এযুগের অবদানও অবহেলনীয় নয়। নাটকের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য থিযেটার এযুগেরই সৃষ্টি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গ্রামোফোন, রেডিও, সিনেমা প্রভৃতি সংগীত-নৃত্য-নাটের পরিধিকে সুদূর-প্রসারী কবে দিয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা অনুসৃত হলেও বহু সমস্যা ও বহুতর জটিলতায় সে কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির, এযুগে নিম্নোক্ত সাংস্কৃতিক সাফল্য ও উদ্যোগসমূহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রাচীন যুগে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের কয়েকজন মহৎ স্রষ্টা :

অশ্বঘোষ—('শারিপুত্র প্রকরণ' এর রচয়িতা)

ভাস—('স্বপ্নবাসবদত্তা' এর রচয়িতা)

বাণভট্ট—(হর্ষচরিত' এর রচয়িতা)

কালিদাস—('অভিজ্ঞান শকুন্তলা', 'বিক্রমোর্বশী', মালবিকাগ্নিমিত্র' এর রচয়িতা)

শূদ্রক—('মৃচ্ছকটিক' এর রচয়িতা)

(ক) কেন্দ্রীয় 'ললিতকলা একাডেমি'র প্রতিষ্ঠা। গুণী শিল্পীর প্রতিভাকে জাতীয় সম্মান দান ও ললিতকলার উন্নতি বিষয়ে গবেষণামূলক কার্য্যাদি পরিচালনা এই একাডেমির একটি বিশেষ দায়িত্ব।

(খ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সংগীত, নৃত্য ও নাট্যের মর্যাদা ও সমাদর লাভ। এস, এস শুভলক্ষ্মী (কণ্ঠ সংগীত), পণ্ডিত রবিশংকর, আলি আকবর খাঁ (যন্ত্রসংগীত), উদয়শংকর, অমলাশংকর (নৃত্য), শিশির কুমার ভাদুড়ী (থিয়েটার), ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ (সরোদ) পথের পাঁচালী বিভূতি ভুষনের কাহিনীর চলচ্চিত্র), পি. সি. সরকার (যাদুবিদ্যা)—প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পী ও শিল্পসৃষ্টি ইংলণ্ড, আমেরিক , রাশিয়া, জার্মানী ইত্যাদি পাশ্চাত্ত্য দেশে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে।

(গ) সংগীত-নৃত্য-নাট্যকে সর্বোচ্চ শিক্ষার বিষয়রূপে স্বীকৃতি দান ও এই উদ্দেশ্যে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(খ) অনাদৃত ও অবহেলিক বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতি, লোকনাট্য ও লোক-নৃত্যের পুনর্গঠন ও যথাযথ মর্যাদা দানের প্রচেষ্টা।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সংস্কৃতি সচেতনতা। ভারতের জনসমাজ যে বিপুল ঐতিহ্যের অধিকারী, যে আবহমান আনন্দধারায় ভারতের জনচিত্ত অভিষিক্ত তার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই বর্তমান সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গোড়ার কথা।

শ্রীহর্ষ—(প্রিয়দর্শিকা', 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ' এর রচয়িতা)

বিশাখদত্ত –(মুদ্রারাক্ষস' এর রচয়িতা)

ভবভূতি—('উত্তররামচরিত', 'মালতী মাধব' এর রচয়িতা)

বর্তমান ভারত

বর্তমান রূপ ঃ বর্তমানের ভারত—বহুবিধ সমস্যা জর্জরিত ভারত। যে ভারতীয় সভ্যতার বেদীমূলে একদিন জগৎ শুনেছিল সাম্যমৈত্রীর বন্দনা গীতি ; যার মনোরম তপোবন মুখরিত হত একদিন বৈদিক ঋষিকুলের সামগানে ; যার সভ্যতা ও সংস্কৃতি সারা বিশ্বকে করেছিল একদিন মোহিত—এ কি সেই ভারত ? একি সেই মহান দেশ ? আজ এ কী তার ভীষণ রূপ—চারিদিকে শুধু স্বার্থ, হিংসা আর ধ্বংস। ভারতমাতা কি ছিলেন—আর আজ কি হয়েছেন। বারবার বিদেশীয়ের ও বিজাতীয়ের বর্বরোচিত আক্রমণ যার অস্থি-মজ্জা-মেদ পুড়ে ছাই করেও নিঃশেষ করতে পারে নি—এ কি সেই বিরাট ভারতবর্ষ ?

কালচক্রের আবর্তনে সভ্যতার ইতিহাস আজ এক বিচিত্র যুগে এসে পৌঁছেছে ! এ যুগের মানুষ সাধারণ ভৌগোলিক সীমাকে করেছে উত্তরণ। জ্ঞান-বিজ্ঞান আর যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতিতে গ্রহ-গ্রহান্তরের গোপন রহস্য ও আমাদের করতলগত হতে চলেছে। সুদূর আকাশের যে চাঁদকে খোকার কপালে এসে টিপ দেওয়ার জন্য মা নানাভাবে আকুতি জানাতেন, সে খোকাই বড় হয়ে আজ চাঁদের কপালে টিপ পরিয়ে দিয়ে আসছে। বহির্বিশ্বের এ প্রভাব ধর্মপ্রাণ ভারত-সত্তাকেও নাড়া দিয়েছে প্রবলভাবে। ফলে বহুদিনের পরাধীন ভারতবাসী অন্ধ অনুকরণে গা ভাসিয়ে পৌঁছেছে এক বিনাশের পর্যায়ে। অন্ধভাবে পরানুকরণ, পরানুবাদ ও পরমুখাপেক্ষিতার অনুশীলনে সে নিজের সত্তাকে হারিয়ে আজ এক কিম্ভূতকিমাকার হয়ে উঠেছে সে আজ স্থৈর্যহীন, ধৈর্যহীন, হতাশ, আক্রোশদুষ্ট ও প্রেমহীন। বর্তমানের ভারত অতীতকে চায় সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে, প্রাচীন ঐতিহ্যকে বর্তমানের বেদীমূলে বলি দিয়ে রাতারাতি একটা নূতন কিছু সৃষ্টি করতে। আপাতমধুর বৈদেশিক প্রভাবদুষ্ট ভারত আজ সনাতন তপোবনাশ্রিত নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাঠামোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে অর্থকরীবিদ্যা আর আত্মসর্বস্বতা নিয়ে থাকতে সদা উন্মুখ। যে ভারত একদিন জগতে গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল ; আজ সে স্বেচ্ছায় অন্যকে সে গৌরবের অধিকারী করে চায় অন্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার নিজস্ব

অশন-বসন, ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য-বিজ্ঞান, রীতি-নীতি সব কিছুকে সযত্নে প্রত্যাখ্যান করে চলতে।

মূল্যায়ণ ঃ জাতীয় মানসের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কত বড় এবং সে জাতি ও সমাজে এর প্রভাব কতদূর বিস্তৃত তার পরিমাপ হয়ে থাকে। কোন একটি জাতির অধ্যাত্ম ও বাস্তবজীবনে সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ যত ভাস্বর, তাদের সংস্কৃতিও তত প্রকাশমান এবং প্রভাময়। জাতীয় মানসের প্রাঞ্জলতা ও প্রাচুর্য, মানসিক সুরুচিজ্ঞান ও শালীনতাবোধের দ্বারাই কোন সংস্কৃতির মূল্যায়ণ হয়,—তা-ই জগৎ সমক্ষে সে সংস্কৃতির পরিচয়পত্র। এ'র ভিত্তিমূল সর্বত্র কিন্তু এক নয়। স্মরণাতীত কাল হতে ভারতীয় সংস্কৃতিধারার যে স্রোতটি নিত্য প্রবহমান, তার মূলে রয়েছে ধর্ম। "ভারতের অণুতে পরমাণুতে রয়েছে ধর্ম"—বলেছেন স্বামীজী। ধর্মসর্বস্ব ভারতীয়দের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কাজ ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বর্তমান যুগে ও প্রাক্-জন্ম সামাজিক সংস্কার থেকে মৃত্যুর পরের অন্ত্যেষ্টি এবং পারলৌকিকক্রিয়া পর্যন্ত ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমানকালের লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য-পীড়িত ভারত-মানস পূর্বসূরী সত্যসন্ধানী ঋষিবর্গের চিরাচরিত কল্যাণপথ হতে একটু সরে এসে বিঘ্নসঙ্কুল পথে আজ অগ্রসর হ'লেও ভারতের সনাতন স্রোতটি ফল্গুধারার মত তার অন্তরে নিত্য প্রবহমান,—কিছুতেই পারেনি তাকে এড়িয়ে যেতে। আধুনিকযুগের এ সন্ধিক্ষণেও সে সনাতন ধারাটিই তার সংস্কৃতিকে নানাভাবে পরিপুষ্ট করছে। তাইতো জাতীয় জীবনের যেকোন আনন্দোৎসব আমাদের মন্দির, মসজিদ বা গীর্জাকে বাদ দিয়ে হয় না। এমনকি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় উৎসবাদিতেও গেয়ে থাকি ভারতমাতার বন্দনাগীতি!

মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে বুদ্ধির (Intelligence) বিকাশ যে হারে ঘটেছে, সে হারে ঘটেনি বোধির (Intuition) বিকাশ। বোধি ও বুদ্ধির অসাম্যতার ফলে বর্তমানের ভারত উপলব্ধি করতে পারছে না তার অতীতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যকে। অতীতের মূল্যবোধে আজ সে আস্থা হারিয়েছে অথচ নূতন করে মূল্যবোধের ধারণা পারছে না গড়ে তুলতে। মুখে সাম্যের কথা বেশ বলে চলেছে, উচ্চারিত হচ্ছে সংঘশক্তির বন্দনা গীতি—কিন্তু মানুষে মানুষে যে সহজ সম্পর্কটি চিরন্তনীবৃত্তিজাত তাকে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতাও আমাদের নেই। বিশ্বের সর্বত্র আজ যে সাম্যবাদ প্রচারিত হচ্ছে;

ইহা কিন্তু ভারত সংস্কৃতির এইটি বিশেষ ধর্ম। পরমতসহিষ্ণুতায় অমৃতের সন্তান ভারতীয়গণ চিরাভ্যস্ত। আর ফলে বিভিন্নকালে উদ্ভূত বিভিন্ন মতবাদকে তাঁরা সহজেই নিজের মত করে নিতে পেরেছে। "মন, হৃদয় ও প্রার্থনা আমাদের সমান হোক", "আমরা কেহ যেন কাউকে বিদ্বেষ না করি"—বৈদিক ঋষিদের এ প্রার্থনার ফলশ্রুতি যেন দেখতে পাই বর্তমানের বিশ্বমৈত্রীর মতবাদে। প্রাচীন ভারতের এসব সনাতন আদর্শনিচয় আজ নানাভাবে বিকৃত হয়ে আমাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। পরমতসহিষ্ণুতা রূপ নিয়েছে আজ ক্লীবতায় ও সার্বজনীনতা আজ এসেছে আত্মসর্বস্বতার রূপ নিয়ে; অল্পেতুষ্টতা পথভ্রষ্ট হয়ে এনেছে জীবনে বিক্ষুব্ধতা আর ধর্মকেন্দ্রিকতার সুযোগ নিয়ে সমাজে এসেছে আচার সর্বস্বতা। তাই কিছুসংখ্যক ধর্মধ্বজীর অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সমাজে দেখা দিয়েছে আজ ধর্ম-বিরোধী একটা মনোভাব।

ভারত চিরকালই অমৃতের পূজারী। ইহ জগতের সুখ, স্বার্থ ও ঐশ্বর্যকে ছোট করে দেখাই তার স্বভাব।

ছোট ছেলে নাচিকেতা পিতার আদেশ অনুসারে ধর্মরাজ যমের নিকট গিয়াছে। যমরাজ নচিকেতার শ্রদ্ধা ও কর্মে নিষ্ঠা দেখে তিনটি বর দিতে চাইলেন। প্রথম বরে পিতার কুশল, দ্বিতীয় বরে অগ্নিতত্ত্ব প্রার্থনা করে তৃতীয় বরে আত্মতত্ত্ব জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করলো নচিকেতা। কথাশুনে যমরাজ বেশ চিন্তিত হলেন এবং দুরূহ আত্মতত্ত্ব বলার আগে, নচিকেতা উপযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য তাকে হাতী, ঘোড়া ধনরত্ন, রাজত্ব প্রভৃতি অনেককিছু দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চাইলেন। স্থির বুদ্ধি নচিকেতা কিন্তু এসব জাগতিক প্রিয় বস্তুর প্রতি মোটেই লোভ করল না। সব কিছুর মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ পাওয়া আত্মজ্ঞান তা'ই সে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করে বলেছিল "শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তিঃ ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃনীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।।" (কঠঃ) [শ্রেয়ঃ ও প্রিয় একসাথে মানুষের কাছে আসে, বুদ্ধিমান পুরুষ উভয়কে ভালভাবে আলোচনা করে পৃথক করে থাকেন। যিনি ধীমান তিনি অবশ্যই প্রিয়ছেড়ে শ্রেয়ঃকে বরণ করেন আর যিনি অল্পবুদ্ধিশীল তিনিই শরীরাদির পুষ্টি ও রক্ষার জন্য প্রিয়কে বরণ করেন।] নচিকেতার মত শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য স্বামীজী বারবার আহ্বান জানিয়েছেন এদেশবাসীকে। শ্রদ্ধার অভাবেই কোন কাজে

আজ নিষ্ঠা আসছে না আর তারই ফলে পদে পদে লাভ হচ্ছে ব্যর্থতার গ্লানি। ধীরে ধীরে আত্মবিস্মৃতির যবনিকা প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্যকে আমাদের কাছে আড়াল করে চলেছে। অন্যান্যদেশে ধন-মানের জন্য প্রভুত্ব-অর্জনের আশায় হানাহানি কাড়াকাড়ি করতে সমাজ উৎসাহ দেয়; ভারতে কিন্তু কোন লোক সমাজ এবং সংসার ছেড়ে ভগবানের জন্য সর্বস্বত্যাগ করলে এখনও সমাজ তাকে উৎসাহিত করে, প্রাণভরে করে আশীর্বাদ। কারণ যা দিয়ে অমৃতত্ব (অমরত্ব) লাভ হয় না তার প্রতি যে ভারতাত্মা সদা নিস্পৃহ—"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্" (বৃঃ উপ.)। যা দিয়ে অমৃতত্ব লাভ হয়না তা' দিয়ে আমি কি করব,—বলেছিলেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিদুষীপত্নী মৈত্রেয়ী। ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী,—মৈত্রেয়ী আর কাত্যায়নী। একদিন ঋষি দুই স্ত্রী আর শিষ্যদেরে ডেকে বললেন যে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের সময় হয়েছে। তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি ও গোধন মৈত্রেয়ী আর কাত্যায়ণীকে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে চান যেন তাদের কোন কষ্ট না হয়। পরমা বিদুষী মৈত্রেয়ী এতক্ষণ চুপ করে বসে সব শুনছিলেন। ঋষির কথা শেষ হ'লে তিনি ধীর কণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব ধনরত্ন দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় কিনা। ঋষির উত্তর এল, না মৈত্রেয়ী, তা সম্ভব নয়। এবার মৈত্রেয়ী সুদৃঢ় কণ্ঠে বললেন, যা' দিয়ে অমৃতত্ব লাভ হয় হয় না' দিয়ে আমি কি করব ?

> শুনিয়া প্রসন্নমন মহা জ্যোতিষ্মান
> পত্নীরে শুনান সেই দুর্জ্ঞেয় ব্যাখ্যান,
> কহেন পরম জ্ঞান আত্মার স্বরূপ
> সেই সর্ব ভেদাতীত অদ্ভুত অরূপ।"

তাই বলতে হয়, একদিন যে জাতির লক্ষ্য ছিল ধ্যানগম্ভীর তপোবনের কুটির প্রাঙ্গণে, ব্রহ্মপরায়ণ তপস্বীর স্তিমিত ধ্যানাসনে আর ধর্মপরায়ন আর্য-গৃহস্থের কর্মমুখর যজ্ঞশালায়; কাল বিবর্তনে আর বিভিন্ন জাতির প্রভাবে তার স্থান আজ কোথায়? তবুও ভালভাবে বিচার করলে দেখা যায় বৈদেশিক আপাতমধুর চাকচিক্যময় আচার আচরণ নবীন ভারতকে প্রভাবিত করলেও সকলকে আকর্ষণ করতে পারেনি। সার্বজনীন পূজার ঘটা আর মন্দির চত্বরের ভীড় দেখলেই বুঝা যায় এখনও ধর্মকে অবলম্বন করেই এ জাতি বেঁচে আছে।

সকল জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এক নহে। পাশ্চাত্ত্য যেমন কর্মকে সর্বোচ্চে

স্থান দিয়ে মানুষকে কর্মের এক একটা যন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছে, ভারত কিন্তু তা করতে পারে নি। কর্মের মূল সুরটি বেঁধেছে সে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনে। "কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে।" তাইতো ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে কর্ম করার নির্দেশ দিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার প্রিয় সখা ও অনুগত শিষ্য অর্জুনকে। ভারত কর্মের মধ্য দিয়ে নিজের মুক্তি ও জগতের হিতসাধনকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করাকেই কর্মের কৌশল মনে করে। "আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়চ", নিজের মোক্ষলাভ এবং জগতের হিতসাধনকে মূলসূত্র করেই যুগস্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণমিশন স্থাপন করেন। এখনও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীমণ্ডলী সেই আদর্শকে সম্মুখে রেখেই জগৎ কল্যাণে কাজ করে চলেছেন। বিদেশীয় আত্মকেন্দ্রিক -মনোভাব ও ইহসর্বস্বতার সংঘাতে ভারতের সে প্রাচীন বৈশিষ্ট্য অহরহঃ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়তই আমাদের নিষ্ঠা হচ্ছে বিচলিত, চরিত্র হচ্ছে ভগ্নবিকীর্ণ, চিত্ত হচ্ছে বিক্ষিপ্ত আর চেষ্টা হচ্ছে ব্যর্থ। প্রাচীন ভারতের কর্মপদ্ধতিতে সর্বদা বিরাজ করত একটা দৃঢ়তা, সহজ সরলতা আর ধৈর্য, স্থৈর্য ও প্রশান্তি। ত'তে আমাদের আড়ম্বরের দীনতা থাকতে পারে কিন্তু ছিল না শক্তির অপব্যয়। আত্মপ্রচারের অনিচ্ছা ছিল বলেই সুপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস এখনও রহস্যাবৃত। মনের এ শক্তির জোরেই প্রাচীন ভারতের কর্মে দৈন্য ছিল না। রাজর্ষি জনকও লাঙ্গল চালাতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না, শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানী ধর্মব্যাধকেও দেখি অবিচলিত চিত্তে মাংস বিক্রয় করতে। সে চারিত্রিক দৃঢ়তার শক্তিতেই তেতুঁল পাতার ঝোল খেয়ে গুরুমহাশয় শিক্ষা দিতেন দর্শনের দুরূহতত্ত্ব, সৈনিক-সেপাই অকাতরে চানাচিবিয়ে যেত যুদ্ধক্ষেত্রে, অনাহার ক্লিষ্ট কৃষকও গান গেয়ে গেয়ে ফলাত সোনার ফসল। আচার রক্ষার সমস্ত অসুবিধা, ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণ ত্যাগ, আর সমাজ রক্ষা করতে গিয়ে চূড়ান্ত দুঃখও হাসি মুখে সহ্য করে ভারতবাসী সে শক্তি বলেই। সনাতন ভারতের সে দুর্লঙ্ঘ্য শক্তি ভারত মানসে এখনও নিত্য বর্তমান। সনাতন ভারত দারিদ্র্যের দ্বারা যে সুদৃঢ় মনোবল সঞ্চয় করেছে, মৌনতা দ্বারা যে স্তম্ভিত আবেগ ধারণ করে আছে, নিষ্ঠা দ্বারা যে পরম শক্তির অধিকারী হয়ে আছে, বৈরাগ্যের দ্বারা অর্জিত যে উদার গাম্ভীর্য বহন করে চলেছে; তা পাশ্চাত্ত্যশিক্ষায় শিক্ষা চঞ্চল আর নাগরিক সভ্যতার বাহক কিছুসংখ্যক লোকের বিলাস, অবিশ্বাস, অনুকরণ আর অনাচার তাকে একেবারে লুপ্ত করে দিতে সক্ষম হয় নি। শহর বা নগরের উপর তার

প্রভাব প্রচুর হলেও পল্লীময় বৃহৎ ভারতের উপর সে চাকচিক্য জলবুদ্বুদের মতই নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। সুদৃঢ় সংযম ও বিশ্বাস ভারতের আত্মসমাহিত শক্তিকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় অধিক দৃঢ়তাই দান করেছে। বহু শতাব্দীর সঞ্চিত সে দৈবশক্তিই ভবিষ্যৎ ভারতকেও রক্ষা করবে। কালে কালে বিদেশীয় ও বিজাতীয়ের প্রবল আক্রমণ ভারতাত্মার সনাতন শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-অনুষ্ঠান—সবকিছুকে ধ্বংস করে দিতে চাইলেও এ জাতি মরবে না। জলন্ত শ্মশান পাশে শব নিয়ে সাধনে যে অভ্যস্ত বিভীষিকার কাছে সে আত্মসমর্পন করবে কেন ?

ধর্মের নির্মল আলোকে সদা আলোকিত ও নিত্যজাগ্রত ভারতমানস কখনও দৈহিক বলের কাছে মাথা নত করে নি। বিদেশীরা রাজ্য জয় করেও এদেশের জনমনকে সহজে জয় করতে সক্ষম হয় নি। কলিঙ্গ বিজেতা অশোককে ভারত-মানস সম্মান দেয় না, কিন্তু ধর্মপ্রচারক ধর্মাশোককে অতি উচ্চস্থান দিতে সে গর্ববোধ করে। বর্তমানের নব জাগরণের যুগেও ভারত কোন রাজনৈতিকের নির্দেশানুযায়ী দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠান করে না। মুখে যে যাই বলুক, সামাজিক ব্যবহারে যজ্ঞবল্ক্য বা মনুর বিধানকেই মেনে চলে, সংসারীর আদর্শ হিসাবে জনকই স্থান পায় আবার ধর্মীয়ানুষ্ঠানে বুদ্ধ, শংকর, রামানুজ, নানক, কবীর, দাদুই সম্মান পেয়ে থাকে, আর জাতির চলার পথে রামমোহন বিবেকানন্দই ভারতের পথ প্রদর্শক।

বর্তমান সংকট ঃ—প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত সমুজ্জল ও তেজোদ্দীপ্ত সুপ্রাচীন ভারত-সংস্কৃতি দীর্ঘসময় অতিবাহনের ফলে রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার ও নানাবিধ যুক্তিহীন বিধিনিষেধের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নানাপ্রকার সংঘর্ষের সম্মুখে এসে আজ উপস্থিত। সম্প্রতি ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে দেখা দিয়েছে এক ভীষণ সংকট। এ সংকট কিন্তু দু' এক, দিনে আসে নি। চোরাবালি আর পলিমাটি কোন জলধারাকে ক্ষীণ করে দিলে সে যেমন নূতন খাতে প্রবাহিত হয়ে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়, তেমনি বহু বছরের পুরাণো ভারত-সংস্কৃতি রুচির বৈচিত্র্য অনুসারে সৃষ্ট বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা আপন গতি হারিয়ে ফেলার উপক্রম হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আগত পাশ্চাত্য, সংস্কৃতির ধারায় ভারত নিজ সংস্কৃতিকে মিশিয়ে দিতে চাইল। মুসলমান যুগ থেকে শুরু করে বহু বছরের পরাধীনতার ফলে ভারত-

রাজা রামমোহন রায়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

বিদ্যাসাগর

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীঅরবিন্দ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
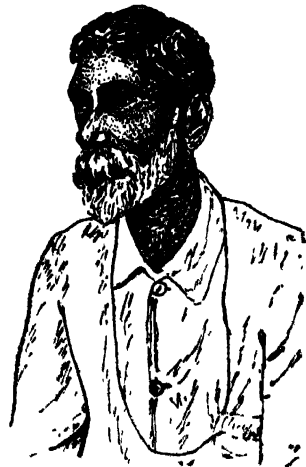
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সংস্কৃতির ধারা যখন ক্ষীণ, পাশ্চাত্য, প্রযুক্তি বিদ্যা আর বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে তখন জগৎকে মুগ্ধ করছে। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে আদান প্রদানের যে সূত্রপাত হয়েছিল ইংরেজদের এদেশে আসার ফলে তা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেল। ফলে যে সংঘর্ষ দেখা দিল তা'ই আজ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বিষয়টি আরও সুন্দর ভাবে বুঝা যাবে :—

"এটি অতি অভিনব ব্যাপার—ইংলণ্ডের ভারত বিজয়। এ নূতন মহাশক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে এবং তাহার পরিণামে ভারতে কি পরিবর্তন প্রসারিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গতকাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।" (বর্তমান ভারত)। স্বামীজীর চিন্তাই আজ ফলবতী হতে চলেছে। উপরন্তু, পৃথিবীতে বিভিন্ন মতবাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে এ যুগে। চিরকালের শান্তিপ্রিয় ভারতমানসও কোন্‌নীতি অবলম্বন করে প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাবে—তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাহিরের এবং ভিতরের নানাবিধ সংঘর্ষে ভারতের নিদ্রা ভাঙ্গলেও হঠাৎ ঘুমভাঙ্গা শিশুর মত সে ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আর মেতে উঠেছে আজ এক ধ্বংস লীলায়। হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই ছুড়ে ফেলে দিয়ে ভেঙ্গে চুরে তছনছ করতে চাইছে, কি করবে ঠিক করতে না পেরে। কোথায় তার শেষ, কি তার পরিনতি, ভাববারও আজ আর অবসর নেই তার। উনবিংশ শতাব্দীতেও এমন একটা মানসিক বিপ্লবের ইতিহাস আমরা দেখতে পাই। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-কলেজ স্থাপিত হয়। সেখানে অধ্যয়ন রত ছাত্রগণ হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য একটি দল গঠন করে তার নাম দিলেন "ইয়ংবেঙ্গল।" তাদের প্রধান কাজ ছিল প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়িয়ে মদ আর গোমাংস খেয়ে "হিন্দুধর্ম ধ্বংস হোক", "গোঁড়ামি ধ্বংস হোক" আওয়াজ তোলা, আর ভারতীয় সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করার জন্য বিভিন্ন আলোচনা সভা করা। যার সুদূর প্রসারী ফল হল, মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি সেরা-সেরা ছেলেদের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ। এরূপ বিচারহীন আতিশয্যের ঢেউ কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় না। যাঁরা ক্ষণিকের উত্তেজনার বশে আর আপাতমধুর চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন, কেউ কেউ আবার প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু সমাজে ফিরেও এসেছিলেন।

'ইয়ং বেঙ্গল'দের তৎপরতা আর তাদের মুখপত্র 'এনকোয়ারার' এর প্রচারকার্য জোর চলতে থাকলে সমসাময়িক চিন্তাবিদ্‌গণ খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তাই ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য রামমোহন রায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাজের ভার নেন। ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হল সত্য; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দলাদলির ফলে দেবেন্দ্রনাথের "আদি ব্রাহ্মসমাজ" কেশবচন্দ্র সেনের "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" আর শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের" সৃষ্টি হল; বলতে গেলে কাজ খুব বেশী একটা হল না। ইয়ং বেঙ্গলের সামনে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তার যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমাধান হল অবশেষে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাবে। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মবিজয়কে ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন,—

"এ বিজয় দু'ভাবে কাজ করেছিল। একদিকে হিন্দু-সংস্কৃতিকে বহির্জগতে শ্রদ্ধার আসনে তা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অপর দিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সংঘাত-হেতু ধর্ম নিয়ে যে তুমুল আন্দোলন দেশবাসীর মনকে বিক্ষুব্ধ করেছিল তার মীমাংসা করে দিয়েছিল।" (সাধনা ও সংস্কৃতি)

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতের চাকচিক্য ভারত-সংস্কৃতিকে যেমন সংঘাতময় করে তুলেছিল, আজ বিংশশতাব্দীতেও বাহিরের প্রভাবই ভারত-মানসকে বিক্ষুব্ধ করছে বেশী। গত শতাব্দীর মত বর্তমানের যুবক-সম্প্রদায়ও প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশকে অনুকরণ করে চলতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। আত্মবিস্মৃত হয়ে সে আজ নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে নিজের প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে পরিবারের বা সমাজের অন্যান্যের কথা ভাববার ও অবসর পায় না। এই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবই হৃদয় ও মনকে ক্রমে সংকীর্ণ করে দিচ্ছে। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বপ্রকার নীতি বিগর্হিত কাজের অনুশীলনেও আজ বর্তমান সমাজের কিছুলোক পশ্চাৎপদ নয়। এ নৈতিক পতনের ফলে এসেছে সামাজিক দুর্নীতি, এনেছে সর্ববিষয়ে ঔদাসীন্য। সব কিছুর মধ্যেই আজ খুঁজে বেড়াচ্ছে সে আপাতমধুরতা আর করছে লাভ-ক্ষতির হিসাব। তারই ফলে শিক্ষা হয়ে উঠেছে আজ নিতান্তই অর্থকরী, সঙ্গে সঙ্গে মানুষও স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে হারিয়ে হয়ে উঠেছে যন্ত্র-প্রায়।

অনেকের মুখেই আজ প্রগতির কথা শোনা যায়। প্রাচীনকে অগ্রাহ্য করাই যেন আজ প্রগতিবাদের মূল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা চিরাচরিত তা ভালই হোক আর খারাপই হোক, তাকে ত্যাগ করে কিম্ভূত-কিমাকার হলেও একটা নূতনকেই গ্রহণ করতে হবে, তার নাম প্রগতিশীলতা নহে। ইহা আত্মপ্রতারণারই নামান্তর।

বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি। তারপক্ষে সবকাজ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে করাটাই স্বাভাবিক। বর্তমান ভারতমানসের এই বৈষম্যভাব বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি কারণ সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ ব্যক্তি ও নগরকেন্দ্রিকতা। ভারতমানস যেদিন আপাতমধুর চাকচিক্যময় নাগরিক সভ্যতায় মুগ্ধ হয়ে ছায়াস্নিবিড় পল্লীময় ভারতকে অস্বীকার করে নিজের সমাজ ছেড়ে দূরে সরে এসে স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছাচারে মন দিল, সেদিন থেকেই মনের শান্তিকে তার বিসর্জন দিতে হল। দেখা দিল একটা অসন্তোষ আর

দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে সবদিক দিয়ে বহির্মুখী করে তুলেছে। ভারতের স্বাভাবিক অন্তর্মুখীভাবের যে স্নিগ্ধতা তা চিরতরে হারিয়েছে বর্তমানের ভারত। তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক চেতনা ও ভারতের জনজীবনে এ সঙ্কট এনে দিয়েছে। কেউ চাচ্ছে ভারতের নিজস্ব রাষ্ট্রনীতির অনুসরণে একটা নূতনভাব আসুক, কেউ বা বিদেশের অনুকরণে তৎপর হয়ে উঠেছে। কোনটা গ্রাহ্য কোনটা ত্যাজ্য এরূপ দ্বন্দ্বের সময় একজন শক্তিশালীনেতার সবল নেতৃত্বই ঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে; কিন্তু দেশে সুযোগ্য নায়কের আজ একান্তই অভাব। যার ফলে রাজনৈতিক সঙ্কট দিন দিন বেড়েই চলেছে। চতুর্থতঃ বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার প্রাধান্য আরেক সংকটের সম্মুখীন করেছে ভারতকে। বিংশ শতাব্দীকে কারিগরী বিদ্যার যুগ (Age of Technology) বলা হয়ে থাকে। ভারত-মানসে এ ভাবধারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারেনি। বিদ্যালয়গুলিরদিকে লক্ষ্য করলেই তা বেশ ভালভাবে বুঝা যায়। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে যে কয়টি ধারা আছে বিদ্যার্থিগণ সবকিছুকে বাদ দিয়ে শুধু বিজ্ঞান আর কারিগরী শাখাতেই পড়তে উৎসুক। অভিভাবক বা শিক্ষাব্রতীগণও শিক্ষাপদ্ধতিতে একটা সাম্য বজায় রাখতে খুব একটা চেষ্টা করেননি। ফলে বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যায় শিক্ষিতের ভীড় বেড়েছে; কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও কারিগর কয়টি বেরিয়েছে তা

ভাববার বিষয়। অবশ্য এটা স্বতঃসিদ্ধ যে সংখ্যায় বাড়লে গুণের দিকে কমে যায়। অপরদিকে ভারতে শিল্পের অবস্থাও এমন হয়নি যে, যেখানে কারিগরের চাহিদা ক্রমে বেড়েই চলবে। মানুষের মনটা কিন্তু হয়ে উঠেছে শিল্পমুখী। ফলে দেখা দিয়েছে অসাম্যের সংকট। উপরন্তু পৃথিবীর অন্যান্য বহুশিল্পায়িত দেশগুলির প্রভাব আমাদের জীবন যাত্রায় প্রয়োজন দিয়েছে বাড়িয়ে। তাতে অর্থনৈতিক সংকট ও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

এসব সঙ্কটের মূল কারণ যে আত্মবিস্মৃতি ও কর্তব্যে অবহেলা তা অস্বীকার করার উপায় নাই। এই সঙ্কটই আজ প্রবল হয়ে অন্যান্য সব সমস্যাগুলিকে শক্তিশালী করে তুলেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মহর্ষি ব্যাসদেব কর্তব্যপালনের জয়গান করেছেন—"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

পরধর্মো ভয়াবহঃ।

মহাভারতেও তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়—

মহাভারতের ধর্মব্যাধ মহাজ্ঞানী। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেও তিনি মাংস বিক্রয় ত্যাগ করলেন না। তাঁর নিকট জ্ঞানলাভের জন্য আগত ঋষি যখন তাঁকে মাংস বিক্রয়ের কাজ ত্যাগ করতে বললেন তখন উত্তর-দিলেন ধর্মব্যাধ "মাংস বিক্রয় আমার জাতিগত স্বধর্ম, তা ত্যাগ করলে যে আমি ধর্ম ত্যাগের পাপে লিপ্ত হব।" শুধু তাই কেন আরেকটি উপাখ্যানে আছে পতিসেবাই পতিব্রতার স্বধর্ম। তা'দ্বারাও তিনি আত্মজ্ঞানের অধিকারিণী হতে পারেন। এক পতিব্রতা পরিশ্রান্ত পতিসেবায় রত আছেন। এমন সময় এক মুনি এসে তার আতিথেয়তা প্রার্থনা করলেন। পতিব্রতা নারী পতিসেবায় রত থাকায় মুনিকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। তাতে মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দিতে উদ্ধত হলে পতিব্রতা স্মিতহাস্যে বললেন, "এ তোমার কাক বক ভস্ম করা নয়।" ঋষিতো শুনে অবাক্। এই ঋষি এখানে আসার পথে গভীর বনে তাঁর তপোবলের দ্বারা একটি পাখীকে ভস্ম করে এসেছিলেন। "সেখানে তো কোন লোক ছিল না, তবে এই পতিব্রতা জানলেন কেমন করে,"—ঋষি ভাবছিলেন এ কথা।

পতিব্রতা তার সব কাজ শেষ করে পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে ঋষিকে অভ্যর্থনা করতে এলে ঋষি গভীর বনে যা ঘটেছে তার সংবাদ কিভাবে তিনি জানলেন, তা জিজ্ঞেস করলেন। সাধ্বী পতিব্রতা ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "পতিকে আমি দেবতার মত সেবা করি এবং তা দ্বারাই আমার সবকিছু জানা হয়

অন্ত কিছু জানি না।" প্রাচীনকালের বিদ্যার্থীগণ গুরু-গৃহে এসে গুরুসেবায় নিরত থাকতেন। গুরু সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করলেই তাদের সকল বিদ্যা অধিগত হত। এসকল আখ্যান উপাখ্যানে স্বধর্ম পালন সেকালে কত নিষ্ঠাভরে করা হত তারই উদাহরণ পাই।

আর ভারত আজ স্বধর্ম পালনে সদা কুণ্ঠিত। কৃষক নিষ্ঠাভরে পালন করছেন না কৃষকের ধর্ম, শ্রমিক তার শ্রমিকের ধর্মত্যাগ করতে পারলেই যেন ভাল হয়, এই ভাব। আজ শিক্ষক শিক্ষকের ধর্ম, ছাত্র ছাত্রের ধর্মই বা কোথায় ঠিকভাবে পালন করছেন। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি আজ নিজ নিজ ধর্ম থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছে বলেই আজ ভারতকে নানা সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক বিশেষ প্রণিধানযোগ্য,—

"স্বধর্মকর্মবিমুখঃ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি বাদিনো।
তে হরেদ্বেষিণে. মূঢ়াঃ · ·"

নিজ ধর্মকর্মে বিমুখ হয়ে যাঁরা মুখে শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন, সে সব মূর্খ ও ভগবানের শত্রু বলে কথিত হয়। অন্যের কথা কি বলব? প্রায় সকলেই আজ কর্তব্য বিমুখ হয়ে কাল কাটাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। তারই বিস্তৃত ফল সর্বব্যাপী প্রবল সংকট। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যেমন সুষ্ঠুভাবে নিজের ধর্ম পালন করে চলেছে তেমনি প্রত্যেকটি মানুষ যদি স্বাভাবিক ধর্ম ও কর্ম পালনে শ্রদ্ধার সহিত মনোনিবেশ করে তবেই এ সঙ্কটের অবসান—আশা করা যায়।

বর্তমান-ভারত আজ নানা সংকটের সম্মুখীন হলেও ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্ব-মহিমান প্রকাশমান থাকবে। এ সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ সমুদয় মহত্ব, নীতি ও আধ্যাত্মিকতার স্রষ্টা। এ জাতি সমস্ত সংকটকে অতিক্রম করবেই। তা না হলে জগৎ থেকে যে আধ্যাত্মিকতা, চরিত্রের মহান আদর্শ, সমুদয় ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ভারত চিরকালই আত্মার শক্তিতে বিশ্বাসী। তাই রামমোহন, বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ স্রষ্টাগণও বেদ উপনিষদের ভিত্তিতে বলেছেন "আত্মানং বিদ্ধি"—(নিজেকে জান) এবং নিজের শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে নিষ্ঠাভরে স্বীয় কার্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হও,—এই আহ্বান করে গেছেন। নবভারতের স্রষ্টা সে সকল ভারত পথিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেই আমরা স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব সন্দেহ নাই। ভারতপথিক রামমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীর

মোহাবিষ্ট ভারতকে উদ্বোধিত করার জন্য পাশ্চাত্যের ভাবকে প্রাচ্যের রসে সিক্ত করে নিজেদের মত করে নিয়ে ভারতকে উপহার দিয়ে ছিলেন। বর্তমান ভারতের ও অপরের ভাব গ্রহণ করে নিজের ভাবে ভাবিত করে নিজস্ব করে নেওয়া প্রযোজন। ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে ভারতকে ভাবাই যায় না। আধ্যাত্মিকতা দ্বারা আত্মবলে বলীয়ান হয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বদেশপ্রেমিক বীরগণ হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে পারতেন। দেশের আপামর জনসাধারণের চিত্তে অনাবিল আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধক নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের জীবনও ছিল আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক। নেতাজী যেন "ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের" মূর্তবিগ্রহ। অগ্নিযুগের ঋষি অরবিন্দের জীবন ও দিব্যভাবের ঘনীভূত মূর্তি। তাঁর আশার বাণী বর্তমান ভারতকে প্রেরণা যোগায়—"ভারত যে এবার জাতীয় জীবন ও সনাতন ধর্ম স্থাপন করিবে তাহা নহে, সমস্ত পৃথিবীতে জাতীয় জীবনের রক্ষাকর্তা হইবে ও মহান্ ধর্ম দান করিবে।"

এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর আশ্বাস বাণী বর্তমান ভারতকে অনেকখানি উদ্বুদ্ধ করবে সন্দেহ নাই—"ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে, বিনাশের বিজয় পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিকবেশ সহায়ে, অর্থের শক্তিতে নয়, ·········· আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিত হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন। শান্তি ও আশীর্বাণীর সহিত তাঁহার নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।"

গ্রন্থ-পঞ্জী

১। ভারতীয় সংস্কৃতি—স্বামী অভেদানন্দ

২। বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা—উদ্বোধন প্রকাশিত

৩। ভারত-সংস্কৃতি—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪। সাধনা ও সংস্কৃতি—শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। শিক্ষা ও সাধনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬। The foundation of Indian Culture—Sri Aurobinda

৭। Essence of Indian Culture—Swami Ranganathananda

৮। Vidya Bhawan Publications

ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। আধুনিক বিশ্বের ধর্মীয় ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে ধর্মপ্রবক্তারা এসেছেন আমেরিকার চিকাগো মহানগরীতে নিজ নিজ ধর্মের ব্যাখ্যা এবং গৌরব ঘোষণা করবার উদ্দেশ্যে। সকলেই সুপণ্ডিত, সকলেই আমন্ত্রিত। শুধু একজন এসেছেন দূর অবহেলিত, পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে দৈব প্রেরণার উন্মাদনায় আর স্বদেশ-স্বজাতিব প্রতি গভীব প্রেম বুকে বহন করে। ইনিই তরুণ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর সহজ সরল প্রাণস্পর্শী বৈদ্যুতিক বক্তৃতায় সেদিন চিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত সহস্র সহস্র নরনারী উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ফেটে পড়েছিলেন। সমগ্র চিন্তাশীল পাশ্চাত্য শ্রোতৃমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন ইনিই ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ বক্তা এবং যে দেশ আর যে ধর্মের প্রতিনিধিত্ব তিনি কবতে এসেছেন সে দেশ ও ধর্ম নিঃসন্দেহে জগতকে অধ্যাত্ম বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারে। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর ধর্ম ব্যাখ্যায় বিন্দুমাত্র গোঁড়ামি ছিল না, ছিল না কিছুমাত্র কুসংস্কার অথবা পরমত অসহিষ্ণুতাব চিহ্ন, ববং তাঁর প্রত্যেকটি কথায় বেজে ছিল আধ্যাত্মিক গভীবতা, বিরাট উদাবতা এবং স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক মননশীলতার সুর যা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূলভিত্তি।

আধুনিক ভারতবর্ষের নবজাগরণের পাশ্চাতে এই অবিস্মরণীয় দিনটি যে কতখানি প্রেরণা যুগিয়েছিল তা আজ প্রায় এক শতাব্দী পরেও ঠিকভাবে ধারণা করা অসম্ভব। শুধুমাত্র বলা যায় সেদিন দূর পাশ্চাত্যের তীরে ভারত গৌরবেব যে ঢেউ উঠেছিল তার তরঙ্গোচ্ছ্বাস মাত্র কযেক বছরের মধ্যেই সমগ্র ভারতভূমির তীরকে কম্পিত করেছিল। ঋষিকণ্ঠের উচ্চারিত বাণী হাজার বছরের ঘুমন্ত ভারতবাসীকে আত্মসচেতন করে বলেছিল, "অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না—আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই ইহার গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না।"

২। স্বামিজীর বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড পৃঃ ৩৮

ভারতের যুগযুগান্তসঞ্চিত আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ভাব প্রচার করেই মুমূর্ষু ভারতে নবজীবনের জোয়ার আনলেন নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ। প্রায় হাজার বছরের পরাধীনতার অন্ধকারে শক, হূন, পাঠান, মোগল, ফরাসী আর ইংরেজ ভারতের সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবনকে বার বার বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেই পরাধীনতার অন্ধকার যুগের অবসান ঘোষিত হলো এক গৈরিক সন্ন্যাসীর বজ্র বাণীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পুর্বে ভারতে যে সমাজ সংস্কারক অথবা ধর্ম সংস্কারকেরা আসেননি তা নয়, কিন্তু ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপটি এত গৌরবোজ্জলভাবে আর কেউ তুলে ধরতে পারেন নি। সংস্কারকগণের মধ্যে কেউ কেউ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ বিশেষের পুনরুজ্জীবনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কেউ কেউ বা ভারতবর্ষের বিরাট প্রাচীন ইতিহাসকে এবং ধর্মকে উপেক্ষা করে পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সবটুকুকেই গ্রহণ করলেন। ভারতের পূজা-পার্বণ, ধর্ম-শাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য-শিল্প-স্থাপত্য কোন কিছুই বাদ গেল না। জগতের সম্মুখে ভারতবর্ষের সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরে প্রথম পাশ্চাত্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন আধ্যাত্মিক সভ্যতার জন্মস্থান ভারতবর্ষের দিকে।

বনের বেদান্তকে ঘরে এনেছিলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই ভাগীরথীর উৎসধারা বিশ্বের দ্বারে বহন করে নিয়ে গেলেন বেদান্তমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাষ্যকার বিবেকানন্দ। যে ধর্ম এতদিন ছিল মঠ-গীর্জা আর পুরোহিতদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, দার্শনিকদের তর্ক-বিতর্কের ধূম্রজালে সমাচ্ছন্ন, বহুবিধ পূজা-পার্বণ, যাগ-যজ্ঞাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অস্পৃশ্যতা ছুৎমার্গ আর কুসংস্কারের সংস্পর্শে সংকীর্ণ এবং দূষিত, ভারতবর্ষের সনাতন সেই ধর্মকে সর্ববিধ **'non-essential'** থেকে মুক্ত করে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সহজ সরল বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত ভাষায় বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরলেন। **Religion is the manifestation of the divinity already in man"** অর্থাৎ 'মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের নামই ধর্ম।"

বিবেকানন্দ সব ধর্মের মূলতত্ত্বটিকে তুলে ধরলেন স্বচ্ছ সতেজ কথায়।

"Each soul is potentially divine. The goal is to manifest

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী বিবেকানন্দ

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

this Divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work, or worship, or psychic control, or philosophy—by one, or more, or all of these and be free. This is the whole of religion. Doctrines, or dogmas, or rituals, or books, or temples, or forms are but secondary details" এই কয়েকটি অনুভূতিলব্ধ কথার মধ্যে দিয়ে বিবেকানন্দ ধর্ম ও জীবনের বিভেদ দূর করে এক বিরাট যুগ সমস্যার সমাধান করলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরু বিবেকানন্দের বাণীর সুদূরপ্রসারী ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন :

'গীতা প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের, ভগবান বুদ্ধ, আচার্য শঙ্করের এবং ভারতের চিন্তা জগতের অন্যান্য সকল আচার্যের মতই—স্বামীজীর বাণীর স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে বেদ উপনিষদের উদ্ধৃতি। ভারতবাসীর কাছে তিনি শুধু নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করবেন ভারতের চিরন্তন সম্পদ।

বিবেকানন্দের বাণীর মধ্যে নূতন কিছুই নাই একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বহুত্ব এবং একত্ব যদি একই চরম সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ হয়ে থাকে, তবে শুধু বহু বিচিত্র উপাসনাই নয়, সকল কাজ, সকল চেষ্টা, সকল প্রকার সৃজনশীল কাজও সমভাবেই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের উপায়। ধর্মীয় এবং ধর্ম নিরপেক্ষ বলে দুই বিভিন্ন দিক আর থাকল না। কর্মই হলো উপাসনা—। জয়ের অর্থই হলো ত্যাগ। সমস্ত জীবনটাই ধর্ম সাধনা। স্বামীজীর সমগ্র বাণী একদিকে দেখতে গেলে একটা মূল বিশ্বাসের ব্যাখ্যা মাত্র। "শিল্প, বিজ্ঞান আর ধর্ম" তিনি একবার বলেছিলেন, "একই সত্যকে প্রকাশ করার তিন বিভিন্ন পথ মাত্র। কিন্তু এ ভাবটিকে ধারণা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই অদ্বৈত বেদান্তকে গ্রহণ করতে হবে"। এই বিশেষ বাণীই হলো আমাদের আচার্য বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর বিশেষত্ব। এখানেই তিনি হয়ে উঠেছেন প্রাচ্য পাশ্চাত্যের, অতীত ও ভবিষ্যতের মিলন সেতু।[২]

বিবেকানন্দের ভাষায় ধর্ম এবং জীবন দুইয়ে মিশে এক হয়ে গেল। মানবের সমস্ত জীবন, তার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা, তার কর্ম-ভক্তি, জ্ঞান, ধ্যান, এক কথায় সমস্ত জীবনটাই জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশেরই

২। Introduction to the complete works of S, Vivekananda

চেষ্টা। এই বিরাট সত্য যা ভারতবর্ষের মূল ধর্ম, অর্থাৎ উপনিষদের ধর্ম অথবা বেদান্তের ধর্ম তার সন্ধান পেয়েছিলেন স্বামীজী গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ একই সত্তার এপিঠ ওপিঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব; বিবেকানন্দ ভাষা। শ্রীরামকৃষ্ণ অতলস্পর্শী গহন গভীর আধ্যাত্মিক বারিধি; বিবেকানন্দ ব-রূপে বহুছন্দে বহু ভঙ্গিমার প্রকাশিত সেই সমুদ্রেরই লীলা চঞ্চল তরঙ্গরাশি যা জগৎ পারাবারেব তীরে তীরে এই নবযুগের প্রারম্ভে মানুষের আঙিনাকে ধৌত স্নাত করে গিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কে? রোঁমা রোঁলার ভাষায়, "The Man was the consummation ot two thousand years of the spiritual life of three hundred million people."[৩] ভারতের পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়? এ প্রশ্ন স্বামীজীকে করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যভ্রমণের সময়। উত্তর দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ, "তিনি সেই পথ, সেই আশ্চর্য পথ যা নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন।···তিনি সেই বিরাট জীবন যাপন করেছেন, এবং আমি সেই মহাজীবনের ভাষ্যকার।"[৪] শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের যে বাণী তা কি ভারতের সার্বজনীন বাণী? ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবীর ভাষায়, "শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অদ্বিতীয়, কারণ তিনি তা কাজে প্রকাশ করেছেন। **এই বাণীই** হলো সনাতন হিন্দুধর্মের বাণী।"[৫] শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের ভাষ্য করতে গিয়ে বিবেকানন্দ নিজে বলেছিলেন। "তাঁর জীবনটি হলো অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আলোকবর্তিকা যা ভারতের ধর্মচিন্তার সমস্ত দিককে আলোকিত করেছে। তিনি ছিলেন বেদের বাণী ও আদর্শের একটি জীবন্ত ভাষ্য। ভারতের বিভিন্ন যুগের সমস্ত ধর্ম পথের সাধনাকে তিনি একটি জীবনেই রূপদান করেছেন।" এই ধর্মকেই পুনরুজ্জীবিত করতে হবে এবং জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থলে তাকে রেখে দেশের পুনরুজ্জীবনের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে। প্রথমবার পাশ্চাত্য বিজয়শেষে রামনাদের অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী ভারতবাসীকে এই মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে বললেন—"তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে।

৩। Life of Ramakrishna—Romain Rolland p 14.

৪। The Master as I saw him. Page 197

৫। Preface to the life of Ramakrishna by Swami Ghanananda.

এক হস্তে ধর্মকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিখিবার শিখিয়া লও, কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দু-জীবনের সেই আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে, তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব-মহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে।"[৬]

গভীর ঐতিহাসিক মননশীলতা নিয়ে বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত অদ্বৈত-বেদান্ত কেবল ভারতীয় ধর্মের মূল কথা নয়, তা সহস্র সহস্র বৎসর ধরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল সূত্র এবং সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। ভারতের শিল্প, সভ্যতা, স্থাপত্য সাহিত্য, রীতি, নীতি, পূজা, পার্বণ, সঙ্গীত এই সমস্ত কিছুরই মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই বেদান্ত ধর্ম। এই ধর্মকে বাদ দিলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি শূন্যতায় পর্যবসিত হবে। এই কঠোর সাবধানবাণী-স্বামীজী বারবার শুনিয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য বস্তুবাদ দ্বারা মোহগ্রস্ত, আত্মবিস্মৃত পরপদলেহী, পরমুখাপেক্ষী ভারতবাসীকে। বারবার বজ্র কণ্ঠে ভারতবাসীকে আত্মসচেতন করে তুলেছিলেন এই মূল সত্তাটির দিকে—সনাতন ধর্মকে বাদ দিয়ে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কখনই দাঁড়াতে পারে না। জগৎ সভায় ভারতবর্ষের যদি মহান এবং যুগোপযোগী নিজস্ব কিছু দেওয়ার থাকে তা হলো এই সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিকতা। আজকের বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদের যুগে পাশ্চাত্যের মানুষ যখন ভোগ লালসার অগ্নিতাপে দগ্ধ, নিজের পাশবিকতায় সন্ত্রস্ত তখন ভারতবর্ষকে এগিয়ে আসতে হবে বিজ্ঞানসম্মত বেদান্ত ধর্মের এই সমন্বয় ত্যাগ ও শান্তির বাণী নিয়ে বিশ্বকে বিপদমুক্ত করতে। জড়বাদ সর্বস্ব পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক শূন্যতাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে ঘরে ফিরেছিলেন দিগ্বিজয়ী বিবেকানন্দ। আর উপলব্ধি করেছিলেন ভারতে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের গুরুত্ব, মাদ্রাজের যুবকগণকে এ ভাবেই উদ্দীপ্ত করলেন স্বামীজী। "আমাদের উপস্থিত কর্তব্য" বক্তৃতায় বললেন "সমুদয় পাশ্চাত্যজগৎ যেন একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত, কালই উহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য লোকেরা পৃথিবীর সর্বস্ব অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু কোথাও শান্তি পায় নাই। এখন এমন কাজ করিবার সময় আসিয়াছে যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ পাশ্চাত্যের অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে। অতএব হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ,

৬। স্বামীজীর বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড পৃঃ ৩৩-৩৭

আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলিতেছি—আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে। আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তার দ্বারা আমাদিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে। এছাড়া আর গত্যন্তর নাই, এইরূপই করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত।"[৭] এ ভবিষ্যৎবাণী স্বামীজী করেছিলেন ১৮৯৭ খ্রীঃ। পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে পর পর দুটি বিশ্বমহাযুদ্ধের আগুনে জ্বলেছে সমগ্র পাশ্চাত্য। সেই লেলিহান অগ্নিশিখার গুপ্ত আগুন আজও সমগ্র পৃথিবীর শান্তিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, আজকের পৃথিবী ভয়ঙ্কর পরমানবিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত একটি যুদ্ধ শিবির। বিশ্ববাসী আজ শান্তির সন্ধানে আবার মুখ তুলে চেয়েছে ভারতবর্ষের দিকে। ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি সম্প্রতি বলেছেন—"এই ধর্মসমন্বয়ের মধ্যে আমরা পেয়েছি এমন একটি জীবনদর্শন এবং মনোভাব যার সাহায্যে সমগ্র মানবজাতি একটি পরিবার হিসাবে গড়ে উঠতে পারে—এবং পারমাণবিক যুগে আমাদের সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র এই জীবনাদর্শ।"[৮]

ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন হবেই এবং তা হবে এই বেদান্ত ধর্মের বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়ে, ব্যক্তি জীবনের এবং সমাজ জীবনের সমস্ত দিকে এবং সর্বস্তরে এই বেদান্তকে কার্যকরী করার মধ্য দিয়ে। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পরে ভারতবর্ষের সমস্তদিকে যেভাবে পুনরুজ্জীবনের ঢেউ এসেছিল, সেটি বিবেকানন্দের অবদান বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। রাজনৈতিক পটভূমিকায় যখন দেখি তখন মনীষী রোঁমা রোঁলার সেই কথা মনে পড়ে। "বিবেকানন্দের পর যারা এলো তারা দেখলো, তাঁর মৃত্যুর তিন বৎসর পর বাংলায় এলো বিপ্লব বাংলার বিপ্লব যে সম্ভব হোলো, আজ যে ভারতবর্ষ সংঘবদ্ধভাবে জনসাধারণকে নিয়ে একযোগে কাজ করতে পারছে তার মূলে রয়েছে স্বামীজীর মাদ্রাজের সেই বাণী—"ঘুমন্ত ভারতবর্ষ জাগো।" বিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্ণধার নেতাজী, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী, তিলক এবং অসংখ্য তরুণ শহীদের আত্মত্যাগের পশ্চাতে সবচেয়ে উন্মাদনা সঞ্চারিণী প্রেরণা যুগিয়েছে বিবেকানন্দের বেদান্তের

৮। **Preface to life of Ramakrishna by Ghanananda.**

৭। **স্বামীজীর বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৭২**

অভীঃ এবং আত্মত্যাগের মন্ত্র। ভারতের জাতীয় আদর্শ ত্যাগ ও সেবা এই পথে ভারতবর্ষকে পরিচালিত করলে অন্যসকল সমস্যার সমাধান সহজেই হবে। একথা বলেছিলেন স্বামীজী প্রায় আশী বছর আগে। তিনি আরও বলেছিলেন ভারতবর্ষ যদি রাজনীতির পথ নেয় তা হলে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী আর সে যদি ধর্মের পথ গ্রহণ করে তবে তার অস্তিত্ব চিরকাল বজায় থাকবে। এ পথে গিয়ে ভারতের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এনেছিলেন মহামতি অশোক আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রচণ্ড যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীর দিকে তাকালে এবং ভারতবর্ষের দৈনন্দিন রাজনৈতিক উত্থানপতন এবং অনিশ্চযতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে ঋষি বাক্য অভ্রান্ত বলেই মনে হয়।

ভারতের নবজাগরণের জন্য যে হাতিয়ারটির প্রয়োজন স্বামীজী সর্বাগ্রে অনুধাবন করেছিলেন সেটি হল শিক্ষা। বিজাতীয়, বিদেশীয় শিক্ষা প্রায় দু'শো বছর ধরে ভারতীয় যুবকদের নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ করে রেখেছিল। স্বামীজী বল্লেন নতুন শিক্ষার ইমারত তৈরী হবে ভারতীয় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে মিলবে উপনিষদের ভাব ও দর্শন। এতদিনের সমাজনীতিতে নিষ্পেষিত প্রায় 'সন্তান-উৎপাদক যন্ত্র" পরিণত ভারতীয় নারী আবার শিক্ষিত হয়ে সমাজ স্বাবলম্বী ও উচ্চমর্যাদাশীলা হবেন। আর চাই জনশিক্ষা যে শিক্ষা নগরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাবে অগণিত গ্রামে গ্রামে, দরিদ্রের পর্ণকুটিরে, চাষীর ঘরে আর অনুন্নত সম্প্রদায়ের আঙিনায়। স্বামীজীর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা জীবন উৎসর্গ করেছিলে তাদের মধ্যে ছিলেন পাশ্চাত্যনারীদ্বয় ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রিশ্চিন আর ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের বহু ত্যাগী শিক্ষিত সন্ন্যাসী।

শুধু শিক্ষাই নয়, ভগিনী নিবেদিতা, নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শিল্পীদের সাহায্যে নতুন করে যে ভারতীয় রীতিতে শিল্পের পুনঃপ্রবর্তন করে-ছিলেন তার সূত্রধার স্বামী বিবেকানন্দ। আধুনিক ভারতে শিল্প জাগরণ, কারিগরী শিক্ষা ও বিজ্ঞান সাধনায় স্বামীজী ছিলেন প্রথম উৎসাহী প্রবক্তা। জামসেদজী টাটার এক পত্রে পাওয়া যায় ভারতীয় যুবকদের বিজ্ঞান সাধনায় জন্যে স্বামীজীই প্রথম একটি বাস্তব পরিকল্পনা করে শ্রীটাটাকে উদ্বোধিত করেন। দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির হাতিয়ার হিসাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান

ও কারিগরী শিক্ষাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করার ডাকও ভারতবর্ষে প্রথম দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ শুধু ভারত প্রেমিকই নন, তিনি দূরদর্শী, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। দূরদর্শী নাবিকের মত বিবেকানন্দ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বলেছিলেন জগতের আধুনিকতম অধ্যায়—শূদ্রশাসনযুগের আবির্ভাবের কথা। শুধু তাই নয়—বিরাট মানবতাবোধের প্রেরণায় বিবেকানন্দই প্রথম ইতিহাসের অবহেলিত অনাদৃত এই শূদ্র সমাজকে আহ্বান করেছিলেন নতুন শক্তিতে জাগাবার জন্য—'নতুন ভারত বেরুক'। 'রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন', 'অদ্ভুত সদাচার', 'অটলজীবনী শক্তি' এবং 'অপূর্ব সহিষ্ণুতা সম্পন্ন' ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী চাষা, ভূষো, জেলে, মুচি, এদের তিনিই আহ্বান করেছিলেন ঝোপ জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে, মুদীর দোকান থেকে, বেরিয়ে আসার জন্য। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উচ্চবর্ণকে বলেছিলেন, "ঐ তোমার রত্ন পেটিকা তোমার মাণিক্যের অংশটি ফেলে দাও এদের মধ্যে যত শীঘ্র পার ফেলে দাও।" শূদ্র যুগের আগমনে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবনতি ঘটতে পারে এ আশঙ্কা বিবেকানন্দ করেছিলেন। তাই তিনি বারবার বলেছিলেন যে নবজাগ্রত শূদ্রদের জন্য শিক্ষা, শিল্প, ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত হোক। স্বামীজীর সে আদর্শ আজ ভারতবর্ষে সর্বজনবিদিত। শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উপনীত করতে হবে। ভারতবর্ষের শূদ্র জাগরণের জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হবে বেদান্ত বা উপনিষদের মুক্তি মন্ত্র। স্বামীজী বলেছিলেন "উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে ওজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। উহা সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল দুঃখী পদদলিতকে উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র যা পরিত্রাণের (**salvation**) কথা বলে না, মুক্তির কথা বলে।"[৯]

ভারতবর্ষের ইতিহাস আত্মত্যাগ এবং সেবার ইতিহাস। সমাজে অবহেলিত মানুষবের আত্মমর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বিবেকানন্দ

৯। স্বামীজীর বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৫

ভাগীরথীর উৎসধারার মত বেদান্ত ধর্মকে নিয়ে এসেছিলেন প্রত্যেক ভারত-বাসীর জীবনে। 'দরিদ্র নারায়ণ' কথাটি বিবেকানন্দের সৃষ্টি। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীবনসেবারই যুগোপযোগী অভিব্যক্তি। আজ ভারতের প্রান্তে প্রান্তে সেবাধর্মের জয়গান। সভা সমিতি, মঠ-মন্দির, শিক্ষাপ্রাঙ্গণ সমস্ত স্তরে বিবেকানন্দ প্রবর্তিত এই সেবাধর্ম ভারতের মানুষকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। ভবিষ্যতেও তাই করবে।

নবজাগরণের উষাকালে বিবেকানন্দই আমাদের কাছে ভারতবর্ষের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, গৌরব, ঐতিহ্যময় অতীত এবং গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের মূর্ত প্রতীক। ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, ভারত তীর্থের কোথাও এমন কোনো ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায় নি, এমন কোনো আশা জাগে নি বা বিবেকানন্দের চিত্তে প্রতিফলিত হয় নি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "If you want to know India, study Vivekananda. In him nothing is negative, everything positive." বিবেকানন্দের অন্য এক পাশ্চাত্য শিষ্য Sister Christine লিখেছিলেন, "Our love for India came to birth, I think, when we first heard him say the word, 'India', in that marvellous voice of his. It seems incredible that so much could have been put in one single word of five letters. There was love, pssion, pride, longing, adoration, tragedy, chivalry, and again love. Whole volumes could not have produced such a feeling in others. It had the magic powers of creating love in those who heard it."

তথাগত বুদ্ধ এবং আচার্য শংকরের মতই ভারতবর্ষের মূর্তপ্রতীক গৈরিক বসনধারী এই বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী তার অতীতের সাক্ষী, ভবিষ্যতের আহ্বায়ক এবং বর্তমানের কর্ণধার। ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষ ভোলেনি তার নবজীবনের আহ্বায়ককে ভারতের শেষপ্রান্তসৈকতে যে শিলাখণ্ডের উপর তিনি ধ্যান নেত্রে দেখেছিলেন দুঃখের পরাধীনতার, দুর্বলতার অন্ধকার থেকে নবজাগ্রতা মহামহীয়সী ভারতমাতার রূপ, সেই শিলাখণ্ডেই আজ যুগনায়ক ভারতাত্মা বিবেকানন্দের বিরাট স্মৃতি মন্দির নির্মিত হয়েছে, তাঁর প্রাণের ভারতীয় যুবকদের সেবা ও

আত্মত্যাগে নির্মিত হয়েছে ইতিহাসের এই নতুন **milestone**। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে ভারতবর্ষকে ডেকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই স্মৃতিমন্দির, ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির চিরন্তন গতিপথ থেকে যেন আমরা ভ্রষ্ট না হই। বিবেকানন্দের পাঞ্চজন্য-কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে অবিস্মরণীয় সেই আহ্বান :

"হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলি-প্রদত্ত, ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভুলিও না নীচজাতি মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল - আমি ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমায ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায মানুষ কর।" আর সেই সঙ্গে স্মরণ করিযে দিচ্ছে আগামী বিশ্বে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আসনের ঐতিহাসিক ভূমিকা—যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ ভবিষ্যৎ বাণী—"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

রামানুজ

তানসেন

কবীর দাস

শিখগুরু নানক

শ্রীচৈতন্য

যীশুখৃষ্ট

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহাপুরুষদের অবদান

"ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" অল্পে সুখ নাই, বৃহতের মধ্যেই সুখ। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক উপনিষদের ঋষি উদাত্তকণ্ঠে জানান এ কথা -তাঁর অনুভূতির মূল অভীপ্সা বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায়। ঋষি ঘোষণা করেন পরম আশার বাণী—

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রত্যয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ হতে জীবসমূহ জাত। জাত জীবসমূহ আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে এবং বিনাশকালে আনন্দেই প্রয়াণ করে।

চিরস্থির সনাতন যে আত্মা তার জয়গান প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক পবিত্র বেদ উপনিষদের প্রতিটি ছন্দে। আত্মচিন্তায় বৈজ্ঞানিক মননশীলতার পরিচয় উপনিষদ্। সত্যানুসন্ধানী ঋষির বলিষ্ঠ ভঙ্গীর স্বাধীন চিন্তার রূপ— "সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ"। সত্য আচরণে মুক্তির আস্বাদ সত্যানুরাগীর জীবনের উপলব্ধিপ্রসূত দৃঢ় ধারণা।

কর্ম, জ্ঞান ও ইচ্ছা—মানুষের তিন শক্তির পূর্ণ বিকাশ প্রাচীন ভারতীয় সচ্চিদানন্দ সাধনার মাধ্যম। এর পরিণতি সর্বভূতে সমদর্শন, সর্বভূতে প্রীতি এবং সর্বভূতে সেবা। এই পরিণতিতে আগ্রহশীল উপনিষদ্ মানবজীবনের দুটি স্পষ্ট মূল্যের নির্ধারক। চিরন্তন শুভ শ্রেয় আর ক্ষণস্থায়ী মধুর প্রেয়। শ্রেয়ের পথে মানুষ পশুত্ব ছেড়ে পৌঁছায় দেবত্বে, উপনীত হয় জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যে। তৎ-ত্বম-অসি—তুমিই সেই, এই তত্ত্বকেন্দ্রিক প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য অনন্তের আনন্দ লাভ। এর জন্য প্রয়োজন অন্তর্মুখী মন। প্রাচীন মুনিঋষিরা বিচরণ করতেন তপোবনে অসীমের সন্ধানে। তাই অসীমের আনন্দে শান্তি হত প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা সুন্দর পোষাক, সুন্দর অট্টালিকা ও সুন্দর আসনের মধ্যে সুখ পেতেন না। সেই তপোবনবাসী চির আনন্দময় পুরুষেরা দিতেন পথের সন্ধান—ভারতের চিরস্থির সনাতন আত্মা বিকশিত হত। সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সভ্যতা,—সবই হত পুষ্ট সেই অসীমের আনন্দের অনুরণনে।

মানুষের চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। এর মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকে, আর প্রকৃত বেঁচে থাকার সাধনাই হল মানুষের সহজাত কর্তব্য। প্রাচীন ভারতীয় মুনিঋষিরা জানিয়ে গেছেন কেমন করে চৈতন্য সংযুক্ত হয়ে বেঁচে থাকা যায়, থাকা যায় আনন্দে। চিরকালের মানুষ চায় "সৎ" অর্থাৎ সত্তা বজায় রাখতে, "চিৎ" অর্থাৎ চৈতন্য অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং "আনন্দ" লাভ করতে অর্থাৎ আনন্দময় হতে। জীবনযুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে সে ক্রমে ক্রমে এ-ও জানতে পারে যে, শান্তি বা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কোনও বাহ্য বস্তুর দ্বারা লাভ হয় না। আনন্দ বা তৃপ্তি মানুষের নিজের ভিতর, তা বাইরের বস্তু নয়। আত্মচিন্তায় মনের কালিমা হয় বিদূরিত, সমস্ত বাসনার হয় নিবৃত্তি, সকল দুঃখের হয় অবসান। তাই প্রাচীন ঋষিকণ্ঠে শোনা যায় "আত্মানং বিদ্ধি"। অমৃতস্বরূপ এই আত্মাকে শ্রবণ করতে হবে, মনন করতে হবে, সতত ভাবনা বা ধ্যান করতে হবে—দর্শন করতে হবে। আর পরিণামে সকল জীবকে আত্মবোধে সর্বদা গ্রহণ করতে হবে, আত্মসংযম ও বৈরাগ্যের অভ্যাসের দ্বারা। সবার মাঝে অবস্থিত পরমাত্মাস্বরূপ আনন্দস্বরূপ সেই ব্রহ্মের উপাসনাই করছে মানুষ তার জীবনসংগ্রামের তার মুক্তিসাধনার মাধ্যমে।

প্রাচীন ঋষিকণ্ঠের জ্ঞানদীপ্ত ঘোষণা—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য়উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥"

একত্বের জ্ঞানবিহীন বহুত্বের জ্ঞান অবিদ্যা, যা আমাদের অন্ধকারে নিয়ে যায়। বহুত্বজ্ঞানহীন একত্বের জ্ঞান (কেবল বিদ্যা) শূন্যতার নামান্তর, সুতরাং তা আমাদিগকে গাঢ়তর অন্ধকারে নিয়ে যায়।

উপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে জানালেন তাঁর সংকল্প। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দুই স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দেবেন বলাতে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বিষয় সম্পত্তি দিয়ে কি অমৃত লাভ করতে পারব?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, "না, ভোগোপকরণসম্পন্ন মানুষের জীবনে যে রকম হয় তোমারও হবে সে রকম।" মৈত্রেয়ী দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন তাঁর প্রাণের কথা, "যা দিয়ে অমৃতলাভ করতে পারব না তাতে আমার কি প্রয়োজন।"

ব্যাসদেবের রচিত অষ্টাদশ পুরাণ ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ—যেন ভারত সাধকের বিশ্বভাবনা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের রাজা বিপশ্চিত মহাপুণ্যবান। সামান্য

কারণে তাঁকে যেতে হয়েছিল নরকে। অল্পক্ষণ নরকবাসের পর যমদূতের আদেশ মত যখন তিনি স্বর্গে যাওয়ার জন্য এগোলেন, তখন নরকবাসীরা তাঁকে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করার জন্য চিৎকার করে উঠল। কারণ বিপশ্চিতের শরীর হতে নির্গত মধুর গন্ধে তাদের নরকযন্ত্রণার লাঘব হচ্ছিল। নরকবাসীদের করুণ আবেদনে বিপশ্চিত নরক পরিত্যাগ করতে হলেন অস্বীকৃত। তিনি বললেন, "আমার মনে হয়, আর্তের দুঃখ লাঘব হলে মানুষ যে আনন্দ পায় স্বর্গে বা ব্রহ্মলোকে তা পাওয়া যায় না। আমি নরকে বাস করলে যদি আর্তজনের দুঃখ লাঘব হয় তা হলে অনন্তকাল নরকে বাস করাই শ্রেয়ঃ মনে করি"। যমদূত তাঁকে বললে, "এই সব লোক নিজ কর্মদোষে যন্ত্রণা ভোগ করছে, তুমি যাও, স্বর্গে গিয়ে তোমার সুকৃতির ফল ভোগ কর"। তখন রাজা বলেছিলেন, "এ সমস্ত নরকবাসী আমার উপস্থিতিতে আনন্দ পাচ্ছে, আমি কিছুতেই এ স্থান পরিত্যাগ করব না। আর্তের জন্য যার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয় না, তার জীবন কলঙ্ক ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ। এদের জন্য যদি আমার নরকযন্ত্রণা ভোগ করতেও হয়, ক্ষুধাতৃষ্ণায় যদি আমার বোধশক্তি রহিতও হয়, তবু, আমি এদের আশ্রয় দেওয়াকে স্বর্গ সুখের চেয়েও প্রীতিকর মনে করি। আমার কষ্টে যদি অসংখ্য হতভাগ্যের কষ্টের লাঘব হয় তবে আমি তার চেয়ে বেশী কিছুই চাই না"। ত্যাগের পরিণতি বন্ধনমুক্তি যা সবার কাম্য।

> "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথ জুষাং
> নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

মানুষ রুচির বিভিন্নতা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন পথ (সরল ও বক্র) অবলম্বন করে। কিন্তু সকলেরই একমাত্র গন্তব্য স্থান তুমি (ভগবান বা পরমাত্মা)। যেমন বিভিন্ন পথগামী নদীসকলের গন্তব্যস্থান সমুদ্র। তাই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ একমাত্র স্বরূপ বিশ্লেষণকারী ধর্মের উপর ভিত্তি করে অপরের সঙ্গে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ স্থাপনপূর্বক জীবনকে মহান আদর্শে উচ্চতর করে তুলতে পারে, পারে আনন্দময় হতে।

মহামুনি বাল্মীকি মহাকাব্য রামায়ণের মাধ্যমে অন্তর্সত্তার পূর্ণ বিকাশ ও মুক্তির সন্ধান দেন মানুষকে। এর প্রতিটি চরিত্রের ইচ্ছা ও কর্মের মধ্যে রয়েছে আদর্শ মানবধর্মের প্রকাশ যা মানুষকে বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ ও ত্যাগী করে তোলে। দেশ, সমাজ, এমন কি বিশ্বমানবের সংস্কৃতির ধারক এই রামায়ণ। বীর যোদ্ধা ও আদর্শ রাজা শ্রীরামচন্দ্র। সত্যাশ্রয়ী রাজা শ্রীরামচন্দ্র প্রজাদের

সুখস্বাচ্ছন্দ্য—সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনে ছিলেন কর্তব্য-কঠোর। তাই সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাঁর রাজত্বে।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণবস্তু ধর্ম। ধর্ম ভারতীয় জীবনকে করেছে রূপান্তরিত, করেছে সত্য, শিব ও সুন্দরে পরিণত, করেছে অনন্ত প্রেমে বিভূষিত।

মহাভারতের মহাকবি ব্যাসদেব নৈতিক কর্তব্য ও আশার বাণী প্রচার করেছেন এবং জোর দিয়েছেন দৈনন্দিন জীবনে সেই আদর্শগুলির প্রয়োগের উপর। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিরাট পরিচয় এই মহাভারতে, "যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ"।

মানবাত্মার এক মহান বিশ্লেষণ—জীবনবাদের এক বলিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকাশিত হয়েছে মহাভারতে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন স্মারকচিহ্ন এই মহাকাব্য। মানবজীবনে আছে অনন্ত বেদনা, ব্যর্থ পরিণাম, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এই সব কিছুকেই করেছে বৈরাগ্যের আবরণে আবৃত। মহাভারতের শান্তিপর্বে এটাই প্রতীয়মাণ যে, সামাজিক কল্যাণের অনুপন্থী নয় যা কিছু এবং যা করতে মানুষের দ্বিধা আসে তা কখনই করা উচিত নয়। যে আচরণ অপরে তোমার সঙ্গে করুক এটা তুমি চাও না, সে আচরণ কখনও তুমি করো না অপরের সঙ্গে। সম্যক জ্ঞানের দ্বারাই মুক্ত হতে পারে মানুষ। বিশ্বজনীন উদারতা ও নৈতিক জীবনের শিক্ষা দেয় মহাভারত, সকল জীবে প্রেম এবং পার্থিব বাসনার ত্যাগই এর লক্ষ্য।

একাধারে যিনি অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী, বিবিধ ভাবসমন্বিত যাঁর চরিত্র সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জোর দিয়ে বলছেন যে, পূর্ণযোগী পুরুষকে কর্ম হতে অবসর নিলে চলবে না। সাধারণ লোক শ্রেষ্ঠদেরই অনুসরণ করে চলে। শ্রেষ্ঠরা কর্মত্যাগ করলে সাধারণ স্ব স্ব ধর্ম বিসর্জন দেবে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব হবে। নিজের জীবনে এই সাধনা করে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ। পুণ্যতীর্থ এই ভারতে অধর্মকে দূরীভূত করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর বাণীতে রয়েছে বলিষ্ঠ জীবনবাদ। অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণ বিপথগামী মানুষকে দেখালেন সত্য পথ। বারবার অর্জুনকে ডেকে বলছেন তিনি—"তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ"। সর্বদা আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর।

জগতে নিষ্কাম কর্মের প্রচার করলেন শ্রীকৃষ্ণ, কর্ম ও বৈরাগ্যের সামঞ্জস্য-বোধ জাগিয়ে তুললেন তিনি মানুষের চেতনায়। কর্ম জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ যে

নীতি দ্বারা মানুষের অধিকারে আসতে পারে নির্দোষ প্রতিষ্ঠা, তার পূর্ণ সমর্থন দেখা যায় গীতার শিক্ষায়। গীতার বিশেষ শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে সেগুলি যেগুলি বিভ্রান্ত মানুষকে জীবনযাত্রার বিধান দেয়। জীবনের মধ্যে দিয়েই মানুষকে অমৃতত্ব লাভ করতে হবে। এর জন্য তো জীবনের ক্ষেত্র হতে, সকলপ্রকার শারীরিক কার্যকলাপ হতে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না, যদিও সে পথ সহজ নয়।

বিশ্বপ্রেমধর্মের মূল উৎস ঋষিশাস্ত্রে। প্রাচীন ঋষির জীবনে ও বাণীতে রয়েছে সর্বভূতহিতের প্রেরণা, রয়েছে বিশ্বপ্রেমের প্রতিষ্ঠা। তাদের জীবনদর্শন হল বিশ্বাত্মবোধ। এর পরিচয় বৈদিক কর্মকাণ্ডে, উপনিষদিক জ্ঞানমূলক শাস্ত্রে ও ভাগবতপুরাণাদি ভক্তিমূলক শাস্ত্রে। ঋষিশাস্ত্রের কথা সর্বভূতের সঙ্গে একাত্মতাবোধ। মানবতাবোধ বা লোকপ্রীতি এ দর্শনেরই অন্তর্গত।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে বুদ্ধের অবদান বিশ্বপ্রেম, মহামৈত্রী ও মহাকরুণা।

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ স্ত্রী, নবজাত শিশু ও রাজসিংহাসন ছেড়ে ভিখারী সেজে বহুকল্পদুর্লভ বোধিসত্ত্ব লাভ করার জন্য করলেন কঠোর সাধনা। সৃষ্টির অনাদি দুঃখ মোচনের জন্য অমৃতের সন্ধানে রাজপথে বেরিয়েছিলেন যে রাজপুত্র তাঁর বৈরাগ্য যে অহেতুক নয়, এ বিষয়ে প্রশ্ন নেই কোনও।

বোধিসত্ত্ব দেখলেন, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই সকল দুঃখের মূল। তাই অবিদ্যার উচ্ছেদ হলেই মুক্তি। সিদ্ধিলাভের পর সিদ্ধার্থের চিত্ত অমৃতরসপানে হল পরিতৃপ্ত। তাঁর অন্তরে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠল সর্বজীবের প্রতি করুণা। জনগণের স্বকীয় ভাষায় জনগণের উপযোগী করে সহজ সরল ভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা করলেন তিনি। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, উচ্চ নীচ ভেদ, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ—কোনও ভেদই রইল না। মৈত্রী ও করুণায় আকৃষ্ট করে সকলকে তিনি দিলেন উপদেশামৃত। জনগণের মাঝে, গ্রামে, বেণুবনে, পর্বতপ্রান্তে, নদীতীরে হল তাঁর আসন, সকলে সহজে পারল তাঁর সঙ্গ লাভ করতে।

মানুষ অপরকে সুখী না করে সেখানে নিজে সুখী হচ্ছে, সেখানেই আসছে তামসভাব। এই তমসাচ্ছন্ন মৃত্যু হতে উদ্ধার পাওয়ার প্রচেষ্টা মানুষের চিরকাল। জড় প্রকৃতির ব্যক্তিসত্তার অন্বেষণ করলেন বুদ্ধদেব।

বেদের নব ব্যাখ্যাকার রূপে এলেন বুদ্ধদেব। সকলপ্রকার পাপবর্জন, কুশল কর্মাদির অনুষ্ঠান ও চিত্তের নির্মলতা সাধন এগুলিই ছিল প্রধানতঃ তাঁর

অনুশাসন। বেদের পরিণতি দেখা যায় বুদ্ধদেবের মাঝে। বেদের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাকার হয়েও বেদকে অতিক্রম করলেন তিনি, প্রবেশ করলেন মানুষের অন্তর্লোকে, যেখানে রয়েছে দুঃখ-লাঞ্ছনা-হাহাকার, যেখানে রয়েছে জরা-ব্যাধি-শোক, যেখানে প্রাত্যহিক দাবদাহে মানুষের প্রাণচেতনা দগ্ধীভূত, যেখানে রয়েছে লোভ ও নিষ্পেষণ, অশান্তি ও অসাম্য। মানুষের সেই সাধারণ জীবনের মর্মকোষে প্রবেশ করে তিনি শোনালেন শান্তির ললিতবাণী।

তিনি জানালেন নির্বাণের প্রকৃত অর্থ। কেবলমাত্রদেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছু নিরোধই নির্বাণ নয়। নির্বাণ হল নিবৃত্তি, মায়াময় সব কিছু প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্তি। যিনি সুখে, দুঃখে, নিন্দায়, প্রশংসায়, অনুরাগে, বিরাগে,—সকল অবস্থায় সমভাবযুক্ত, তিনিই প্রকৃত নিবৃত্তিময় পুরুষ। এই নিবৃত্তিময় সমতা-জ্ঞানই হল সাম্য ও শান্তি।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বুদ্ধদেবের মত প্রতিভাবান শঙ্করাচার্যের অবদানও যথেষ্ট। খুব অল্প বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত করে ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের তর্কে পরাস্ত করে স্বীয় অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি, রচনা করলেন উপনিষদ্, বেদান্ত ও গীতার ভাষ্য। তাঁর মতে ব্রহ্মই সমস্ত জীব জগৎ এবং জীব ও জগতের অতীত। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্মে ভেদ হয় অজ্ঞানতাবশতঃ। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি সনাতন হিন্দু ধর্মের মহান রূপ কে উদ্‌ঘাটিত করলেন শঙ্করাচার্য তাঁর অসামান্য প্রতিভাবলে।

ব্রহ্মচর্য, জীবেদয়া, সরলতা, বিষয়বৈরাগ্য শৌচ ও অভিমান বর্জনই চিত্তপ্রসাদের কারণ। সর্ববস্তুতে নিজেকে দর্শন করা ও সর্বত্র ভেদজ্ঞান বর্জন করার মধ্যে রয়েছে জীবনের সার্থকতা। আত্মজ্ঞানে জীবের হিতসাধন হয়। শঙ্করাচার্য ভারতবাসীর মনে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে এনে একান্ত নিজস্ব বৈদিক কৃষ্টিধারায় ভারতবাসীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মধ্যযুগের ভক্তিবাদে মানবতা ও মৈত্রীর বাণী বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছে অসংখ্য সাধকের মাধ্যমে। এই সাধকদের অনেকেই সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের লোক ছিলেন। রবিদাস ছিলেন মুচি, কবীর জোলা, নানক শস্যবিক্রেতার ছেলে, দাদূ তুলাধুনকর। এঁরা অনেকেই ছিলেন নিরক্ষর। সাধারণের বোধগম্য চলিত ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন এঁরা প্রায় সকলেই। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কবি ও গায়ক। এদের মূল কথা ছিল সকল

কুসংস্কার ও অনুষ্ঠানিক আড়ম্বর ত্যাগ করে সহজভাবে ঈশ্বরের সন্তান সকল মানুষকে ভালবেসে, সেবারূপ পূজার মাধ্যমে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া।

শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক শান্তির পূজারী ছিলেন। ভক্তির বন্যায় ও মানবসেবার মহান আদর্শে মানবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। অবিরত যজ্ঞের মত তাঁর জীবন তিনি উৎসর্গ করেন ঈশ্বরসন্তান মানবের হিতসাধনে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ করে সকলশ্রেণীর মানবের কাছে তিনি জানালেন,—সবাই নানক বা অগ্নিসম হতে পারে। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের মানবতার ইতিহাসে এক নতুন যুগের আবির্ভাব হল তাঁর সাধনায়। প্রগতিবাদী নানক উপলব্ধি করলেন, সকল মানুষই এক। সুতরাং হিন্দুমুসলমান বিভেদ এবং জাতি, শ্রেণীবৈষম্য প্রভৃতি সবই ভ্রান্তি-প্রসূত। মানুষের অভাব সহানুভূতিও ভ্রাতৃত্ব—এ জন্য দুর্বল ও দরিদ্র মানবের মাঝে এসে দাঁড়ালেন তিনি। মুসলমান গায়ক মর্দানাকে তিনি ডাকলেন 'ভাই' বলে, করলেন নিত্যসঙ্গী. গভীর প্রেমে আলিঙ্গন করলেন ক্ষুধার্ত, অন্ধ, পঙ্গু—সকলকে। চেষ্টা করলেন তাঁদের কষ্ট লাঘব করতে, সাম্যবাদের পূজা করলেন বিনয় ও প্রেমের নৈবেদ্যে। মহান কর্মকে প্রতিষ্ঠিত করলেন ধর্মের আসনে। বুদ্ধদেবের মতই বিপ্লবী ধর্মপ্রচারক ছিলেন নানক। দরিদ্রের বন্ধু প্রেমের পূজারী নানক ঘোষণা করলেন, ধর্মই জীবন, কর্মই এর প্রকৃত লক্ষণ।

সিদ্ধ ভক্ত কবীর। পবিত্র তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন। খাঁটি মানুষ কবীর সকলপ্রকার ভণ্ডামি, মিথ্যাচারকে আঘাত করলেন কঠোরভাবে। সংগ্রাম করার প্রচণ্ড সাহস ও শক্তি ছিল তাঁর, আর ছিল মানুষের মহত্ত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। সত্য বলে যা মনে করেছেন তা-ই প্রচার করেছেন তিনি নির্ভীক-ভাবে, হৃদয়ের ভক্তি বা প্রেমের উপরই জোর দিয়েছেন, প্রচার করেছেন শুদ্ধ রামনাম। কোনও রকম অলসতা, আরামপ্রিয়তা, কোনও রকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেন না তিনি। বাহ্যানুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখত না তাঁর জীবন সাধনা। সৎপথে মতি ও মন স্থির করার কথাই প্রচার করেন তিনি। সেবা-কর্মের কথাই বিশেষভাবে বলেছেন কবীর—ভগবৎ সেবা বলতে বুঝিয়েছেন মানুষের সেবা, নরনারায়ণের পূজা। তাঁর মতে জীবনের পরিপূর্ণতা আসে আসক্তিত্যাগে, সত্যধর্মে ও প্রেমতৃষ্ণায়। জৈব বা মৃন্ময় রূপে মানুষ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নানা জটিলতায় জড়িত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, রিপুতাড়িত। কবীর পথ দেখালেন মানুষকে—চিন্ময়রূপে শুদ্ধমুক্তস্বভাববান হতে।

রামানন্দ জানালেন, প্রেমই মানুষকে মানুষের নিকটে আনে, প্রেমই মানুষে মানুষে ভেদ বিদূরিত করে। রবিদাসও প্রচার করলেন লোকসেবা। দাদূও জানিয়ে গেলেন একই কথা, অন্তরেই ভগবানের আসন, প্রেমেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভক্তিতেই তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। বিশ্বসেবায় নিজেকে নিযুক্ত করলেই ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়া যায়, হওয়া যায় নির্ভয়।

দক্ষিণ ভারতে তামিল দেশে বৈষ্ণবধর্ম বিস্তারের মূলে রয়েছেন তামিল আল্‌বারগণ। সংখ্যায় মোট বারো এই আল্‌বারগণ রচনা করেন বিষ্ণুস্তোত্রসমূহ। এগুলির সংকলন করেন বৈষ্ণবাচার্য নাথমুনি। তামিল বৈষ্ণবদের কাছে এগুলি বেদস্বরূপ। এদের জীবনসাধনায় ঈশ্বরকেন্দ্রিক শুভ কর্মের প্রেরণা পাওয়া যায়। ভাগবত ধর্মের বিস্তার এই সাধনার মাধ্যমে। কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমের পূর্ণবিকাশ মানেই ভাগবত-প্রকৃতি লাভ। কর্মে যখন মানুষ সর্বভূতহিত-সাধনে রত থাকবেন, জ্ঞানে যখন সর্বভূতে সমদর্শী হবেন ও প্রেমে যখন সর্বভূতে প্রীতিমান্ হবেন, তখনই মানুষের জীবনসাধনা হবে সার্থক। জগতের মানবমাত্রেই যখন জাতিধর্মনির্বিশেষে এই উদার ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করবেন, সর্বত্রই যখন এই ধর্ম সম্যক অনুষ্ঠিত হবে তখনই জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা হবে। এই সার্বভৌম ধর্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হলে সকল ব্যক্তিই সর্বভূতে সমদর্শী, নিষ্কামকর্মী, সর্বভূতহিতে রত ও ভগবানে ভক্তিমান হবেন। তখন হিংসাদ্বেষ, যুদ্ধবিবাদ, অশান্তি-উপদ্রব সমস্তই হবে দূরীভূত। জগতে বিরাজ করবে অখণ্ড অনাবিল শান্তি।

চিতোরের রাজরানী হয়েও জীবনের পরমধন ঈশ্বরলাভের জন্য মীরাবাঈ ত্যাগ করলেন অর্থ, প্রতিপত্তি, কুল ও মান সবই। ঈশ্বরানুভূতি নিয়ে সাধিকা মীরা নেমে এসেছিলেন দুঃখকষ্টময় পৃথিবীর মাঝে প্রভুর সেবার আনন্দে বিভোর হতে। ঈশ্বরের প্রিয়তম জনসাধারণের দুঃখ ও যন্ত্রণা দেখে তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেন মীরাবাঈ। নাম কীর্তনের মাধ্যমে পবিত্র সেবাব্রতের অনুষ্ঠান করলেন তিনি। কর্ম বলতে শুধু বিশেষ সমাজ বা দেশের চাহিদা মেটানোই বোঝায় না। দেশকালের গণ্ডী ছেড়ে অসীম অনন্তের পূজাও কর্ম,—পবিত্র কর্ম যা আনে শান্তির প্রলেপ সমগ্র মানব-চেতনায়। মীরা করলেন সেই পবিত্র কর্ম, ঘুরলেন পথে প্রান্তরে। উপনিষদের ঋষিরা যে আনন্দবার্তা জানিয়েছেন বিশ্বজনকে তারই প্রকাশ মীরার ভজনে।

দেশে ভক্তির বন্যা এনে সমাজ ও ধর্মজীবনের গ্লানিসমূহ দূরীভূত করার

জন্ম আবির্ভাব হল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের। তাঁর প্রভাবে এল নবচিন্তাশক্তি, এল হৃদয়বৃত্তি ও অধ্যাত্মচেতনার এক অভিনব বিকাশ—এল নব জাগরণ। প্রেম ও ভক্তির জোয়ারে দেশের সাহিত্য, ধর্ম ও দৈনন্দিন আচার-আচরণ তুচ্ছতার অগৌরব হতে পেল রক্ষা। মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জীবনে এল এক বিরাট পরিবর্তন। সর্বাঙ্গীন মানস জাগরণ হল প্রত্যক্ষ। চৈতন্যদেব এনে দিলেন এক অভূতপূর্ব আনন্দের বাণ হিন্দুমুসলমান, ব্রাহ্মণচণ্ডাল, উচ্চনীচ, স্ত্রীপুরুষ সবার মনে। বৈষ্ণব মতবাদের প্রভাবে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের তীব্রতা হ্রাস পেল। ব্রাহ্মনেতর সমাজ নবজাগ্রত বৈষ্ণবমতের প্রতি আকৃষ্ট হল আর উচ্চবর্ণেরাও সমাজকল্যাণের জন্য নিজেদের করল পরিমার্জিত। উচ্চতর শিক্ষিতমহলে বিশেষভাবে স্বীকৃত হল পৌরাণিক আদর্শ ও জীবনধারা। দেশের জনসাধারণের মনোজগতে বিশেষতঃ অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে এ মতবাদ সঞ্চার করল এক মহৎ জীবনাদর্শ। সামাজিকতা ও চেতনার সীমা হল সম্প্রসারিত চৈতন্যপ্রভাবে হিন্দুর ধর্ম ও আচার বিচারের আমূল পরিবর্তন হওয়ায় হিন্দুসমাজে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক বাসনা আবার ফিরে এল। গণমানসে ভাব ও প্রেম সঞ্চিত হল। সমাজ ও জীবনের ক্ষেত্রে বৃহৎ মানবতার আদর্শ স্পষ্ট হল।

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক প্রাচীন মহাপুরুষগণ। এদের পবিত্র জীবন-সাধনায় রয়েছে এক অনন্তের তীর্থযাত্রার সুর। তাঁদের শিক্ষায় রয়েছে বিশ্বপ্রেমের মহান বাণী। অসহিষ্ণুতা, অহিংসা ও আদর্শ-ভক্তি হল তাঁদের পাথেয়। বহু সংঘাতেও ভারতীয় সংস্কৃতির বিনাশ হয় নি, কারণ সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর এটা প্রতিষ্ঠিত। জগতের কল্যাণে আধুনিক যুগেও এই ভারতীয় সংস্কৃতি প্রীতি, মৈত্রী ও শান্তির বাণীই প্রচার করছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরুষদের সাধনা ও বাণীতে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে আধুনিক বিশ্বের দরবারে।

প্রাচীনকালে ঋষিগণ লোকসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। সেজন্য সেসময় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বৈষয়িকতার সুসমঞ্জস সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। সমগ্র জীবনই হয়েছিল ধর্ম জীবন। কেবল ব্যষ্টিজীবন নয়, সমষ্টিগতভাবে সমগ্র সমাজজীবন ধর্মের অধীন ছিল। এ ধর্মশাস্ত্রে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সমস্তই অন্তর্গত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির

সবচেয়ে বড় উপাদান মানুষের মর্যাদাদান। জগতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। সেই সাধারণ মানুষ কখনও একযোগে সবাই নিঃস্বার্থপর হয়ে যাবে না। ধনী-দরিদ্র, উচ্চনীচ, মূর্খ পণ্ডিত, সাদাকালো ভেদ থাকলেও প্রয়োজন মনের ক্ষমতা ও সমান সুযোগ। বহির্জগতে বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সুনিয়ন্ত্রিত অন্তরের ক্ষমতাই মানবসমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

প্রাচীন আর্যগণের লক্ষ্য ছিল জীবনে ঋদ্ধি, জীবে প্রীতি ও জগতে শান্তি। ভারতীয় ধর্ম হল বিশ্বমানবধর্ম। সেজন্য দেখা যায় আর্যগণের প্রার্থনা,—

"দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥"

—শুক্লযজুঃ

—হে পরমেশ্বর, আমাকে এমন দৃঢ় কর যেন সকল প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করে, আমি যেন সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করি। আমরা যেন পরস্পরকে মিত্রভাবে দর্শন করি।

প্রাচীন ঋষিগণ সর্বভূতহিতে রত থাকতেন, দেশের ও সমাজের হিতকামনা করতেন। রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-কামনায় প্রার্থনা করতেন এই ত্যাগী ঋষিরা,—

"আ ব্রহ্মণ্ ব্রাহ্মণস্তেজস্বী ব্রহ্মবর্চসী জায়তামা রাষ্ট্রে।
রাজন্যঃ শূরঃ ইষব্যো মহারথো জায়তাম্।
দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়ানড্বানাশুঃ সপ্তি সভেয়ো যুবা
পুরন্ধ্রি যোষা জিষ্ণু রথেষ্ঠা।
আস্য যজমানস্য বীরো জায়তাম্।
নিকামে নিকামে পর্জন্যো বর্ষতু।
ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাম্।
যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্।

(শুক্ল যজুর্বেদ, ২২ অধ্যায়, ২২ মন্ত্র)

"হে ব্রহ্মণ্, আমাদের রাষ্ট্রে তেজস্বী ও ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করুন। জন্মগ্রহণ করুক শৌর্যবান্ রাজন্যবর্গ, সাহসী যোদ্ধার দল, দুগ্ধবতী গাভী, নিরলস ভারবাহী বলীবর্দ এবং দ্রুতগামী অশ্বসমূহ। দেবীতুল্য

নারীগণ, বিজয়ী রথীকুল এবং উন্নতরুচিসম্পন্ন যুবকগণ জন্মগ্রহণ করুক। যজ্ঞের ফলস্বরূপ যজ্ঞপরায়ণ পিতার বীর সন্তান লাভ হউক। মেঘসমূহ বর্ষণ করুক প্রভূত বারিধারা। বৃক্ষরাজি অজস্র পরিমাণে ফল উৎপাদন করুক। আমরা যেন আমাদের অপ্রাপ্ত অভীপ্সিত বস্তু সমূহ লাভ করি এবং প্রাপ্ত বস্তু যেন রক্ষা করিতে সমর্থ হই।"

সনাতন মানবধর্মকে জাগ্রত রাখার নির্দেশ, রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে। শান্ত, শিব ও অসীমের উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন অপরকে ভালবাসা ও সংযমী জীবনযাপন করা। সততা, সরলতা, নিষ্ঠা ও আলস্যহীন উদ্যম, সন্তোষ ও ঈশ্বরপ্রেমকে জীবনের আদর্শরূপে বরণ ক'রে সর্বদা একাগ্র সাধনাই ভারতীয় সংস্কৃতির নির্দেশ।. সেজন্য সত্যানুসন্ধানী ঋষিকণ্ঠের প্রার্থনায় ব্যক্ত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণবস্তু,—

"অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"

আমাদের অসত্য হতে ়ত্যে নিয়ে যাও, আমাদের অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে যাও, আমাদের মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

১। ভারত-আত্মার বাণী--শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

২। ভারতের সাধক—শঙ্করনাথ রায়

৩। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪। গোবিন্দদাসের কড়চা

৫। শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত—৺বৃন্দাবন দাস ঠাকুর

৬। Prophets and Saints—T. G. Vaswani.

৭। The Great Religious Leaders—Charles Tmancis Potte..

৮। The Sikh Religion—Mac Auliffe.

৯। Enclyclopedia of Religion and Ethics, Vol. IX.

ঋষিদৃষ্টিতে ঈশ্বর, সৃষ্টি ও সমাজ

সনাতন ধর্মের সে এক যুগ বটে !

সেই নয়নাভিরাম অরণ্য আর সেই আশ্রম—ব্রহ্মচর্য ও তপস্যার পীঠস্থান।

ভৈরব রাগে পুব গগনে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে উষার আলো আর ঋষিদের কণ্ঠোত্থিত বৈদিক মন্ত্রের ছন্দে ছন্দে স্পন্দন লাগে বনভূমির রন্ধ্রে রন্ধ্রে...... বিহঙ্গের আকুল কূজনে···কলকল উছল স্রোতস্বিনীর তরঙ্গনৃত্যে···আর উপরে অনন্ত নীলিমা, নীচে দিগদিগন্ত বিসর্পী শ্যামলিমা···

এরই মাঝে ঋষিরা আপনাপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল।

এঁরাই উপনিষদের উদ্গাতা।

বজ্রনির্ঘোষে এঁরাই বলেছিলেন—মানুষ অমৃতের সন্তান।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

(শোন বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ আর যারা দিব্য ধামেতে আছ ! আমি অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে জেনেছি, কেবলমাত্র তাঁকেই জেনে মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়, আর অন্য কোন পথ নেই)

বিশ্বে এক সনাতন সত্তা--সদ্-চিৎ-আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা বিরাজমান। এই মৃত্যুময় সংসারের পারে তিনিই একমাত্র আপন জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান।

তিনি এক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই আত্মারূপ মহান চৈতন্যসত্তাতে পরিব্যাপ্ত। সমগ্র সৃষ্টির অণুতে পরমাণুতে তিনিই বিরাজিত। এঁকে জানলেই সমস্ত জানার পরিসমাপ্তি হয়। আর এই আত্মজ্ঞান লাভ করলেই মর্ত্যবাসী অমৃতের অধিকারী হয়। ঋষিগণ এই পরমাত্মাকেই বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।—'একম্ সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' অর্থাৎ সেই সদ্‌বস্তু (ব্রহ্ম) এক, ঋষিগণ বহু প্রকারে তাঁকে অভিহিত করেন।

তিনি এমন এক সত্তা যা আমাদের মন-বুদ্ধির অগোচর। উপনিষদ্ বলেন,—

'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'।

অর্থাৎ যেখান থেকে মন ও বাক্য তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পেরে ফিরে আসে। তবে তিনি বাস্তবিকই এমন কিছু যা আমাদের ধরা-ছোঁয়া-বোঝার বাইরে। কোন দেশকালের গণ্ডীতে তাঁকে আবদ্ধ করা যায় না। যাবতীয় বস্তু যা বিনাশী, যা নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তিনি এমন কিছুও নন। বস্তুবিশ্বের কোন উপমা দিলে তাঁকে বুঝান যায় না। তাঁর সম্পর্কে কেবল বলা যায়—'নেতি নেতি'। অর্থাৎ তিনি ইহা নন, তিনি ইহা নন।

তিনিই শাস্ত্রোক্ত পরব্রহ্ম। তিনি অস্তিত্ব, চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ এক সর্বব্যাপী সত্তা। তাঁর চৈতন্যে বিশ্বের সমস্ত কিছু চেতনায়িত।

তুলনীয়: 'কো হি এব অন্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশো ন আনন্দয়তি।' (উপনিষৎ) অর্থাৎ জীবের অন্তরে এই চৈতন্যস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ অধিষ্ঠিত আছেন বলেই মানুষের সমস্ত কর্মচেষ্টা, তার প্রাণধারণ, সুখদুঃখ আনন্দ হাসির খেলা।' তাঁর প্রকাশে, তাঁর দ্যুতিতে চন্দ্র সূর্য-নক্ষত্র প্রকাশিত। মানবের দেহ-ইন্দ্রিয় তাঁর চৈতন্যে সঞ্জীবিত হয়ে বস্তু-বিশ্বে ক্রিয়াশীল।

পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত এত কথা সত্ত্বেও তাঁকে কিন্তু সমগ্রভাবে বোঝান সম্ভব নয়। শাস্ত্রে কেবলমাত্র আভাস পাওয়া যায়। যেমন দূর থেকে, সমুদ্র দেখেনি এমন কোন ব্যক্তিকে সমুদ্রের কথা কেবল 'কি হিল্লোল, কি কল্লোল' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ঠিক বুঝান যায় না; পরব্রহ্ম সম্বন্ধেও শাস্ত্রের উক্তি ঠিক তদ্রূপ। সেজন্য শাস্ত্রে তাঁকে বলেছে 'তৎ' অর্থাৎ তিনি 'তাহা'। এই 'তাহা' বলতে তাঁকে যা বুঝান হয়েছে তা আমাদের পরিচিত কোন কিছুর দ্বারা বিশ্লেষিত করা যায় না। তাঁর সম্বন্ধে শুধু এই কথা বলা যায়—

'তিনি এক শক্তিজাতীয় সত্তা। (স্বামী বিবেকানন্দ)

এই বিশ্বের মূলে এই পরমাত্মাই আছেন। বিশ্বসৃষ্টিতে আর দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই। উদাহরণ দেওয়া যায় মাকড়সার। মাকড়সা যেমন নিজের জাল বিস্তার করে তাতেই অবস্থান করে, তিনিও সেইরূপ এই বিশ্ব সৃষ্টি করে তাতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। এই বিশ্ব তাঁর ভিতর থেকেই প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। আমাদের প্রাচীন ঋষিদের উপলব্ধিতে এই পরম সত্য ধরা পড়েছে।

তুলনীয় : 'সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি ॥" (গীতা)

অর্থাৎ, সর্বভূতে সেই পরব্রহ্ম সমভাবে বিরাজিত। যে ঋষি তা উপলব্ধি করেছেন, তিনিই যথার্থদর্শী। সমস্ত বিনাশশীল বস্তুর মধ্যেও তিনি এই অবিনাশী পরব্রহ্মকে দেখেন।

শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে আবার বলেছেন, বিশ্বসৃষ্টি করে তিনি তাতে নিঃশেষিত হয়ে যান নি। 'ময়ি একাংশেন স্থিতং জগৎ'—অর্থাৎ তাঁর একাংশে এই জগৎ অবস্থিত। তিনি সেইজন্য সবকিছু সৃষ্টি করেও সবকিছুর অতীত। তিনি যাবতীয় বিনাশী বস্তুরও অতীত, আবার অবিনাশী মায়াশক্তিরও অতীত।

বিশ্বে রূপায়িত মায়া-উপাধিধারী এই পরব্রহ্মকে বলা হয়েছে 'সগুণ', আবার সমাধিস্থ অবস্থায় ঋষি উপলব্ধি করেন, 'নির্গুণ'।

রুচি ও বৈচিত্র্যের তারতম্যের জন্য এই এক পরব্রহ্ম বহু দেবতারূপেও প্রতীয়মান হন। সনাতনধর্মে সেইজন্য বহু দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার কোন কোন মতে তিনি নিরাকার হলেও সগুণ।

কিন্তু অধিকাংশ মতে তিনি সাকার ও সগুণ। এইজন্য দেখা যায় বহু দেবতার পূজা। বিভিন্ন মূর্তিতে—মাতা, পিতা, সন্তান প্রভৃতিরূপে তাঁকে পূজা করা হয়। এইভাবেই দেখা যায় সনাতনধর্মে নানা মতবাদী—অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী। ঈশ্বর সম্বন্ধে এমনি উদার ও বিশাল ধারণা ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এই উদার বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে কখনও কখনও সাম্প্রদায়িক কলহের সূচনা হয়। হীন-স্বার্থপরতা ও চিত্তের অনুদারতাই এর কারণ। এই বিপদকালে শ্রীভগবান করুণাবশে হিন্দুধর্মের সনাতন সত্যটি জাগিয়ে তোলেন নিজেই আবির্ভূত হয়ে। এইভাবেই যুগে যুগে এসেছেন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পুরুষগণ। শাস্ত্রে এই অবতার পুরুষদের পরব্রহ্মেরই স্বরূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বধর্মের আর সত্যের মহিমা ঘোষণা করতেই এঁদের আবির্ভাব হয়।

ঋষিদের আর একটি দুঃসাহসিক অভিযান জগতের বিচিত্র সৃষ্টির মূলে ঐক্য কোথায় তা নির্ণয় করা। এই জগতে এত বিভিন্নতা কোথা থেকে এল? সুপ্রাচীন ঋক্‌বেদেও সৃষ্টির এই রহস্যের বিষয় প্রশ্ন করা হয়েছে।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা
কো বেদ যত আবভূব ॥

'এই বিচিত্র সৃষ্টির মূল কোথায় তা কে জানেন? কে তার নিখুঁত বর্ণনা করতে পারেন? দেবতাদেরও আবির্ভাব সৃষ্টি আরম্ভের পরে। কাজেই কে জানে কোথা থেকে এই বিচিত্র জগতের উদ্ভব হয়েছে?'

ঊর্দ্ধে-অধেঃ অসংখ্য প্রাণ, অসংখ্য শক্তি নিত্য ক্রিয়াশীল। মানুষের অশান্ত জিজ্ঞাসা বহির্জগতে ধাবমান হয়ে অনুসন্ধান করছে এইসব শক্তির মূল কোথায়? সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-মানুষ-জীব-জীবাণু কোথায় লুকিয়ে আছে এই মহারহস্য?

বহির্জগৎ মানুষের এই জিজ্ঞাসায় কখনও সাড়া দেয়নি। বহির্বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত এই রহস্যের মীমাংসা করতে সক্ষম হচ্ছে না। কিন্তু বহুযুগ পূর্বেই অসীম-সাহসী অরণ্যবাসী ভারতীয় ঋষিগণ এই রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করে গেছেন।

ঋষিগণ তাঁদের অন্তর্জগতের জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করে এই রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন। জগতের বিভিন্নতার মধ্যে তাঁরা মিলনের ঐকতান উপলব্ধি করেছেন। শ্রুতি বলছেন, 'পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥' অর্থাৎ, শ্রীভগবান মানুষের ইন্দ্রিয়সকল বর্হিমুখ করে সৃষ্টি করেছেন; তাই মানুষ আপন অন্তরাত্মার সন্ধান পায় না। কিন্তু কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃতত্ব-লাভে ইচ্ছুক হয়ে আপন অন্তর্লোকেই আত্মার সন্ধান পেয়েছেন।

ঋষিরা পেয়েছেন জগতের বিভিন্নতার মাঝে একটি ঐক্যসূত্র। তা বাইরে কোথাও নয়, নিজেদেরই অন্তরে।

মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা—তার আত্মাই—এই জগতের মহামিলনভূমি।

এই অসংখ্য মানুষ, অথবা নিম্নস্তরের প্রাণী কিংবা ঊর্দ্ধ লোকসমূহে নানা তেজোপুঞ্জ দেবতা, সবই এক পরমাত্মার চেতনায় চেতনান্বিত। যেখানেই কার্য-কারণ শৃঙ্খল, সেখানেই এই পরমাত্মার শক্তির প্রকাশ। এই এক পরমাত্মারই নব নব রূপে নব নব শক্তিতে নানা দেশে নানা কালে রূপায়ণ। এই পরমাত্মাই আপন অচিন্ত্যনীয় শক্তিতে দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন।

তুলনীয়: সোঽ কাময়ত—বহু স্যাম্ প্রজায়েয়েতি।...ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশয়।

(তিনি [ব্রহ্ম] কামনা করিলেন—আমি বহু হব। এইভাবে তিনি সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং সবকিছুতেই অনুপ্রবিষ্ট হলেন।)

বিশ্বচরাচরের যাবতীয় ভেদ, তা শুধু দেশ-কাল-নিমিত্তেরই ভেদ—কিন্তু সত্তাগত কোন ভেদ নাই। যেমন, বায়ু—একই বায়ু সমস্ত বিশ্বে প্রবাহিত হচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংস্পর্শে এর রূপায়ণ হচ্ছে। কিন্তু সবকিছুর মূল সত্তা বায়ুই।

যেমন—সূর্য। জগতের সর্বত্র কিরণ-সম্পাত করছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে রূপায়িত হচ্ছে। কিন্তু সবকিছুরই মূল সত্তা সূর্যের তেজ। এইভাবেই এক পরমাত্মা সর্বত্র ওতপ্রোত হয়ে আছেন। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ তাঁরই অভিব্যক্তি, তাঁরই সত্তায় সত্তাবান্।

বিশ্বসৃষ্টিতে সবকিছুর মূলীভূত কারণ তিনিই, আর সৃষ্টির এই বিভিন্ন প্রকাশ, তাঁরই সত্তার ব্যক্ত ভাব। বিশ্বের যে প্রাণশক্তি, তা তাঁরই প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তি বিভিন্ন স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে বিশ্বের সর্বত্র প্রাণশক্তির সঞ্চার করছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, কিভাবে মানুষ এই একত্বের সন্ধান পেতে পারে? সামান্য শক্তির আধার হ'য়ে, তার 'ক্ষুদ্র আমিত্ব' নিয়ে সে কিভাবে এই 'বৃহত্তম আমি'-তে পর্যবসিত হ'তে পারে? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মানুষের পক্ষে তা খুবই সম্ভব। সে ভ্রান্তিবশতঃ নিজেকে সসীম মনে করে এই 'ক্ষুদ্র আমি'কে যথাসর্বস্ব মনে করছে। আর তার মনই এরজন্য দায়ী। আবার সে চেষ্টা করলেই এই মনকে এত সবল করতে পারে যাতে সে অন্তর্লোকের জ্ঞান-সমুদ্রে আপন যথার্থ স্বরূপ খুঁজে পেতে পারে। মানুষের মনের পশ্চাতে আছেন এই পরমাত্মা—তার আসল স্বরূপ—যেখানে আপন মহিমায় অধিষ্ঠিত। এই বিভিন্ন রূপধারী জীবসকল যেন একই চৈতন্য-সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমাত্র। কিন্তু এ সবকিছুর পশ্চাতে আছে এক মহাসমুদ্র—জলে জলময়। যেমন তরঙ্গ সমুদ্রের জল-সত্তায় অভিন্ন-এক, তেমনি সৃষ্টির বৈচিত্র্য পরমাত্মার প্রাণসত্তায় অভিন্ন—এক।

যেমন বিভিন্ন নদী—

বিভিন্ন নদী এক সাগরাভিমুখে মিলিত হবার জন্য ছুটে চলেছে। সাগরে

মিলিত হ'য়ে তাদের আর নিজস্ব কোন অস্তিত্ব থাকে না, তখন তারা সাগরের সংগে অভিন্ন হয়ে যায়। সেইরকম এই যে জীবজগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমিত্ব' তা যেন নদীর মতোই এক মহা 'প্রাণ-সমুদ্রে' মিলিত হবার জন্য ক্রমাগত পরিবর্তন, ক্রমাগত নবনব রূপে রূপায়িত হচ্ছে। এবং যতদিন না এই মহা-প্রাণসমুদ্রে একীভূত হতে পারে ততদিন জীবাত্মার এই যাত্রাপ্রবাহ চলবেই। একদিন সে উপলব্ধি করবে বিশ্বসৃষ্টি এক পরমাত্মার প্রকাশ, সৃষ্টির মাঝে বহু কোথাও নেই।

বহির্বিজ্ঞান যে 'একত্বে'র মীমাংসা করতে বিভিন্ন জড়বস্তুতে এই অনুসন্ধান চালিয়েছে, ঋষিরা অন্তর্বিজ্ঞানের সাহায্যে অর্থাৎ তাঁদের অন্তর্জগতের জ্ঞানালোকের দ্বারা এই 'একত্ব' খুঁজে পেয়েছেন, সগৌরবে ঘোষণা করেছেন— 'তত্ত্বমসি'—অর্থাৎ 'তুমিই সেই'।

ঋষিদের এই চিন্তাধারার সার্বজনীনতা ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবও লক্ষ্যণীয়। আমরা জানি পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো এবং ইজিপ্টের নিওপ্লেটোনিকদের চিন্তাধারাও আংশিকভাবে ঔপনিষদিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আবার এই সময়কার শিক্ষাব্যবস্থায়, গণিত, ব্যাকরণ ও মনোবিশ্লেষণবিদ্যার যে অদ্ভুত উৎকর্ষ দেখা যায়—তা এইসময় অন্যান্য দেশের চিন্তানায়কদের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এইভাবে ঋষিদের বৈদান্তিক চিন্তাধারায় ভারতীয় সভ্যতা পুষ্টিলাভ করতে থাকে। বলাবাহুল্য যে, ঋষিরা নিজনিজ তপস্যালব্ধ সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে সেই সুপ্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সমস্ত সমাজব্যবস্থাকে, তার দর্শন ও চিন্তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কী কঠোর সাধনা ও মনোবলের দ্বারা তাঁরা সমাজের বিভিন্ন সংস্থাকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চালিত করতেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ঋষিদের চেতনায় সদা জাগ্রত ছিল— অভীঃ অর্থাৎ ভয়শূন্য হও। মানবমনে দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে কী দুর্বলতার কাছে—অন্যায়ের কাছে পরাভব স্বীকার করতে হবে? মানবাত্মার অনন্তশক্তি কী দুর্বলতার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকবে? মানবমনের এই দুর্বলতার গ্লানি দূর করতেই উপনিষদের এই অভয়মন্ত্র—হে মানব, তেজস্বী হও, বীর্য অবলম্বনপূর্বক সমস্ত চিত্তবিভ্রম বিদূরিত কর। ঋষিরা তপস্যাবলে এই মন্ত্রশক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। তাঁদের তপস্যায় যে সত্য উপলব্ধ হত সমাজ-শাসনে তাই পরমকল্যাণজনক বলে পরিগণিত

হত। বস্তুতঃ তাঁদের জীবন ও সাধনায় অনুরণিত হত—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং"—অর্থাৎ সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, মিথ্যার কখনোই জয় হয় না।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যের একটি উদার জয়গাথা লিপিবদ্ধ আছে, তারই আলোকে আমরা দেখতে পাব ঋষি বিচারে সমাজের কুসংস্কার ও হীনমন্যতা কিভাবে মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়।

ঋষি গৌতমের আশ্রম। শান্ত এক সন্ধ্যায় আশ্রমে উপস্থিত হল এক নবীন শিক্ষার্থী। আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীরা উৎসুক হয়ে উঠে। ঋষি সস্মিত-মুখে তাকিয়ে থাকেন। কে এই শান্ত সুন্দর বালক ?

'কে তুমি, বৎস ?' ঋষির শান্তকণ্ঠে স্নেহের সুর।

'আমি সত্যকাম।' বালক উত্তর দেয়।

বা! "কি তোমার পরিচয় ? তোমার গোত্র কী ?"

ঋষি আবার জিজ্ঞাসা করেন।

সত্যকামের নিজের বংশ পরিচয় জানা ছিল না। সে তাই বাড়ী ফিরে এসে মাকে তার বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। মা-ও সবিশেষ জবাব দিতে না পেরে বলেন, "তোমার মায়ের নাম জাবালা, আর তোমার নাম সত্যকাম—এই তোমার পরিচয়।"

মায়ের মুখে এই কথা শুনে সে ঋষি গৌতমের কাছে আবার এসে বলে, আমার বংশ-পরিচয় কি তা তো আমি জানি না। আমার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বললেন, আমার জন্ম রহস্যাবৃত, তাই আমার গোত্র-পরিচয় কারও জানা নেই।

সত্যকাম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের বংশ-পরিচয় দিল। কিন্তু আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারীদের মধ্যে বিদ্রূপের আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। এ কী! কুল-গোত্রহীন বালক—সে চায় ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে ? হায় নির্বোধ বালক, শুধুমাত্র সত্যের পাথায় ভর করে তোমার এই দুঃসাহসিক অভিযান ?

'হ্যাঁ, সত্যই এর রক্ষাকবচ'—গৌতম মুনির গম্ভীরকণ্ঠে বনভূমি চমকিত হয়'—'তাই সত্যই এর প্রাপ্য।' ঋষি সত্যকামকে আলিঙ্গন করে সস্নেহে বলেন, 'সত্যকাম, তুমি যথার্থই ব্রাহ্মণ।'—সত্যসন্ধ ঋষি সত্যের মহিমায় সত্যকামকে উদ্বুদ্ধ করেন। আজ থেকে সত্যকাম তাঁর শিষ্য। বেদ-বিদ্যালাভের যথার্থ অধিকারী।

ঋষি-কণ্ঠে তাই ঝংকৃত হয়েছে—

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযান।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥

জগতে সত্যই একমাত্র জয়লাভ করে, মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সত্যের সাধনাই ব্রহ্মের সাধনা। সত্যাশ্রিত ঋষিগণ যে পরম বাঞ্ছিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তা যে সত্যের মহিমাতেই উদ্ভাসিত।

এই ঋষিরাই আবার সমাজ-শাসনে কখনো কঠোর—বজ্রবৎ। এর মূলেও সেই সত্যেরই প্রেরণা। সত্যসন্ধ ঋষি বেদ-গর্হিত কাজকে স্বীকার করতেন না। এর ফলে তিনি যে কোন ত্যাগ ও তিতিক্ষার সম্মুখীন হতে কুণ্ঠিত হতেন না। এবার সে কাহিনীই বলব।

ঋষি উদ্দালক ও তাঁর পুত্র শ্বেতকেতু।

ঋষির দেশ জোড়া নাম। কত দূর দূরান্ত থেকে ব্রহ্মচারীরা আসে তাঁর কাছে বেদ-অধ্যয়ন করতে। কী সুন্দর তাঁর আশ্রম। কত বিচিত্র মনোরম গাছপালা চারপাশে। কত বিচিত্র পাখী, কত রং, কত কলতান। চারদিকে কত ফুল, কত সৌরভ। আর এর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি স্রোতস্বিনী। অধ্যয়নরত বালব্রহ্মচারীদের বেদধ্বনি আর নদীর কলধ্বনি—দু'য়ের অপূর্ব মিল—যেন সুর ও তালের সামঞ্জস্য।

বেদাধ্যয়নের এমনি পরিবেশ আর ঋষির ছেলে শ্বেতকেতু।

কিন্তু তার অধ্যয়নে একটুও মন নেই। সেকালের নিয়মে এক ঋষির ছেলেকে আর এক ঋষির কাছে শিক্ষালাভ করতে যেতে হত। যদি কোন ঋষি-পুত্র বেদ-অধ্যয়ন করতে না চাইত, তবে তাকে বলা হত 'ব্রহ্মবন্ধু'। যেসব ঋষি-পুত্র কোন কারণে, তা নিজের দোষ হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে কোন ঋষির কাছে শিক্ষালাভ করতে যেতে পারতো না, তাদের বলা হত 'ব্রহ্ম বন্ধু'। একথাটা কিন্তু মোটেই সম্মানজনক নয়। সমাজে তাদের অবস্থা খুবই মর্মান্তিক হত। তারা অনেকটা জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত অবস্থায় জীবনযাপন করত। ঋষি উদ্দালক নিজ পুত্রের এই মর্মান্তিক পরিণামের কথা ভেবে শ্বেতকেতুকে একদিন খুবই ভর্ৎসনা করলেন। 'শ্বেতকেতু! ছি ছি তুমি শেষকালে 'ব্রহ্মবন্ধু' হতে চলেছ। আমার বংশে এ-নামের কলঙ্ক কেউ বহন করেনি।'

ঋষির ছেলে শ্বেতকেতু। পিতার ভর্ৎসনায় দুঃখে ও অভিমানে তিনি পিতার আশ্রম ছেড়ে গুরুগৃহে যাত্রা করলেন। কিন্তু এই অভিমানই শ্বেতকেতুর কাল হল।

এরপর শ্বেতকেতুর গুরুগৃহে শিক্ষা আরম্ভ হল বটে, কিন্তু অধ্যবসায় ও জ্ঞানস্পৃহা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অন্তরের প্রচ্ছন্ন অভিমানের পর্দা সরে গেল না।

শ্বেতকেতু অক্লান্ত পরিশ্রমে পড়ে চলেছেন, চারি বেদ—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব আর ছয় বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ।

দীর্ঘ বারো বছর গুরুগৃহে বাস করে এবার শাস্ত্রজ্ঞ শ্বেতকেতু বাড়ী ফিরে চলেছেন। শ্বেতকেতুর পিতার ভর্ৎসনার কথা মনে পড়ে আর মনে মনে হাসেন। পিতা উদ্দালক এই আশঙ্কাই করেছিলেন। শ্বেতকেতুর মুখে চোখে অহংকার পরিস্ফুট। তিনি পণ্ডিত, তিনি বেদজ্ঞ, তাঁর সমান আর কেউ নেই।

উদ্দালক ঋষি অনুশোচনা করেন—তবে তো শ্বেতকেতু গুরুগৃহে যথার্থ অনুশাসন লাভ করেনি। তিনি কঠোর শাসনে শ্বেতকেতুকে বলেন, "বৎস, তোমার শিক্ষালাভ যথার্থ হয়নি। গুরুর কাছে যে জ্ঞানলাভের জন্য তুমি গিয়েছিলে—সেই জ্ঞানলাভ করে কেউ অহংকারী হয় না, চিত্তবিভ্রমও কারও ঘটে না।"

শ্বেতকেতু পুনরায় সংশয়াচ্ছন্ন হন—তাই তো, কি সেই দুর্লভ বস্তু, যা তিনি গুরুগৃহে এত বছর কঠোর তপস্যা করেও লাভ করতে সমর্থ হলেন না।

ঋষি উদ্দালকের মুখে ঝঙ্কৃত হয় "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবন্তি অমতং মতং অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্ ইতি।" (যে জ্ঞান দ্বারা সেই অশ্রুত বিষয় শোনা যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাতকে জানা যায়।)

শ্বেতকেতু নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজ ঋষি পিতার কাছে পুনরায় সেই অশ্রুত, অচিন্তিত এবং অজ্ঞাত জ্ঞানলাভে ব্রতী হলেন।

ধীরে ধীরে শ্বেতকেতুর হৃদয়ের সংশয় আর অজ্ঞানান্ধকার কেটে গেল। আপন সত্যসন্ধ পিতার সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হলেন তিনিও। পিতার কাছে শ্বেতকেতু আত্মজ্ঞান লাভ করলেন।

এই আত্মজ্ঞানলাভই ঋষিদের যুগযুগান্তের তপস্যার শেষ কথা। এই আত্মোপলব্ধির মাঝেই শুরু হয়েছিল ভারতের গৌরবময় যুগ।

শ্বেতকেতু—অধ্যায়ও এইভাবেই শেষ হল—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" নিজ পুত্রের প্রজ্ঞালাভে উৎফুল্ল ঋষিকণ্ঠে আনন্দ-নির্ঝর বইতে লাগল; "বৎস

শ্বেতকেতু, তুমিই সেই, তুমিই সেই।" অর্থাৎ তুমিই সেই আত্মাস্বরূপ! ব্রহ্মস্বরূপ!

"তত্ত্বমসি—তৎ অর্থ তাহা বা সেই অর্থাৎ 'ব্রহ্ম', ত্বম্ অর্থ তুমি—এখানে 'জীবাত্মা', অসি অর্থ হও। অর্থাৎ তুমি বা জীবাত্মা মাত্রই সেই 'ব্রহ্মস্বরূপ'। সংক্ষেপে বলা যায় জীব মাত্রই ব্রহ্ম।

একের পর এক উদাহরণ দিয়ে ঋষি শ্বেতকেতুকে এই পরম সত্যটি বোঝালেন। যে শ্বেতকেতু একদা দুর্বিনীত ও বিপথগামী হয়ে সমাজচ্যুত হতে বসেছিলেন, ঋষির সত্য-শাসনে তিনিই আবার হলেন পরম প্রজ্ঞাবান।

প্রাচীন সংস্কৃতি ঋষিদের এই শাশ্বত উপলব্ধিতেই বিস্তার লাভ করতে থাকে। এর সাহিত্য, এর সঙ্গীত, এর দর্শন, এর বিজ্ঞান সব কিছুতেই এই স্থূল জগতের জিজ্ঞাসাকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু ঋষিদের তন্ময়তা সেই 'অক্ষর পুরুষে' সমাহিত থাকলেও, এরই মধ্যে তাঁদের অদ্ভুত চিন্তাশক্তি ও সৃজনীশক্তি পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের কাব্য সৌন্দর্যের তুলনা নেই। বেদের সংহিতাভাগে ঋষিদের এই কবিত্বশক্তির অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে। এই কবিত্বশক্তি ও শিল্পবোধের মাঝেই ঋষিদের বহিঃ-প্রকৃতির বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আর সংগীতজগতের স্রষ্টা তো এই বৈদিক ঋষিরাই। যে বিশুদ্ধ স্বর লহরীতে বৈদিক মন্ত্রসমূহ গীত হয়, তা ঋষিকণ্ঠেই প্রথম ঝংকৃত হয়েছিল।

আর্য ঋষিদের এই মহত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "এই পরিবর্তনশীল, অনিত্য, প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মৃত্যু-দুঃখ-শোকপূর্ণ এই জগতের বিদ্যা খুব বড় হতে পারে। কিন্তু যিনি অপরিনামী, আনন্দময়, একমাত্র যাঁর শান্তি বিরাজিত, একমাত্র যাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন ও পূর্ণত্ব, একমাত্র যাঁর নিকট গেলে সকল দুঃখের অবসান হয়, তাঁকে জানাই, আমাদের পূর্বপুরুষগণের মতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যে সকল বিদ্যা বা বিজ্ঞান আমাদের শুধু অন্নবস্ত্র দিতে পারে, স্বজনদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার-ক্ষমতা দিতে পারে, যে-সকল বিদ্যা শুধু মানুষকে জয় ও শাসন করবার এবং দুর্বলের ওপর সবলের আধিপত্য করবার শিক্ষা দিতে পারে, ইচ্ছা করলে তাঁরা অনায়াসেই সেই-সকল বিজ্ঞান, সেই সকল বিদ্যা আবিষ্কার করতে পারতেন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তাঁরা ওদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করে একেবারে অন্য পথ ধরলেন, যা পূর্বপথ অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ, পূর্বপথ অপেক্ষা যাতে অনন্তগুণ বেশী আনন্দ।"

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য

আধুনিক শিল্প সমৃদ্ধ ইউরোপের পথে ভ্রমণকালে স্বামীজী অতীব গর্বের সঙ্গে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে পত্রে জানিয়েছিলেন, "মানব জাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কাজ করছে তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদি কাল হতে উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরা, মতি ইত্যাদির ব্যবহার একশ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তাছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি, পশমিনা, কিংখাব ইত্যাদি এ দেশের মত কোথাও হোত না। আবার লবঙ্গ, এলাচ, মরিচ, জায়ফল জয়ত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীন কাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হোত, তখনই সকল জিনিষের জন্য ভারতের উপর নির্ভর।" প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ভারতের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময়। ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের খ্যাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। বতমান ভারতের কলকারখানা গড়ার জন্য বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনতে হচ্ছে। অথচ সুদূর রোম সাম্রাজ্যে ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ কাজ করতে যেতেন বলে অনেক প্রমাণ রয়েছে। কথিত আছে কনস্টান্টিনোপোলের রাজার ভারতীয় পাচক ছিল। সে যাই হোক, বর্তমানে ভারতকে বাণিজ্য নীতির ব্যাপারে ইউরোপীয় চালচলন ও কলাকৌশল শিখতে হবে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার রীতিনীতি ও কলা-কৌশল জেনে কি ভাবে বাণিজ্যিক ব্যাপারে উন্নতি করা যায়, জাপান তা প্রমাণ করেছে। ভারত আবার জাগবে। তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে। পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণের মতে আনুমানিক ২০০০—১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে আর্যরা ভারতে আসে। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা ধ্বংসস্তূপ খননের পর প্রমানিত হয়েছে যে আর্যদের ভারতে আসার কয়েক হাজার বছর আগে ভারতে নগর সভ্যতার পত্তন হয়েছিল। মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপে সুন্দর সমান্তরাল ও সরল একাধিক রাজপথ সমন্বিত একটি নগরী আবিষ্কৃত হয়েছে। ইটের তৈরী বাড়ি, পয়ঃপ্রণালী, বড় বড় স্নানের ঘর, কূয়ো, শৌচাগার উন্নত ধরনের নগরীয় সভ্যতার পরিচয় দিয়েছে। এ নগরীর

অধিবাসিগণ সোনা, রূপা, ও তামার কাজ জানত। কুলাল চক্রের সাহায্যে মাটির হাঁড়ি, কলসী ও খেলনা প্রভৃতি নির্মান করত। শিল্পে ব্যবসা বাণিজ্যে এ নগরী সে যুগে অদ্বিতীয় ছিল। মহেঞ্জোদড়োতে তাম্রযুগের সভ্যতা ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। এখানকার সভ্যতা খুব উঁচুস্তরের ছিল। হাতির দাঁতের তৈরী চিরুনি, পাশা প্রভৃতি, সুতো কাটার টেকো, কার্পাস বস্ত্র, সোনা, রূপো ও দামী পাথরের অলঙ্কার, ব্রোঞ্জের দর্পন, ক্ষুর, কুঠার, করাত প্রভৃতি যন্ত্র, সূচ, মাছ ধরবার বড়শি, প্রসাধনের দ্রব্য ইত্যাদি বিভিন্ন রকম দ্রব্যের হদিশ পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদড়োতে। এ সব কিছুই প্রমাণ করে যে প্রাচীন ভারতে নানা রকমের শিল্পজাত দ্রব্য তৈরী হত। শিল্পে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রাচীন ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল।

ভারত নদীমাতৃক দেশ। আবহমান কাল যাবৎ এ দেশের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, কৃষ্ণা ও কাবেরী। এ দেশ চিরদিনই সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা। উন্নত ধরনের কৃষিকাজ এ দেশেই সৃষ্টি হয়েছে। কৃষিকাজ অবলম্বন করে অনেক উপাখ্যান রয়েছে দুটি প্রাচীন মহাকাব্যে—রামায়ণ ও মহাভারত। অর্থশস্ত্রে কৃষিকে বলে নিষ্কাশন শিল্প। কোন দেশের শিল্প প্রগতিতে এ নিষ্কাশন শিল্পের অবদান অত্যন্ত বেশী। বস্তুতঃ নিষ্কাশন শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য অন্যান্য শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নিষ্কাশন শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের উপর অন্যান্য শিল্প নির্ভরশীল। প্রাচীন ভারতে কৃষিই ছিল অধিকাংশ লোকের পেশা। বর্তমানেও ভারতীয়দের কৃষিই প্রধান উপজীবিকা। শতকরা সত্তরজন ভারতীয় এখনও কৃষিকাজ করে জীবিকা অর্জন করে। এ নিষ্কাশন শিল্পে শ্রমিকদের কাজের ব্যাপকতা অছে। তারা বিভিন্ন নামে বিভক্ত। ধীবরগণ মাছের চাষ করে, কাঠুরিয়া বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, শিকারী বনে জঙ্গলে পশুপাখী শিকার করে, ডুবুরীরা মুক্তা তোলে, কৃষকরা চাষাবাদ করে, শস্য উৎপাদন করে। প্রাচীন ভারতে পশু প্রজনন শিল্প খুব প্রসার লাভ করেছিল। বিশেষ করে গোরু পালন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সমাজের পারিবারিক পদবীগুলো পেশা থেকে উদ্ভব হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। গোয়ালা পদবী এ চিন্তার সত্যতা কিছুটা প্রমাণ করছে। গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, শূকর, মুরগি, হাতি, হরিণ প্রভৃতি ভারতবাসীরা পালন করতেন। তাছাড়া ছিল বিভিন্ন রকমের পাখি যথা, ময়ুর, টিয়া, কাকাতুয়া। পশু প্রজনন শিল্প ও নিষ্কাশন

শিল্পের উন্নতি হওয়াতে অন্যান্য নির্মাণকর্ম শিল্পগুলি সহজেই বিস্তার লাভ করেছিল। দ্রব্য উৎপাদন কাজ প্রধানতঃ হাতের দ্বারাই সম্পাদিত হত। তৈল নিষ্কাশন শিল্পে গোরু মহিষের শক্তির ব্যবহার খুবই ব্যাপক ছিল। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত তা অত্যন্ত সহজ ও সরল ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের জটিল যন্ত্রপাতি প্রায় ছিল না বলে মনে হয়। উৎপাদন পদ্ধতি আদিম প্রকৃতির। কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্যের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য বিচার করলে উৎপাদনের কলা কৌশলকে তারিফ না করে পারা যায় না। পৃথিবীর সেরা শাড়ি ঢাকাই মসলিন ভারতেই তৈরি হত। ভারতে সুতা কাটা ও কাপড় বোনার পদ্ধতি এতই উন্নত ছিল যে ভারতে তৈরী শাড়ি সুদূর রোম সাম্রাজ্যের অভিজাত রমনীদের বিলাস চরিতার্থ করার জন্য অতি চড়া দামে বিক্রী হত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতের কার্পাস বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছিল। মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পায় সুতো কাটার অসংখ্য টেকো এবং কার্পাস বস্ত্রের টুকরো পাওয়া যায়। ভারতীয় মৃৎপাত্রেরও যথেষ্ট সমাদর ছিল। এখানে বিভিন্ন ধরণের প্রচুর মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। হাঁড়ি, কলসী, শরা, মটকী, গেলাশ, পেয়ালা, থালা, বাটি, হাতা, ঢাকনি, ঘট প্রভৃতি ভারতবাসীরা ব্যবহার করত। প্রধানতঃ কুমোরের চাকের সাহায্যে এ সব মাটির বাসন তৈরি হত। মহেঞ্জোদড়োতে চাক পাওয়া যায় নি। কাঠের জিনিস দীর্ঘকাল মাটির তলায় থাকায় হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে, তবে কুমোরের পোণ বা ভাটির চিহ্ন পাওয়া গেছে। ভারতের মৃৎশিল্প আজও অটুট আছে। উৎপাদন পদ্ধতি ও দ্রব্যের উৎকর্ষ খুব একটা পাল্টায় নি। প্রায় দু'হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আমাদের দেশে কুমোরের শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে যুগে শুধু সাধারণ রকমের মাটির বাসন তৈরী হত তা নয়, কাচের মত চকচকে ও মসৃণ বাসন তৈরী হত। বাসন-পত্তরগুলি রং করা হত। গায়ে নানারকম সুন্দর চিত্র এঁকে দেওয়া হত। এছাড়া ছোট ছেলেমেয়েদের আমোদের ও খেলার জন্য নানারকম মূর্তি ও খেলনা তৈরী হত। অনেক প্রাচীন রাজা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করে গেছেন। এ স্তম্ভগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাথর কেটে তৈরী হয়েছে। পাহাড় কেটে প্রাসাদতুল্য গুহা তৈরী অত্যন্ত ফ্যাসানের ব্যাপার ছিল। প্রাচীন ভারতে পাথর কাটার উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি নিশ্চয়ই ছিল। সাধারণ সহজ সরল যন্ত্রপাতির দ্বারা বড় বড় পাথর কেটে ছোট ছোট থালা বাসন তৈরী করা,

বড় বড় পাহাড় কেটে প্রাসাদোপম গুহা তৈরী সম্ভব হত না। প্রাচীন ভারতীয়রা উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত বলে আমরা অনুমান করতে পারি। দিল্লীস্থ কুতব মিনারের কাছে মেহরৌলীতে যে লৌহ স্তম্ভ অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তা অনেকের মতে চন্দ্র বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল। এ স্তম্ভটি ২৩ ফুট উঁচু। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় এ স্তম্ভটির কোথাও জোড়া দেওয়া হয় নি। এত বড় স্তম্ভটি কিভাবে তৈরী হল, কিভাবে বহন করে আনা হল ও কিভাবে বসান হল তা ভাবলে আমাদের অবাক করে দেয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে অন্ততঃ পক্ষে ৪০০০টি বর্ষা ঋতু এ স্তম্ভটির উপর দিয়ে বয়ে গেছে, তবু কোথাও একটু মরিচা ধরেনি। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতে খাঁটি লোহা তৈরী হত। লোহা বৈদিক যুগে ছিল কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তবে ছান্দোগ্য উপনিষদে সোনা, রূপা, লোহা, ও সীসা এ চারটি ধাতুর উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সোনা, রূপা, তামা, লোহা, টিন, সীসা ও পারদের নাম রয়েছে। বৈদিক যুগে হিন্দু রমণীরা সোনার অলঙ্কার ধারণ করত। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগেই ভারতে খনিজ পদার্থের আবিষ্কার হয় এবং ঐ সমস্ত পদার্থ থেকে ধাতু প্রস্তুতের বিশেষ কলকারখানার পত্তন হয়। রসার্ণব দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা। আকরিক খনিজ পদার্থ থেকে ধাতু তৈরীর জন্য রসার্ণবে শুধু যে বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে তা নয়, সে সময়ে যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হত সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা এই দুই শহরেই সোনা রূপোর বিবিধ অলঙ্কার আবিষ্কৃত হয়েছে। স্বর্ণকারের শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল এবং স্বর্ণকারেরা সূক্ষ্ম কাজে দক্ষ ছিল। মহেঞ্জোদড়োতে তিনটি রূপোর পাত্র ছাড়া আর যেসব বাসন পাওয়া গেছে সেগুলি তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী। সেখানে তামা ও ব্রোঞ্জের নানারকম জিনিস প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক প্লিনি প্রথম শতাব্দীতে লিখে গেছেন যে জগতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কাচ তখন ভারতবর্ষে তৈরী হত। বৈদিক যুগে মেয়েরা কাচের গহনা পরতো বলে শাস্ত্রে ইঙ্গিত রয়েছে। 'তক্ষশিলার নিকটবর্তী স্থানসমূহের মৃত্তিকাগর্ভে যে সমস্ত জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে মৌর্য রাজত্বের পূর্বেই কাচ প্রস্তুত প্রণালী খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল' (কুমারস্বামী)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও কাচের উল্লেখ আছে।

ঐতিহাসিকেরা বলেন যে চিনির উৎপাদন সর্বপ্রথম ভারতবর্ষেই আরম্ভ হয়। প্রাচীন গ্রীকদেশে ভারত থেকে চিনি রপ্তানি হত। উক্ত অঞ্চলে চিনিকে ভারতীয় মিষ্ট লবণ বলা হত। যদিও ব্যাপক উৎপাদনের জন্ম ভারি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তবু উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষ ও অভিনবত্ব দেখে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

সংগঠন ব্যবস্থা ঃ

প্রাচীন ভারতে দ্রব্যের উৎপাদন উন্নত ধরণের সংগঠন ব্যবস্থায় সম্পাদিত হত। উৎপাদনের চারটি প্রধান উপাদান। কাঁচামাল, শ্রমিক, মূলধন ও সংগঠনী প্রতিভা। এ উপাদানগুলির মধ্যে সংগঠনী প্রতিভার প্রয়োগ চাতুর্যই উৎপাদন ব্যবস্থাকে দক্ষ করে তোলে। যে দেশে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা যত বেশি পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও ধৈর্যশীল, সে দেশের দ্রব্য উৎপাদনের উপাদানের ব্যবহারও তত বেশি। এ উদ্যোগচাতুর্য আধুনিককালে বিভিন্ন রকম পদ্ধতিতে প্রয়োগ হচ্ছে। নানাপ্রকারের সংগঠনী ব্যবস্থা আছে, যথা একক মালিকানা, যৌথ পারিবারিক, অংশীদারী, সমবায় সমিতি ও কোম্পানি। এ সমস্ত সংগঠনী ব্যবস্থার অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতেও ছিল। একক মালিকানা কারবারে মালিক একজন। যিনি মালিক, তিনিই পরিচালক। মালিক স্বয়ং সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা চালান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিক নিজেই কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে দ্রব্য তৈরি অবধি যাবতীয় কাজ করে থাকেন। পারিবারিক সংগঠনের রীতিনীতি সম্পর্কে চালুক্য সম্রাট ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বিজ্ঞানেশ্বর 'মিতাক্ষরা' আইন লিপিবদ্ধ করেন। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি 'কর্তা' হিসাবে এ কারবার পরিচালনা করেন। পরিবারের অন্যান্য পুরুষেরা কারবারের মালিক বলে বিবেচিত হন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিদ্বয়ের লেখায় পারিবারিক ব্যবসায় সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এ ধরণের কারবারের সংখ্যাই প্রাচীন ভারতে বেশি ছিল। বৃটেনের অংশীদারী আইনের অনুকরণে ১৯৩২ সালে ভারতীয় অংশীদারী আইন প্রণীত হয়। স্বভাবতঃই মনে হবে যে পূর্বে আমাদের দেশে অংশীদারী সংগঠনে কোন ব্যবসায় পরিচালিত হত না। কিন্তু মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন প্রমুখ মনীষীদের লেখায় অংশীদারী সংগঠনের নানারকম বিধিনিষেধ পাওয়া

বায়। শুধু কি তাই, উক্ত বিধিনিষেধের সঙ্গে আধুনিক যুগের অংশীদারী আইনের অভাবনীয় সাদৃশ্য রয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রে অংশীদারী সংগঠনকে 'সম্ভূয়সমুত্থান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোন যজ্ঞ সমাপনান্তে পুরোহিতগণ যে হারে প্রাপ্য দক্ষিণা ভাগ করে থাকেন সে হারে অংশীদারেরা তাঁদের ব্যবসায়ের মুনাফা ভাগ করে নেবেন, এ নির্দেশ ছিল মনুর। কাজের পরিমাণ ও দায়িত্বের গুরুত্বের অনুযায়ী পুরোহিতদের দক্ষিণার পরিমাণ নির্ধারিত হত। তাছাড়া বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন ঋষিদ্বয়ের নির্দেশ অনুযায়ী প্রধান স্থপতির মজুরী অন্যান্য স্থপতির মজুরীর দ্বিগুণ হত। ১: ২: ৩: ৪এ অনুপাতে কোন কারবারের শিক্ষানবীশ, উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন নতুন কর্মচারী, অভিজ্ঞ কর্মচারী ও প্রধান কারিগর মুনাফা ভাগ করে নিত। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে প্রত্যেক অংশীদারী সংগঠনে অংশীদারদের মধ্যে একটি চুক্তি থাকবে এবং এ চুক্তির সর্তানুসারে অংশীদারেরা মুনাফা বণ্টন করবে। তাছাড়া মনু, বৃহস্পতি, ও কাত্যায়ন প্রভৃতির লেখা থেকে জানা যায় যে কোন অংশীদারের গাফিলতির জন্য কারবারের ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট অংশীদার কারবারের ক্ষতিপূরণ করবে। অপর দিকে কারবারের আসন্ন ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য কোন অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতি স্বীকার করলে কারবার সংশ্লিষ্ট অংশীদারকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেবে। ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারী আইনে অনুরূপ দুটি বিধি আছে, এ সাদৃশ্য বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ। ঋগ্বেদে সমবায় সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। ইংলণ্ডের রচডেইল ব্যবস্থার মত কোন সমবায় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না সত্য, কিন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে কিছু কিছু সংগঠন সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে শ্রমিক সমবায়, ব্যবসায়ী সমবায়ের জনপ্রিয়তা ছিল। নাসিকের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে সমবায় সংস্থাগুলি সন্ন্যাসী, দুঃস্থ ও পীড়িতদের সাহায্য প্রদান করত। কুষাণ আমলের মথুরা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে এক সমবায় সমিতি ৫০০ পুরাণ (মুদ্রা) গচ্ছিত আমানতের সুদ থেকে ১০০ জন ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন অর্থ সাহায্য করত। এ সংস্থা ক্ষুধার্ত ও নিঃস্বদেরও সাহায্য করত। এরূপ সাহায্য প্রদান করা আধুনিক সমবায় সমিতির একটি অন্যতম কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়। কারবার ছোট হলে মূলধন কম লাগে, লেনদেন কম হয়, একজন মালিকই তা পরিচালনা করতে পারে। ব্যবসায় বড় হলে মালিকের সংখ্যা বাড়াতে হয়।

তাই মালিকানাস্বত্বের বিস্তৃতির জন্য বিভিন্ন রকমের ব্যবসায়িক সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে। একজন মালিককে নিয়ে একক মালিকানা কারবার, দুই বা তার বেশি সংখ্যক মালিক নিয়ে অংশীদারী কারবার। এ ধরণের সংগঠন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি এদের অনিশ্চিত স্থায়িত্ব। মালিককে বাদ দিলে এ কারবারের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। মালিকের কর্মদক্ষতা, স্বাস্থ্য ও জীবনের উপর এ কারবারের উন্নতি ও অবস্থিতি নির্ভরশীল। ফলে এ কারবারের মূলধন অভাব হলে সহজে তা মেলে না। কারবারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত বলে জনসাধারণ এ কারবারকে ধার দিতে চায় না। কিন্তু বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উপরিউক্ত সংগঠনী ব্যবস্থা সুবিধাজনক নয়। বর্তমান সময়ে বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কোম্পানি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ হয়েছে। প্রাচীন ভারতে কোম্পানি সংগঠনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তেমন কোন প্রমাণ নেই। তবে অনেক বড় বড় কারবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া বৃহদায়তন কারবারের সুবিধা লাভের জন্য, তীব্র প্রতিযোগিতা জনিত অপচয় দূর করায় জন্য এমন অনেক ব্যবসায়িক জোটের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের কার্যপদ্ধতি ও উদ্দেশ্য অনেকটা আধুনিক যুগের পুল, কার্টেল, ট্রাষ্ট প্রভৃতি ধরণের। প্রাচীন ভারতে এ ব্যবসায়িক জোটকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হত। শ্রেণী, সঙ্ঘ, গণ, পুগ, ব্রাত, আরও কত কি। কোন গোষ্টির সভ্য ব্যবসায়িগণ একই জাতি বা পেশাভুক্ত ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তবে এমন অনেক ইঙ্গিত রয়েছে যা থেকে বলা যায় কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যের ব্যবসায়িগণ একত্র হয়ে একেকটি শ্রেণী গঠন করতেন। উত্তর বঙ্গে প্রাপ্ত ৪৪৩-৪৪ এবং ৪৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে শ্রেণীর সভাপতিকে নগরশ্রেষ্টিন, প্রধান ব্যবসায়ীকে সার্থবাহ, প্রধান কারিগরকে প্রথম কুলিক, প্রধান কারণিককে প্রথম কায়স্থ বলা হত। এ রকম একেকটি শ্রেণীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানতো ছিলই তাছড়া এরা অন্যান্য কাজও করত। এরা ভয়ানক ক্ষমতাশালী ছিল। এদের হাতে অনেক রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল। অনেক সময় দেশের রাজাকে ব্যবসায়িক জোটগুলির ক্রীড়নক হয়ে থাকতে হত। ব্যবসায়িক জোটের অভিমত অনুযায়ী রাজা তাঁর রাজ্যেয় ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক নীতি নির্ধারণ করতেন। একেকজন শ্রেণী সভ্য সমাজে এতটা প্রভাবশালী ছিলেন যে শত্রুগণ আক্রমণ করার আগে রাজ্যের শ্রেণী সভ্যদের

বিশেষ করে শ্রেণী প্রধানকে হাত করার চেষ্টা করত। তৎকালীন ব্যবসায়িক জোটগুলিকে প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত করা যায়। উৎপাদক ব্যবসায়ীদের জোট এবং দ্রব্য বিক্রেতাদের জোট। নবম শতাব্দীতে মনুস্মৃতির ভাষ্যকার মেধাদিতি শ্রেণী ও সংঘের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখিয়েছেন। একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যবসায়ীরা যে জোট সৃষ্টি করত তাকেই সাধারণতঃ শ্রেণী বলা হত। কুসীদজীবী শ্রেণী, কারিগরি শ্রেণী, গাড়োয়ান শ্রেণী, এরকম বিভিন্ন ব্যবসায়ের জোট তৈরী হয়েছিল। সংঘ কথাটি আরও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও বিভিন্ন জাতিভুক্ত ব্যবসায়ীদের সম্মেলনকে সংঘ বলা হত। এ শ্রেণী বা সংঘের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, এরা সমিতিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করত। আধুনিক যুগে কোম্পানী সংগঠনে যেমন কোম্পানির একটি আলাদা নিজস্ব আইনগত সত্তা আছে, তেমনি এ সংঘ বা শ্রেণীরও একটি নিজস্ব আলাদা সত্তা ছিল। কোন সভ্যের মৃত্যু বা অবসর গ্রহণের ফলে সংঘের বা শ্রেণীর অস্তিত্বে কোনরূপ ব্যাঘাত হত না। এ দিক দিয়ে কোম্পানির সংঘে মিল রয়েছে। আবার বিশেষ আইনে প্রতিষ্ঠিত 'কর্পোরেশন' নামক কোম্পানি প্রতিষ্ঠানের মত তৎকালীন শ্রেণী বা সংঘ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হত। এমন কি কোন কোন সংঘ সভ্যদের মাধ্যমে নিজস্ব মুদ্রা বাজারে ছাড়ত। এদের নিজস্ব বিচারালয়ও ছিল। সভ্যদের মধ্যে কেউ আইন অমান্য করলে সংঘ নিজস্ব বিচারালয়ের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর শাস্তির ব্যবস্থা করত। অর্থ জরিমানা বা দেশ থেকে বিতাড়ন বা অনুরূপ অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। প্রাচীন বৈশালীতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী, কারিগরী ব্যবসায়ী, সাধারণ ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের মধ্যে বিরাট বিরাট শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। আধুনিক যুগের বাণিজ্যিক সমিতি বা চেম্বার অফ্ কমার্স ধরণের কাজ শ্রেণীগুলি করত। একেকটি শ্রেণীর অন্তর্গত ছোট ছোট স্থানীয় সভ্য প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করত। শ্রেণীগুলির নিজস্ব শীলমোহরও ছিল। উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কোন কোন প্রাচীন জায়গায় এমন অনেক শিলালিপির অনুসন্ধান পাওয়া গেছে।

শ্রমিক ঃ

শ্রমিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ শ্রমিকের কর্মকৌশল ও শিক্ষাদীক্ষার ফলে দেশের শিল্প-উন্নতি ঘটে। শ্রমিকের কর্মকৌশল তার সন্তুষ্টির উপর

নির্ভর করে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সংগঠন ব্যবস্থায় শ্রমিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়েছিল। বর্তমান যুগে ব্যবসা বাণিজ্যে শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট প্রভৃতি অতি স্বাভাবিক ঘটনা। প্রাচীন ভারতে শ্রমিক অসন্তোষ সম্পর্কে তেমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি। বরং শিল্পপতিদের সঙ্গে শ্রমিকদের সাধারণতঃ সদ্ভাব বজায় থাকত। ব্যবসায়ীরা তাদের বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ব্যবসায়ের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ মনে করতেন। তাই তাঁরা কর্মচারীদের শ্রদ্ধা করতেন। শ্রমিকদের শ্রম সম্পদ বলে বিবেচিত হত। প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন তেমনি শ্রমিকের শ্রম শক্তিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার, এ চিন্তা সে কালের ভারতীয় শিল্পপতিদের ছিল। শ্রমিককে উপযুক্ত পরিমাণে মজুরী দিতেন। শ্রমিকদিগকে মুনাফার অংশ অবধি দেওয়া হত। এ যুগে শ্রমিককে অনেক সংগ্রাম করে এ অধিকার সংগ্রহ করতে হচ্ছে। কোন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়লে মালিক তার সেবাশুশ্রূষার দায়িত্ব নিতেন। কাজের দক্ষতা অটুট রাখার জন্য দৈনিক কিছু সময় বিশ্রাম, নির্দিষ্ট দিন অন্তর ছুটি, জীবন ধারণের উপযোগী বেতন প্রভৃতি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার বলে বিবেচিত হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। শুক্রের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রমিকের যোগ্যতা ও উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে মজুরীর পরিমাণ ধার্য হত। স্বভাবতঃই দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকরা অধিক বেতন পেতেন। শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন না দিলে ব্যবসায়ীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হত। তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হত। বর্তমান যুগে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক সংঘের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীন ভারতেও শ্রমিক সংঘের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতক কাহিনীতে শ্রমিক সংঘ সম্পর্কীয় কাজের হদিশ মিলে। কৌটিল্য, কামান্দক ও শুক্র এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে শ্রমিকের শ্রম উৎপাদন কাজে ব্যবহারের জন্য তাকে উপযুক্ত পরিমাণে মজুরী দিতে হবে, আর শুধু মজুরী দিলেই চলবে না, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কিছু সময় যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে দ্রব্য উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের বিশেষ শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

মুদ্রা ব্যবস্থা ঃ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য চলে আসছে। ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম দিক যথা, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক ও ঋণ ব্যবস্থা, পরিবহণ, বীমা,

বিজ্ঞাপন, গুদামঘর এ সমস্ত কিছুরই আশ্চর্যরকম উন্নতি হয়েছিল। এ সব সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে। দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় খুবই সহজ সরল পদ্ধতিতে হত। খুচরো ও পাইকারী উভয় রকম লেনদেনের প্রচলন ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজা দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতেন। দেশে ভোগ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য ও মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতার জন্য খুব কম দামে দ্রব্যাদি বিক্রয় হত। মুদ্রার অভাবে 'বার্টার' বা 'দ্রব্যের বদলে দ্রব্য বিনিময় পদ্ধতি' জনপ্রিয় ছিল। তবে গ্রামের দিকেই এ পদ্ধতিতে লেনদেন হত। তাছাড়া কোন এক সময়ে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা মুদ্রার বিনিময়ে দ্রব্য বিক্রয় হীন কাজ বলে মনে করতেন। কোন কোন সম্প্রদায় সোনা রূপো নিয়ে দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছিল। তবে অনেকেই মনে করেন যে ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম মুদ্রার সৃষ্টি হয়। প্রায় ছয়শত খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ছিদ্রকরা রূপো ও তামার মুদ্রা ভারতে ব্যবহৃত হত। মনু স্মৃতিতে মুদ্রার মান ওজনের ভিত্তিতে করার নির্দেশ রয়েছে। মুদ্রার একেকটি একককে বলতো 'রক্তিকা' বা 'রতি'। আশি রক্তিকার মূল্য এক সুবর্ণ। সুবর্ণ সুবর্ণ ছিল নির্দিষ্ট মানের সোনার মুদ্রা। আশি রক্তিকার সমান তামার মুদ্রাকে কার্সাপন বলত। একশ রক্তিকার সমান তামার মুদ্রাকে বলতো পণ। আর বত্রিশ রক্তিকা মানের রূপোর মুদ্রাকে বলা হত পুরাণ বা ধরণ। রাজা কখনো কখনো ব্যবসায়িক সংঘ শীলমোহরের ছাপ দিয়ে মুদ্রা বাজারে ছাড়তো। অর্থশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী মুদ্রা তৈরীর একচেটিয়া অধিকার কেবল মাত্র রাজারই ছিল। লক্ষণাধ্যক্ষ নামক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জনসাধারণের কাছ থেকে সোনা বা রূপো বা তামার পিণ্ড গ্রহণ করে মুদ্রা তৈরী করে দিতেন। মুদ্রা তৈরীর জন্য প্রতি মুদ্রায় নির্দিষ্ট হারে শুল্ক রাজাকে দিতে হয়। এ ধাতব মুদ্রা প্রচলনের অনেক আগে কড়ি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কড়ি হল শামুক জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী বিশেষের খোলা। কড়ির অপর নাম কপর্দক। তাই আজও আমরা অর্থাভাবকে কপর্দক শূণ্যতা বলে থাকি। বৈদিক যুগে গোরুও মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে পুরোহিতদের দক্ষিণা গোদানের দ্বারাই করা হত। গীতা মহাত্ম্য অধ্যায়ে আছে, "তদা গোদানজং পুণ্যং লভ্যতে নাত্ত সংশয়"। গোরুর মত মূল্যবান সম্পদ আর কি আছে? তবে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে লেনদেনের পরিমাণ বাড়লে কড়ি বা গোরু দিয়ে মূল্য আদান প্রদান খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। বৃহদারণ্যক্ উপনিষদে রয়েছে বিদেহ রাজ জনক পণ্ডিতদের সভা

ডেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যকে এক হাজার গোরু দান করেন। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে কি ভাবে এতগুলি গোরু একস্থানে জড়ো করা হয়েছিল এবং কি ভাবেই বা সেগুলি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বহন করে নিয়ে যান। যুগের প্রয়োজনে মুদ্রা ব্যবহার পরিবর্তন হয়। পরবর্তী যুগে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। চন্দ্রগুপ্তের সময় সোনা, রূপো ও তামার মুদ্রা প্রস্তুত হত এ সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ রয়েছে।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ঃ

সমাজে ধাতব মুদ্রার প্রচলন হলে, মুদ্রার রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা দেখা দেয়। প্রাচীন ভারতে জন সাধারণের সুস্থ সুন্দর পারিবারিক জীবন ছিল। পরিবার পরিজনকে সুখশান্তিতে রাখার জন্য পরিবারের কর্তরা উপার্জনের কিছু অংশ সঞ্চয় করত। এ সঞ্চয় তাদের ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রেহাই দিতো। কিন্তু সঞ্চয়ের পরিমাণ বেড়ে গেলে চুরি ডাকাতির ভয় ছিল। চুরি ডাকাতির হাত থেকে সঞ্চয়কে রক্ষা করার জন্য তারা সমস্ত সঞ্চয় দেশস্থ মহাজন, সাহুকার, শ্রেষ্ঠিনদের কাছে জামানত রাখত। মহাজনেরা এ জামানতী মুদ্রা বিভিন্ন ব্যবসায়ে খাটিয়ে প্রচুর লাভ করতেন। জামানতের পরিমাণ বাড়াবার জন্য মহাজনেরা তাদের লাভের একটা অংশ সুদ হিসাবে আমানতকারীদের দিতেন। ফলে দেশের জনসাধারণদের মধ্যে সঞ্চয় করার আগ্রহ বাড়তে থাকে। এভাবে সে সময়ের মহাজন, সাহুকার ও শেঠ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবসায়ীরা জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করতেন। অন্য কোন ব্যবসায়ীর মূলধনের অভাব হলে চড়া সুদে আমানতি মুদ্রা ধার দিতেন। আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কাজের সঙ্গে এ মহাজনদের কাজের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করে এবং প্রয়োজন সময়ে উক্ত অর্থ আমানতকারীকে ফেরত দেয় বা কিছু পরিমাণ সুদ লাভের আশায় অন্য কোন ব্যবসায়ীকে স্বল্পকালীন ঋণ দেয়। কোন দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির মূল সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক ব্যবসা। ব্যাঙ্ক মুদ্রার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যবসায়ীর মূলধন সরবরাহ করে। মূলধন ব্যবসায়ের প্রাণ। ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ব্যবসা বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। প্রাচীন ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসা আরম্ভ হয় দেশীয় মহাজন, সাহুকারে ও শেঠ সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা। পুগ নামক-অনেক ব্যবসায়িক সংঘও ব্যাঙ্ক ব্যবসা করত। বড় বড় মন্দিরের মালিকরাও অনেক সময় ব্যাঙ্কের

মত দামী গহনাপত্র ও মুদ্রা আমানত রাখত এবং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে মুদ্রা ধার দিত। বর্তমান যুগে দেনা পাওনার স্বীকৃতিস্বরূপ নানারকম দলিলপত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। ঐ দলিলপত্রগুলির মধ্যে চেক, হুণ্ডি ও প্রতিশ্রুতি পত্র প্রধান। জাতক কাহিনীতে ও অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মনে হয় তখনকার দিনেও প্রতিশ্রুতি পত্র ও হুণ্ডি জাতীয় দলিলের ব্যবহার ছিল। ধর্মসূত্রে সুদকে কুসীদ বলে উল্লেখ করেছে। সাধারণতঃ সে সময়ে কুসীদজীবীদের অবহেলা করা হত। কিন্তু পরবর্তী যুগে মুদ্রার লেনদেন ব্যবসায়ে কুসীদ অর্জনকে প্রধান চারটি বার্তা বা পেশার অন্যতম বার্তা বা পেশা হিসাবে গণ্য হতে থাকে। শ্রেষ্ঠিনগণ অত্যন্ত সম্মানীয় ছিলেন। 'শ্রেষ্ঠী' কথাটি একটি সম্মানীয় পদবী। শ্রেষ্ঠীরাই ছিলেন সমাজের বড় বড় ব্যবসায়ী। বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে যে রাজ্যের প্রধান শ্রেষ্ঠীকে রাজাও সমীহ করতেন রাজদরবারে তাঁকে বিশেষ সভাপদ দেওয়া হত। গুপ্তযুগে দেখা গেছে শ্রেষ্ঠী জেলাশাসক পরিষদের একজন সভ্য হিসাবে নির্বাচিত হতেন। দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সুদের হারের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা সচেতন ছিলেন। অর্থশাস্ত্র, স্মৃতি, অগ্নিপুরাণ, প্রভৃতি গ্রন্থে সুদ সম্পর্কে নানান বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সে যুগেও ঋণের পরিমাণ, অধমর্ণের পরিচিতি, ঋণ পরিশোধের সময় প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে সুদের হার ধার্য হত। বন্ধকী ঋণের উপর সুদের হার কম ছিল। তাছাড়া অধমর্ণের সুবিধার জন্য আসলের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য মূলধনের চাহিদা খুব বেশি ছিল। ভীষণ চড়া হারে সুদ দিয়ে ব্যবসায়ীরা মূলধন সংগ্রহ করতে কুণ্ঠা বোধ করত না। মূলধনের চাহিদা এবং চড়া সুদের হার সে সময়ে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে উন্নতি ঘটায়। তবে যাতে অতিরিক্ত চড়া সুদের হারে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব না আসে সেজন্য সর্বোচ্চ সুদের হার বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। অর্থশাস্ত্রে ও স্মৃতিতে ১৫% সুদের হারকে ন্যায্য বলে ধরা হয়েছে। মথুরা এবং নাসিক শিলালিপি থেকেও সুদের হার সম্পর্কে নানান তথ্য আমরা পেয়েছি। ২০০০ এবং ১০০০ কাহাপন (মুদ্রা) স্থায়ী আমানতের জন্য বাৎসরিক সুদের হার শতকরা ১২ ও ৯ ছিল।

দুটি কারণে প্রাচীন ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রসার ঘটেছিল। প্রথমতঃ জনসাধারণের মধ্যে সুদে অর্থ খাটানোর প্রবণতা এবং দ্বিতীয়তঃ ধনসম্পত্তির

রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। প্রাচীন ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসা সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল বলে অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। আধুনিক ব্যাঙ্কের মত এ সমবায় ব্যাঙ্ক অনেক সময় বহু সম্পত্তির অছিগিরির দায়িত্ব নিত। নাসিক নামক গুহায় বিভিন্ন শিলালিপিতে প্রাচীন ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেছে। কাঞ্চী নগরী এবং তার উপকণ্ঠের তিলি সম্প্রদায়ের সমবায় ব্যাঙ্কের উল্লেখ ২৬১ নম্বর মাদ্রাজ শিলালিপি (১৯০৯) থেকে পাওয়া যায়। ডি, স্পুনার বৈশালী (বসার) থেকে কমপক্ষে ১৬টি সীল পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে প্রতিটি সীলে 'শ্রেষ্ঠি নিগমস্য' কথাটি বর্তমান এবং এ দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বৈশালীতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। মনুও বৈশালীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

পরিবহণ ব্যবস্থা ও গুদামঘর

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের অন্যতম বাহক পরিবহণ ব্যবস্থা। আধুনিক যুগে পরিবহণ ব্যবসা বাণিজ্যের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে। উন্নত ধরণের পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যবসায়ের নতুন নতুন দিক উদ্ঘাটন করছে। সড়ক পথ, নদীপথ, রেলপথ, সমুদ্রপথ, ও বিমান পথ এ পাঁচটি প্রধান পরিবহণ মাধ্যম। প্রাচীন ভারতে উন্নত ধরণের সড়ক ব্যবস্থা, নদীপথ, ও সমুদ্রপথ ছিল। অশোকের শিলালিপি, অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতি, সর্বোপরি মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ হতে জানা যায় যে সে সময়ে রাজারা সুন্দর সুন্দর রাস্তা তৈরী করতেন। রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্তপাল নামক রাজকর্মচারী নিযুক্ত করতেন। শুক্রের লেখা থেকে জানা যায় যে রাজ্যের প্রধান সড়কগুলি চওড়া ছিল প্রায় ৪৫ ফুট। আর রাস্তার দুদিকে জল নিষ্কাশনের উত্তম ব্যবস্থা থাকত। মহেঞ্জোদড়োতে রাস্তাগুলি সোজাসুজি পূর্ব-পশ্চিমে বা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। দু'পাশে পাকা নদমা ছিল। বৌদ্ধযুগে উত্তর ভারতে বড় বড় সড়ক তৈরী হয়। মৌর্যযুগে দাক্ষিণাত্যেও অনুরূপ সড়ক তৈরীর প্রমাণ রয়েছে। কলিকাতার অনতিদূরে গঙ্গানদীর তীরে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে নদীতীর বেয়ে চম্পা, পাটলিপুত্র ও বারাণসী হয়ে কৌশম্বী পর্যন্ত একটা রাজপথ ছিল। এ প্রধান রাজপথের একটি শাখা বিদিশা ও উজ্জয়নী হয়ে নর্মদা নদীর মুখে পাটল বন্দর অবধি গিয়েছে। আরেকটি প্রধান রাস্তা দিল্লী থেকে পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী অতিক্রম করে সাকাল বা শিয়ালকোট হয়ে

তক্ষশীলা অবধি বিস্তৃত ছিল। এ পথটি কাবুল উপত্যকা হয়ে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগ সাধন করেছিল। দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠান থেকে উজ্জয়নী পর্যন্ত একটি রাজপথ ছিল। এ পথটি কাঞ্চি, মাদুরাই প্রভৃতি অঞ্চলগুলির সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগ সাধন করেছিল। প্রাচীন ভারতে সেতু ছিল কিনা এ বিষয়ে সঠিক মন্তব্য করা সম্ভব নয়। খেয়া পারাপারের মাধ্যমেই সাধারণতঃ নদীনালা পার হতে হত। রাজা কর্মচারী নিয়োগ করে খেয়াঘাট রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তাছাড়া খেয়া মাঝির প্রাপ্য মজুরী নিয়ে অনেক গীতি উপাখ্যান আজও লোকের মুখে শুনা যায়। যে সমস্ত নদী ব্যাপকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত হত তার মধ্যে প্রধান গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, কৃষ্ণা। ব্যবসায়ীরা এ নদীপথে দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করতেন। পথে চুরি ডাকাতির ভয় ছিল। তাই সে সময়ের রাজারা পথচারী ও ব্যবসায়ীর নিরাপত্তার জন্য রাস্তা ও নদীপথের মাঝে মাঝে পাহারাদার নিযুক্ত করতেন। সাধারণতঃ স্থানীয় উৎপাদকেরাই বাজারে দ্রব্য যোগান দিতেন। বিলাসজাত দ্রব্য দূর দূর অঞ্চল থেকে আমদানি হত। দক্ষিণ ভারতের মশলা, চন্দন কাঠ, সোনা, ও মণিমুক্তা, বারাণসীর সিল্ক, বাংলার মসলিন শাড়ি, পার্বত্য অঞ্চলের মুখোশ, জাফরাণ ও চামর, দক্ষিণ বিহারের লোহা, দাক্ষিণাত্য ও রাজস্থানের তামা, সমুদ্র সৈকত অঞ্চলের লবণ, পাঞ্জাবের পার্বত্য লবণ, সিন্ধু গাঙ্গেয় উপত্যকার চিনি, চাউল, গম, প্রভৃতি খাদ্যশস্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রয় হত।

জায়গায় জায়গায় দ্রব্য মজুত রাখার জন্য তৎকালীন রাজারা গুদামঘর তৈরী করতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গুদামঘর সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা আছে। সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয়, সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতায় গুদামঘরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। 'বর্তমানে সেটি উত্তর-দক্ষিণে ১৬৮ ফুট লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৩৪ ফুট চওড়া। সম্পূর্ণভাবে খনন কার্য সমাধা হলে হয়তো আরও বৃহত্তর বলে প্রমাণিত হতে পারে। কি উদ্দেশ্যে এ দালান তৈরী হয়েছিল তা জানা যায় নি, তবে এটি একটি বড় গুদামঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে' (ম্যাকে)। গুদামঘরের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। রাজার অধীনে কতকগুলি গুদামঘর রাখার নির্দেশ ছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্য

প্রাচীন ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় তার বৈদেশিক বাণিজ্য। পাশ্চাত্ত্যের সুদূর রোম সাম্রাজ্যে এবং প্রাচ্যের সুদূর জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, মালয় ও চীন প্রভৃতি দেশে ভারতীয় দ্রব্যের প্রচুর সমাদর ছিল। পাশ্চাত্ত্যে এ বহির্বাণিজ্য দুটি ধারায় চলত। স্থলপথে আফগান ইরাণ দেশ হয়ে আর জলপথে লোহিত সাগর হয়ে। প্রাচ্যে এ বহির্বাণিজ্য সমুদ্রপথেই ছিল। তবে অনেকের মতে পার্বত্য পথে সে সময় তিব্বত হয়ে চীন দেশে যাবার রাস্তা ছিল। সে সময়কার ভারতের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলি ছিল মশলা, গন্ধদ্রব্য, কার্পাস, বস্ত্র, চিনি, চাউল, গম, ঘি, লাক্ষা, নীল, জহর, হাতির দাঁতের সৌখিন দ্রব্য, লোহা ও নানা জাতের পশুপাখি যথা হাতি, বাঘ, সিংহ, মহিষ, গণ্ডার, বানর, টিয়া, ময়ূর ইত্যাদি। রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের অনুকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত থাকত, কারণ রোমে রপ্তানি বেশি হত। তাই প্রতি বছর ভারত প্রচুর পরিমাণে সোনা ও মুদ্রা রোম থেকে আমদানি করত। কোন এক সময়ে রোমের অধিকাংশ মুদ্রা ভারতবর্ষে চলে আসে। এমন কি ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে রোম সাম্রাজ্যের মুদ্রার ব্যবহার হত। ইংরেজ শাসনের সময়ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় রোম দেশীয় মুদ্রা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক প্লিনির মতে অর্থনৈতিক কারণে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রোমের মুদ্রা ভারতের বাজারে চলে আসার ফলে রোমের ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব আসে। রোমের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হয়। জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়ে। রোমের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য প্লিনি সে সময়কার রোমান রমণীদের দোষারোপ করেন। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে রোমান রমণীদের বিলাস চরিতার্থতার জন্য প্রতি বছর ভারতীয় ব্যবসায়ীরা রোমে একশ মিলিয়ন সেস্টের্স (sesterces) মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করে অনুরূপ পরিমাণে মুদ্রা ভারতে নিয়ে যেত। পরিব্রাজক রচনায় স্বামীজী লিখেছেন, "বাবিলন, ইরান, গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতো, তা অনেকে জানে না। রোম ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীয় ভিনিস ও জেনোয়া ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্ত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্করা রোম সাম্রাজ্য দখল করে ইতালীয়দের ভারত বাণিজ্য রাস্তা বন্ধ করে দিলো, তখন জেনোয়াবাসী কলম্বাস আটলাণ্টিক

পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করার চেষ্টা করেন, ফল আমেরিকা আবিষ্কার। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বাসের ভ্রম যায় নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেইজন্যই আমেরিকার নিবাসীরা এখনও 'ইণ্ডিয়ান' নামে অভিহিত।"

এরপর ভারতের বহির্বাণিজ্য আফ্রিকা, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সুমাত্রা, বোর্ণিও, জাভা, চীন প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে বাড়তে থাকে। চীন দেশে ভারতীয় বিলাসজাত দ্রব্যের যথেষ্ট সমাদর ছিল। চীনা মাটির বাসনপত্র দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে ব্যাপকভাবে আমদানি হত। বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানতঃ সমুদ্রপথেই সম্পন্ন হত। তৎকালীন সমুদ্রপথে বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক মনোমুগ্ধকর উপাখ্যান বিভিন্ন পুঁথিপত্রে লিখা রয়েছে। চাঁদ সদাগর সপ্ত ডিঙ্গা নিয়ে বাণিজ্যে যেতেন এ কথা পাই মনসামঙ্গল কাব্যে। নানারকম ব্রত অনুষ্ঠানের পাঁচালিতেও ভারতীয় সদাগরের সমুদ্র যাত্রা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য জাহাজগুলি আকারে খুব বড় ছিল না, এ মর্মে ঐতিহাসিক প্লিনি মন্তব্য করেছেন। অজন্তার চিত্রেও কয়েকটি ছোট ছোট জাহাজ দেখানো হয়েছে। ভারত পরিদর্শক ফা-হিয়েন সিংহল থেকে জাভায় জাহাজযোগে গিয়েছিলেন। তাঁর জাহাজটিতে দু'শ জন যাত্রী ছিল বলে তিনি ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। তাই মনে হয় ভারতীয় সদাগরগণ উন্নত ধরণের জাহাজ ব্যবহার করতেন। ভারতীয় জাহাজে করে বিদেশীরা অবধি দ্রব্য পরিবহণ করতেন। বিদেশে ভারতে তৈরী জাহাজ বিক্রয়ও হত। সুপ্রতিষ্ঠিত জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও ব্যবসায়িক উদ্যম সম্পন্ন জনসাধারণ প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিল। জাতক কাহিনীতে রয়েছে যে কোন একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী ভ্রিগুকচ্ছ বন্দর থেকে বভেরু বা বেবিলনে বাণিজ্য করতে গেছিলেন। পালি ভাষায় লিখিত কয়েকটি উপাখ্যানে আছে ভারতীয় সদাগর আলেকজেন্দ্রিয়া, ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীনদেশে বাণিজ্যে যেতেন। কোন একটি উপাখ্যানে একজন ব্যবসায়ীর ছেলে কালো যবনের দেশে বাণিজ্যে গিয়েছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে সে সময় ভারতীয়রা ইউরোপবাসীদের যবন এবং মাদাগাস্কার (মালাগাসি) ও জাঞ্জিবার দেশের অধিবাসীদের কালো যবন বলত।

প্রাচীন ভারতের প্রধান বন্দরগুলি আফ্রিকা মহাদেশের নিকট অবস্থিত ছিল। ভ্রিগুকচ্ছ (নর্মদা নদীর মুখে), সুপার (বোম্বের নিকট), পাটল (সিন্ধু নদীর মুখে) এগুলি ছিল সে সময়ের উল্লেখযোগ্য বন্দর। আফ্রিকার

সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ার অন্যতম কারণ মৌসুমী বায়ু আবিষ্কার। ৪৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে হিপ্পলাস মৌসুমী বায়ু আবিষ্কার করলে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে নিরাপদে অল্পসময়ে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্য জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলিতে চলে আসত। অবশ্য খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেও ভারতীয় বণিকরা সোমালী বন্দরে ব্যবসা করতে যেত বলে জানা যায়। পূব উপকূলে নদী বন্দর হিসাবে চম্পার প্রতিষ্ঠা ছিল। মৌর্যযুগে চম্পার প্রাধান্য কমে যায় এবং কলিকাতার অনতিদূরে তাম্রলিপ্ত বা তমলুক প্রথম শ্রেণীর বন্দর হয়ে উঠে। তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সিংহল, মালয়, চীন প্রভৃতি দেশে দ্রব্য রপ্তানি হত। আচার্য বোধিধর্ম তাম্রলিপ্ত বন্দর হতে ভারতীয় সমুদ্রযানের যাত্রী হয়ে চীনে উপনীত হয়েছিলেন। সেদিনের বৌদ্ধ ভারতের সাংস্কৃতিক আকর্ষণে যে সকল চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের কেহ কেহ তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধ অবস্থার কথা ভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন।

বাণিজ্য শিক্ষা ব্যবস্থা

ব্যবসা-বাণিজ্য একটি সমাজ বিজ্ঞান। অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ের মত ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে চিন্তা, আলোচনা ও গবেষণা প্রযোজন। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ব্যবসা বাণিজ্যের জাগরণের পশ্চাতে ছিল মিল, রিকার্ডো, মার্শাল প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারা। অর্থনীতি, পৌরনীতি, ব্যবসায় সংগঠন ও পরিচালনা, হিসাব রক্ষণ, সংখ্যাতত্ত্ব, ব্যাঙ্কিং, বীমা, পরিবহণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আধুনিক ইউরোপীয় জনসাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যে অপরিসীম উন্নতি করেছে। প্রাচীন ভারতেও অনুরূপ একদল অর্থনীতিবিদ্দের আবির্ভাব হয়েছিল। কৌটিল্যকে অর্থনীতি শাস্ত্রের পথিকৃৎ বলা যায়। স্বর্ণময় গুপ্তযুগ সৃষ্টিতে কৌটিল্যের অবদান অনস্বীকার্য। অবশ্য কৌটিল্যের পূর্বেও অর্থনৈতিক শাস্ত্র ছিল। প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার্থীকে চারটি বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করতে হত। অন্বিক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি এ চারটি বিষয়। 'বার্তা' কথাটি এসেছে 'বৃত্তি' শব্দ থেকে। বৃত্তির অর্থ জীবিকা সংস্থানের পেশা। রাজাকেও বার্তা বিষয়ে পড়তে হত। ভারতীয় মনীষীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্যবহারিক জীবনে উন্নতি প্রয়োজন এবং জীবনের ব্যবহারিক দিকে উন্নতির জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার দরকার। তাই সে যুগে বার্তা অধ্যয়ন আবশ্যকীয়

করা হয়েছিল। বেদ অধ্যয়ন যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সাহায্য করে, তেমনি বার্তা অধ্যয়ন বৈষয়িক উন্নতির সহায়ক। আদর্শ সমাজ তৈরীর জন্য উপনিষদের বাণী 'দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে পরাচৈবাপরাচ' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বেদ ও উপনিষদ পরা শাস্ত্র, আর বার্তা অপরাশাস্ত্র। উভয় বিদ্যারই প্রয়োজন রয়েছে। বার্তা শুধু বৃত্তি বিষয়ক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করে। দ্রব্য উৎপাদন, বণ্টন ব্যবহার ও ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে। অর্থশাস্ত্রের আলোচনা এতই ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ যে এ পুঁথিটিকে ঋগ্বেদ বা অথর্ববেদের উপবেদ বলা হত। এরূপ মূল্যবান পুঁথি খুব কমই আছে। এ পুঁথির বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। পুঁথিটি পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। রাজার শিক্ষাদীক্ষা, রাজকীয় আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কার্যাবলী, অসামরিক আইন কানুন, দুর্নীতি মূলক ক্রিয়াকলাপ দমন (কণ্টক শোধন), রাজার জরুরী কার্যাবলী, রাষ্ট্রের গুণাবলী, কূটনৈতিক দৈত্য রাজ্যের বিপদ আপদ (ব্যসন) পররাজ্য অভিযান (বিজিগীষু), যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। শেষ অধ্যায়ে রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একটি সুন্দর পরিকল্পনা দেওয়া আছে। কৌটিল্য বলতে চেয়েছেন যে রাজ্য দখলই রাজার একমাত্র কাজ নয়। রাজ্য দখলে রেখে কি করে তা সুষ্ঠুভাবে শাসন করা যায় এ বিদ্যা রাজার জানা একান্ত প্রয়োজন। তাই রাজ্যের ঋদ্ধিবৃদ্ধি কিভাবে সম্ভব তা কৌটিল্য আলোচনা করেন। তাই অর্থশাস্ত্র বৈষয়িক শাস্ত্র। অর্থ বা সম্পদকে কেন্দ্র করে যাবতীয় কাজ এ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু। কৌটিল্যের পূর্বে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের লেখক ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে অনুরূপ কোন পুঁথি লিখেছেন বলে আজও জানা যায় নি। কৌটিল্যের পরে তাঁর অর্থশাস্ত্রের অনুসরণে পুরাণের ঢংয়ে 'নীতিসার' নামক একটি পুঁথি লিখেন মনীষী কামন্দক। প্রজাদের সুখশান্তি পরিবর্ধক রাজকার্য কি রকম হওয়া উচিত তা নীতিসারে আলোচনা করা হয়েছে। শুক্রনীতিসারে সামাজিক রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের সারগর্ভ চিন্তা রয়েছে। সোমদেব তাঁর নীতিবাক্যামৃতমে ধনসম্পদ, বৃত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কিছু বিধির প্রবর্তন করতে চেয়েছেন।

উপসংহার

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। অতীব পরিতাপের বিষয়, সেদিনকার সমৃদ্ধ ভারত এখন ঐতিহাসিক গ্রন্থের একটি উল্লেখ মাত্র। কী কারণে ও কেমন করে সে সমৃদ্ধ ভারত জীর্ণ হতে জীর্ণতর হয়ে গেল। পণ্ডিতেরা গবেষণা করে হয়তো কোন দিন প্রাচীন ভারতের পূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন। আর এ গবেষণার কাজ স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের একটি কঠিনতম দায়। সে যাইহোক সেই ভারতের সমৃদ্ধ জীবনের ঈর্ষান্বিত শোভার চিত্রটিকে আর ফিরে পাবার সম্ভাবনা নেই। শুধু কল্পনা করতে পারি, প্রাচীন ভারতের হৃৎ মৃদু হতে হতে একদিন স্তব্ধ হয়ে গেছে। আজিকার ভারতীয়ের পক্ষে ইহা একটি কঠিন বিস্ময়ের প্রশ্ন। সে কোন্ দুর্ভাগ্যের ঝড় যা ভারতের বহু শতাব্দীর সমৃদ্ধির পতন এনেছিল? অনুমান করার যুক্তি আছে, তা ছিল রাজনীতিক দুর্ভাগ্যের ঝড়। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসের ঘটনাতে প্রমাণ পাওয়া যায়, জাতির রাজনীতিক প্রতিষ্ঠা যখন আঘাতে আঘাতে বিচলিত হয়েছে, তখন তার শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও রিক্ততা এসেছে।

কয়েকজন আধুনিক চিন্তাবিদের
দৃষ্টিতে
ভারতীয় সংস্কৃতি

মানব সভ্যতায় ভারতীয় সংস্কৃতি

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

মানুষ মাত্রেরই একটি সাধারণ স্বভাব এই যে, সে মনে করে তাহার চারিদিকে যাহা কিছু দেখে, তাহার প্রায় সমস্তই অনাদি অনন্ত কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। 'প্রায়' বলিলাম এই জন্য যে কয়েকটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আমরা আজ যে সকল সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছি যেমন রেল, ষ্টিমার, হাওয়াই জাহাজ, রেডিও প্রভৃতি এগুলি যে প্রাচীনকালে ছিল না, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তা ছাড়াও এমন অনেক জিনিষ আছে যেগুলি বাদ দিয়া আমরা মানুষের জীবন কল্পনা করিতে পারি না। যেমন জমি চাষ করিয়া ধান, গম উৎপাদন করা এবং তাহা হইতে মানুষের খাদ্য সংগ্রহ করা, এবং সেই খাদ্য আগুনে সিদ্ধ করিয়া আহারের উপযোগী করা। আমরা কি কখনও ভাবিয়া দেখি যে, মানুষের সৃষ্টির পর লক্ষ লক্ষ বছর পর্যন্ত মানুষ ইহার কিছুই জানিত না। যে সকল ফল, মূল আপনা আপনি জন্মে সেই সমুদয় এবং বন্য পশু মারিয়া তাহার কাঁচা মাংস খাইয়াই মানুষ জীবন ধারণ করিত। তেমনি মানুষ ঘর বাড়ী তৈরী করিতে জানিত না, পর্বতের গুহায় বাস করিত। আলোর ব্যবহার জানিত না। রাত্রে অন্ধকারেই কাল কাটাইতে হইত। লোহা, তামা বা অন্য কোন ধাতুর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। পাথর ঘষিয়া অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ করিয়া অথবা পশুর বা মাছের হাড়, কাঠের মাথায় লাগাইয়া যে অস্ত্র তৈরী করিত তাহা দিয়াই পশু মারিয়া হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা এবং পশু বধ করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইত। মানুষ যেদিন ধনুক-বাণ জুড়িয়া দূর হইতে পশু বধ করিতে শিখিল, সেদিন মানুষের ইতিহাসে চিরস্মরনীয়—সেই দিন হইতে সে পশুর উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিল।

বাহ্যিক জগতে যেরূপ মানসিক জগতেও সেইরূপ, বিশ পঁচিশ হাজার বছর আগে কোন মানুষ কথাবার্তা দ্বারা অন্যের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিত না। আজ দুইটি ছয় মাসের শিশুকে অথবা দুইটি বয়স্ক বোবাকে একত্র বসাইলে যাহা হয়, মনের ভাবের আদান প্রদান সম্বন্ধে সমগ্র মানুষ জাতিরও সেই অবস্থা ছিল। কথা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভাবের বিনিময় অর্থাৎ ভাষার সৃষ্টি, মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিতে আগুনের ও ধনুর্বাণের

আবিষ্কারের ন্যায় যুগান্তরকারী ঘটনা—অথচ হাজার হাজার, হয়ত লক্ষ লক্ষ বছর মানুষ ভাষার ব্যবহার ছাড়াও জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিয়াছে। আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া লিখিত অক্ষরের দ্বারা ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা মানবের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অতি সাম্প্রতিক ব্যাপার। হাজার পাঁচেক বছর আগেও মানুষের অক্ষর পরিচয় ছিল না। তখন ছবি আঁকিয়া বা রেখা টানিয়া মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের বিবরণ রাখিয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে এইগুলি থেকে অক্ষরের উদ্ভব হইয়াছে। আজ যাকে আমরা সবচেয়ে পুরানো অক্ষর বলে জানি তা তিন হাজার বছরের আগেও প্রচলিত ছিল না।

কিরূপে মানুষ যে এইভাবে ধীরে ধীরে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার যেটুকু সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা জানি তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মানুষের এই অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছিল বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় ও সংস্পর্শের ফলে। কোন কোন দেশের লোক হয়ত দৈবাৎ কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুনের সৃষ্টি করিল—ক্রমে ক্রমে অন্য মানুষও তাহার সন্ধান পাইল। কৃষিকাজ, গৃহনির্মাণ, ধনুর্বাণ, ধাতুর ব্যবহার, এই সবই এই ভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিস্তৃত হইয়াছে। খুব প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানব সভ্যতার এইরূপ বিস্তারের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য এবং অসম্পূর্ণ। যেটুকু জানা যায় তাহার ফলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, প্রধানতঃ মিশর, ইস্রায়েল, পশ্চিম এশিয়ার ইউফ্রেটীস ও টাইগ্রিস নদীর তীর বাসী সুমের, হিটাইট প্রভৃতি জাতি এবং চীন ও ভারতবর্ষের অধিবাসীদের পরস্পর সাহায্য ও নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলেই মানব জাতির সভ্যতার এই অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে।

ইহার মধ্যে কোন্ দেশের অবদান কি এবং কতটুকু তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ভারতবর্ষের অবদান সম্বন্ধে অনেক মতামত প্রকাশিত হইয়াছে এই সম্বন্ধে কিছু বলাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রত্যক্ষ, বাস্তব ব্যবহারিক সভ্যতার দিক থেকে বলা যায় যে সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন নিদর্শন হইতে পাঁচ হাজার বছর আগেকার নাগরিক জীবনযাত্রার যে চিত্র আমরা কল্পনা করিতে পারি, ঐ যুগে অন্যত্র তাহার কোন নিদর্শন মেলে নাই। বেশ চওড়া বড় বড় সোজা রাস্তা তাহার ধারে ধারে পয়ঃপ্রণালী, দোতালা, তেতালা পাকা ইটের বাড়ী—বিস্তৃত স্নানাগার প্রভৃতি মানুষের ব্যবহারিক সভ্যতার যে

উন্নতির পরিচয় দেয়, পরবর্তী কালে অন্য দেশেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—স্থতরাং এ বিষয়ে ভারতের কাছে মানব সভ্যতা অনেক পরিমাণে ঋণী এরূপ অনুমান অসঙ্গত বলা যায় না। অগ্নিদেবতা সম্বন্ধে ঋগ্বেদে যে সব স্তুতি আছে তাহাতে মনে হয় আগুনের আবিষ্কারও ভারতে স্বাধীনভাবেই হইয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক বিষয় অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

লিখন পদ্ধতি সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। মিশর দেশের ছবির সাহায্যে লিখিবার পদ্ধতি (hieroglyphics) সবাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গৃহীত হয়। বর্তমান কালে ইউরোপে প্রচলিত অক্ষরগুলি ফিনিসীয় অক্ষর থেকে উদ্ভূত। গত শতাব্দীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে ভারতীয় অক্ষরও ঐ ফিনিসীয় অক্ষর থেকেই সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু মহেঞ্জোদারোতে যে শত শত ছবির অক্ষরযুক্ত সীল (seal) মোহর পাওয়া গিয়াছে তাহা এখনও কেহই পাঠকরিতে পারে নাই, স্থতরাং অসম্ভব নয়যে, ঐ থেকেই ভারতীয় অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। বহুকাল পূর্বে কানিংহাম সাহেব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় প্রাচীন প্রতি অক্ষরটিই, ঐ অক্ষর দিয়া আরম্ভ হইয়াছে এমন একটি দ্রব্যের ছবি থেকে আসিয়াছে। যেমন ক-অক্ষরটি ছিল বর্তমান যোগ চিহ্নের ন্যায় (+)। তিনি মনে করেন এটি 'করাত' বা অনুরূপ দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত আকৃতি মাত্র। এইরূপ খনিত্র থেকে খ, গগন থেকে গ, ঘণ্টা থেকে ঘ প্রভৃতি অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মত গৃহীত হয় নাই—কিন্তু অধিকাংশ অক্ষরের সহিত ঐ অক্ষর দিয়া আরম্ভ কোন দ্রব্যের অদ্ভুত আদর্শ দেখা যায়। চ, ছ, ধ প্রভৃতি ভারতীয় অক্ষরের সর্বপ্রাচীন রূপ যে অবিকল চামচে, ছত্র, ধনুকের ন্যায়, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

অক্ষর সম্বন্ধে যাহাই হউক সাহিত্যিক রচনার মধ্যে ঋগ্বেদ যে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। পূর্বোক্ত প্রাচীন ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাষার সহিত ঋগ্বেদের ভাষার যে মূলগত ঐক্য আছে—তাহা সকলেই স্বীকার করেন এবং এর ফলেই Comparative Philology নামক ভাষা বিজ্ঞানের সৃষ্টি। ঐ সমুদয়ের মূল যে আর্য ভাষা, তাহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। ভারতের ঋগ্বেদ গ্রন্থেই এর প্রাচীনতম রূপ আছে। মানুষ আদিম অবস্থায় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করে—যেমন মাতা, পিতা, দুহিতা,, ভ্রাতা প্রভৃতি—প্রায় সকল আর্যভাষাতেই ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে এখনও

প্রচলিত আছে—mother (mutter) father (pater), daughter (derher) brother (frater)—প্রভৃতি মাতর, পিতর, দুহিতর, ভ্রাতর—প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্য দেখে পণ্ডিত প্রবর ম্যাক্স মূলর বলিয়াছিলেন যে, অষ্টাদশ ঊনাবংশ শতাব্দীতে এইটিই জগতের একটি প্রধান আবিষ্কার। কেননা বৃহৎ জগতের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতিদের মধ্যে, আজকাল আকৃতি, প্রকৃতি, ঐতিহ্য, সংস্কার প্রভৃতির গুরুতর বৈষম্য থাকিলেও, এককালে যে ইহারা সকলে একই মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল পূর্বোক্ত শব্দসাদৃশ্য তাহাই প্রমাণ করে।

আদিম মানুষের ধর্মচিন্তা সম্বন্ধেও এইরূপ অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। ঋগ্বেদে যেমন ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য, ঊষা প্রভৃতি নানা দেবদেবী, নানাবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্য (ঝড়, বৃষ্টি, সমুদ্র, আকাশ, আগুন, সূয, প্রভাত কাল) প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা রূপে কল্পিত হইয়াছেন—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই সেইরূপ বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেসব দেশের প্রাচীন সাহিত্য না থাকায়, তাহাদের দেবদেবীর উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট ধারণা করা যাইত না। কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রাচীনতম সাহিত্য-গ্রন্থ ঋগ্বেদ সেই অভাব পূরণ করিয়াছে। এর মধ্যে সহস্রাধিক দেবস্তুতি আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে মানুষ কিভাবে নানা দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিল কিরূপে যজ্ঞ করিয়া অর্থাৎ খাদ্যপানাদি দানে তাহাদের তুষ্ট করিয়া তাহাদের সকল রকম অভাবের প্রতিকার আশা করিত—অনাবৃষ্টি হইলে ইন্দ্রের আরাধনা, সমুদ্র পার হইবার সময় বরুণের পূজা—ঝড় হইলে বায়ুদেবের আরাধনা, এ সকলের স্পষ্ট পরিচয় ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। সে যুগের লোকেরা বজ্র-বিদ্যুৎ দেখিলে ভয় পাইয়া এবং বৃষ্টির জন্য ভারতীয়েরা পর্জন্য দেবের আরাধনা করিত। বহুকাল থেকে ঋগ্বেদের এই দেবতাটির নাম ভারতবাসীরা ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু অনতিকাল পূর্বেও উত্তর ইউরোপের এক অতি ক্ষুদ্র প্রায়—অপরিচিত লিথুয়ানিয়া (Lithuania) দেশে খ্রীষ্টানেরা অনাবৃষ্টি হইলে এই পর্জন্য দেবের যে প্রার্থনা করিত, ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৮৩ সংখ্যক স্তুতির সঙ্গে তাহার বিশেষ পার্থক্য নাই।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে এইসব ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর ধারণা থেকে যে এক অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের ধারণার জন্ম হইল, তাহারও পরিচয় ঋগ্বেদে আছে। স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে সৃষ্টির মূলে এক ভগবান। মানুষ তাঁহাকে ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেবরূপে কল্পনা করে। জগতে ধর্মের যে চরম পরিণতি এক ভগবানে বিশ্বাস, ঋগ্বেদের বহুকাল পরে পৃথিবীতে খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম

তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহার মূলে আছে ঋগ্বেদের দ্যু-পিতর, গ্রীক Zeus (দ্যু:) এবং রোমান জুপিটার (Jupiter)। কিন্তু ঋগ্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসের বিবর্তনের ফলে কিরূপে এক ভগবানে বিশ্বাসের সৃষ্টি হইল—তাহার যে পরিচয় পাই—গ্রীক, রোম, বা প্রাচীন অন্য কোন ভাষায় কোন গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

উপসংহারে বক্তব্য এই, এক ভগবানে বিশ্বাসের উৎপত্তি ছাড়াও ভারতীয় সংস্কৃতির আর একটি বিশেষ অবদান--সর্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা। হিন্দুধর্মের প্রথম থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সময় পর্যন্ত, এই মত পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে যে, ভগবানকে নানাভাবে অভিহিত করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায়—ঠাকুরের কথায়, যত মত তত পথ। এখনকার প্রচলিত দুটি বড় ধর্মের মতে, যাহারা ঐ ঐ ধর্মানুযায়ী বিশ্বাস বা আচরণ না করে, সেইসব মানুষের মুক্তির কোন উপায় তো নাইই; অনন্ত নরক ভোগেরই ব্যবস্থা হয়। এই পরধর্ম সহিষ্ণুতা জগতের সংস্কৃতিতে, ধর্মপ্রাণ হিন্দুজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মের নামে যুগে যুগে যে বীভৎস অত্যাচার ও নরহত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা পড়িলে মনে সন্দেহ জাগে যে মোটের উপর ধর্মের দ্বারা মানুষের কল্যাণ যতটুকু হইয়াছে, অকল্যাণ হইয়াছে তাহার চেয়ে ঢের বেশী। ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায় ধর্মের নামে বীভৎস অত্যাচার করিয়াছে, এর ছোটখাট দৃষ্টান্ত থাকিলেও অন্য ধর্মের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। ভারতবর্ষ পরধর্ম সহিষ্ণুতার যে গৌরবময় আদর্শ জগৎসভায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার জন্য তহার গর্ব করিবার যথেষ্ট অধিকার আছে।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষা

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীতে তিনটী বিশিষ্ট সভ্যতার ধারা আজকাল বিদ্যমান। এই তিনটি ধারা হইতেছে [১] ভারতীয়—ইহার বাহন সংস্কৃত ভাষা, [২] চীনা—ইহার বাহন চীনা ভাষা, [৩] গ্রীক ও ইউরোপীয়—ইহার বাহন, প্রথমতঃ গ্রীক ভাষা, তদনন্তর লাটিন, তৎপরে ফরাসী, ইটালীয়ান, স্পেনীয়, ইংরেজী, জারমান ও রুষ। মুসলমান সভ্যতা মুখ্যতঃ গ্রীক সভ্যতার আধারের উপর স্থাপিত—তবে ইহার বাহন হইয়াছিল আরবী ও ফারসী। আজকাল এই তৃতীয় ধারাটিই বিশেষ প্রবল—আর দুইটীকে, এই গ্রীক মূল যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতা এখন বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িযাছে, এই সভ্যতার ক্রমিক পরিবর্দ্ধন ও প্রসার ঘটিতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার যন্ত্রশক্তির মারফৎ এই সভ্যতা এখন অপরাজেয় শক্তিতে বিশ্বজয় করিতেছে। চীনা সভ্যতা স্বাধীনভাবে চীন দেশে উদ্ভূত হয়, খ্রীষ্টজন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে, এই-সভ্যতা পরে কোরিয়ায়, জাপানে এবং টংকিনে ও আনামে প্রসার লাভ করে এবং তিব্বতে ও মধ্য এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। চীনা সভ্যতার পরিপুষ্টি সাধনের জন্য ভারতীয় সভ্যতা অনেকটা সহায়তা করে; ভারতের বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে আসার ফলে, দর্শন ও বিজ্ঞানে এবং শিল্প ও কলায় চীন উন্নতির অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। ভারতীয় সভ্যতা ভারতবর্ষে আর্য্য ও অনার্য্য (দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক) জাতির সংঘাতে ও মিলনের ফলে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়ায় এবং আর্য্য-ভাষা সংস্কৃত ইহার বাহন হয়। পরে এই সভ্যতা ভারতের বাহিরে কতকগুলি দেশে প্রসারিত হয়, তত্তৎদেশবাসিগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, মালয় দেশ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ বোর্ণিও, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, এবং আফগানিস্থান ও মধ্য এশিয়া—এই সমস্ত ভূভাগ ভারতীয় সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ভারতেরই এক অভিন্ন অংশ হইয়া দাঁড়ায়—বৃহত্তর ভারতে পরিণত হয়। চীন, কোরিয়া ও জাপানের মত সুসভ্য দেশও ভারতীয় সভ্যতা দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এবং অংশতঃ ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করে।

যে যে দেশে ভারতীয় সভ্যতা প্রসৃত হয়, সেই সমস্ত দেশে সংস্কৃত ভাষারও প্রচার ঘটে। এই ভাষা মানব-সভ্যতার এক অদ্ভুত সৃষ্টি। পৃথিবীতে তিনটী মৌলিক সাহিত্য আছে—গ্রীক সাহিত্য, চীনা সাহিত্য এবং সংস্কৃত সাহিত্য। অন্যান্য ভাষার সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে এই তিনের একটী দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত অথবা অনুপ্রাণিত। এই তিনটী প্রধান ভাষার নিজস্ব গুণ কতকগুলি আছে। অন্যান্য সকল ভাষা সম্বন্ধেই অবশ্য একথা খাটে। সাধারণতঃ, ভাষা জাতির সভ্যতার মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া থাকে। জাতির সভ্যতার ও মনোভাবের ছাপ যেন ভাষাতেও পড়িয়া থাকে। ভারতীয় মনের ছাপ যে সংস্কৃত ভাষার উপর পড়িবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

ভারতীয় দর্শনে মানবজ্ঞানাতিগ নির্গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিচার ও মতবাদ একটি প্রধান কথা। "ব্রহ্ম" শব্দ সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গ হওয়ায়, এই প্রকার ধারণা, বিচার বা কল্পনার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছে। যাহারা ঐশী শক্তিকে কেবল He বা পুরুষ বলিতে অভ্যস্ত, তাহাদের মধ্যে মাতৃরূপিণী অথবা লিঙ্গাতীত ও গুণাতীত ঐশীশক্তির কল্পনা করা কঠিন হয়, কারণ তাহাদের ভাষায় She বা প্রকৃতি অথবা It বা কেবলমাত্র "সৎ" শব্দদ্বারা ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করার রীতি নাই। সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে ঠিক তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। অন্য জাতীয় চিন্তা বা চিন্তাভাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলির সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলিতে পারা যায়। কিন্তু বিশ্বমানবের পক্ষে ভারতীয় চিন্তার যদি কিছু অর্থ বা মূল্য থাকে তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষাও সেই চিন্তাকে প্রকাশিত ও পরিস্ফুট করিতে সাহায্য করিয়াছে এবং করিতেছে বলিয়া লোকের সাধুবাদ পাইবার যোগ্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের—অতএব সংস্কৃত ভাষারও—আর একটি প্রধান অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহা বিশ্বহিতৈষণা ও বিশ্ব সমন্বয়ের সাহিত্য ও ভাষা। এক অখণ্ড মানবজাতির বহু অংশ স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য-সমেত নিজ মহিমায় ও উপযোগিতায় বিদ্যমান. নিজ বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব লইয়া সমগ্রের গণ্ডীর ভিতরে প্রত্যেক অংশেরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে., এই কথা বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষেরই বাণী। সেই যে ঋগ্বেদের বাণী ঘোষিত হইল—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—"যাহা আছে তাহা এক, পণ্ডিতগণ তাহাকে বিভিন্নরূপে বর্ণনা করেন"—তাহা হইতে আরম্ভ

করিয়া জগতের সমক্ষে ভারতবর্ষ যে সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করিয়া আসিতেছে, তাহা মানব-সভ্যতার একটি বড় কথা। এই আদর্শের উদারতা ও ইহার সর্ব্বগ্রাহিতাকে বহু জাতি, ধর্ম ও সভ্যতা এখনও উপলব্ধি করিতে পারে নাই ও পারিতেছে না। বিভিন্ন মতবাদ যে মানুষের বোধ ও বিচার শক্তির অতীত একই বিরাট পরমার্থকে বুঝিবার প্রয়াস মাত্র, অতএব এই সকল মতবাদের সার্থকতা আছে, বিভিন্ন প্রকারের ধার্ম্মিক বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি যে বিভিন্ন প্রকারের পাত্রে অবস্থিত বিভিন্ন আকারগ্রাহী আকাশ বা বারিসমষ্টিমাত্র; অতএব বিরোধ কিছুই নাই, এবং এই বিভিন্নতার বৈচিত্র্য বিশেষভাবে উপভোগ্য, বিভিন্ন জীবন-প্রণালী একই বৃহত্তর মানব জীবনের পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ ভঙ্গী মাত্র, অতএব এক প্রকার প্রণালী দ্বারা অন্য প্রকারের প্রণালীর উচ্ছেদ-সাধন অনুচিত ও গর্হিত,—ভারতবর্ষ সাধনার পথে এই বড় সত্যের উপলব্ধি করিয়াছিল। এই সত্য যেমন একদিকে মানবকে আধ্যাত্মিক বোধ বা অনুভূতির চরম শিখরে লইয়া যায়, অন্যদিকে তাহাকে সমগ্র মানব-জগৎ —মানব-জগৎ কেন, প্রাণীজগৎকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দিতে শিক্ষা দেয়—তাহার মন হইতে বিরোধ ভাবকে দূরীভূত করে, যেখানে অজ্ঞতা বা বিরোধ, সেখানে তাহাকে করুণা ও মৈত্রীতে এবং সেবাধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করে। ইহাই ভারতীয় আদর্শ—বিশ্বময় নিজ আত্মার প্রসার, এবং বিশ্বাত্মাকে নিজের মধ্যে সঙ্কোচন বা গ্রহণ। সংস্কৃত ভাষা যেন বিশেষভাবে এই আদর্শেরই ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

"যিনি সমস্ত বস্তুকে নিজের আত্মাতেই দেখেন এবং সমস্ত বস্তুতে আত্মাকেও দেখেন, তদনন্তর তিনি নিজেকে গুপ্ত বা পৃথক্ করিয়া দেখিতে চাহেন না।"

আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখদায়ক ব্যাপার ইহাই হইতেছে যে আমরা ব্যবহারিক জীবনে এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি।

সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিশিষ্টতা হইতেছে, ইহার অন্তর্নিহিত অহিংসার বাণী। এই বাণী ভারতবর্ষের নিজস্ব। ইহা বাহির হইতে আগত আর্য্যদের বাণী নহে—ইহা বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি মতবাদ কর্তৃক প্রথম প্রচারিত হয়, জীব-অহিংসাময় বৈদিক বা আর্য্য-যজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ এই মনোভাব আত্মপ্রকাশ করে এবং এই মনোভাব ক্রমে সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে

পরিব্যাপ্ত হয়। "পশুমারণকর্ম দারুণ" ব্রাহ্মণও এই অহিংসা-বৃত্তিকে নিজ জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লন। অহিংসা নীতির ফলে সর্ব্বজীবের অন্তর্নিহিত পাবিত্র্য বা অলঙ্ঘ্যতা—The Sacredness of All Life—সম্বন্ধে সুহৃদয় ও সুশিক্ষিত মানবের চেতনা এখন সর্ব্বত্র জাগরিত হইতেছে। ব্যবহারিক জগতে হয়তো অহিংসানীতি সর্ব্বত্র অনুসৃত হওয়া কঠিন—যেমন রজোগুণের আবশ্যকতা যেখানে সেখানে মাংস ভক্ষণ অনুমোদিত হইলে অহিংসা পালন অসম্ভব হয়। কিন্তু আদর্শটী যে মহান্, এবং মানুষের পরমার্থ সাধনের পক্ষে যে অত্যাবশ্যক, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অহিংসা কেবলমাত্র negative বা নিষ্ক্রিয় রীতি নহে, ইহার অপরদিকে মৈত্রী ও করুণা রূপ positive বা সক্রিয় রীতি বিদ্যমান। অহিংসা রীতির মূলে আছে, বিশ্বপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে একটী বিশেষ দার্শনিকমত; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানবকেই কেন্দ্র করিয়া আছে, জগতের সমস্ত প্রাণী ও বস্তুর অস্তিত্ব কেবল মানবেরই দাসত্ব বা সেবার জন্য, এইরূপ অজ্ঞতা-প্রসূত দাম্ভিকতার স্থান এই মতে নাই। মানব বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একটী ক্ষুদ্র অংশমাত্র, মানবই চরম সৃষ্টি নহে। এইরূপ বোধ, পরমাত্মা ও জগৎ উভয়েরই সমক্ষে মানবকে নম্র ও বিনীত করিতে সাহায্য করে। এইরূপ আত্ম-বিনয় আত্মশুদ্ধির এবং আধ্যাত্মিক জীবনের দ্বারস্বরূপ।

ভারতীয় সাধনার তৃতীয় বড় কথা হইতেছে—মূলকারণ বা মূল সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা। সমগ্র ভারতীয় ও ভারতীয় মতবাদ এই সত্যানুসন্ধিৎসার বিবিধ বিকাশ মাত্র। "বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু", "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" "অপ্রমাদোহমৃতপদম্"—এই সমস্ত মহাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তর্ককে ঋষিবৎ মাননীয় করিয়া লইয়া, ভারতীয় সংস্কৃতি এই পথে অগ্রসর হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য এই সার-সত্যে ও মূল কারণে পঁহুছিবার জন্ত স্পৃহায় ভরপূর, সংস্কৃত ভাষাও যেন এই জিজ্ঞাসার আকর। এই সত্যদিদৃক্ষা যদি মানবকে নাস্তিকতায়ও লইয়া যায়, ভারতবর্ষের চিত্ত তাহার জন্ত কখনও ভীত হয় নাই।

আমার মনে হয়, এই যে সমন্বয়, অহিংসা ও সত্যানুসন্ধিৎসা—এই তিনটী হইতেছে আমাদের ভারতীয় সভ্যতার মূল বা প্রধান কথা। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এই তিনটি বিষয় পূর্ণরূপে পাওয়া যায় এবং সংস্কৃত ভাষাও যেন এগুলিতে ভরপূর। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে যেখানে যেখানে সংস্কৃত ভাষা গিয়াছে,

সেখানকার লোকেদের মধ্যে কিছু কিছু পরিমাণে এই সব ভাবও পঁহুছিয়াছে। বলি দ্বীপে ভ্রমণকালে একজন গুজরাটি খোজা মুসলমান দোকানদারের সঙ্গে দেখা হইল। বলিদ্বীপের লোকেরা এখনও হিন্দু, তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রচার একসময়ে হইয়াছিল, সংস্কৃত সাহিত্যের কতকগুলি বড় বড় বই যথা রামায়ণ, মহাভারত, কামান্দকীয় নীতিসার প্রভৃতির সঙ্গে তাহারা পরিচিত। গুজরাটি মুসলমানটী বলিদ্বীপের লোকের চরিত্র ও রীতি নীতির প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"বাবুজী, ইয়ে লোগ হিন্দু হৈঁ, ইস্‌মে ইন্‌মে সব্‌র্ বহুৎ হৈ" এই যে "সব্‌র্" অর্থাৎ ধৈর্য্য চিত্তস্থৈর্য্য, ইহা সমন্বয়বোধ ও অহিংসা এবং সার সত্যের দিকে লক্ষ্য স্থির থাকিলে সহজেই আইসে।

সংস্কৃত ভাষা বিরাট ভারতীয় সভ্যতার ভাষা। বহুদেশে এই ভাষা মানুষকে যুক্তিযুক্তভাবে গভীরভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছে। কতকগুলি ভাষা সংস্কৃতেরই প্রসাদে সাহিত্যিক পদবীতে প্রথম উন্নীত হইয়াছিল। যবদ্বীপীয়, শ্যামদেশীয় ও কম্বোজী ভাষা সংস্কৃতের পটভূমিকা ব্যতীত বড় হইয়া উঠিতে, অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিতে পারিতই না। এক সময়ে বাঙ্গালা, হিন্দী, মারহাটি, তেলুগু, তামিল কানাড়ী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাসার মত এই সংস্কৃতের ভাণ্ডার যবদ্বীপীয় ভাষার জন্ত মধ্য এশিয়ান খোটানী ভাষা ও কুচীয় ভাষার জন্য উন্মুক্ত ছিল, আবশ্যক হইলেই এইসব ভাষা সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া নিজ কলেবরের পুষ্টিসাধন করিত। এখনও যবদ্বীপীয় ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায়। শ্যামদেশ আধুনিক উন্নতির পথে যতই অগ্রসর হইতেছে ততই সংস্কৃতের দ্বারস্থ হইতেছে; নূতন নূতন ভাবের জন্য নূতন উদ্ভাবিত নানা বৈজ্ঞানিক ও অন্য বস্তুর জন্য যখনই নূতন শব্দের আবশ্যকতা হইতেছে, শ্যামদেশীয় ভাষা তখনই সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিতেছে। এইসব শব্দ লেখা হয় যথাবৎ সংস্কৃত বানানে, কিন্তু উচ্চারণ করে শ্যামদেশের বিকৃত উচ্চারণ রীতি অনুসারে Aeroplane এর জন্য "আকাশ-যান" শব্দ শ্যামদেশীয় ভাষায় প্রচলিত, উচ্চারণ করে "আগাৎ ছান্"; Telephone কে লিখিত শ্যামী ভাষায় বলে "দূর শব্দ", ইহার কথ্যরূপ "থোরো সপ্" রেলওয়ে লাইনের Traffic Superintendent পদের শ্যামী অনুবাদ করা হইয়াছে "রথচারণ প্রচক্ষ্" অর্থাৎ "রথচারণ প্রত্যক্ষ"; Irrigation Officer কে শ্যামী ভাষায় বলে "ওয়ারি সীমা ধ্যক্ষ্" অর্থাৎ "বারিসীমাধ্যক্ষ।" এইরূপ বহু বহু সংস্কৃত শব্দ ভারতের বাহিরের নানা

ভাষায় স্থান পাইয়াছে। চীনা-ভাষারও বহু সংস্কৃত শব্দ আছে। চীনা শব্দ দুই চারিটা সংস্কৃতেও স্থান পাইয়াছে—সংস্কৃতের একটি চীনা শব্দ হইতেছে "কীচক"—এক প্রকার বাঁশ অর্থে। চীনারা সংস্কৃত শব্দ প্রায়শঃ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া লয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বহু সংস্কৃত শব্দ চীনাদের মুখে বিকৃত হইয়া গিয়া চীনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—শব্দগুলি সংস্কৃত বলিয়া বুঝিবার আর উপায় নাই। সংস্কৃত "বুদ্ধ" শব্দ প্রথমে চীনাদের মুখে হয়, "বুধ", পরে "ভুদ্", পরে "বুৎ", শেষে "ফু" ও "ফাৎ" রূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছে; "অমিতাভ" হইয়া গিয়াছে "ও-মিতো-ফো", "ব্রাহ্মণ" হইয়া গিয়াছে "পো-লো-মন্", "ব্রাহ্ম, ব্রহ্ম", হইয়া দাঁড়াইয়াছে "ফান্"। চীনদেশের রাষ্ট্রনেতা Sun yat-sen সুন্ য়াৎ-সেন-এর নামের সুন্-অংশ হইতেছে তাঁহার বংশনাম বা পদবী (চীনাদের মধ্যে পদবী প্রথম লেখা হয়) এবং যাৎ-সেন্ তাঁহার ব্যক্তিগত নাম; এই "য়াৎ সেন্" আমাদের একটি সংস্কৃত শব্দের বিকৃত রূপ—ইহা দৈবীশক্তি বিশিষ্ট দেবযোনি "যক্ষ" (অর্থাৎ "যক্ষ") ব্যতীত আর কিছুই নহে। "যক্ষ" সম্বন্ধে নানা কাহিনী ও বিশ্বাস বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে যায়, ও "যক্ষ" শব্দটি নাম রূপে চীনদের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। জাপানী ভাষায়ও এইরূপ বহু সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। জাপানী অধ্যাপক আনেসাকি এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া ইংরেজী ভাষায় কতকগুলি বিশেষ উপযোগী প্রবন্ধ কিছুকাল হইল প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

এশিয়ার নানা ভাষার উপরে সংস্কৃতের প্রভাব আলোচনা—ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতি ও মনোভাবের প্রভাব আলোচনারই একটি প্রধান অঙ্গ। শিক্ষিত ভারতীয়ের পক্ষে গৌরবের বিষয় এই আলোচনায় যথেষ্ট আছে; কিন্তু এই আলোচনার প্রথম সোপান—ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাকে বুঝিতে ও শিখিতে হইবে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে হইবে, তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর, বিশেষতঃ প্রত্যেক হিন্দুর এই জন্য সংস্কৃতভাষার সহিত সামান্য পরিচয়ও অত্যন্ত আবশ্যক।*

* প্রাকৃত পত্রিকা হইতে লেখকের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

হিন্দু-সংস্কৃতি

ডক্টর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য-রত্ন

শংসন্তি শিল্পানি দেব শিল্পানি।
আত্ম সংস্কৃতির্বাব শিল্পম্ ॥
অনেন যজমানঃ আত্মানং সংস্কুরুতে।
অনুকৃতির্হি শিল্পম্ ॥

যাহার দ্বারা আত্মার সংস্কার সাধিত হয়, তাহাই সংস্কৃতি। সুতরাং ব্যক্তির মত জাতির, ব্যষ্টির মত সমষ্টির সংস্কারের মূল ভিত্তি হইল সংস্কৃতি। সংস্কৃতি—জাতির জীবিকার অবলম্বন—পশুপালন, কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য। সংস্কৃতি—জাতির সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, রাজ্য-শাসন পদ্ধতি। সংস্কৃতি—জাতির মানস সম্পদ, সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান। অতএব যে জাতির জীবিকার অবলম্বন যত উন্নত, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যত নির্দোষ, মানস সম্পদ যত সমৃদ্ধ, তাহার সংস্কৃতিও সেইরূপ উৎকৃষ্ট।

মানুষ যে দিন হইতে স্বভাবের সঙ্গে সংগ্রাম সুরু করিয়াছে, প্রাকৃতিক যুদ্ধে জয়ী হইতে চাহিয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহার সংস্কৃতির সূত্রপাত হইয়াছে। মানুষ তাহার স্বভাবজ প্রবৃত্তি—অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, লোভকে সংযত করিয়াছে, পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে বসবাস করিয়াছে, মানুষ—অগ্নি, বায়ু, বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করতে শিখিয়াছে, এই স্বভাবের উপর বিজয়-লাভের সঙ্কল্পেই তাহার সংস্কৃতির উদ্ভব। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই হইল প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন। অপরা প্রকৃতির পরাজয় শুধু পরা প্রকৃতির বশীকরণেই সাধিত হয়, ইহাই হিন্দুর অনাদিকালের আদর্শ। হিন্দু যেমন উচ্চগ্রামে সুর বাঁধিয়া দিয়া ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে এক দিব্য ভূমিতে সমুন্নত করিয়াছে, তেমনই স্বভাবের সঙ্গে সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির বশীকরণে সমর্থ হইয়াছে।

অনেকে হিন্দু সংস্কৃতিকে কৃষি-প্রধান বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এইরূপ অভিধানের সার্থকতা বুঝিতে পারি না। কৃষি এবং শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে

আবদ্ধ। কৃষির জন্যই শিল্পের প্রয়োজন হইয়াছিল। শিল্পের সাহায্য ভিন্ন কৃষি শস্য সম্পন্ন হয় না—তা সে শিল্প যতই নিম্নশ্রেণীর হউক। অবশ্যই এই শিল্প কুটির শিল্প নামে আখ্যাত হইতে পারে। তথাকথিত প্রস্তর যুগের শিকারী মানবও কুঠার এবং তীরের ফলক নির্মাণে শিল্পের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। তথাকথিত আদিম-মানবকেও গিরিগুহাবাসের জন্য শিল্পীর সাহায্য লইতে হইয়াছিল। কৃষিকার্যে আদিম কাল হইতেই লাঙ্গল, জোয়াল প্রভৃতি শিল্প দ্রব্যের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং আদিম মানব আগে কৃষক পরে শিল্পী এরূপ বিভাগ চলে কিনা সন্দেহ। প্রস্তর যুগের শিকারী মানব কবে পশুচারণে বা পশুপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাই বা কে বলিবে? অতএব তাহারাও আগে শিল্পী পরে পশু পালক এটরূপই অনুমান করিতে হয়।

ধর্ম এবং সংস্কৃতি এক বস্তু নহে এবং ভারতীয় সংস্কৃতিরই নামান্তর হিন্দু-সংস্কৃতি। তথাপি আমরা ভৌগলিক সংস্থান ধরিয়া নামকরণ না করিয়া প্রবন্ধের "হিন্দু সংস্কৃতি" নাম ইচ্ছাপূর্বক দিয়াছি। কারণ ভারতে হিন্দু ভিন্ন অপর কোন জাতি নাই, যাহারা আছে তাহারা সম্প্রদায় মাত্র, এবং পরবর্তী কালে হিন্দু-সংস্কৃতি হইতেই এই ভারতবর্ষে অপর কয়েকটি সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে।

ধর্ম এবং সংস্কৃতি এক বস্তু না হইলেও, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষত হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝিতে হইলে প্রধানতঃ ধর্মের মধ্য দিয়াই বুঝিতে হইবে। হিন্দু সংস্কৃতিকে আমি ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। জন্ম হইতে মরণোত্তর কর্তব্য বিধানে হিন্দু যে ছয়টি দেবতার উপাসনা করে, হিন্দু-সংস্কৃতির আংশিক নামকরণে আমি সেই ছয়টি দেবতারই সাহায্য লইয়াছি। হিন্দুর উপাস্য এই ছয়টি দেবতার নাম—'গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নি বিষ্ণু শিবং শিবা'। গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি। অতএব আমি হিন্দু সংস্কৃতির বিভাগ বণ্টন করিয়াছি—(১) গাণপত্য-সংস্কৃতি, (২) সৌর-সংস্কৃতি, (৩) আগ্নেয় সংস্কৃতি, (৪) বৈষ্ণব সংস্কৃতি, (৫) শৈব-সংস্কৃতি, ও (৬) শাক্ত সংস্কৃতি। ইহাদের সংক্ষেপত পরিচয় এইরূপ :—

(১) **"গাণপত্য-সংস্কৃতি"** :—শাস্ত্র বলিয়াছেন 'জ্ঞানং গণেশং'। মানুষের যেদিন হইতে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে মানুষ বুদ্ধির ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে,

মানুষের পঞ্চ সৃষ্টি বা পঞ্চজন একত্রে "গণে" দলবদ্ধ হইয়াছে—সেইদিন হইতেই গাণপত্য সংস্কৃতির সৃষ্টি। হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের—তাহার মানস-সম্পদের মূলে আছে এই গাণপত্য সংস্কৃতি। হিন্দুর বিদ্যা ও শ্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী ও লক্ষ্মী গণেশেরই সহোদরা। হিন্দুর ললিত কলা এই দেবগোষ্ঠীরই অবদান: উপনিষদের "দেবজন-বিদ্যা" এই গাণপত্য সংস্কৃতিরই পরিণতি। সঙ্গীত হইতে সাহিত্য, এমন কি দর্শন পর্যন্ত এই ধারণার অন্তর্ভুক্ত। যদিও নিশ্চিত রূপে চিহ্নিত করিবার উপায় নাই—তথাপি একথা বলিতে পারা যায় যে, রাজনীতি, হিন্দুর পারিবারিক প্রথা ও সমাজের আদিমতম বিধি ব্যবস্থা এই সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত। কালে গণপতি অপ্রধান হইলেও হিন্দু সমাজ হইতে তাঁহার প্রভাব অন্তর্হিত হয় নাই। ভারতের-তথা বাঙ্গালার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যেও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(২) "**সৌর-সংস্কৃতি:**" এক হইতে দশম সংখ্যা লিখন পদ্ধতি, যজ্ঞকার্য্যের ও মানবের শুভাশুভ গণনার জন্য দিন, পক্ষ, মাস, বৎসর, গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি প্রভৃতির আলোচনামূলক গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতি এই সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত। সমাজের সর্বস্তরে ইহার প্রভাব। বেদে মিত্র দেবতা বহু সম্মানিত। ভারতীয় ব্রাহ্মণের সর্বশ্রেষ্ঠ দীক্ষা সাবিত্রী দীক্ষা বা গায়ত্রী-দীক্ষা। গায়ত্রী মন্ত্রে মিত্র দেবতারই স্বরূপ প্রকাশিত। অধুনা সমাজে গ্রহাচার্য্যগণ যতই অবজ্ঞাত হউন, এক সময় তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণের অন্যতম ছিলেন। বসন্তের মত দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির চিকিৎসাও সৌর সংস্কৃতির সৃষ্টি। আয়ুর্বিজ্ঞানের কিয়দংশ এই সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

উড়িষ্যার কোণার্কের মন্দির এবং মন্দির পার্শ্বস্থ মূর্তি নিচয় সৌর-সংস্কৃতির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে-পরিচয় প্রকাশিত, তাহা লইয়া যে কোন দেশের যে কোন জাতি গৌরব করিতে পারে। এই মন্দির ও মূর্তি-গোষ্ঠী দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সৌর-সংস্কৃতির প্রভাব বহু বিস্তৃত ছিল। বাঙ্গালার নানাস্থানে বহু প্রাচীন সূর্য্য মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাঙ্গালার পাল ও সেন রাজগণের কেহ কেহ সৌর ছিলেন। পশ্চিম-বঙ্গের পল্লীর সর্বশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত "ইতুপূজা" বা "মিতু পূজা" মিত্র পূজারই নামান্তর। সূর্যদেব আজিও আরোগ্যের দেবতারূপে পূজা প্রাপ্ত হন।

(৩) "**আগ্নেয়-সংস্কৃতি:**"—মানুষের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে অগ্নিদেব যেদিন প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন।

প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণে অথবা অরণিকাষ্ঠের মন্থনে কিরূপে অগ্নির প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাহা ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। কিন্তু যে রূপেই তাহার আবির্ভাব ঘটুক, অগ্নিকে যাহারা প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন নিশ্চয়ই তাঁহাদের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমুন্নত ছিল। যজ্ঞবেদী নির্মাণের জন্য ভূ-মিতি ও পরিমিতি শাস্ত্রের উদ্ভব এই সংস্কৃতি হইতেই হইয়াছিল। আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদের অনেকাংশ এই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্কৃতি হইতে রাষ্ট্রনীতি ও অলঙ্কার শাস্ত্র এবং নক্ষত্র বিদ্যার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

আর্য্যগণের অনেকেই সাগ্নিক ছিলেন, তাঁহাদের পৃথক অগ্নি-গৃহ ছিল। প্রতিদিন এই গৃহরক্ষিত অগ্নিতে সমিধ দান করিতে হইত। আজিও কোন কোন ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত নিত্য-হোমে তাহারই শেষ স্মৃতি বর্তমান রহিয়াছে। কবে অভিশপ্ত-অগ্নি সর্বভুক্ হইয়াছেন। কবে আর্য্যগণের এক শাখা অগ্নি উপাসক পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে নিশ্চিত করিয়া জানিবার উপায় নাই। মনে হয় ব্রহ্মার সঙ্গে অগ্নির কিছু সম্বন্ধ ছিল। আজিও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি হিন্দুপ্রধান পল্লীতে অগ্নিভয় নিবারণ জন্য চৈত্র মাসের কোন এক নির্দিষ্ট দিনে অগ্নির আরাধনা হয়। ঐদিন ব্রহ্মা-পূজার দিন নামে পরিচিত। শান্তি-স্বস্ত্যয়নে হোম করিতে হইলে মর্ত্যে ব্রহ্মা আছেন কিনা দেখিয়া দিন স্থির করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন "জয়া পূর্ণা মহীতলে"। জয়া ও পূর্ণা তিথিতে ব্রহ্মা মর্ত্তে অবস্থিতি করেন। ব্রহ্মাও আদিতে পঞ্চবদন ছিলেন। মহাদেবের সঙ্গে বিবাদে তাঁহার একটি মস্তক লুপ্ত হইয়াছে। ভরতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলের ব্রহ্মা ব্যাসকে কহিতেছেন—

"আমার আছিল বাছা পাঁচটি বদন।
এক মাথা কাটিয়া লইল পঞ্চানন।"

এই বিবাদের পৌরাণিক রহস্য আছে এবং ব্রহ্মার এই মস্তকহীনতার সঙ্গে অগ্নিপূজা লোপেরও সম্বন্ধ আছে।

(৪) **"শৈব-সংস্কৃতি"** :—অনেকে বলেন আর্য্যগণ অথবা আর্য্যেতর কোন কোন জাতি আদিতে পশুচারক ছিলেন। আমার মনে হয় শৈব ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির সঙ্গে পশুচারক জাতীর সম্বন্ধ আছে। শৈব-সংস্কৃতির সঙ্গে কৃষির এবং বৈষ্ণব-সংস্কৃতির সঙ্গে বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। শৈব-সংস্কৃতি হইতে যে লোকগীতি এবং মঙ্গল কাব্যেরসৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শিবের

কৃষিকার্য্য একটি প্রধান উপাখ্যান। শৈব- সংস্কৃতি বহু প্রাচীন এবং অতীতে শিবোপাসক জাতিই কৃষির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইঁহারাই যোগমার্গের প্রবর্তক। চিকিৎসা কার্য্যে মুক্তা, প্রবাল, পারদ, স্বর্ণাদি ইঁহারাই প্রথম ব্যবহার করেন। ঔষধরূপে হলাহলের প্রয়োগও এই সংস্কৃতির অন্যতম দান।

জাতি গঠনে এই সংস্কৃতির অবদান বড অল্প নহে। সমাজের আপাদ মস্তক-চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই শিবপূজার অধিকারী, স্মরণাতীত কাল হইতে এই সংস্কৃতির মধ্যে শুদ্ধি-আন্দোলন অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য হরপ্রসাদের "মহাদেব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এই শুদ্ধির বিবরণ রহিয়াছেন। সেকালে একদল ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহারা "যাযাবর"। তাঁহাদের গোত্রই ছিল "যাযাবর।" ঋষি জরৎকারু প্রভৃতি "যাযাবব" গোত্রের ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের দলকে "ব্রাত্য" বলিত, দলভুক্ত সকলেই "ব্রাত্য" ছিলেন। দুই চারি দিনের জন্য ইঁহারা যেখানে থাকিতেন সেই স্থানকে "ব্রাত্য" বলিত। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বলে ব্রাত্যেরাও ঋষিদের মত দৈব প্রজা অর্থাৎ দেবতাব উপাসক। তবে তাঁহাদের দেবতারা স্বর্গে গিয়াছিলেন। মরুৎ দেবতারা তাহাদিগকে কতকগুলি সামগান শিখাইয়া গিয়াছিলেন। সেই গান করিলে তাঁহারা দেবতাদের খুঁজিয়া পাইতো। সেই গানগুলির নাম 'ব্রাত্য স্তোম'। যে যজ্ঞে ব্রাত্য স্তোম হইত তাহার নামও ব্রাত্যস্তোম। অন্য অন্য যজ্ঞে ঋত্বিক ছাড়া একজন মাত্র যজমান থাকে, দুইজন যজমানের কথা বড দেখা যায় না। কিন্তু ব্রাত্যস্তোমে যজমান হাজার হাজার হইতে পারে। আর সকলেই ব্রাত্যস্তোম করিয়া পবিত্র হইয়া যাইতেন ও ঋষিদের সঙ্গে সমান হইয়া যাইতেন। ব্রাত্যস্তোমের পর ঋষিরা ব্রাত্যদের সঙ্গে একত্রে যাইতেন, তাহাদের হাতের রান্না খাইতেন, তাঁহাদিগকে বেদ পড়িতে দিতেন, তাঁহাদিগকে ঋত্বিক দিতেন, মোট'মুটি তাঁহাদিগকে আপনার সমান করিয়া লইতেন।" এই ব্রাত্যদের দেবতা ছিলেন শিব। পূর্ব্বে ব্রাত্যস্তোম বা শুদ্ধি যজ্ঞ যখন তখন হইত। পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে শুদ্ধি যজ্ঞ সুরু হয়। আজিও বৎসরের শেষে চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন শিবের গাজনের দিন। এই দিনের নাম "হোম পর্ব্ব।" শিবের গাজনে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত ভক্ত হইতে

পারে এবং উত্তরীয় সূত্র (উপবীত) গলায় দিয়া গাজনের কয়দিন সকলেই সমান হইয়া যায়। ইহাদের মূলমন্ত্র—

"মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবোমহেশ্বরঃ।
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥"

সমগ্রভারতে এবং ভারতের বাহিরেও এই সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, তক্ষণশিল্পে, সঙ্গীতে, কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, জীবিকার অবলম্বনে, সমাজ ব্যবস্থায় এবং রাষ্ট্রনীতিতে এই সমুন্নত সংস্কৃতির প্রভাব সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট।

"শাক্ত-সংস্কৃতি" ঃ—শৈব-সংস্কৃতির এবং বৈষ্ণব-সংস্কৃতির সংগে ইহার যোগ আছে। ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতিবাদ বা শক্তিবাদ এই সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত। এই সংস্কৃতি সমাজের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সমাজে এখনও ইহার প্রভাব অপ্রতিহত। এই সংস্কৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলিকে এক অখণ্ড যোগসূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ভারত ব্যাপী নবরাত্র উৎসব এবং বাঙ্গালার দুর্গোৎসব প্রকৃতই জাতীয় উৎসব। দুর্গোৎসবে সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে কৃষি শিল্প এবং বাণিজ্যেরও সমবায় সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কামার, কুমার, ছুতার মালাকার হইতে আরম্ভ করিয়া মুচি হাড়ি ডোম চণ্ডাল পর্য্যন্ত এই উৎসবে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিল। হিন্দু জাতির সর্ব্ব সম্প্রদায়-সম্মেলনের তেমন উৎসব বাঙ্গালায় আর দুইটি নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে অর্থাভাব হেতু এবং ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালার পল্লী ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার এই উৎসবের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে এই সমস্ত উৎসবে নূতন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শক্তি-সংস্কৃতির ফলে বাঙ্গালার সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি, রাজনীতি ও সমাজনীতি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছিল। শাক্তগণ চিন্ময়ী জননীকে মৃন্ময়ীর সঙ্গে মিলাইয়া এই নদী, পর্ব্বত, বনানী ব্যবধানবহুল ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড ঐক্যে আবদ্ধ করিয়াছিল।

(৬) **"বৈষ্ণব-সংস্কৃতি"** ঃ—এই সংস্কৃতিও বহু পুরাতন। বেদ এবং তন্ত্রের সমন্বয়ে এই সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, অধর্ম্ম নিবারণ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন এই সংস্কৃতির অন্যতম আদর্শ। শৈব-সংস্কৃতির মূলমন্ত্র যেমন "যত্র জীব তত্র শিব" এই সংস্কৃতির মূলমন্ত্রও তেমনই মানব প্রেম,

সর্ব্বভূতে সমদর্শন। পরাধীনতার মধ্যে জাতি গঠিত হয় না। জাতিকে স্বারাজ্য-সংসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে পঞ্চবিধা মুক্তি অর্জন করিতে হইবে ইহাই বৈষ্ণব দর্শনের বাণী। জাতি গঠনে এই পঞ্চবিধা মুক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

জাতি-গঠনে প্রথম প্রয়োজন "সাষ্টি"—সমান ঐশ্বর্য্য। অর্থ-নৈতিক ভিত্তিই ইহার মূল। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয়, যে, সকলকে সমান ভাগে সমাজের ঐশ্বর্য্য কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। বণ্টন করিয়া দিলেও সকলের রাখিবার সামর্থ্য সমান নয়, ব্যয়ের বুদ্ধিও সমান নয়, ন্যায়সঙ্গত নয়, সুতরাং সমাজের মধ্যে অর্থপ্রবাহের নিয়মানুগত প্রণালী থাকা চাই, শ্রমের মর্য্যাদা চাই, বিনিময়ের বিধিসঙ্গত ব্যবস্থা চাই, আদান প্রদানের শুভবুদ্ধি চাই, সহযোগিতা চাই, সমাজের মধ্যে সকলেই যেন প্রতিভা-প্রকাশের, যোগ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র পায়। সমাজে কেহ যেন উপেক্ষিত না হয়।

দ্বিতীয় মুক্তি "সালোক্য"—সমান দেশ। এক দেশের অধিবাসীকে লইয়া জাতি গঠনে যেমন সুবিধা হয়, ভিন্নদেশের অধিবাসীকে লইয়া তেমনই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই দিক দিয়া ভৌগোলিক-ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দুগণ তীর্থের সৃষ্টি করিয়া যদিও খণ্ড ভারতকে অখণ্ড মহাভারতে পরিণত করিয়াছিলেন, তথাপি জাতি-গঠনে সালোক্য-মুক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় মুক্তি "সামীপ্য"—একদেশে বাস চাই, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে বা অন্য বিষয়ের আদান প্রদানে জাতির মধ্যে পরস্পরের নৈকট্য থাকা চাই। তীর্থযাত্রায়, পার্ব্বণে, নানা উপলক্ষে নানা রূপ সম্মেলনেও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

চতুর্থ মুক্তি "সারূপ্য"—জাতিগঠনে সমান রূপ চাই। কিন্তু আকার সকলের সমান হয় না, সুতরাং সবর্ণের অবশ্যকতা আছে। সে ক্ষেত্রেও বৈষম্য ঘটিলে পরিধেয় সমান হওয়া আবশ্যক। এই জন্যই জাতীয় পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আজিকার দিনে এই কথাটি বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

পঞ্চম মুক্তি "সাযুজ্য"—পঞ্চবিধ মুক্তির কোনটিই উপক্ষেণীয় নয়। জাতি গঠনে ভাবসাযুজ্যের প্রয়োজনীয়তাও প্রচুর। একভাষা না হইলে ভাবসাযুজ্য ঘটে না। দেশের ব্যবধান থাকিলেও যদি পরিচ্ছদ এবং ভাষার ঐক্য থাকে, তাহা হইলেও জাতিগঠনে ব্যাঘাত ঘটে না, এমন কি এক ভাষার

ঐক্যেই জাতীয়তা সংরক্ষিত হইতে পারে। সংস্কৃতি রক্ষার মূলেও আছে ভাষা। ভাষাই সাহিত্য সৃষ্টি করে, সংহতি রক্ষা করে, জাতিকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। যে জাতি নিজস্ব ভাষা ভুলিয়াছে তাহার দুর্ভাগ্যের অন্ত নাই। বৈষ্ণব-সংস্কৃতি আমাদিগকে এই মহান্ শিক্ষা দান করিয়াছে। বৈষ্ণব-সংস্কৃতির মধ্যেও শুদ্ধির স্থান অপ্রধান নয়। শিখ, হুণ, এমনকি গ্রীক, যবনেরাও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

সৌন্দর্যবোধ এবং রুচির দিক দিয়া বৈষ্ণব-সংস্কৃতির অবদান সুপ্রচুর। রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য, সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিও বৈষ্ণব-সংস্কৃতির ফলে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এই সংস্কৃতিকে বাঙ্গালীর প্রেমের ঠাকুর, বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভু এমন এক দিব্য মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছিলেন, বাস্তবতার এমন এক অমৃতময় লোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন, মানুষের ইতিহাসে অভিনব।*

* ভারতবর্ষ পত্রিকা হইতে লেখকের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

উপনিষদের মানবিকতা

ডক্টর শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবিকতা শব্দটি দর্শনের পরিভাষা হিসাবে নূতন সৃষ্টি হয়েছে[১] কিন্তু তা এত রকম বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে আমরা তাকে কোন অর্থে ব্যবহার করব সে বিষয় একটি স্পষ্ট ধারণা প্রথমেই করে নেওয়া উচিত মনে হয়। ডি, ডি, রিউমস সংকলিত দর্শনের অভিধানে তার সাতটি অর্থ দেওয়া হয়েছে। তাদের কোনটি পাঠনের বিষয় প্রসঙ্গে, কোনটি নীতিশাস্ত্রের, কোনটি দর্শনশাস্ত্রের, কোনটি ধর্মতত্ত্বের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এদের বর্তমান ক্ষেত্রে বিস্তারিত পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। আমরা স্পষ্টতই বর্তমান আলোচনায় তাকে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কেও পারিভাষিক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করব। মানবিকতার এই প্রসঙ্গে অর্থ দাঁড়ায় যে মানুষের কল্যাণই ধর্ম আচরণের মূল অবলম্বন হিসাবে পরিগণিত করা। আমরা এই অর্থেই বর্তমান আলোচনায় কথাটিকে ব্যবহার করব।

মানবিকতা দুই শ্রেণীর হতে পারে। মানব জাতির কল্যাণ ও সেবা ঈশ্বর চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিয়ে মানবিকতা প্রচার করা যেতে পারে, আবার ইশ্বরকে বর্জন করে মানবিকতারও প্রচার করা যেতে পারে। আমাদের দেশের চিন্তায় ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে মানবিকতা প্রচারের একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। মনুসংহিতায় পাঁচ শ্রেণীর যজ্ঞ সম্পাদন করতে গৃহীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল: দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। অর্থাৎ সেখানে মানুষের কল্যাণমূলক কাজকে ধর্মাচরণের কাজ বলে পরিগণিত করা হয়েছে। এই দৃষ্টি ভঙ্গি শুধু শাস্ত্র কেন সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের চিন্তায় ও অনুপ্রবেশ করেছিল। সাধারণ মানুষকে তারা নর নারায়ণ বলে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে এই সংস্কার বর্তমান যে মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। গরীব মানুষকে দরিদ্রনারায়ণ বলা হয়। অর্থাৎ অবহেলিত মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ সে সংস্কারও তাদের মধ্যে বর্তমান। এখানে মানবিকতা ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে।

(১) D D. Rumes, Dictionary of Philosophy

(২) মনুসংহিতা ॥ ৪ ॥ ২১

আর এক শ্রেণীর মানবিকতা আছে যা ঈশ্বরকে বর্জন করে গড়ে উঠেছিল তার সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই কোঁত স্থাপিত মানবিকতার মধ্যে। তাঁর দর্শন গড়ে উঠেছিল একটি হতাশার মনোভাব হতে। তিনি ধর্ম তথা দর্শনের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন এই ধারণায় যে তারা নিশ্চিত জ্ঞান দিতে অক্ষম। তাঁর ধারণায় তারা ঈশ্বর সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না। সেই জন্য যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি সেই মানুষকেই তিনি ঈশ্বরের আসনে বসাবার প্রস্তাব করেছিলেন এবং ঈশ্বরের উপাসনার পরিবর্তে মহামানবকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সর্বমানবের সেবাকেই ধর্মাচরণের প্রকৃত রীতি বলে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রাচীন উপনিষদের চিন্তায় যে মানবিকতার বিকাশ ঘটেছিল তা এই দুই শ্রেণীর কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ তার প্রকৃতি অনন্য সাধারণ। তা একদিকে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে যেমন গ্রহণ করেনি, তেমন ঈশ্বরকে মানবিকতার আদর্শ হতে বর্জন করেনি। বর্তমান প্রবন্ধে এই অনন্যসাধারণ মানবিকতার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হবে।

উপনিষদের ঋষির প্রেরণা ছিল হৃদয়বৃত্তি নয় বুদ্ধিবৃত্তি, ভক্তি নয় জ্ঞান পিপাসা। ব্রহ্মকে জানবার দুর্বার কৌতূহল তাঁদের বিশ্বের মৌলিক সত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে উৎসাহিত করেছিল। সত্যকে জানবার জন্য তাঁরা উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই তাঁদের প্রার্থনা বাণীতে ছিল ভক্তি নিবেদনের কথা নয়, এই ইচ্ছা প্রকাশ যে পরম সত্তা যেন তাঁদের এমন ধীশক্তি দেন যাতে তাঁর বরেণ্য ভর্গ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।' এই পথে অগ্রসর হয়ে তাঁরা ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বরকে খুঁজে পান নি। তাঁরা পেয়েছিলেন এক অব্যক্ত শক্তির পরিচয় যাঁর পৃথক সত্তা রূপে কোন প্রকাশ নেই। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। বিশ্বে যা কিছু আছে সব তাঁকে আশ্রয় করে আছে। তিনি সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন। তিনি এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। তাই তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। যিনি সব থেকে বিরাট সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন, তিনিই ত ব্রহ্ম। সুতরাং উপনিষদে যে দর্শন গড়ে উঠেছে তা সর্বেশ্বরবাদ। বিশ্ব সত্তা তার পরিকল্পনায় ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট নয়, তা বিশ্বের নিয়ন্ত্রক ও ধারক নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তি।

(৩) August Comte, Positive Philosophy

উপনিষদের মানবিকতা এই সর্বেশ্বরবাদকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বিশ্বের সকল বস্তু যে একই মহাসত্তার প্রকাশ এই বোধই উপনিষদের মানবিকতার মূল প্রেরণা। যে হেতু সেখানে হৃদয়বৃত্তি প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল না, জ্ঞানপিপাসাই চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেখানে ঈশ্বরকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের বা সেবা করবার কোন ইচ্ছা লক্ষিত হয় না। ভক্তির থেকে পরমাত্মার প্রকৃতি আলোচনাই সেখানে বড় আকর্ষণ। কাজেই তার মধ্যে আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি কোন অনুরাগ লক্ষ্য করা যায় না। এখানেই বেদের সংহিতা অংশের সহিত তার পার্থক্য। সেই কারণেই বেদের সংহিতা অংশকে কর্মকাণ্ড বলা হয় এবং উপনিষদ অংশকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়।

নীতির ক্ষেত্রে এক মূল সমস্যা হল মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব। প্রতি মানুষই নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে বেশী সচেতন, কাজেই স্বভাবতই নিজের স্বার্থ সংরক্ষণে বেশী নজর দেয়। এই ভাবে স্বার্থের সহিত পরার্থের সংঘাত নীতিশাস্ত্রে একটি মৌলিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

উপনিষদে এই সমস্যা সমাধান খোঁজা হয়েছে এক বিচিত্র পথে। এই পরিকল্পনায় বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয় বৃত্তিকে বিভিন্ন ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, কোনটিকে বর্জন করা হয় নি। তাদের পরস্পর পরিপূরক ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। গীতা বা দার্শনিক কাট এর মত হৃদয় বৃত্তিকে বজন করা হয়নি। উপনিষদে মৌলিক ভূমিকা দেওয়া হয়েছে হৃদয়বৃত্তির আর প্রেরণা দেবাব ভূমিকা পড়েছে বুদ্ধিবৃত্তির ওপর। ব্যবস্থাটি সত্যই অভিনব। সুতরাং এই তত্ত্বটি সহজবোধ্য করবার জন্য একটু আলোচনার প্রযোজন। মোট কথায় উপনিষদ বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্যে হৃদয় বৃত্তির পরিবর্দ্ধন চেয়েছে এবং হৃদয় বৃত্তির প্রসারের সাহায্যেই স্বার্থ এবং পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে। এখন মানুষের হৃদয় বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ পাই স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসায় বিস্তারে। এই ভালবাসাকে বিস্তার করেই স্বার্থ পরিশোধিত হতে পারে। সেটা সম্ভবও কারণ সকল মানুষের মধ্যেই স্বার্থ এবং পরার্থবোধ দুই ই ক্রিয়াশীল। এমন কি সাধারণ মানুষও বিশেষ ক্ষেত্রে স্বার্থত্যাগ সহজেই করতে পারে এবং পরার্থে অনেক আত্মত্যাগ স্বীকার করতে পারে। সন্তানের জন্য এমন ত্যাগ নেই যা সে করতে প্রস্তুত নয়; প্রিয়জনের জন্য প্রেমিক সর্বস্বত্যাগ করতেও দ্বিধা বোধ করবে না।

কেন এমন হয়? তার উত্তর হল এসব জায়গায় ব্যক্তির স্বার্থ সংকুচিত ক্ষেত্র অতিক্রম করে অন্যের স্বার্থকে নিজের করে নিয়েছে। মা যখন সন্তানের

জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন তাঁর কষ্টবোধ হয় না সন্তানের স্বার্থ তাঁর স্বার্থের সহিত একীভূত হয়ে গেছে। প্রেমিক তখন প্রেমাস্পদের জন্য আত্মত্যাগ স্বীকার করে, এখন তার কাছে প্রেমাস্পদের সুখ নিজের স্বার্থের অধিক প্রিয় হয়ে উঠেছে। এমন হয়, তার কারণ এদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। আমাদের এ কথার সমর্থনে একটি সচরাচর দৃষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন একটি ছোট মেয়েকে হয়ত ভালবেসে কেউ কতকগুলি লজেন্স উপহার দিয়েছেন। প্রতিবেশী বালক বালিকা যদি এসে তার কাছে চায় বলে আমায় একটা দেন, সে হয়ত দেবে না। কিন্তু বাড়ীতে এসে নিজের ভাইবোনদের মধ্যে না চাইলেও সে তা বিতরণ করবে। আচরণের এই ভিন্নতার কারণ প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ নেই তাদের সে আপন জন মনে করে না আর পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ আছে আছে বলেই তাদের আপন জন মনে করে। সেই কারণেই তাদের সহিত ভাগ করে ভোগ করতে তার কোন বাধাবোধ আসে না।

উপনিষদ এই প্রেমের স্বরূপ [illegible] মীমাংসা করেছে। [illegible] বলে [illegible] বিশ্বের [illegible] ব্যাপ্ত করে এবং [illegible] সত্তা প্রচ্ছন্নভাবে [illegible] একই পরিবারের [illegible] প্রীতি করবে। [illegible] সঙ্গে [illegible] বোধ [illegible] বিস্ফুট হবে তখন সকলের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ [illegible] উঠবে। [illegible] স্বার্থের সংঘর্ষ [illegible] হবে।

এখন আমাদের [illegible] সমর্থনে উপনিষদের কিছু বচন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন [illegible] নিকট যে পতি প্রিয় হয় তা পতির কারণে নয় পতির নিকটে যে জায়া প্রিয় হয় তা জায়ার কারণে নয়, মার নিকট যে পুত্র প্রিয় হয় তা পুত্রের কারণে নয়। তিনি বলেছেন, তারা প্রিয় হয়, তার কারণ সকলকে ব্যাপ্ত করে একই আত্মা বর্তমান আছেন। (৮) এখানে আত্মা কথাটি সব কিছু জড়িয়ে যে সত্তা

(৪) ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ন বা অরে পুত্রানাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মানস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

আছেন অর্থাৎ ব্রহ্মকেই যা সূচিত করা হয়েছে তা পরের বাক্যে স্পষ্টতই উল্লেখ আছে। (৫)

ঈশ উপনিষদে এই তত্ত্বটি অবলম্বন করে সকল মানুষকে পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত ব্যবহার করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সকলেই একই মহাসত্তার প্রকাশ, সকলেই সকলের ভাই বোনের মত। সুতরাং স্বার্থপরের মত একাকী সম্পদ ভোগ করার অর্থ হয় না। তাই পরস্পর ভাগ করে ভোগ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যুক্তি হল "ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্।" বিশ্বে যা কিছু আছে সবই এক মহাসত্তা দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সুতরাং উপদেশ দেওয়া হয়েছে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'। পরস্পর ভাগ করে ভোগ করবে। 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্'। কারও ধন অপহরণ করবে না।

এই উপলব্ধিকে ভিত্তি করেই উপনিষদের মানবিকতা গড়ে উঠেছে। তার পরিণতরূপে তা বলে মানুষের তিনটি মৌলিক কর্তব্য পালন করা উচিত। তা হল দম, দান এবং দয়া। বিষয়টি বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি সুন্দর গল্পের সূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেবার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সেখানে পাই যে গুরু সমাবর্তনের দিনে শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন, আত্মদমন করবে, দান করবে এবং দয়া করবে। এই গুরু যে সে গুরু নন, স্বয়ং ব্রহ্মা। তাই একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের এক কাব্যময় ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, এই মহান উপদেশের সর্বক্ষেত্রে, সর্বকালে প্রয়োগ আছে, তাই নাকি প্রতিবছর মেঘে ঢাকা দিনে স্তনয়িত্নু বজ্র রবে ঘোষণা করে 'দ দ দ', অর্থাৎ বজ্রে তার বাণী ঘোষিত হয় এই বলে। তা যেন বলতে চায়, ওগো বিশ্ববাসী, তোমরা স্বার্থকে, বিদ্বেষকে, ক্রোধকে সংহত কর, নিজের সম্পদ অন্যকে দান কর ও অবহেলিতকে দয়া কর। (৬)

এই হল সংক্ষেপে উপনিষদের মানবিকতা। ব্যক্তিরূপী জ্ঞান করে এখানে ঈশ্বরের সেবা করবার প্রশ্ন ওঠে নি। কারণ তখনও ভারতীয় দর্শনে একেশ্বরবাদের বিকাশ ঘটেনি। বিশ্বসত্তা সেখানে সর্বব্যাপী প্রফুল্ল নৈর্ব্যক্তিক সত্তারূপে পরিকল্পিত। তিনি মনীষা দ্বারা অধিগম্য ব্রহ্ম তিনি ভক্তিমার্গে লভ্য ঈশ্বর নন। তবু এই নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের এখানে একটি ভূমিকা আছে। তিনি মানুষে

(৫) ইদং সর্বং যদয়মাত্মা ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪॥৫॥৭

(৬) তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং দয়ামিতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥৫॥২॥৩

মানুষে সম্বন্ধসূত্র হিসাবে বর্তমান। এই বোধকে অবলম্বন করে যে পারস্পারিক প্রীতি গড়ে উঠতে পারে তাকে ভিত্তি করে এই মানবিকতার পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিতে এই আদর্শটি সুন্দর প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক লাইন কটি এই :

নাই যে তুমি ভাইয়ের মাঝে প্রভু
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ করে মোর ধন
তোমার মুঠ কেন ভরি নে। (১)

এখানে যেন পুনঃ উপনিষদের বচনের প্রতিধ্বনি পাই। উপনিষদের মানবিকতার সহিত রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার এইটুকু পার্থক্য যে তিনি সর্বেশ্বর-বাদকে স্বীকার করে ও আন্তরিকভাবে এক ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর মানবিকতা মানুষের ধর্মচেতনার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। ঈশ্বরে ভক্তি তাঁর একটি মূল প্রেরণা। উপনিষদের মানবিকতার সে প্রেরণা নেই, কারণ ও ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের সন্ধান পায় নি। তার মানবিকতার ভিত্তি হল ঈশ্বরের নৈর্ব্যক্তিক সত্তা হিসাবে সর্বব্যাপিত্ব বোধ হতে মানুষের মধ্যে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার উপলব্ধি।

— —

প্রাচীন ভারতের মহীয়সী নারী

ডক্টর রমা চৌধুরী

উপক্রমণিকা

সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যক উপনিষদে সৃষ্টি প্রসঙ্গে অতি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে:—

"স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ,

স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়তঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ

যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়াপূর্যত এব।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১।৪।৩)

অর্থাৎ, তিনি (পরমাত্মা) একাকী আনন্দলাভ করলেন না সেজন্য কেহ একাকী আনন্দলাভ করেন না। তিনি দ্বিতীয় একজনকে লাভ করতে ইচ্ছা করলেন। তখন তিনি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। এরূপে, পতি ও পত্নীর উদ্ভব হল। যেজন্য, যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে—প্রত্যেকে মটরাদি শস্যের সমান সমান দুই অংশের একটী অংশবিশেষ। সেজন্য এক জীবনের পতির এই শূন্যস্থান পত্নী দ্বারাই পূর্ণ হয়।"

এই সুবিখ্যাত মন্ত্রে পত্নীকে পতির অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিনী, সহমর্মিণী সহকর্মিনীরূপে সগৌরবে স্বীকার করা হয়েছে। সেজন্য, নর-নারী সর্বদিক থেকেই সমান—তুল্য গৌরব বিমণ্ডিত, তুল্যাধিকারসম্পন্ন, তুল্য গুণ শক্তির আধার।

কিন্তু না, এর চেয়েও বড় কথা নারীদের সম্বন্ধে আছে- যেস্থলে বলা হয়েছে যে, নারী কেবল পুরুষের সমান, তাই নয়, তার চেয়েও বহুগুণে উচ্চতরা মাতৃরূপে। সর্বজনবিদিত মনুস্মৃতির সেই অপূর্ব সুন্দর শ্লোকটী এস্থলে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য, আচার্যাণাং শতং পিতা।

সহস্রন্তু পিতৄন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥" (মনু-স্মৃতি ২।১৪৬)

অর্থাৎ, একজন আচার্য দশজন উপাধ্যায়কেও, একজন পিতা শতজন আচার্যকেও, এবং একজন মাতা সহস্রজন পিতাকেও অনায়াসে গৌরবে অতিক্রম করেন।"

জ্ঞানমূলক ; এবং এর থেকে, প্রাচীন ভারতে, নারীরা কিরূপে ব্রহ্মোপলব্ধি ও ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানের শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিলেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবিদুষী বাক্ ছিলেন অম্ভৃণ মহর্ষির পরমাদরিণী কন্যা। আটটী অনুপম সূক্তে তিনি নিজেকে স্বয়ং পরব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নরূপে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করে সগৌরবে বলছেন

(১) 'আমি রুদ্রগণের সঙ্গে, বসুগণের সঙ্গে তাদের আত্মারূপে বিচরণ করি, আমি আদিত্যের সঙ্গে বিশ্বদেবগণের সঙ্গেও তাদের আত্মারূপে বিচরণ করি। ব্রহ্মরূপা আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কেই ধারণ করি, ব্রহ্মরূপা আমি ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়কেই ধারণ করি ; ব্রহ্মরূপা আমি অশ্বিনীদ্বয়কেও ধারণ করি।

(২) আমি শত্রুহন্তারক সোমকে ধারণ করি, আমি ত্বষ্টা, পূষণ, ভগকেও ধারণ করি। হোমকারী, তর্পনকারী, সোমপেষক যজমানের জন্যও আমি যজ্ঞফল দাত্রীরূপে যজ্ঞফলরূপ ধন ধারণ করি।

(৩) আমিই সমগ্র বিশ্বের ঈশ্বরী উপাসকবৃন্দের জন্য ধনসমূহের সংগ্রাহিকা, ব্রহ্মজ্ঞা, যজ্ঞার্হগণের মধ্যে মুখ্যা। বহুভাবে বিশ্বপ্রপঞ্চে আত্মারূপে অবস্থিতা বহুভূতে অনুপ্রবিষ্টা আমাকে দেবগণ বহুদেশে সংস্থাপিত করেছেন, অথবা, আমি সর্বব্যাপিনী।

(৪) যে অন্ন ভোজন করে, সে আমার দ্বারাই তা করে ; যে দর্শন করে, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে, যে কথিত বাক্য শ্রবণ করে, সে আমার দ্বারাই তা' করে। যারা অন্তর্যামিনীরূপে অবস্থিতা আমাকে অবগত নহে, তারা হীনতা প্রাপ্ত হয়। হে বন্ধুগণ! সকলে শোন, যা সকলে শ্রদ্ধাযোগ্য তা' শোন—আমি তোমাদের জগতের ব্রহ্মাত্মকতা সম্বন্ধে বলছি।

(৫) দেব-মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত এই ব্রহ্মাত্মতা সম্বন্ধেই আমি তোমাদের বলছি। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে শক্তিশালী করি, তাকে স্রষ্টা ব্রহ্ম, তাকে ঋষি, তাকে সুমেধা করি।

(৬) ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী, হিংস্র অসুর হননের জন্য আমি মহাদেবের ধনুতে জ্যা রোপণ করেছি। স্তবকারিগণের রক্ষার্থে, আমি শত্রুজনের সঙ্গে সংগ্রামে রত হই। আমিই অন্তর্যামিনী রূপে স্বর্গমর্ত্যে প্রবিষ্টা হয়ে আছি।

(৭) পিতা স্বর্গকে আমি পরমাত্মার মস্তকোপরি সৃষ্ট করি। চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম থেকেই আমার উৎপত্তি। অতএব আমি সকল ভূতে অনুপ্রবেশ করে তাদের পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান' করি এবং দেহদ্বারা স্বর্গলোক স্পর্শ করি।

(৮) সকল ভূত উৎপাদনকারণ আমি বায়ুর ন্যায় প্রবাহিতা। আমি আকাশ অপেক্ষা ও এই পৃথিবী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা, সেই জন্য নিবাতশয়, আমার মহিমা চিরন্তন। (ঋগ্বেদ ১০।১২৫)

কি রোমাঞ্চকর কথা এগুলি! সত্যই, মানবজাতির মধ্যে যে বাণী ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির মর্মবাণী উপনিষদের ঐ মধুর-মোহন মন্ত্রসমূহের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কয়েকটি হল এই

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩।১৪।১)

"ব্রহ্মেদং সর্বম্।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৫।১)

"তত্ত্বমসি"। (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।৮।৭)

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৫।১৯)

"অহং ব্রহ্মাস্মি"। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১।৪।১০)

'বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম"।

"ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড'।

"তিনিই তুমি।"

"এই আত্মাই ব্রহ্ম।"

"আমিই ব্রহ্ম।"

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই যে ব্রহ্ম—এরূপ সাহসের কথা পৃথিবীর আর কে বলতে পেরেছেন? অথচ এই হল ভারতবর্ষের প্রাণের প্রিয় কথা।

সেজন্য ভারতবর্ষের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা এই পৃথিবীকে দীনহীন ক্ষুদ্রক্ষীণ-পাপতাপমলিন রূপে কোনোদিনও দেখেননি, দেখেছেন তাকে অশেষ সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য-বিমণ্ডিত স্বয়ং শ্রীভগবানের মূর্ত প্রতিচ্ছবিরূপেই। কেবল এই মতানুসারে, জগতের সকলেই ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মরূপে সকলেই এক ও অভিন্ন।

প্রাচীন ভারতের মহামহীয়সী নারী-ঋষি বাকের অনুপম সূক্তেও এই একই সুউচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। ব্রহ্মাত্মভাবে ভাবান্বিতা হয়ে তিনি ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে এক ও অভিন্ন বলে, উপলব্ধি করছেন পরমানন্দ সহকারে। এই কারণেই, তিনি স্থির বিশ্বাসভরে বলেছেন যে, তাঁর শক্তি, তাঁর কৃতি, তাঁর ভাপ্তি, তাঁর শান্তি সত্যই অপরিসীম, তিনি কোনোদিক থেকেই অবলা নারী নন, দীনহীনা নন, পাপী তাপী নন—কিন্তু সর্বশক্তিশালিনী, পরমানন্দময়ী, পরমসৌভাগ্যবতী। সর্বোপরি সকলেই তাঁর অতি আপন জন, অতি নিকট জন, অতি প্রিয় জন, বিশ্বের সকলের সঙ্গেই

তিনি অচ্ছেদ্য প্রীতি-মৈত্রীর সম্বন্ধে আবদ্ধ, সকলের সুখদুঃখ তাঁর নিজেরই সুখদুঃখ, সকলের কার্যকলাপ তাঁর নিজেরই কার্যকলাপ, সকলের মুক্তিশান্তি তাঁর নিজেরই মুক্তিশান্তি। ভারতবর্ষের চিরন্তন বিশ্বপ্রীতি-বিশ্বমৈত্রীর এই মহিমময় বিকাশ প্রাচীনতম ঋগ্বেদের যুগের এই মহিমময়ী নারীর মধ্যে দেখে কে না মুগ্ধ এবং স্তব্ধ ও চমৎকৃত হবেন?

উপনিষদের যুগের মহীয়সী নারী

প্রখ্যাত উপনিষদ সমূহের মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ অতি প্রাচীন, অতি প্রকৃষ্ট, সর্বজন শ্রদ্ধেয়, সর্বজন সমাদৃত। এই উপনিষদে মৈত্রেয়ী ও গার্গী নাম্নী দু'জন সত্যদর্শী ব্রহ্মবাদিনী নারীর সাক্ষাৎলাভ করে, আমরা ধন্যাতিধন্য হই। তাঁরাও ছিলেন নারী ঋষি বাকের সুযোগ্যা উত্তরাধিকারিণী ও উত্তরসাধিকা এবং তাঁরই মত ব্রহ্মজ্ঞানোদ্বুদ্ধা।

মৈত্রেয়ী

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ, এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে সন্নিবিষ্ট "মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ" শীর্ষক অনুপম প্রবন্ধটি ভারতীয় নারীগণের অতুলনীয় বিদ্যাবত্তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে চিরকাল বিরাজ করবে সগৌরবে। এই সর্বজনবিদিত, সর্বজনসমাদৃত ঘটনাটি এরূপ—

মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যের দুজন পত্নী ছিলেন মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। এঁদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ছিলেন 'ব্রহ্মবাদিনী', কিন্তু কাত্যায়নী ছিলেন 'স্ত্রী-প্রজ্ঞা', অথবা সাধারণ স্ত্রীজনোচিত বিদ্যাবুদ্ধিবিশিষ্টা। একদিন যাজ্ঞবল্ক্য, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করতে কৃতসংকল্প হয়ে মৈত্রেয়ীকে আহ্বান করে বললেন—

"অয়ি মৈত্রেয়ী, আমি আজ এই স্থান থেকে চলে যাচ্ছি। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে বিভাগ করে দিচ্ছি।"

এই ক্ষোভজনক প্রস্তাব অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে, মৈত্রেয়ী ব্যাকুলভাবে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন

"হে ভগবন! এই সমুদয় পৃথিবী যদি বিত্তদ্বারা পূর্ণ হয়, তাহলে তদ্বারা আমি কি অমর হতে পারব?"

প্রাজ্ঞ শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য তৎক্ষণাৎ অকপটে উত্তর দিলেন—

মহিমায়—ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা এবং জীবাত্মার, শিব ও জীবের চিরন্তন অভিন্নত্ব। সেজন্যই, যাজ্ঞবল্ক্য এস্থলে বলেছেন যে সংসারে আমাদের যা কিছু প্রিয় বস্তু আছে, তা সবই যথা পতি পত্নী, পুত্র বিত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, স্বর্গাদি লোকসমূহ দেবগণ ভূতগণ, এ সকল বস্তুই—সেই সেই বিশেষ ও বিভিন্ন বস্তুর প্রতি ভালবাসা আমাদের প্রিয় হয় না, একমাত্র আত্মপ্রীতির জন্যই তারা আমাদের প্রিয় হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যেই একমাত্র পরমাত্মাকেই আমাদের দর্শন করতে হবে প্রীতি করতে হবে, একমাত্র পরমাত্মাকেই আমাদের পূজা করতে হবে একমাত্র পরমাত্মারই আমাদের সেবা করতে হবে—এই তো হল শ্রেষ্ঠজ্ঞান। কি অপরূপ ভাবেই না যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন—

'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো, মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৪।৫, ৪।৫।৬)

'আত্মাকেই দর্শন করবে, আত্মাকেই শ্রবণ করবে আত্মাকেই মনন করবে, আত্মাকেই ধ্যান করবে আত্মার শ্রবণ দর্শন মনন-বিজ্ঞানের দ্বারাই এই সমুদয় অবগত হওয়া যায়।'

যোগ্য গুরু, সত্যদ্রষ্টা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের যোগ্য শিষ্যা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী এইভাবে এরূপ মহাব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, অমৃতত্বের অধিকারিণী হয়ে, কিভাবে ভবিষ্যৎ জীবন যাপন করেছিলেন তা অবশ্য উপনিষদে উল্লেখ করা নেই। তা সত্ত্বেও আমরা অনায়াসে ভেবে নিতে পারি যে, অতঃপর তিনিও পতির ন্যায় সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক গুরুর স্থান অধিকার করে, শত শত শিষ্য শিষ্যাকে ব্রহ্মামৃত বিতরণে পরমতৃপ্ত করেছিলেন।

গার্গী

উপনিষদের যুগের আরেকজন সত্যদ্রষ্টা, ব্রহ্মবাদিনী নারী হলেন বচক্নুর সর্বজন শ্রদ্ধেয়া কন্যা গার্গী বাচক্নবী। একদিক থেকে, তিনি মৈত্রেয়ী থেকেও প্রাজ্ঞতরা যেহেতু মৈত্রেয়ী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করে, তাঁর নিকট থেকে নিগূঢ় আত্মতত্ত্ব জেনে নেন। কিন্তু গার্গী সেই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকেই প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে প্রথমে পরাজিত করে ফেলেন, যা অন্যান্য পাঁচজন মুনিশ্রেষ্ঠগণ করতে পারেন নি। পরে অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে "দুর্বোধ্য অক্ষর-ব্রহ্ম-তত্ত্ব", বুঝিয়ে বল্লে, তিনি আনন্দে তাঁকে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নেন।

সুবিখ্যাত বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও অষ্টম ব্রাহ্মণে এই মহিমময় গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ সন্নিবিষ্ট করা আছে। এইভাবে:

বিদেহরাজ জনক বহুদক্ষিণাযুক্ত একটী মহাযজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে কুরু ও পাঞ্চাল দেশের বহু ব্রাহ্মণ সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ তা জানবার জন্য রাজা জনক বিশেষ উৎসুক হন। সেজন্য তিনি এক স্থানে এক সহস্র গাভী বেঁধে, প্রত্যেকটীর শৃঙ্গদ্বয়ে দশ পাদ করে স্বর্ণমুদ্রা বেঁধে রাখলেন, এবং ব্রাহ্মণদের সকলকে আহ্বান করে বললেন— "পরমশ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণবৃন্দ! আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি এই সমস্ত গাভী নিয়ে যান।" কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কেহই গাভী নিয়ে যেতে সাহস করলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য নিজ শিষ্যকে সেই সকল গাভী নিয়ে যেতে আদেশ করলেন, এবং শিষ্যও সেই আজ্ঞা পালন করলেন। তাতে অন্যান্য ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অধিক ব্রহ্মজ্ঞানী কিনা জানবার জন্য তাঁকে নানাভাবে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। একে একে পর পর পাঁচজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ,—যথা, অশ্বল, আর্তভাগ, ভুজ্যু, উষস্ত ও কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে যথাক্রমে পাঁচটী নিগূঢ়তম দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করলেন— যথা, মুক্তি ও অতিমুক্তি, গ্রহ ও অতিগ্রহ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি সম্বন্ধে আত্মা, এবং সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম। কিন্তু মহাপ্রাজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্য অনায়াসে সেই সকল কঠিনতম প্রশ্নেরও যোগ্য উত্তর দান করে, তাঁদের সকলকে পরাজিত করলেন। তারপরে সাহস সহকারে অগ্রসর হয়ে এলেন মহাবিদুষী গার্গী বাচক্নবী, এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে "কিসে সমুদয় ওতপ্রোত" এই সুকঠিন বিষয়ে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন এই ভাবে এবং যাজ্ঞবল্ক্যও উত্তর দিয়ে চললেন সেই ভাবে:

এই সমুদয়ই জলে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। কিন্তু এই জল কিসে ওত-প্রোতভাবে বিদ্যমান? উত্তর—বায়ুতে। এই বায়ু কিসে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান? অন্তরীক্ষ সমূহে। এই অন্তরীক্ষ সমূহ কিসে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান? গন্ধর্বলোকে? এই গন্ধর্বলোক কিসে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান? আদিত্যলোকে। এই আদিত্যলোক কিসে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান? চন্দ্রলোকে। এই চন্দ্রলোক কিসে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান? নক্ষত্রলোকে। এই নক্ষত্রলোক কিসে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান? দেবলোকসমূহে। এই দেবলোক সমূহ কিসে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান? ইন্দ্রলোক সমূহে। এই ইন্দ্রলোকসমূহ কিসে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান? প্রজাপতিলোকে। এই

প্রজাপতিলোক কিসে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান? ব্রহ্মলোক সমূহে। এই ব্রহ্মলোক কিসে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান? কিন্তু এই শেষ, মূলীভূত প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে, যাজ্ঞবল্ক্য হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন— "হে গার্গি! অতি-প্রশ্ন করা উচিত নয়, তোমার মস্তক যেন নিপতিত না হয়। যে দেবতার বিষয়ে অতিপ্রশ্ন করা উচিত না, তুমি তারই বিষয়ে অতিপ্রশ্ন করছ। হে গার্গি! পুনরায় [illegible] অতিপ্রশ্ন করো না।' যাজ্ঞবল্ক্য এইভাবে গার্গীকে তিরস্কার করলেন, যেন তার মস্তকও নিপাতিত হয়ে যাবে বলে ভয় দেখালেন, তিনি [illegible] নিরস্ত হলেন, যাজ্ঞবল্ক্যকে তখনকার মতন অব্যাহতি দান করলেন।

কিন্তু পরে গার্গী পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে উদ্যতা হলেন পরম সাহস করে এবং বললেন—

'যাজ্ঞবল্ক্য! যেমন কাশী, অথবা বিদেহ দেশের বীরপুত্র ধনুতে জ্যা রোপণ করে শত্রুবিদারী দুটি শর হস্তে নিয়ে উপস্থিত হন, আমিও তেমনি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। তুমি আমার এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দাও।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন— জিজ্ঞাসা কর।

গার্গী বললেন 'যা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, যা পৃথিবীর নিম্নে এবং যা দ্যাব পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যমান, যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তা কোন বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন আকাশে।

গার্গী সন্তুষ্ট হয়ে বললেন 'যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমার প্রথম প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছ তোমাকে নমস্কার। দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য মনকে প্রস্তুত কর।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় নিশ্চয়ে বললেন—'জিজ্ঞাসা কর।

গার্গী প্রশ্ন করলেন 'কোন বস্তুতে এই আকাশ ওতপ্রোতভাবে বর্তমান?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন— 'অক্ষরব্রহ্মে।

তারপর যাজ্ঞবল্ক্য [illegible] অথবা নির্গুণ, নিত্য-নিরঞ্জন সত্য সনাতন পরব্রহ্মের কথা অতি সুন্দরভাবে প্রপঞ্চনা করলেন। তিনি সাধারণ, সাংসারিক বস্তু নন। সেজন্য সাধারণ, সাংসারিক বর্ণনা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন তিনি স্থূলও নন, সূক্ষ্মও নন, হ্রস্বও নন, দীর্ঘও নন, লোহিতও নন, দ্রবও নন, বায়ুও নন, আকাশও নন। তাঁর রস গন্ধাদি সাধারণ-সাংসারিক গুণ কিছুই নেই। চক্ষু-কর্ণাদি সাধারণ-সাংসারিক ইন্দ্রিয়াদিও

আনন্দের বিষয় এই যে, প্রাচীন যুগের মহামহিমময়ী মহিলারা কেবল নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকেননি। কেবল নিজেদের মধ্যেই নিঃশেষিত, হয়ে যাননি, কেবল নিজেদের মধ্যেই পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেননি—কিন্তু নিজেদের পরিপূর্ণ ভাবে দান করে দিয়েছিলেন পরবর্তিনীদের মধ্যে। এরূপে, বেদোপনিষদের যুগের সত্যদ্রষ্টা নারী ঋষি ও ব্রহ্মবাদিনীগণ মানব সভ্যতার প্রথম স্বর্ণ উষাগমে জ্ঞান ও তপস্যার সমিধ আহরণ করে যে পূত যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত করেছিলেন সগৌরবে, পরবর্তী যুগের অসংখ্য বিদুষী সাধিকা, ভক্তশ্রেষ্ঠা নারী তাতে জীবনাহুতি দেন,—তাকে কোনোদিনও নির্বাপিত হতে দেননি মুহূর্তের জন্যও। সেজন্য সুনিশ্চিত ভাবে বলা চলে যে বেদোপনিষদের সেই সব মহা মহীয়সী নারীদের প্রাণের অনির্বাণ আলোকে সকল দেশের, সকল কালের সকল সম্প্রদায়ের, সকল শ্রেণীর নারীদের প্রাণের প্রদীপগুলিও চিরদিন প্রজ্জলিত হয়ে থাকবে; তাঁদের মনের অনন্ত সঙ্গীতে, এরূপ পরবর্তিনী নারীদের মনের বীণাগুলিও চিরদিন রণিত হয়ে থাকবে, তাঁদের আত্মার অফুরন্ত অমৃতে, এরূপ পরবর্তিনী নারীদের আত্মার পাত্রগুলিও চিরদিন পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে। এই ভাবে, তাঁরা সমগ্র নারীসমাজের স্থির ধ্রুবতারা রূপেই চিরবিরাজ করবেন, তাঁদের উত্তাল সংসার-সমুদ্রে পথ স্থির করতে, তাদের লক্ষ্য নির্দেশ করতে, তাদের গন্তব্যস্থানে উপনীত করতে। এই কারণে, জগতের নারীসমাজ তাঁদের নিকট অশোধ্য ঋণে চিরঋণী।

আদিবাসী সংস্কৃতি

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ, বি, এল

মানুষ যাযাবর, ঊষা মানবের যুগ থেকেই সে বেরিয়েছে পথে ঘুরেছে পাহাড়ে জঙ্গলে, মরুভূমিতে, ভেলা বেঁধে নেমেছে নদীতে, সাগরে হ্রদে। সে খুঁজেছে সঙ্গিনী, সে চলেছে খাদ্য অন্বেষণে নিছক জৈবিক প্রবৃত্তির উত্তেজনায়, আকাশের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়েছে ভয়ে, কি ঐ জ্বলন্ত পিণ্ড ? কে ঐ পুরুষ ? মানবজীবনের প্রথম দিন থেকেই ইতিহাসের এই পদযাত্রা শুরু সেই পদাবলীর চিহ্ন ঘিরেই গড়ে উঠেছে সমাজ সংস্কৃতি, কৌম চেতনা, শিল্পকলা, ভাষা, ভালবাসা, কুলপতি বা যথপতির প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্রবোধ। পদে পদে তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গে, ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে, যুঝতে হয়েছে অপরা মানুষের সঙ্গে, রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে, আর তারও পরে এ সচ্ছে তার সবচেয়ে বড় যুদ্ধ নিজের সঙ্গে, অন্তর প্রকৃতির সঙ্গে, সুমতি কুমতির সঙ্গে, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ– এই বাহ্য, না এই গ্রাহ্য। আজও যখন বিজ্ঞান ও প্রযোগ বিদ্যা তার হাতে নূতন নূতন কৌশল ও অস্ত্র এনে দিচ্ছে যখন সে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটছে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ভেদ করে অনন্তের পথে পা বাড়িয়েছে তখনও মানুষ প্রায় অসহায়। মহাপ্রকৃতিকে জয় করতে কতটুকু সে পেরেছে ? সম্ভাবনার তরঙ্গমালায় (**waves of probability**) সে দুলছে--বৈজ্ঞানিকের ভাষায় আধার বিহীন বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সমষ্টি, দেশ কাল সমবায়ে যে ঘটনাপুঞ্জ ঘটে, যাদের গুণ নির্দেশ করা যেতে পারে গাণিতিক সংকেতের দ্বারা (**a system of spatio-temporal entities, whose qualities are exclusively mathematical**)। তখন দেশ ও কাল আধারও নয়, আধেও নয় (**Time and space are not containers nor are they contents they are variants**)। সবই আপেক্ষিক, সবই সমকালীন। আসলে, আইনষ্টানের উপমায় বলতে গেলে মানুষ একটা সীমাহীন কালো সমুদ্রের মাঝে বসে আছে একটা নৌকোয় ঘন কুয়াশার মাঝে (**a man adrift in a sea in a small boat in a fog**)। কয়েক সহস্র বৎসরের মানুষের ইতিহাস নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে আমরা বলি – এই তো সভ্যতার আর একটি বিশিষ্ট শিখরে আমরা পৌঁচেছি, এঁরা

আদিবাসী, এঁর গায়ের রং সাদা, ওঁর গায়ের রং কালো, মাথার চুলের এই বৈশিষ্ট্য, নাকের গঠন এই ধরণের। কবির ভাষায় বলতে গেলে—

Laugh and the world laughs with you
Weep and you weep alone.
For the sad old earth must borrow its mirth
But has trouble euongh for its own.

আমাদের দেশের আদিবাসীদের কথা বলতে গেলেই এই ধরণের চিন্তা পেয়ে বসে যে, কারা এই আদিবাসী, কি তাদের ইতিহাস, এই যাত্রী মানুষের দল কোথা থেকে এসেছিল, কতটা বদলেছে, তাদের আচার বিচার জীবন যাত্রার প্রণালী গোষ্ঠী চেতনার সামগ্রিক রূপ কি। প্রাচীন যুগ থেকেই খণ্ড খণ্ড ভাবে এদের আমরা দেখেছি, বিশ্লেষণ করেছি—তাদের গায়ের রং মুখের ছবি ভাষার ভঙ্গী। বলেছি, কোথায় গেল সেই অনার্য কৃষ্ণবর্ণ আচারহীন নিষাদ [illegible], [illegible] পিশাচ যজ্ঞের আরম্ভেই যাদের 'নিহন্মি" কামনা করেছেন শ্বেতকায় আর্যগণ। তারা কি মঙ্গোলয়েড টাইপ (যেমন নাগা পাহাড়ের সেমা নাগা) না প্রোটো অষ্ট্রাল (যেমন কোচিন পার্বত্য অঞ্চলের কাদার বা ময়ূরভঞ্জের আদিম অধিবাসী) না সিন্ধু-মেডিটারেনিয়ান টাইপ (যেমন কোচিনের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ বা পাটনার বিহারী ব্রাহ্মণ বা কলকাতার উচ্চবর্ণের মানুষ)। গায়ের রং নিয়েই কত গবেষণা, মস্তকের গঠন পদ্ধতি নিয়েও কত সরব আলোচনা। গাত্রবর্ণ সাদা (**Leucodermic**) না **Xantho dermic** (পীত) না **Melanodermic** (কালো)। মাথার চুল সরল (**Leitrichy**) না মসৃণকুঞ্চিত (**cymotrichy**) না মেষের মত (**wooly, ulotrichy**)। চক্ষুর গঠন নিয়েও জল্পনা কল্পনার অভাব নেই সরল (**Horizontal**) না বাদামিচক্ষু (**almond-shape**) না তির্যক (**mongoloid** এর যেমন)—চক্ষুর তারকাও ধূসর, বাদামী না কৃষ্ণ। নাসিকার গঠনও সরল ও উন্নত, চেপ্টা, বা মধ্যমাকৃতি হতে পারে। সবচেয়ে বেশী গবেষণা হয়েছে—মস্তকের গঠনপদ্ধা নিয়ে, লম্বা (**Dolico-cephalic**), গোল (**Brachy-cephalic**) না মধ্যমাকৃতি (**meso-cephalic**)। ভারতবর্ষে, কর্ণেল ড্যাল্টন রিসলি, গ্রিয়ারসনের যুগ থেকে বিরজাশংকর গুহ, হাটন, ডি, এন, মজুমদার, এস্ দত্তমজুমদার, নির্মল বসু, কে পি চট্টোপাধ্যায় ভোরিয়ার এলউইন, এস্ সি রায় প্রভৃতি বহু মনীষীর দল এই মিছিলে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু **Racial**

type কি ঠিক থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী রক্তের সংমিশ্রণ ঘটছে Racial Formula কষে শ্রেণীবিভাগ প্রায় উঠে গেছে। "Anthropology is regarded with some suspicion in India. There are several reasons for this ..... " এই কথাগুলি ভেরিয়ার এলউইন্ সাহেবের - ১৯৪৪ সালের ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের একটি শাখার সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন।

মনে হয় কবির সত্যদৃষ্টিই এখানে যবনিকা উত্তোলন করতে পারে

কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।

'দিবে আর নবে' 'মিলাবে মিলিবে' শুধু কল্পনা নয়, সিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য, অর্দ্ধসিদ্ধও নয়। শুধু মাফজোক, "এনথ্রোপোমেট্রি" করেই সম্পূর্ণ সত্য নির্ধারণ হয় না।

শতযুগান্ত আগে যে মানুষ যাত্রা করেছে সুরু
সেই যে প্রপিতামহ,
জীবনে মরণে পথের শরণে দুনিয়ার যত পদাতিকদের
একটি প্রণাম সহ।

পথিক মানুষ চলেছে, পাহাড় ডিঙিয়েছে, মরুকান্তার পার হয়েছে, ভেসে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে, কেউ আগে কেউ পরে—হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসে তার পরিচয়পত্র ক্ষীণ হতে বাধ্য—কিন্তু সময়ের সীমার মধ্যে পড়লেই সেই আগমনই হয় আক্রমণ, সেই আক্রমণেই হয় জনপ্রবাহের বিস্তার। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছেড়ে দিলেও আজও ভারতবর্ষে (১) নেগ্রিটো, (২) প্রটো অষ্ট্রলয়েড (৩) মঙ্গোলয়েড (৪) মেডিটারেনিয়ান, (৫) পাশ্চাত্ত্য গোলমুণ্ড (৬) নর্ডিক প্রভৃতি মানুষের শ্রেণীবিন্যাস দেখা যায়। তাছাড়া হাজার হাজার বছর ধরে হয়েছে রক্তের সংমিশ্রণ অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহ, ধর্ম, ভাষা, সামাজিক অবস্থার বিবর্তন। আরীণ বা আর্যদের ধর্ম ভাষা, সামাজিক পদ্ধতি গোষ্ঠীগত বিচার সুপ্রাচীন আদিবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আজও ভারতবর্ষের আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় দুইকোটী—মোটামুটি তারা নিজেদের অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু বলেই পরিচয় দেয়—Tribe-caste mobility অর্থাৎ উপজাতি থেকে হিন্দু সমাজের উচ্চ বর্ণে তাদের

উন্নীত হতে দেখা যায়। ঋগ্বেদের যুগ থেকে মহাভারত রামায়ণ পুরাণ সংহিতার মধ্যে "শূদ্র" কথাটির তাই এতো ব্যাপকতা। বাংলা বিহারের প্রায় ১৭ লক্ষ সাঁওতালদের মধ্যে অন্ততঃ ৬ লক্ষ হিন্দু-আচার ধর্মে বিশ্বাসী, বিহারে ৫ লক্ষ হোর মধ্যে ১ লক্ষের উপর হিন্দু, সাড়ে পাঁচলক্ষ মুণ্ডার মধ্যে দেড় লক্ষ হিন্দু, ৬ লক্ষ ওঁরাও এর মধ্যে সওয়া দুইলক্ষ হিন্দু, ৬ লক্ষ খোন্দদের মধ্যে দেড লক্ষ হিন্দু। মধ্যপ্রদেশের গোন্দরাও অধিকাংশ হিন্দু। কোল পারিয়া করওগা প্রভৃতির অধিকাংশ হিন্দু। রাজস্থানের ভীল ও অন্য অনুন্নত শ্রেণীরা, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, আসামের গারো, খাসী, কুকী, লালুং, মেড্, মিকির, নাগা, কিছু কিছু খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। কিন্তু একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে মুসলমান ধর্ম তাদের আকৃষ্ট করেনি। ছোটনাগপুরে বা আসামে বা মধ্যপ্রদেশে মিশনারীদের যে প্রভাব ও শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে যে আগ্রহ সে ধরণের আগ্রহ মুসলমান প্রচারকদের তো ছিলই না—হিন্দুনেতাদের মধ্যেও কম দেখা যায়। কেবল দেখা যায় যে বৈষ্ণব ধর্মই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আসামের "মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণব ধর্ম" বা বাংলার মহাপ্রভু প্রবর্তিত নামকীর্ত্তন ঝাডখণ্ডে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ' এই শ্রুতিই কি তাদের স্মৃতিকে উজ্জীবিত করেছিল?

বাংলাদেশের পশ্চিম সীমানা হতে আরম্ভ করে একটি উচ্চভূমি অঞ্চল বিন্ধ্য কৈমুর পর্যন্ত প্রসারিত। এর পশ্চিমে আছে মালব মালভূমি, উত্তরে আরাবল্লী, পূবে রাজমহল। এই মালভূমির পূর্ব অংশ ছোটনাগপুর—প্রাচীন নাম ঝাড়খণ্ড—বাংলাদেশের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত (ঝাড়গ্রাম নামটি স্মরণে রাখতে হবে এবং এই মহকুমাতেই সাঁওতাল অধিবাসীদের বেশী সংখ্যা বাস ও বসতি)। গাঙ্গেয় উপত্যকার বাহিরে এই সুবিস্তীর্ণ ভূমিতেই আমরা দেখি সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, বৈগা, গোন্দ, ভূমিয়া, ভূমিজ, ভিল, মীনাদের। প্রশ্ন হচ্ছে,—এরা কি হিমালয়ের পাদদেশে কিরাত বা নিষাদ জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা হতে বিতাড়িত আর্যপূর্ব ভারতবাসী? উপজাতীয় জনসমষ্টির (আজকের ভাষায় **Tribal population**) একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আসাম ও আসাম সীমান্তে বাস করে—এদের বাসভূমি পাতকই ও নাগাপর্বত। লুশাই, জয়ন্তীয়া, গারো পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত নিম্ন আরাকানে বা চট্টগ্রামের চাকমাতেও এদের দেখা যায়। দক্ষিণ

ভারতের টোডারা প্রাচীন গোষ্ঠীর ভাসমান ভগ্নাংশ Pre-Dravidian vedda —এরা প্রটো—অষ্ট্রলয়েড গোষ্ঠীর মানুষ। অনাস (নাসিকাহীন) কৃষ্ণবর্ণ আচারহীন নিষাদ জাতি কারা? আবার হাটনের মতে "The Telegu is the purest mediterranean stock in India" মহাভারতের দুর্যোধনের স্বপক্ষে যে কিরাত ও চীন সৈন্য যুদ্ধ করেছিল তারাই বা কারা? অনেকে বলেন ওরা আসামের কাছাড়ী হিমালয়ের প্রান্তবাসী। ভোটব্রহ্ম শাখার বড় গোষ্ঠীর বোডো। আসামে মাতৃপ্রধান সমাজে তান্ত্রিক আচারবিচার হিন্দুধর্ম গ্রহণে সহায়তা করেছিল। প্রমীলা রাজত্ব হিড়িম্বার দেশ প্রভৃতি কথার কথা নয়, তার মধ্যে অন্তর্নিহিত সত্য এইটুকু যে সভ্যতার সংঘর্ষে আদান প্রদান চলেছে ও চলবে। নাগাদের কথা আজকাল আমরা প্রায়ই শুনি। নাগ বংশ সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে, শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও চম্পায়, কম্বোডিয়ায়, মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ায়। রাঙ্গমী, আও, সেমা, কাচা, বেঙ্গমা, লোটা, কনিবাক, সাংটাল প্রভৃতি বহু শাখায় এই নেগ্রিটো ও অষ্ট্রলয়েড মিশ্রজাতি বিভক্ত। বাংলাদেশের উত্তরেও আছে কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে লেপচা জাতির ইতিহাস। ১৯৫০ সালের জার্নাল অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "কিরাত জন-কৃতি"র' কথা বিবৃত করেন। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে যে অর্জুন যখন হিমালয়ের এক পর্বত শৃঙ্গে কঠোর তপস্যায় রত হলেন, তখন তাঁকে প্রলুব্ধ করবার জন্য উমা ধারণ করলেন কিরাত রাণীর রূপ আর স্বয়ং শিব হলেন কিরাত পুরুষ। বর্তমানের আসামের ইতিহাসের গভীরে ঢুকলেই বোঝা যায় এই সংমিশ্রণের রূপ। মনে পড়ছে শতপথ ব্রাহ্মণের কথা। ঋষি চলেছেন পূর্বাস্য হয়ে বেদবরদ মন্ত্রকণ্ঠে, উষার উদয় পথতীর্থে—তাইতো নাম প্রাগ্-জ্যোতিষ। কিন্তু কামরূপে শুধু তো আর্যরাই আসেননি—আরো পূর্বের অধিবাসী যারা আর যারা এসেছে পরে শিবসাম ব্রহ্ম-থাই-মন দেশের লোক —অহম্ অচম্ অসম্ যারা হয়ে গেল বশিষ্ঠের উপাসক ইন্দ্রের সন্তান, স্বর্গের দেবতাদের বংশধর। আবার যাদের দেখেছি ঝুম্ চাষের ফাঁকে ফাঁকে আ-মা-তি উৎসবে নমক্রিম্ নাচের আশে পাশে সৌমরপীঠে, রত্নপীঠে, কা-মা-ই-খায় কৃষি প্রধান গ্রামীন সভ্যতায়। শুধু মগধ, গৌড় মিথিলা, অঙ্গবঙ্গ, কনৌজ হতেই আসেনি, নেমেছে চীনের প্রান্তর থেকে। অঘোরপন্থী শাক্তর সঙ্গে মিশেছে নাম-ঘোষার বৈষ্ণব। ভারতবর্ষের ইতিহাস, এই বিচিত্র মোজেইককেই

গড়া। এখানে এসেছে সবাই, মিশে গেছে সবাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস তাই সমন্বয়ের ইতিহাস, শ্রদ্ধার ইতিহাস, সব পথ এসে মিশে যায় শেষে একটি বিরাট কলধ্বনিতে। অবশ্য অনেক অনার্য গোষ্ঠী নিজস্ব সত্তা একেবারে বিসর্জন না দিয়েও আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে - আবার অনেকে আগন্তুক-চাপে ক্রমশঃ অরণ্য ও পর্বতের নিম্নতম অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। সব দেশেই তা হয়েছে যেমন অষ্ট্রেলিয়ায় নিউজিল্যাণ্ড বা খাস আমেরিকায়। কিন্তু প্রভেদ এই যে ভারতবর্ষের সমীকরণ একটু বিশিষ্ট ধরণের—সেখানে আদান প্রদানের শুধু কথা নয়, চিহ্নও আছে, চেষ্টাও চলেছে। আদিবাসী অর্থে সাধারণতঃ বোঝানো হয় যারা ঐ ভূখণ্ডের প্রথম বাসিন্দা। অনেকে এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন যে আদিবাসীরা হচ্ছেন মানব গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র বৃহৎ অনগ্রসর বিশেষ গোষ্ঠী, যারা বিভিন্ন স্থানে সভ্যতার অন্তরালে অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর প্রাকৃতির পরিবেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ গঠন করে (Local groups) বাস করে। কিন্তু আসলে "আদিবাসী" হয়তো কেউই নয়—অনগ্রসর বটে। এই সব খণ্ড বা উপজাতির পূর্ব পুরুষরা ইতিহাসের কোন না কোন অধ্যায়ে এই ভূখণ্ডে দেখা গেছে। এরা উপনিবিষ্ট হয়েছিল তারপর নবনব গোষ্ঠীর চাপে আশ্রয় নেয় পর্বতের জঙ্গলে, যেমন নিষাদরা, কিরাতরা, শবররা। বিবাহ যখন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ তখন তাকে অন্তর্বিবাহ বলি (Endogamy) এবং স্বকীয় গোষ্ঠীর বাহিরে এই বন্ধন স্থাপিত হলে তাকে বহির্বিবাহ (Exogamy) বলা হয়। তাছাড়া একবিবাহ (Monogamy), বহুবিবাহ (Polygamy) ব পতিক বিবাহ (Polygny) (যেমন হিমালয়ের খস্ এ অন্তত্র টোডা জাতির বা দ্রৌপদীর পঞ্চপতি প্রথা। এই সব আদিবাসীদের মধ্যে ইন্দ্রজাল, তুকতাক ম্যাজিকে বিশ্বাস প্রবল। তাছাড়া সবসময়ে এদের পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে হয়। মোটামুটি ভারতবর্ষের আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৩৪ রকমের ভাষা প্রচলিত। এক দ্রাবিড় মূল ভাষার উপভাষাই প্রায় পনেরোটি। পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী বলতে আদিবাসী বংশ সম্ভূতদের বলা হয়। তবে তপশিলী সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরো বেশী যেমন Scheduled caste (যারা মূলতঃ হিন্দু) বলতে বাউরী, চামার, মুচি, রুইদাস, ঋষি, ধোবি, দোসাদ, পাশি, রাজওয়ার থেকে বাগদি, ডুলে, কোটাল, লোহার, কোক, মাল, রাজবংশী পাটনী, পোদ, কেওড়া ইত্যাদি আছে এবং পুরুলিয়া জেলায় নাট, ভোগতা,

যৌপল প্রভৃতি আরো নয়টি সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু Scheduled Tribes বলতে যাদের প্রায় সকলেই আদিবাসী -হো সাঁওতাল, ওঁরাও, ভুটিয়া, গারো, মেচ, রাভা, চাকমা, হাজং ভূমিজ ইত্যাদি। একটি উদাহরণ দিই। উত্তরবঙ্গের কোচরা—হাজো রাজার দুই কন্যা হীরা ও জীরা এবং তাদের দুইপুত্র চন্দন ও মদন, বিশু ও শিশু কোচবিহার রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে জড়িত। বিশ্বসিংহের দুই পুত্র নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ। এঁরা একেবারে পুরোপুরি বৈষ্ণব ও হিন্দু রাজা। বাংলা ভাষাও ঐ ধরণে বিবর্ধিত। প্রাচ্য আর্য-শাখার বৈদিক রূপের সঙ্গে পূর্ব-মগধী অপভ্রংশ মিশে গেছে। ভাষায় যেমন, আচার বিচার পূজা পদ্ধতিতেও এই সমীকরণ ও সংমিশ্রণ সুস্পষ্ট, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, শক্তি শৈব সব এক তন্ত্রে মিশে যাচ্ছে। তান্ত্রিকক্রিয়ার সঙ্গে যাদুবিদ্যা ও বৈদিক মন্ত্র মিশে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু সর্বত্রই যে তা হয়েছে তা নয়। পৃথিবীর অন্যত্র বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে তথাকথিত সভ্য-জাতিদের মধ্যে একটা প্রচেষ্টা ছিল তাদের সংস্কৃতির চিহ্ন গুলিকে Anthropological specimens করে রাখা। ভারতবর্ষ চেয়েছিল তাদের আরও একাত্ম করে সমাজ গোষ্ঠীতে মিলিয়ে দিতে, সে উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলের জুয়াং, ভুঁইয়া, খুটিয়া, খন্দ, গরজা শবরই হোক বা বিহারের সাঁওতাল, ওরাং বা মধ্যপ্রদেশের গন্দ বইগা বা আসামের খাসী, নাগা, লুশাই। এক নেফাতেই দেখি পঞ্চান্নটি উপজাতি। ভেরিয়ার এলুইন তাই লিখলেন—A Philosophy for Nefa (1957)। এক সাঁওতালদের মধ্যেই আজও দেখি (১) মুর্মু (পুরোহিত সম্প্রদায়) (২) কিস্কু (রাজা) (৩) হেমব্রম (অভিজাত কুমার) (৪) মারান্ডী (ভূমিজ কিষাণ) (৫) সোরেন (সিপাহী) (৬) হাসডাক (৭) টুডু (বাদক নাচের সঙ্গে যারা বাজায় মান্দারীয়—মন্ত্র কথা থেকে উৎপত্তি কিনা বোঝা যায় না, মন্দ্র অর্থে ধ্বনি)। এ ছাড়া মিশ্র সাঁওতাল আছে তাদের বলা হয় বেদিয়া। ভাষার মধ্যেও বাংলা ও হিন্দী ঢুকে গেছে প্রচুর নাগদের বিষয়ে কথা বলতে গেলে তিনটি গল্প মনে পড়ে - প্রথমটি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের কথা। প্রবাদ আছে যে পুণ্ডরীক নাগ নামে একটি সর্প মনুষ্যবেশ ধারণ করে ঐ যজ্ঞ থেকে পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করে। কাশীতে এসে সে একটি পরম রূপলাবণ্যবতী ব্রাহ্মণ কন্যার দেখা পায়। তাকে বিবাহ করে তারা পুরী-নীলাচলে জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করে। নববিবাহিতা পত্নী কিন্তু লক্ষ্য করে যে তার স্বামীর জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত। ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে যেতে

যেতে ঐ মহিলার প্রসব বেদনা সুরু হয়। এই সময় পুনরায় সে স্বামীর পরিচয় জানতে চায়। তখন ঐ নাগরাজ বলেন যে আমি কে তা বললেই আমার এই দেহের লয় হবে। পত্নী পুত্র প্রসব করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনুষ্য দেহ হতে একটি বিরাট অজগর সর্প বেরিয়ে বনের দিকে চলে যায় এবং ঐ দেহটি মৃত বলে প্রতিভাত হয়। সাধ্বী স্ত্রী পতিদেহ সমভিহারে চিতায় আরোহণ করেন ও নবজাতকের ভার গ্রহণ করেন এক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ। তাঁরই নাম ফণীমুকুট রায়, কিম্বদন্তী যে তিনিই ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ এবং এই ভাবেই নাগবংশের বিস্তৃতি হয়। আধুনিক কালে এইখানেই (দুর্জন শালগড়) একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুণ্ডা বিদ্রোহের সূত্রপাত, যার উদ্গাতা ছিলেন এমন একটি মানুষ, যাকে বলা হোত "ভগবান"। 'বিরশা ভগবানের' কথা ও কাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের গল্প এবং তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ ও প্রমান আছে। শ্রদ্ধেয় এস্ সি, রায়ের মুণ্ডা ও তাদের দেশে (The Mundas and their Country) এর বিবরণী আছে, এমন কি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের রায়েও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি তরুণ যুবক এর নেতা—সে ছিল জন্মসূত্রে আদিবাসী, ধর্মে প্রথম জার্মান্ লুথেরান (German Lutheran), রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনেছে, পড়েছে। অর্জুন, ভীম, হনুমানের বীরত্ব কথা শুনেছে। তারপর এই খ্রীষ্টিয়ান যুবক কীর্ত্তন শিখলে এক বৈষ্ণব গুরুর কাছে, যৌগিক আসন প্রাণায়াম শিক্ষা করলে, আর কিছু টোটকাটুটকি ওষুধের ব্যবহার আয়ত্ত করলে, যাতে তার নাম হয়ে গেল ভিষক্‌রাজ বলে (Miracle maker), রোগীকে স্পর্শ করলেই সে সেরে যায়। একদিন জলঝড়ের মধ্যে চমকিত বিদ্যুতের আলোতে তাকে তার সঙ্গী আর একজন মুণ্ডা যুবক দেখলে যেন সে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। সে প্রচার করে বেড়াতে লাগলো যে স্বয়ং সিঙ্গাবোঙ্গা ওকে দর্শন দিয়েছেন, ওর জ্যোতি লাভ হয়েছে এবং বিরশা যত কিছু অত্যাচার, অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে দৃঢ় সংকল্প। দলে দলে লোকে রাঁচির গিরিদেবী অরণ্যে বিরশার দলে যোগ দিতে লাগলো। তার প্রচারকরা তার অলৌকিক ক্ষমতার কথা সর্বত্র রটিয়ে দিলো, তারা বললে বিরশার আশ্রম ছাড়া সর্বত্রই দেবতার কোপ পড়বে—অতএব চলো থামার থামার চালকাদ গ্রামে। শেষকালে স্বয়ং পুলিশের বড় সাহেব গিয়ে চুপিচুপি নিদ্রিত বিরশার মুখে রুমাল চাপা দিয়ে তাকে বন্দী করেন ও হাতি পৃষ্ঠে দ্রুত পলায়ন করেন।

অবশ্য একথা সত্য এবং ইংরাজ অফিসাররাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে জমিদার, তালুকদার, কাটকিনদারদের অত্যাচারে আদিবাসীরা প্রপীড়িত ছিল এবং বিরশা ভগবানই এই চত্বরে প্রথম আন্দোলন সুরু করেন—লাঙ্গল যার জমি তার। এমনও প্রবাদ আছে যে যেদিন বিরশাকে রাঁচি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়, সেদিন নাকি দৈবরোষে জেলের একটি দেওয়াল ভেঙে পড়ে যায়। বিরশার ও তার অনুচবদের কারাদণ্ড হয় কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষাট বছর শাসন-পূর্তি উপলক্ষে (১৮৯৭) তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু শোষিত অত্যাচারিত আদিবাসীদের পক্ষ নিয়ে পুনরায় বিরশা ভগবান মেতে উঠলেন এবং পুনরায় তাঁকে ব্রিটিশরাজ বন্দী করতে বাধ্য হয় এবং সেবারই তিনি জেলে কলেরায় মারা যান। এঁর প্রচারের একটি দিক ছিল যা গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়—বিরশা বলতেন অহিংস আন্দোলন গড়ে তোলো, মনে জ্ঞানে পবিত্র হও, মদ্যপান করো না, সত্যকথা বলবে—তা হলে দেবতা হবেন সুপ্রসন্ন—সেই জীবনের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। যীশু, চৈতন্য, বৈষ্ণব প্রচারকরা এবং আদিবাসী সংস্কৃতি সব মিলে মিশে তার মানস ক্ষেত্রের উর্বরতা গড়ে তুলেছিল।

একটি কাহিনী বলেই গল্পবলার পালা শেষ করা যাক। এটি খসিয়া উপকথা। উছ্‌লেন নামে এক বিরাটকায় সর্পের অস্তিত্বে বিশ্বাসী খাসিয়ারা। নবরক্ত ছাড়া তার তৃপ্তি হয় না। চেরাপুঞ্জীর নিকট এক গুহায় সে বাস করতো, সে আশেপাশের সব জন্তু জানোয়ারকে গিলে ফেলতে লাগলো। তখন খাসিয়ারা ঠিক করলে যে প্রত্যহ একটি করে ছাগল ঐ সর্প দেবতাকে নৈবেদ্য দেওয়া হবে। প্রতিদিন এই ভোজন উপকার পেয়ে সর্পটি খুশী, সে আর গুহার বাহিরে যায় না খাদ্য সন্ধানে এবং একটি সংকেত ধ্বনি শুনলেই মুখ ব্যাদান করে থাকে মাংস পিণ্ডের লোভে। এমনি ভাবে কিছু-দিন গেলে একদিন একটি জলন্ত লৌহ পিণ্ড ওর মুখে ঢুকিয়ে দিলে ওর মৃত্যু হয়। কিন্তু বিপদের সেই শেষ নয়। খাসিয়ারা তখন দেহটি টুকরো টুকরো করে কেটে পুড়িয়ে দিলে, কিন্তু একটি মাংসখণ্ড কোথায় কেমন করে পড়েছিল, তাই থেকে রক্তবীজের মত লক্ষ লক্ষ সর্প খাসিদের দেশ ছেয়ে ফেলে। কিন্তু ঐ সর্পরাজের বংশধরেরাই ঐ দেশের রক্ষা কর্ত্তা। সর্প সংকুল পল্লীতে সর্প দেবতার কল্পনা অন্যত্রও পাওয়া যায়। মনসার পূজা, ভাসান, গান, নৃত্য আজও পূর্ববঙ্গে সমধিক প্রচলিত। আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে আর্যদের

শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি এমন ভাবে মিলে গেছে যে আজকের আমরা এক যুক্ত সংস্কৃতিরই বাহক ও ধারক। অথচ এই বিরাট দেশে নানা ধারা এসে মিশেছে তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট আছে এবং সকলেই এই ভারতের মহা-মানবের সাগর তীরে তর্পণ করে মহাভারতের সৃষ্টি করেছে।

———